রবীন্দ্রনাথ

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
জসীম উদ্‌দীন
মুহম্মদ আবদুল হাই
মুহাম্মাদ কুদরাত-এ-খুদা
আবুল ফজল
শওকত ওসমান
আবদুল মান্নান সৈয়দ
কাজী মোতাহার হোসেন
আহমদ শরীফ
গোলাম মুরশিদ
মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী
মযহারুল ইসলাম
আবদুল কাদির
জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা
হাসান হাফিজুর রহমান
কবীর চৌধুরী
সারওয়ার মুরশিদ
মুনীর চৌধুরী
নীলিমা ইব্রাহিম
আনোয়ার পাশা
সন্তোষ গুপ্ত
সন্‌জীদা খাতুন
হায়াৎ মামুদ
শামসুর রাহমান
আহমদ ছফা
রফিকুল ইসলাম
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
অজিতকুমার গুহ
রণেশ দাশগুপ্ত
আনিসুজ্জামান



সম্পাদক
আনিসুজ্জামান

রবীন্দ্রনাথ

সম্পাদক
আনিসুজ্জামান

দ্বিতীয় মুদ্রণের মুখবন্ধ

পাকিস্তান সরকারের পরোক্ষ বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯৬১ সালে পূর্ব বাংলায় রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিক উদ্‌যাপিত হয়েছিল সাড়ম্বরে। তবে *সমকালের* একটি বিশেষ সংখ্যা ছাড়া সমকালীন পূর্ব বাংলায় রবীন্দ্রভাবনা ধরে রাখার কোনো সার্থক প্রয়াস হয় নি। তার আগে ও পরে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এখানে বিভিন্ন লেখকের বই প্রকাশিত হয়েছিল এবং তার কয়েকটিই ছিল মূল্যবান। তবু রবীন্দ্রনাথবিষয়ে পূর্ব বাংলার লেখকদের রচনা একটি সংকলন-আকারে প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা রয়ে গিয়েছিল।

এই ধরনের বোধ থেকে ১৯৬৭ সালে আমার দুই ছাত্র, আহমদ ছফা ও কাজী সিরাজ, অনুরূপ একটি সংকলন প্রকাশের উদ্‌যোগ নিতে আমাকে অনুরোধ করে এবং তা প্রকাশ করার দায়িত্ব নিতে যিনি সম্মত হন—স্টুডেন্ট ওয়েজের মোহাম্মদ ওহিদউল্লাহ্—তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয়। তখনকার পরিস্থিতির আরো একটি দিকের কথা উল্লেখযোগ্য। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পরে পূর্ব বাংলায় রবীন্দ্রনাথের বইসহ ভারতীয় প্রকাশনা আসা বন্ধ হয়ে যায় এবং বেতারে-টেলিভিশনে রবীন্দ্রনাথের রচনাসহ ধ্রুপদী বাংলা সাহিত্যের অনেক রচনাপ্রচারে অলিখিত বাধা এসে উপস্থিত হয়।

সংকলনের কাজে হাত দিয়ে বিষয় স্থির করে আমি প্রায় পঞ্চাশ জন লেখকের কাছে প্রবন্ধ চেয়ে চিঠি দিই। তার মধ্যে অনেক লেখক সম্মতিজ্ঞাপন করেন, অনেকে অন্য বিষয়ে লেখার প্রস্তাব করেন, অনেকে নতুন লেখার পরিবর্তে তাঁদের প্রকাশিত রচনা গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। কেউ কেউ আবার সম্ভাব্য সরকারি প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কায় লিখতে বিরত থাকেন, কেউ কেউ কর্মব্যস্ততার কারণে শেষ পর্যন্ত লিখে উঠতে অসমর্থ হন। আমার ফরমায়েশি লেখা পেয়েছিলাম ষোলো-সতেরোটা। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌কে আমি কোনো বিষয় নির্ধারণ করে দিই নি, তিনি নিজেই তা স্থির করেছিলেন এবং আমাকে বলেছিলেন শ্রুতিলিখন নিতে। একদিন তাঁর বেগমবাজারের বাড়িতে, আরেকদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে তাঁর অফিসে বসে তিনি মুখে মুখে বলে গিয়েছিলেন, আমি লিখে নিয়েছিলাম—পরে অনুলিপি তিনি সংশোধন করে দিয়েছিলেন। অন্তিম অসুস্থতার আগে এটাই যদি তাঁর শেষ লেখা হয়ে থাকে, তাহলে বিস্মিত হব না।

পরিকল্পনা করার পর থেকে গ্রন্থপ্রকাশ হওয়া পর্যন্ত বেশ সময় নিয়েছিল। তারই মধ্যে ১৯৬৭ সালের ২২ জুন কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবউদ্দীন পাকিস্তান জাতীয় সংসদে ঘোষণা করেন যে, দেশের প্রচারমাধ্যম থেকে ভবিষ্যতে পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পরিপন্থী রবীন্দ্রসংগীত প্রচার করা হবে না এবং এ-ধরনের অন্যান্য গানেরও প্রচার হ্রাস করা হবে। সঙ্গে সঙ্গেই

আমরা উনিশ জন লেখক এর প্রতিবাদে একটি বিবৃতি দিই। তারপর এ-বিষয়ে বেশ কিছুকাল বাদানুবাদ চলে এবং শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় তথ্য মন্ত্রণালয় মৌখিক আদেশ দিয়ে সংবাদপত্রে এ-সম্পর্কে লেখালিখির প্রকাশ বন্ধ করেন। এই বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমাদের পরিকল্পিত সংকলন ভিন্ন চারিত্র অর্জন করে। ১৯৬৮ সালে বইটি প্রকাশিত হলে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের সভাপতিত্বে একটি প্রকাশনা-অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। সভায় সংকলনের লেখকদের উপস্থিতি, শ্রোতাসমাগম, বক্তাদের আলোচনা এবং পরদিন সংবাদপত্রে গুরুত্বসহকারে তার বিবরণ-প্রকাশ *রবীন্দ্রনাথ*-কে তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্যে মণ্ডিত করে। আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্র থেকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এর অনুকূল সমালোচনা করেন। স্বপন মজুমদার বইটির ভারতীয় সংস্করণ-প্রকাশে আগ্রহ দেখান, কিন্তু আমার সাহসের অভাবে তা সম্ভবপর হয়ে ওঠে নি।

পরবর্তীকালে অনেকে এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে, *রবীন্দ্রনাথ* শুধু রবীন্দ্রবিষয়ে নয়, সাধারণভাবে পূর্ব বাংলার সাহিত্যসমালোচনার একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সংকলনের মর্যাদালাভ করেছে। এর সকল রচনার মান যে একরকম ছিল, তা নয়। তবে এতে প্রবীণ ও নবীন লেখকদের রচনা যেমন ছিল, তেমনি লেখকদের সাহিত্যরুচির ভিন্নতা এবং সাহিত্যসমালোচনার মানদণ্ডের পার্থক্যও স্পষ্টত ধরা পড়েছিল। সুতরাং একথা বললে হয়তো অতিশয়োক্তি হবে না যে, সংকলনটি পরিণামে উদ্দেশ্যের সাময়িকতা অতিক্রম করে গিয়েছিল।

প্রকাশের অল্পকালের মধ্যেই বইটি দুষ্প্রাপ্য হয়ে যায়। বার দুই পুনঃপ্রকাশের বিফল চেষ্টাও হয়। কেউ কেউ পরামর্শ দিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে এখানে প্রকাশিত রবীন্দ্রবিষয়ক রচনার নির্বাচিত সংগ্রহ দিয়ে এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করতে—তাও হয়ে ওঠে নি। আলমগীর রহমানের আগ্রহে বইটি এখন পুনর্মুদ্রিত হল। সুহৃদ হায়াৎ মামুদ কেবল নতুন মুদ্রণের প্রুফ দেখে দেন নি, প্রথম প্রকাশকালে বইতে যেসব ভুল রয়ে গিয়েছিল, সেগুলোও দূর করেছেন। এঁদের কাছে আমি ঋণী।

তিরিশ বছরেরও বেশি পরে বইটি পুনঃপ্রকাশ করতে গিয়ে বিশেষভাবে শ্রদ্ধানিবেদন করছি এর যেসব লেখক আর আমাদের মধ্যে নেই তাঁদের প্রতি। এঁদের মধ্যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন চার জন, দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন এক জন, আরো এগারো জন আগে-পরে মৃত্যুবরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি যিনি এঁকে দিয়েছিলেন, তিনি আর নেই, এবং যিনি প্রচ্ছদ অঙ্কন করেছিলেন, তিনিও সম্প্রতি আমাদের ছেড়ে গেছেন। এ দুজনকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

১৯৬৭ সালে রবীন্দ্রসংগীত-সম্পর্কিত উনিশ জনের বিবৃতির মূল কৌতূহলোদ্দীপক হতে পারে মনে করে, বইয়ের শেষে তার প্রতিলিপি পুনর্মুদ্রিত হল।

আনিসুজ্জামান

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৩০ জানুয়ারি ২০০১

নিবেদন

পূর্ব পাকিস্তানে রবীন্দ্রনাথের চর্চা ও অনুশীলন যতটা হয়েছে, সে তুলনায় তাঁর সম্পর্কে এখানে প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা নগণ্য। বিচ্ছিন্নভাবে এ বিষয়ে যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের রচনাকে স্থায়ী আকার দেবার কোনো প্রচেষ্টা হয় নি। প্রধানত এই অভাববোধ থেকেই বর্তমান সংকলনের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তবে রবীন্দ্রসাহিত্যের চর্চায় নিয়োজিত সকল বিদ্বজ্জনের রচনা এতে সংকলিত হয় নি—এ ধরনের সংগ্রহে তা হওয়া সম্ভবপরও নয়। তবু পূর্ব পাকিস্তানের তিরিশ জন লেখকের রচনার এই সংকলন আমরা দ্বিধাহীনচিত্তে পাঠকের হাতে তুলে দিচ্ছি। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এ দেশের ও একালের ভাবনার যে-স্বাক্ষর এ-বইতে ধরা পড়েছে, তার একটা বিশেষ মূল্য আছে। লক্ষ করা যাবে যে, সংকলিত প্রবন্ধগুলোর কোনোটিতে রবীন্দ্রনাথের যে-দিকটার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, অন্য কোনোটিতে হয়তো তাকেই বিশেষ করে নাকচ করা হয়েছে। দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তন শুধু রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নয় সাধারণভাবে পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যসমালোচনার ধারা বুঝতেও আমাদেরকে সাহায্য করবে।

এ-বইতে রবীন্দ্রসাধনার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় ধরা পড়েছে, এমন দাবি করার কারণ নেই। তবে রবীন্দ্রনাথের কথা বলতে গিয়ে সংকলনের লেখকেরা তাঁর কবিতা ও নাটক, উপন্যাস ও ছোটগল্প, সংগীত ও চিত্রকলার আলোচনা করেছেন; তাঁর অধ্যাত্মভাবনা ও সমাজচিন্তা, দর্শন ও ধর্মচেতনা, সাহিত্যতত্ত্ব ও সৌন্দর্যবোধ, ব্যক্তিহৃদয় ও প্রেমানুভূতি, মূল্যবোধ ও গণসচেতনতা, ভাষাতত্ত্ব-চর্চা ও শিক্ষাবিষয়ক চিন্তার পরিচয় দেবার প্রয়াস পেয়েছেন। দেশী বিদেশী সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের স্বরূপ কী, অনুবাদে তাঁর কাব্যের আস্বাদ কেমন, তাঁর সাহিত্যের মূল্যায়নের সমস্যা কী, তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ ও প্রকৃতি কী প্রেরণা দিয়েছে এবং পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যচর্চায় তিনি কী প্রেরণা দিচ্ছেন, এসব কথাও এই সংকলনের বিভিন্ন প্রবন্ধে বলা হয়েছে। হয়তো কোনো কোনো দিক—যেমন কবিতা বা উপন্যাস—সম্পর্কে পূর্ণতর আলোচনা প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু সে ত্রুটি সংশোধন করতে গেলে সংকলনের কলেবরই শুধু বাড়ত না, তা প্রকাশ হতেও অনেক দেরি হয়ে যেত।

বছর দেড়েক আগে এই সংকলনের প্রস্তাব নিয়ে আসে আমার দুজন প্রাক্তন ছাত্র, আহমদ ছফা ও কাজী সিরাজ। এই পরিকল্পনায় বর্তমান

প্রকাশককে তারাই উৎসাহী করে তোলে। সেজন্যে আমার ধন্যবাদ তাদের প্রাপ্য। বইটি অনেক আগেই প্রকাশিত হবে বলে সকলে আশা করেছিলাম। কিন্তু সময়মতো সব লেখা হাতে এসে পৌঁছোয় নি। সংকলনটির প্রকাশ তাই এত বিলম্বিত হল এবং তাই বিষয়ের ক্রম রক্ষা করে প্রবন্ধগুলো সন্নিবেশ করা গেল না।

এই সংকলনের কোনো কোনো রচনার সাক্ষাৎ অন্যত্র মিলবে। কবি জসীমউদ্‌দীনের লেখাটি তাঁর 'ঠাকুরবাড়ির আঙিনায়' (ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৩) গ্রন্থের "রবীন্দ্র–তীর্থে" প্রবন্ধের সংক্ষেপিত রূপ। অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই ও ডক্টর সারওয়ার মুরশিদের প্রবন্ধ দুটি 'সাহিত্য পত্রিকা'য় (বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৮) প্রকাশিত হয়; বর্তমান সংকলনে শেষোক্ত রচনাটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়েছে। জনাব আবদুল মান্নান সৈয়দের প্রবন্ধটি এই সংকলনের জন্যে লেখা; তবে তা 'সমকাল' পত্রিকাতেও (বৈশাখ–শ্রাবণ ১৩৭৪) প্রকাশ পেয়েছে। ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেনের রচনাটি প্রথম মুদ্রিত হয় 'পূর্বমেঘ' পত্রিকায় (বৈশাখ–আষাঢ় ১৩৬৮)। ডক্টর আহমদ শরীফের প্রবন্ধটি প্রথমে এই সংকলনে মুদ্রিত হলেও তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত *'বিচিত–চিন্তা'* (কথাকলি, ১৯৬৭) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। জনাব মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর লেখাটি সংগৃহীত হয়েছে তাঁর 'রবি–পরিক্রমা' (কোয়ালিটি পাবলিশার্স, ১৯৬৩) বই থেকে। ডক্টর জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার প্রবন্ধ 'সমকালে' (রবীন্দ্র–সংখ্যা, ১৩৬৮) প্রকাশিত তাঁর আলোচনার পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত রূপ। জনাব হাসান হাফিজুর রহমানের প্রবন্ধটি নেওয়া হয়েছে তাঁর 'আধুনিক কবি ও কবিতা' (বাঙলা একাডেমী, ১৯৬৪) গ্রন্থ থেকে। এসব প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণের সুযোগ দেবার জন্যে তাদের প্রকাশকদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর সেইসঙ্গে এই সংকলনের সকল লেখককে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি তাঁদের সহযোগিতার জন্যে।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন এই সংকলনে প্রকাশের জন্যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি অঙ্কন করে দিয়ে এই বইয়ের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

গ্রন্থটি মুদ্রণের ব্যাপারে শিল্পীবন্ধু কাইয়ূম চৌধুরীর উপদেশ লাভ করে উপকৃত হয়েছি। প্রকাশক জনাব মোহাম্মদ ওহিদউল্লাহ্‌র সহযোগিতার কথাও এই সঙ্গে উল্লেখ করা দরকার।

যত্ন নেওয়া সত্ত্বেও বইটিতে বেশ মুদ্রণ–প্রমাদ রয়ে গেল। যেমন, ৯৯ পৃষ্ঠার শেষ দিকে "গেঁজিয়ে" হয়েছে "সেঁজিয়ে" আর "Angst" ছাপা হয়েছে "Augst"। ১০৪ পৃষ্ঠার শেষে "এ্যানালজিকাল" হয়ে আছে "এ্যানালসল"। ১৪৯ পৃষ্ঠায় 'রবীন্দ্র জীবনী'র উদ্ধৃতিতে "গাছ" হয়ে গেছে "পাছ"। ১৫১ পৃষ্ঠার পঞ্চম পঙ্‌ক্তিতে "নিয়তি নির্দিষ্ট" কথাটা ছাপা হয়েছে "নিয়মিত নির্দিষ্ট"। ১৫২ পৃষ্ঠার শেষ পঙ্‌ক্তিতে "বিশ্বাসবোধের" জায়গায় "বিশ্ববোধ" হবে। ৫৪০ পৃষ্ঠায়

রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতিতে "অভ্যস্ত পাপের সম্বন্ধে" ভুলে ছাপা হয়েছে "অত্যন্ত পাপের সম্বন্ধে"। তালিকা বাড়াতে গেলে আরো ভুল হবার সম্ভাবনা থাকবে। ২৫৭ থেকে ২৮৮ পৃষ্ঠা যে ভ্রমক্রমে ১৫৭ থেকে ১৮৮ রূপে মুদ্রিত হয়েছে, তা না বললে হয়তো পাঠকের চোখেও পড়বে না।

ক্রটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথবিষয়ে আমাদের প্রথম সংকলন প্রকাশ করতে পেরে আজ অপরিসীম তৃপ্তিবোধ করছি।

আনিসুজ্জামান

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২২ শ্রাবণ ১৩৭৫



রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি : শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন-অঙ্কিত

.... নির্মম কঠোরতা মেরেছে ঢেউ
আমার নৌকার ডাইনে বাঁয়ে,
জীবনের পণ্য চেয়েছে ডুবিয়ে দিতে
নিন্দার তলায়, পঙ্কের মধ্যে।
বিদ্বেষে অনুরাগে
ঈর্ষায় মৈত্রীতে,
সংগীতে পরুষ কোলাহলে
আলোড়িত তপ্ত বাষ্পনিঃশ্বাসের মধ্য দিয়ে
আমার জগৎ গিয়েছে তার কক্ষপথে।
এই দুর্গমে, এই বিরোধ-সংক্ষোভের মধ্যে
পঁচিশে বৈশাখের প্রৌঢ় প্রহরে
তোমরা এসেছ আমার কাছে।
জেনেছ কি,
আমার প্রকাশে
অনেক আছে অসমাপ্ত
অনেক ছিন্ন বিচ্ছিন্ন
অনেক উপেক্ষিত?

অন্তরে বাহিরে
সেই ভালো মন্দ
স্পষ্ট অস্পষ্ট,
খ্যাত অখ্যাত,
ব্যর্থ চরিতার্থের জটিল সংমিশ্রণের মধ্য থেকে
যে আমার মূর্তি
তোমাদের শ্রদ্ধায়, তোমাদের ভালোবাসায়,
তোমাদের ক্ষমায়
আজ প্রতিফলিত,
আজ যার সামনে এনেছ তোমাদের মালা,
তাকেই আমার পঁচিশে বৈশাখের
শেষবেলাকার পরিচয় বলে
নিলেম স্বীকার করে,
আর রেখে গেলাম তোমাদের জন্যে
আমার আশীর্বাদ।
যাবার সময় এই মানসী মূর্তি
রইল তোমাদের চিত্তে,
কালের হাতে রইল বলে
করব না অহংকার। ....

সূচিপত্র

রবীন্দ্রনাথ

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

মরমী রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে বলেছেন :

> বৈষ্ণব ধর্মমত ও পদাবলী আমার পিতার হৃদয়কে অধিকার করে নাই, সে আমি জানি। তাঁহার রসভোগের সখা ছিলেন হাফেজ। তিনি নিজে কাব্য রচনা করিতে পারেন নাই, তাঁহার সেই আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়াছিলেন হাফেজের গানে। উপনিষদ তাঁহার ক্ষুধা মিটাইত আর হাফেজ তাঁহার তৃষ্ণা দূর করিয়াছিল।

তাঁহার উপযুক্ত পুত্র শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেন পিতার উত্তরাধিকারসূত্রে পারস্যের মরমীয়াবাদ গান কবিতায় প্রকাশ করেছিলেন। সেই হিসাবে তাঁকে বাংলা ভাষার সুফি কবি বলা যেতে পারে। আমি এখানে তাঁর তিনটি কবিতা থেকে তাঁর আধ্যাত্মিকতার দিকটা পরিস্ফুট করছি।

প্রথমে তাঁর "উর্বশী" কবিতার কথা বলি। আমি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে "উর্বশী" কবিতার একটি আবৃত্তি রেকর্ড করিয়েছিলাম। আমার অধ্যাপকেরা বলেছিলেন, "মানে তো কিছু বুঝলাম না, কিন্তু এর সঙ্গীত বড় সুন্দর লাগে।" এই উর্বশী পৌরাণিক উর্বশী নয়। কোনো লোকের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। নারীমাত্রেই হয় মাতা, নয় কন্যা, নয় বধূ। কিন্তু উর্বশী এর কোনোটাই নয়—"নহ মাতা নহ কন্যা, নহ বধূ সুন্দরী রূপসী"। তবে কবির উর্বশী কী? আমি মনে করি, সে হচ্ছে অরূপ সৌন্দর্য (ideal beauty)। আদিম কাল থেকেই মানুষের মনে সৌন্দর্যপিপাসা জেগেছিল। আর এই সৌন্দর্যলাভের জন্য কত মারামারি হানাহানি হয়েছে। প্রাচীন গ্রিসের হেলেন, ভারতের সীতা, মধ্যযুগের পদ্মিনী এর জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। কুরআন শরিফে হাবিল ও কাবিলের যে বৃত্তান্ত আছে, তাতে দেখা যায় যে, কাবিল হাবিলকে হত্যা করেছিল। এর কারণ বলা হয়েছে, কাবিলের নারীসৌন্দর্যের পিপাসা। সেই সৌন্দর্যপিপাসার কথাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

যুগ যুগান্তর হতে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী,
হে অপূর্বশোভনা উর্বশী!
মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল,
তোমারি কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল,

এই সৌন্দর্যলাভে যারা বঞ্চিত হয়েছে, তাদের কথা কবি বলেছেন :

জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা,
ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণশোণিমা।

পৌরাণিক উর্বশীর ন্যায় রবীন্দ্রনাথের উর্বশী স্বর্গবাসিনী নয়। সে হচ্ছে,

অখিল মানসস্বর্গে অনন্তরঙ্গিণী,
হে স্বপ্নসঙ্গিনী!

সৌন্দর্যপিপাসা মানুষকে উদ্‌ভ্রান্ত করেছে। কবি বলেন :

ওই শুন দিশে দিশে তোমা লাগি কাঁদিছে ক্রন্দসী,
হে নিষ্ঠুরা বধিরা উর্বশী।

এই অরূপ সৌন্দর্যলাভের জন্য এখনো অশেষ আনন্দের মধ্যে মানুষের মনে বিষাদের কালো মেঘ ছেয়ে আসে। তাই কবি বলেছেন :

ফিরিবে না, ফিরিবে না—অস্ত গেছে সে গৌরবশশী,
অস্তাচলবাসিনী উর্বশী।
তাই আজি ধরাতলে বসন্তের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
কার চিরবিরহের দীর্ঘশ্বাস মিশে বহে আসে,
পূর্ণিমানিশীথে যবে দশ দিকে পরিপূর্ণ হাসি
দূরস্মৃতি কোথা হতে বাজায় ব্যাকুল-করা বাঁশি—
ঝরে অশ্রুরাশি।

ইসলামবিশ্বাসী মানুষের বিশ্বাস, 'ইন্নাল্লাহা জমীলুন ও য়ুহিব্বুল জমাল' (হাদীস)—আল্লাহ্ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে ভালবাসেন। এ সৌন্দর্যপিপাসা মানুষেরও আছে, কিন্তু তার পূর্ণ তৃপ্তি মরজগতে হয় না। মরণের পরে বেহেশ্‌তের আনন্দধামে তার সৌন্দর্যপিপাসা মিটবে। কবিও বলেন :

তবু আশা জেগে থাকে প্রাণের ক্রন্দনে,
অয়ি অবন্ধনে!

'উৎসর্গ' কাব্যগ্রন্থের "বিরহিণী" কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেন :

আমার মাঝারে যে আছে কে গো সে,
কোন বিরহিণী নারী?

এই বিরহিণীকে নিয়ে কবি বড় বিব্রত। কবি বলেন :

আপন করিতে চাহিনু তাহারে
কিছুতেই নাহি পারি।
রমণীরে কে বা জানে—
মন তার কোন্‌খানে?
সেবা করিলাম দিবানিশি তার,
গাঁথি দিনু গলে কত ফুলহার,

কিন্তু

কিছু দিন যায়, একদিন হায়
ফেলিল নয়নবারি—
"তোমাতে আমার কোনো সুখ নাই"
কহে বিরহিণী নারী।

কবি বিরহিণীকে কত রত্ন-অলঙ্কার দিলেন, রাত জেগে চন্দন-ভেজা বায়ে তাকে ব্যজন করলেন, কনকখচিত পালঙ্কের 'পরে তাকে বহু সমাদর করে বসালেন, কিন্তু

কিছু দিন যায়, লুটায়ে ধুলায়
ফেলিল নয়নবারি—
"এসবে আমার কোনো সুখ নাই"
কহে বিরহিণী নারী।

তখন কবি বিরহিণীকে নিয়ে দিগ্বিজয়ে বের হলেন—তিনি তাঁর রথের সারথি হলেন। চারদিকে জয়জয়কার হল, কিন্তু

"হৃদয় কুড়ায়ে কোনো সুখ নাই"—
কহে বিরহিণী নারী।

তখন কবি বড় ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন :

আমি কহিলাম, "কারে তুমি চাও
ওগো বিরহিণী নারী।"
সে কহিল, "আমি যারে চাই, তার
নাম না কহিতে পারি।"
দিন চলে যায়, সে কেবল হায়
ফেলে নয়নের বারি।
"অজানারে কবে আপন করিব"
কহে বিরহিণী নারী।

এই বিরহিণী নারী কে? আমি মনে করি, সে মানুষের আত্মা।

ইসলামের ধারণায়, আল্লাহ্‌র উক্তিতে বলা হয়েছে, "যে আমার স্মরণে বিমুখ, নিশ্চয় তার জন্যে তার জীবন সংকীর্ণ" (কুরআন, ২০/১২৪)। আরো বলা হয়েছে, "অবগত হও, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র স্মরণে হৃদয় সমূহ শান্তি পায়" (কুরআন, ১৩/২৮)। এই যে বিরহিণীর আকাঙ্ক্ষিত— যার "নাম না কহিতে পারি"—সুফিরা বলেন,

বনামে আঁকে হেচ নামে নদারদ।
বহর নাম কে খানী সরবর্ আরদ্।।

অর্থাৎ তাঁর নাম নিয়ে আরম্ভ করি, যাঁর কোনো নাম নেই; যে নামেই তুমি ডাক, সে নামেই তিনি সাড়া দেন। হাফিয বলেছেন :

আজ মন জুদা মশও কে তূআয নূরে দীদঈ।
আসরামে জানো মুনিসে কল্‌বে রমীদঈ।।
"তুমি যে আঁখির আলো আমায় ছেড়ে যেও না
তুমি যে প্রাণ-জুড়ানো ব্যাকুল হিয়ার চেতনা।"

কুরআন শরিফে আছে, "হে মানুষ, তুমি তোমার প্রভুর জন্য চেষ্টায় চেষ্টিত হও; অনন্তর তুমি তার সাক্ষাৎ পাবে।" (কুরআন; ৮৪/৬)।

রবীন্দ্রনাথের "কৃপণ" কবিতা আলোচনা করি। তিনি বলেন, এক ভিখারি গ্রামের পথে পথে ভিক্ষা করে ফিরছিল। সেই সময়ে মহারাজ যাচ্ছিলেন স্বর্ণরথে চড়ে। সহসা রথ থেমে গেল।

'আমায় কিছু দাও গো' বলে
বাড়িয়ে দিলে হাত।

ভিখারি বড় নিরাশ হল, বড় লজ্জিতও হল। ঝুলি থেকে একটি ছোট কণা তুলে দিল। ঘরে

ফিরে এসে সে দেখল, তার ঝুলির মাঝে একটি ছোট সোনার কণা রয়েছে। ভিখারি বলছে,

দিলেম যা রাজ-ভিখারিরে
স্বর্ণ হয়ে এল ফিরে,
এখন কাঁদি চোখের জলে
দুটি নয়ন ভরে—
তোমায় কেন দিইনি আমার
সকল শূন্য করে।

এই ভিখারি হচ্ছে পরম কৃপণ।

পারসি কবি কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন :

হর চেদারী সরফ্ কুন্ দর্‌রাহে হূ।
লান্‌তনালুল বিররা হাত্তা তুনফিকূ।।

অর্থাৎ "তোমার যা কিছু আছে, তাঁর পথে সব বিলিয়ে দাও। কেননা, (কুরআন বলেছে) তোমাদের কিছুতেই মঙ্গললাভ হবে না, যে পর্যন্ত না (যা তোমরা ভালবাস) আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করবে।" কুরআনে আছে, "কে আছে আল্লাহ্‌কে উত্তম দান দেবে, তা তিনি বহুগুণে বাড়িয়ে দেবেন" (কুরআন, ২/২৪৫)।

জসীম উদ্‌দীন

রবীন্দ্র-স্মৃতি

এতদিন পরে কিছুতেই ভালোমতো মনে করিতে পারিতেছি না, কোন্ সময়ে প্রথম রবীন্দ্রনাথের নাম শুনি। আবছা একটু মনে পড়িতেছে, আমাদের গ্রামের নদীর ধারে দুইটি ভদ্রলোক কথা বলিতেছিলেন। একজন বলিলেন, "অমুক কবি কবিতা লিখে এক লক্ষ টাকা পেয়েছেন।" তখন সেই এক লক্ষ টাকার বিরাট অঙ্কের পিছনে কবির নামটি ঢাকা পড়িয়াছিল।

তারপর কবির সঙ্গে মনের পরিচয় হইল 'প্রবাসী'তে তাঁহার 'জীবনস্মৃতি' পড়িয়া। অল্প বয়সের সেই কিশোরবেলায় একজন কিশোর কবির প্রথম জীবনের কাহিনীর ভিতর দিয়া সেদিন যে মিলন-লতাটি রচিত হইল, তাহাতে ফুল ফুটিয়া গন্ধ ছড়াইয়া আমার সমস্ত জীবন আমোদিত করিয়াছে। কবি কোথায় রেলগাড়িতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, জানালার পথে দৃষ্টি মেলিয়া পথের পাশের প্রতিটি দৃশ্যকে কীভাবে তিনি সমস্ত অন্তর দিয়া অনুভব করিয়াছিলেন, কোথায় অবস্থানকালে সকাল হইতে দুপুর, দুপুর হইতে সন্ধ্যা সেখানকার প্রতিটি গাছ, লতা, পাতার দিকে কবি চাহিয়া থাকিতেন, পদ্মা নদীতে বোটে বসিয়া মাত্র এক বাটি দুধ পান করিয়া সারাদিন তিনি লিখিয়া যাইতেন, এইসব যে কত একনিষ্ঠভাবে অনুকরণ করিতাম সে কথা ভাবিলে আজ হাসি পায়।

তারপর বুঝিয়া না-বুঝিয়া কবির বইগুলি যেখানে যেখানে পাইয়াছি পড়িয়া গিয়াছি। সব বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু ভালো লাগিয়াছে। হয়তো কবির রচনায় যে অপূর্ব সুরের মাদকতা আছে, তাহারই পরশ আমার অবচেতন মনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এখন রবীন্দ্রনাথের কবিতা পূর্বাপেক্ষা অধিক বুঝিতে পারি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হইয়া কয়েক বৎসর কবির কবিতা ছাত্রদের পড়াইলামও, কিন্তু আগের মতো কবিতার মাদকতার স্বাদ এখন পাই না। বোধ হয়, কিছু বোঝা যায় কিছু বোঝা যায় না— যেসব কবিতায় এই আলো-আঁধারির ছায়ামায়া থাকে, সেগুলিতে রস-উপভোগের একটি অপূর্ব আস্বাদ থাকিয়া যায়।

তারপর বহুদিন কাটিয়া গিয়াছে। আমার বন্ধুরা কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী', 'অচলায়তন' প্রভৃতির অভিনয় দেখিয়া আসিয়া আমার কাছে গল্প করিয়াছেন। আমি একান্ত মনে সেইসব গল্প শুনিয়াছি। কতবার যে কবিকে স্বপ্নে দেখিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। এইভাবে বহুদিন কাটিয়া গিয়াছে।

পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া একবার কলিকাতা আসিয়াছি। পল্লী-বালকের কল্পনার সেই কলিকাতা অপূর্ব রহস্যে জীবন্ত হইয়া রহিয়াছে। শুনিতে পাইলাম ঠাকুরবাড়িতে 'শেষ বর্ষণ' অভিনয় হইবে। আমি আট আনা দিয়া সর্বনিম্নের একখানা টিকিটি কিনিয়া নির্দিষ্ট আসনে গিয়া উপবেশন করিলাম। তখনো অভিনয় আরম্ভ হয় নাই। অভিনয়-মঞ্চটি একটি কালো পরদায় ঘেরা। তাহার সামনে প্রকাণ্ড হলঘরে দর্শকেরা বসিয়াছে। এই গৃহের সবকিছুই আমার কাছে অপূর্ব রহস্যময় বলিয়া মনে হইল। সামনে পিছনে, এধারে ওধারে, যে দিকে চাহি, আমার মনে হয়, আমি যেন কোনো অপূর্ব স্বর্গরাজ্যে আসিয়াছি। আমার সামনের আসনগুলিতে নানা সাজসজ্জায় সজ্জিত হইয়া চারিদিক নানা গন্ধচূর্ণে আমোদিত করিয়া কলিকাতার অভিজাত শ্রেণীর মেয়েরা যে কলগুঞ্জন করিতেছিল—আমার মনে হইল, ইহার চাইতে আকর্ষণীয় কিছু আমি আর কোথাও দেখি নাই। সকলের পিছনে বসিয়াছিলাম বলিয়া আমার আরো ভালো লাগিতেছিল। পিছন হইতে আমি সকলকেই দেখিতে পাইতেছিলাম। যদি বেশি দামের টিকিট কিনিয়া সামনের আসনে বসিতাম সেদিন হয়তো আমি কিছুতেই এত খুশি হইতাম না।

কিছুক্ষণ পরে সামনের মঞ্চের পরদা উঠিয়া গেল। বর্ষাকালের যত রকমের ফুল সমস্ত আনিয়া মঞ্চটিকে অপূর্বভাবে সাজানো হইয়াছে। সেই মঞ্চের উপর গায়ক-গায়িকা পরিবৃত হইয়া রবীন্দ্রনাথ আসিয়া যখন উপবেশন করিলেন, তখন আমার সামনে উপবিষ্ট সেই রহস্যময়ীরা চাঁদের আলোতে জোনাকিদের মতো যেন একেবারে ম্লান হইয়া গেল। গানের পরে গান চলিতে লাগিল। সে কী গান! পুরুষকণ্ঠে, মেয়েকণ্ঠে, কখনো উচ্চগ্রামে উঠিয়া, কখনো একেবারে অস্পষ্ট হইয়া, সুরের উপরে সুর-বর্ষণ হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে গানের বিষয়বস্তু অনুসরণ করিয়া মূক অভিনেত্রীরা মঞ্চের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। সুর, ছবি আর পুষ্প গন্ধের অপূর্ব সমন্বয়। শ্রবণ-নয়ন-মন-মুগ্ধকর অপূর্ব অভিনয়। তখনো ভদ্রঘরের মেয়েরা মঞ্চে দাঁড়াইয়া নৃত্য করিতে অভ্যস্ত হয় নাই। দুটি মেয়ে মাঝে মাঝে দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া গানের বিষয়বস্তুটি জীবন্ত করিয়া তুলিতেছিল।

শেষবারের মতো একটি মেয়ে শুকতারা হইয়া মঞ্চে আসিয়া দাঁড়াইল। কী অপূর্ব তাহার চেহারা! গানের সুর বাজিয়া উঠিল, "শুকতারা ঐ উঠিল আকাশে।" তারপর ধীরে ধীরে শুকতারা মঞ্চ হইতে চলিয়া গেল। একটি মনোমুগ্ধকর স্বপ্ন-জগৎ যেন আমার সামনে দিয়া চলিয়া গেল।

এইভাবে অভিনয় শেষ হইল। দর্শকেরা কেহই হাতে তালি দিল না। যে যাহার মতো নীরবে আসন হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল। কবি মঞ্চের উপর দাঁড়াইলেন। অনেকে আগাইয়া গিয়া কবিকে প্রণাম করিলেন। আমিও তাঁহাদের সঙ্গে এক পাশে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু কবিকে প্রণাম করিলাম না। এই রবীন্দ্রনাথ—আমারই রবীন্দ্রনাথ। আর দশজনের মতো তাঁহাকে প্রণাম জানাইয়া পথের দশজনের মধ্যেই আবার মিশিয়া যাইব, কবির সঙ্গে আমার সম্পর্ক তো এমন নয়! আমি শুধু মুগ্ধদৃষ্টিতে কবির মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। কবি সমাগত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়দের সঙ্গে দু-চারিটি কথা বলিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার মন যেন কোন সুদূর ধ্যানলোকে মগ্ন। এই দৃশ্য ভাবিতে ভাবিতে আমি আমার আশ্রয়স্থানে ফিরিয়া আসিলাম।

এম. এ. পড়িতে কলিকাতা আসিয়া ওয়াই. এম. সি. এ. হোস্টেলে আশ্রয় লইলাম। আমার 'রাখালী' আর 'নক্সী কাঁথার মাঠ' বই দুইখানি ইহার বহু পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। কিছু কিছু কবিখ্যাতিও লাভ করিয়াছি। মাঝে মাঝে আমি অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে

দেখা করিতে জোড়াসাঁকো যাই। এই উপলক্ষে ঠাকুর-পরিবারের প্রায় সকলের সঙ্গেই আমার পরিচয় হইয়াছে। অবনীন্দ্রনাথের পাশের বাড়ি রবীন্দ্রনাথের। তিনি এখানে আসিয়া মাঝে মাঝে কিছুদিন অবস্থান করেন। শান্তিনিকেতন হইতে গানের দল আসে। তাঁহাদের গানে-অভিনয়ে সমস্ত কলিকাতা সরগরম হইয়া ওঠে। আমার জানা-অজানা কত লোক আসিয়া কবির সঙ্গে দেখা করিয়া যায়। আমি কিন্তু একদিনও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করি না। আমার কবিতার বই দুইখানি বহু অখ্যাত বিখ্যাত সাহিত্যিককে উপহার দিয়াছি। তাঁহাদের মতামত জানিবার জন্য কতজনের দ্বারস্থ হইয়াছি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে বই পাঠাই নাই।

তখনকার দিনে রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের তরুণ সাহিত্যিকদের সমালোচনা করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহাদের পক্ষ লইয়া শরৎচন্দ্র ইহার উত্তর দিয়াছিলেন। নজরুল হইতে আরম্ভ করিয়া বহু সাহিত্যিক নানা প্রবন্ধ লিখিয়া নিজেদের সদম্ভ আবির্ভাব ঘোষণা করিয়াছিলেন। বন্ধুবর অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কবিতা করিয়া লিখিলেন, সামনে যদি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পথ রুধিয়া দাঁড়ান তবু আমরা আগাইয়া যাইব। এই আন্দোলনের মাঝখানে শৈলজানন্দ প্রমুখ কয়েকজন লেখককে রবীন্দ্রনাথ প্রতিভাবান বলিয়া স্বীকৃতি দান করিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে দিলীপকুমার রায় বুদ্ধদেব বসু-রচিত কয়েকটি কবিতা কাঁচি-কাটা করিয়া রবীন্দ্রনাথকে পাঠাইলেন। রবীন্দ্রনাথ সেগুলির প্রশংসা করিলেন। আমি যদিও কল্লোল-দলের এক জন, আমার লেখা লইয়া কেহই উচ্চবাচ্য করিলেন না। মনে অভিমান ছিল, আমার সাহিত্যের যদি কোনো মূল্য থাকে তবে রবীন্দ্রনাথ একদিন ডাকিয়া আমাকে আদর করিবেন। ইতিমধ্যেই আমি অবনীন্দ্রনাথের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়াছি। রবীন্দ্রনাথের সামনে উপস্থিত হওয়া এখন আমার পক্ষে সবচাইতে সহজ, তবু ইচ্ছা করিয়াই তাঁহার সামনে উপযাচক হইয়া উপস্থিত হই নাই। কিন্তু আড়াল হইতে যতদূর সম্ভব তাঁহার সবকিছু খবর লইতেছি।

সেবার রবীন্দ্রনাথের খুব অসুখ হইল। সারা দেশ কবির জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। শঙ্কাকুল দেশবাসী অতি আগ্রহের সহিত প্রতিদিন খবরের কাগজে কবির স্বাস্থ্যের খবর লক্ষ করিতে লাগিল। জাতির সৌভাগ্য, সে যাত্রা কবি রোগমুক্ত হইলেন। আরোগ্য লাভ করিয়া কবি কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন। সেটা বোধ হয় ১৯৩০ সন।

তখন আমার মনে হইল বয়োবৃদ্ধ এই কবির সম্পর্কে অভিমান করিয়া দূরে থাকিলে আমার জীবনে হয়তো তাঁহার সঙ্গে পরিচয় হইবে না। কারণ এই ক্ষণকালের অতিথি কখন যে ওপারের ডাক পাইয়া আমাদের এই পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন তাহা কেহই জানে না।

অবনীন্দ্রনাথের দৌহিত্র মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় আমার বন্ধু। দুই জনে অনেক জল্পনা-কল্পনা করিয়া একদিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিতে রওয়ানা হইলাম।

অবনীন্দ্রনাথের বাড়ি হইতে রবীন্দ্রনাথের ঘর তিন মিনিটের পথও নয়। এই এতটুকু পথ অতিক্রম করিতে মনে হইল যেন কত দূরের পথ যাইতেছি। আমার বুক অতি আনন্দে দুরুদুরু করিতেছিল। ঘরের সামনে আসিয়া আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া মোহনলাল ভিতরে প্রবেশ করিল। আমি দরজার সামনে দাঁড়াইয়া কত কথা ভাবিতে লাগিলাম। আমি যেন কোনো অতীত যুগের তীর্থযাত্রী। জীবনের কত বন্ধুর পথ অতিক্রম করিয়া আজ আমার চির-বাঞ্ছিত মহামানবের মন্দিরপ্রান্তে আগমন করিয়াছি। ছবির উপরে ছবি মনে ভাসিয়া আসিতেছিল। এতদিন এই কবির বিষয়ে যাহা ভাবিয়াছি, যাহা পড়িয়াছি, যাহা শুনিয়াছি সব

যেন আমার মনে জীবন্ত হইয়া কথা কহিতেছিল। অনেকক্ষণ পরে মোহনলাল আসিয়া আমাকে ভিতরে লইয়া গেল। স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় আমি যেন কোন্ কল্পনার জগতে প্রবেশ করিলাম। সুন্দর কয়েকখানি ছবি দেয়ালে টাঙানো। এখানে-সেখানে সুন্দর সুপরিকল্পিত চৌকোনা আসন। তাহার উপরে নানা রঙের ডোরা-কাটা বস্ত্র-আবরণ। সেগুলি বসিবার জন্য, না চোখের তৃপ্তিলাভের জন্য কে বলিয়া দিবে! এ যেন বৈদিক যুগের কোনো ঋষির আশ্রমে আসিয়াছি।

তখন বর্ষাকাল। কদমফুলের গুচ্ছ গুচ্ছ তোড়া নানা রকমের ফুলদানিতে সাজানো। আধ-ফোটা মোটা মোটা কেয়াফুলের গুচ্ছগুলি কবির সামনে দুইটি ফুলদানি হইতে গন্ধ ছড়াইতেছিল। বেলিফুলের দু'গাছি মালা কবির পাশে পড়িয়া রহিয়াছে। মনে হইতেছিল, বাংলাদেশের বর্ষা ঋতুর খানিকটা যেন ধরিয়া আনিয়া এই গৃহের মধ্যে জীবন্ত করিয়া রাখা হইয়াছে। চারিধার হইতে সবকিছুই মূক ভাষায় আমার সঙ্গে কথা বলিতেছিল। কবি যদি আমার সঙ্গে কোনো কথাই না বলিতেন তবু আমি অনুতাপ করিতাম না। আজ এই গৈরিক বসন পরিহিত মহামানবের সামনে আসিয়া আমার সমস্ত অন্তর ভরিয়া গিয়াছে। সালাম জানাইয়া কম্পিত হস্তে আমি 'নক্সী কাঁথার মাঠ' আর 'রাখালী' পুস্তক দুইখানি কবিকে উপহার দিলাম। কবি বই দুইখানি একটু নাড়িয়া চাড়িয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমার মনে হচ্ছে তুমি বাংলাদেশের চাষী মুসলমানদের বিষয়ে লিখেছ। তোমার বই আমি পড়ব।"

প্রথম পরিচয়ের উত্তেজনায় সেদিন কবির সঙ্গে আর কী কী আলাপ হইয়াছিল, আজ ভালো করিয়া মনে নাই।

ইহার দুই-তিন দিন পরে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মধ্যম ছেলে অধ্যাপক অরুণ সেন আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি কবিকে বই দিয়ে এসেছিলে। আজ দুপুরে আমাদের সামনে কবি অনেকক্ষণ ধরে তোমার কবিতার প্রশংসা করলেন। এমন উচ্ছ্বসিতভাবে কারো প্রশংসা করতে কবিকে কমই দেখা যায়। কবি অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন, তিনি তোমাকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে যাবেন।"

পরদিন সকালে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসিয়া আমি কবির সঙ্গে দেখা করিলাম। কবি আমার বই দুইখানির প্রশংসা করিলেন। বলিলেন, "আমি শান্তিনিকেতনে গিয়েই তোমার বই দুখানার উপর বিস্তৃত সমালোচনা লিখে পাঠাব। তুমি শান্তিনিকেতনে এসে থাক। ওখানে আমি তোমার একটা বন্দোবস্ত করে দেব।"

আমি বিনীতভাবে উত্তর করিলাম, "এখানে আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পড়ছি। শান্তিনিকেতনে গেলে তো পড়া হবে না।"

কবি বলিলেন, "ওখান থেকে ইচ্ছে করলে তুমি প্রাইভেটে এম. এ. পরীক্ষা দিতে পারবে। আমি সে বন্দোবস্ত করে দেব।"

আমি উত্তরে বলিলাম, "ভালো করে ভেবে দেখে আমি আপনাকে পরে জানাব।"

কলিকাতায় আমার সবচাইতে আপনার জন ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করিলাম। তিনি আমাকে কলিকাতা ছাড়িয়া শান্তিনিকেতনে যাইতে নিষেধ করিলেন। তিনি বলিলেন, "কবি যদি এত বৃদ্ধ না হতেন তবে আমি তোমাকে ওখানে যেতে বলতাম। কিন্তু কবি কতকাল বেঁচে থাকবেন বলা যায় না। এখান থেকে এম. এ. পাস করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা কর। ওখানকার আশ্রয় বহুদিন পাওয়ার সৌভাগ্য তোমার নাও হতে পারে।"

আমার আর শান্তিনিকেতনে যাওয়া হইল না। ইহার পর কবি আরো বারো বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন। আজ অনুতাপ হইতেছে, এই সুদীর্ঘ বারো বৎসর যদি কবির সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিতাম তবে জীবনে কত কী শিখিতে পারিতাম!

কবি শান্তিনিকেতনে চলিয়া গেলেন। প্রায় দুই মাস হইয়া গেল। কবি আমার বইয়ের সমালোচনা পাঠাইলেন না। কিন্তু কী ভাষাতেই বা কবিকে তাগিদ দিয়া পত্র লিখিব! বহু চেষ্টা করিয়াও কবিকে লিখিবার মতো ভাষা খুঁজিয়া পাই না। মোহনলালকে দিয়া কবিকে পত্র পাঠাইলাম। তখন কবি শান্তিনিকেতনে কী–একটা অভিনয় লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। কবি একটা ছোট্ট চিঠিতে মোহনলালকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "জসীম উদ্‌দীনের কবিতার ভাব, ভাষা ও রস সম্পূর্ণ নতুন ধরনের। প্রকৃত কবির হৃদয় এই লেখকের আছে, অতি সহজে যাদের লেখবার শক্তি নেই, এমনতর খাঁটি জিনিস তারা লিখতে পারে না।"

কবির এই কথাগুলি বইয়ের বিজ্ঞাপনে ছাপাইয়া সেই সময় মনে মনে খুবই বাহাদুরি অনুভব করিয়াছিলাম। 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' ছাপা হইলে বাংলাদেশের বহু সাহিত্যিক ইহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। যাঁহারা বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতে প্রস্তুত হইতেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের এই প্রশংসার পরে তাঁহারা আর সে বিষয়ে সাহসী হইলেন না। সাপ্তাহিক 'সম্মেলনী'তে একজন প্রবীণ সাহিত্যিক 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ'–এর সমালোচনার মাধ্যমে ব্যক্তিগতভাবে আমার প্রতি কিছু কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন, কিন্তু বইখানি যে খারাপ, এ কথা বলিতে সাহস পান নাই।

ইহার পরে রবীন্দ্রনাথ যখনই কলিকাতা আসিয়াছেন, আমি অবসর পাইলেই গিয়া দেখা করিয়াছি। আমাকে দেখিলেই কবি তাঁহার বিগত কালের পদ্মাচরের জীবন লইয়া আলোচনা করিতেন।

তখন আমি 'বালুচর' বইয়ের কবিতাগুলি লিখিতেছি। ইহার অধিকাংশ কবিতাই ত্রিপদী ছন্দে লিখিত। মাসিকপত্রে ইহার অধিকাংশ কবিতা ছাপা হয়। সমালোচকেরা বলিতে লাগিলেন, "তোমার কবিতা একঘেয়ে হইয়া যাইতেছে। ছন্দ পরিবর্তন কর।"

একদিন কবিকে এই কথা বলিলাম। কবি বলিলেন, "ওসব বাজে লোকের কথা শুনো না। যে ছন্দ সহজে এসে তোমার লেখায় ধরা দেয়, তাই ব্যবহার কর। ইচ্ছে করে নানা ছন্দ ব্যবহার করলে তোমার লেখা হবে তোতাপাখির বোলের মতো। তাতে কোনো প্রাণের স্পর্শ থাকবে না।"

আমার 'বালুচর' বইখানা ছাপা হইলে কবিকে একখানি পাঠাইয়া দিলাম। সঙ্গে পত্র লিখিয়া অনুরোধ করিলাম, পড়িয়া আপনার কেমন লাগে অনুগ্রহ করিয়া লিখিয়া জানাইবেন। কবি এ পত্রের কোনো উত্তর দিলেন না। তিনি কলিকাতা আসিলে দেখা করিলাম। কবি বলিলেন, "তোমার 'বালুচর' পড়তে গিয়ে বড়ই ঠকেছি হে। 'বালুচর' বলতে আমি তোমাদের দেশের সুদূর পদ্মাতীরের চরগুলির সুন্দর কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা আশা করেছিলাম। কেমন চখাচখি উড়ে বেড়ায়, কাশফুলের গুচ্ছগুলি বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু কতকগুলি প্রেমের কবিতা দিয়ে তুমি বইখানাকে ভরে তুলেছ। পত্রে এ কথা লিখলে পাছে রূঢ় শোনায় সে জন্য এ বিষয়ে কিছু লিখি নি। মুখেই বললাম।"

ইহার পরে রবীন্দ্রনাথ যখন বাংলা কবিতার সংকলন বাহির করেন তখন এই 'বালুচর' বই হইতেই "উড়ানীর চর" নামক কবিতাটি চয়ন করিয়াছিলেন।

'রাজা ও রানী' নাটকখানি নতুন করিয়া লিখিয়া রবীন্দ্রনাথ ইহার 'তপতী' নামকরণ করিলেন। একদিন সাহিত্যিকদের ডাকিয়া তাহা পড়িয়া শোনাইলেন। সেই সভায় আমিও

উপস্থিত ছিলাম। একই অধিবেশনে প্রায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া কবি সমানে নাটকখানা পড়িয়া গেলেন। বিভিন্ন চরিত্রের মুখে বিভিন্ন সংলাপগুলি কবির কণ্ঠে যেন জীবন্ত হইয়া উঠিতেছিল। মহাসমারোহে কবি কলিকাতায় এই নাটক অভিনয় করিলেন। এই অভিনয়ে কবি রাজার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সত্তর বৎসর বয়সের বৃদ্ধ কী করিয়া প্রেমের অভিনয় করিবেন, তাঁহার সাদা দাড়িরই বা কী হইবে, অভিনয়ের পূর্বে এইসব ভাবিয়া কিছুই কূলকিনারা পাইলাম না। কিন্তু অভিনয়ের সময় দেখা গেল, দাড়িতে কালো রং মাখাইয়া মুখের দুই পাশে গাল পাট্টা তুলিয়া দিয়া কবি এক তরুণ যুবকের বেশে মঞ্চে আসিয়া দাঁড়াইলেন। 'তপতী' নাটকে রাজার ব্যর্থ প্রেমের সেই মর্মান্তিক হাহাকার কবির কণ্ঠমাধুর্যে আর আন্তরিক অভিনয়নৈপুণ্যে মঞ্চের উপর জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই নাটকে রাজার ভূমিকাটি বড়ই ঘোরালো। নাটকের সবগুলি চরিত্র রাজার বিপক্ষে। সেইসঙ্গে সাধারণ দর্শক-শ্রোতার মনও বাহির হইতে দেখিতে গেলে রাজার উপর বিতৃষ্ণ। রাজা যে রানীর ভালবাসা পাইল না, তারই জন্য যে রাজার সব কাজ নিয়ন্ত্রিত হইতেছিল, এ কথা সাধারণ দর্শক-শ্রোতা সহজে বুঝিতে পারে না। হয়তো সেইজন্য ইহা বাংলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে বেশিদিন টিকিল না। কিন্তু যাঁহারা গভীরভাবে এই নাটকটি আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা লক্ষ করিবেন, রাজার ব্যর্থ জীবনের হাহাকারের মধ্যে নাটক-লেখকের দরদী অন্তর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই ব্যাপারটি কবির অভিনয়ে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

কবি এই নাটক অভিনয়ের সাত-আট দিন আগে দলবল লইয়া শান্তিনিকেতন হইতে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আগমন করিলেন। প্রতিদিন মহাসমারোহে নাটকের মহড়া চলিল। আমার বন্ধু মোহনলালের সঙ্গে লুকাইয়া ছাপাইয়া আমি এই নাটকের মহড়া দেখিতে যাইতাম। তাহাতে লক্ষ করিতাম, নাটকটি অভিনয়ের উপযোগী করিতে কবি বিভিন্ন ভূমিকাগুলিকে কেবলই বদলাইয়া চলিয়াছেন। কবির নাটকে যাঁহারা অভিনয় করিতেন তাঁহাদিগকে বড়ই বিপদে পড়িতে হইত। যে পর্যন্ত অভিনেতা মঞ্চে গিয়া না দাঁড়াইতেন, সে পর্যন্ত তাঁর ভূমিকার পরিবর্তন হইতে থাকিত। মোহনলালের নিকট শুনিয়াছি, কোনো অভিনেত্রী তাঁহার নির্দিষ্ট ভূমিকা বলিতে মঞ্চে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময় কবি তাঁহাকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, "দেখ, এইখানটিতে এই কথাটি না বলে ওই কথাটি বলবে।"

'তপতী' নাটক পরে শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয় সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেন। এই অভিনয়ের চার-পাঁচ দিন আগে কবি শিশিরবাবুকে টেলিগ্রামে শান্তিনিকেতনে ডাকাইয়া লইয়া গিয়া নাটকের কয়েকটি অংশ বদলাইয়া দিলেন। কবির সৃজনীশক্তি কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইতে জানিত না। বিধাতা যেমন তাঁহার অপূর্ব-সৃষ্ট কাব্য-ধরণীর উপর আলো ছড়াইয়া আঁধার ছড়াইয়া নানা ঋতুর বর্ণসুষমা মাখাইয়া উহাকে নব নব রূপে রূপায়িত করেন, তেমনি কবি দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিয়া তাঁর রচিত কাব্য-উপন্যাস ও নাটকগুলিকে নানাভাবে নানা পরিবর্তনে উৎকর্ষিত করিয়া আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। 'রাজা ও রানী' নাটকের 'তপতী' সংস্করণ কবির এই সৃষ্টিধর্মী মনের অসন্তুষ্টির অবদান।

রবীন্দ্র-জয়ন্তীর সময় ছাত্রছাত্রীদের তরফ হইতে রবীন্দ্রনাথের 'নটীর পূজা' নাটকের অভিনয় হয়। শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েরা এই অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তোলেন। আমার যতদূর মনে পড়ে এই অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রম্প্‌ট করিয়াছিলেন। শেষ দৃশ্যে যেখানে নটীর মৃত্যুর পর ড্রপসিন পড়ার কথা—অর্ধেক ড্রপসিন পড়িয়া গিয়াছে, হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ গায়ে একটা মোটা কম্বল জড়াইয়া মঞ্চে আসিয়া নটীর মৃতদেহের উপর দুই হাত শূন্যে তুলিয়া "ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গেলেন। তখন হইতে 'নটীর পূজা'র শেষ দৃশ্যে

এই পাঠটি প্রবর্তিত হইয়া আসিতেছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার খাতা দেখিয়াছি। তাহাতে এত পরিবর্তন ও এত কাটাকুটি যে দেখিয়া অবাক হইতে হয়। রবীন্দ্রনাথের সৃজনীশক্তি কিছু করিয়া তৃপ্ত হইতে জানিত না। তিনি আজীবন এত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকখানিতে তাঁহার মনের একান্ত যত্নের ছাপ লাগিয়া রহিয়াছে। গ্রন্থগুলি লিখিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি অপরকে দিয়া নকল করান নাই। যতবার নকল করিতে হয় নিজেই করিয়াছেন এবং প্রত্যেকবারেই সেই রচনার ভিতর তাঁহার সৃজনীশক্তির অপূর্ব কারুকার্য রাখিয়া গিয়াছেন।

'তপতী'র পরেও নাটক রচনার নেশা রবীন্দ্রনাথকে পাইয়া বসিয়াছিল। তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে একদিন আমি পাড়াগাঁয়ের লোক-নাট্য 'আসমান সিংহের পালা'র উল্লেখ করিলাম। কথাপ্রসঙ্গে কবি আমাকে বলিলেন, "তুমি লেখ না একটা গ্রাম্য নাটক।" আমি বলিলাম, "নাটক আমি একটা লিখেছি। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ পড়ে বললেন, 'নাটক লেখার শক্তি তোমার নেই'।" কবি একটু জোরের সঙ্গে উত্তর করিলেন, "অবন নাটকের কী বোঝে? তুমি লেখ একটা নাটক তোমাদের গ্রাম-দেশের কাহিনী নিয়ে। আমি শান্তিনিকেতনের ছেলে-মেয়েদের দিয়ে অভিনয় করিয়ে দেব।" আমি বলিলাম, "একটা প্লট যদি দেন তবে আর একবার চেষ্টা করে দেখি।" কবি বলিলেন, "আজ নয়। কাল সকালে এসো।"

পরদিন কবির সামনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। একথা সেকথার পরে আমার নাটকের প্লট দেওয়ার কথা কবিকে মনে করাইয়া দিলাম। কবি হাসিয়া বলিলেন, "তুমি দেখছি, ছাড়বার পাত্র নও। চোরের মন বোঁচকার দিকে।" নিকটে আরো দু-একজন ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁহারা হাসিয়া উঠিলেন। কবি প্লট বলিতে লাগিলেন।

কবির এই প্লট অবলম্বন করিয়া আমি নাটক রচনা করিয়াছিলাম। দুই-তিনবার অদলবদল না করিয়া কিছুতেই কোনো লেখা আমি প্রকাশ করি না। তাই কবি জীবিত থাকিতে তাঁহাকে এই নাটক দেখাইতে পারি নাই। 'পল্লীবধূ' নাম দিয়া এই নাটক কয়েক বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। ঢাকা বেতারে এই নাটক অভিনীত হইয়া শত শত শ্রোতার মনোরঞ্জন করিয়াছে। আজ যদি রবীন্দ্রনাথ বাঁচিয়া থাকিতেন, তাঁহাকে এই নাটক উপহার দিয়া মনে মনে কতই না আনন্দ পাইতাম!

রবীন্দ্র-জয়ন্তীর পরে কবি কিছুদিন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অবস্থান করেন। এই সময় আমি প্রায়ই কবির সঙ্গে দেখা করিতে যাইতাম। একদিন কবিকে গিয়া বলিলাম, "আমরা আপনাকে মনে মনে কীভাবে কল্পনা করি তা হয়তো আপনার জানতে ইচ্ছা করে। আপনার উপর নতুন ছন্দে একটি কবিতা লিখেছি। যদি বলেন তো পড়ে শুনাই।"

কবি বলিলেন, "কবিতাটি আমাকে দাও, আমি নিজেই পড়ি।"

আমি বলিলাম, "আমার হাতের লেখা আপনি পড়তে পারবেন না।"

কবি বলিলেন, "তুমি দাও, আমি ঠিক পড়ব।"

কম্পিত হস্তে তাঁকে কবিতাটি দিলাম। কবি মনে মনে কবিতাটি পড়িতে লাগিলেন। আমার মনে হইল, আমার পড়ায় বিশুদ্ধ উচ্চারণ হইবে না মনে করিয়াই তিনি আমাকে পড়িতে দিলেন না। তিনি এতটুকু উচ্চারণ-দোষ সহ্য করিতে পারিতেন না। কবির নিজের নাটকে যাঁহারা পাঠ লইতেন, কবির নিকট সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উচ্চারণ শিখিতে তাঁহাদের প্রাণান্ত হইত। কবিতাটি পড়া শেষ হইলে তিনি বলিলেন, "বেশ হয়েছে।"

আমি বলিলাম, "কবিতাটিতে ত্রিপদী ছন্দের পদগুলোকে কমিয়ে বাড়িয়ে একটু নতুন ধরনতে রূপান্তরিত করতে চেষ্টা করেছি।"

তিনি লেখাটিতে কিছুক্ষণ চোখ বুলাইয়া উত্তর করিলেন, "তা এটিকে তুমি নতুন ছন্দ বলতে পার।"

রবীন্দ্রনাথ আমাকে দেখিলেই হিন্দু-মুসলমান সমস্যা লইয়া আলোচনা করিতেন। তিনি বলিতেন, "দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে দিলেই যে ঘরে আগুন লাগে তার কারণ সেই ঘরের মধ্যে বহুকাল আগুন সঞ্চিত ছিল। যাঁরা বলতে চান, আমরা সবাই মিলমিশ হয়ে ছিলুম ভালো, ইংরেজ এসেই আমাদের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দিল, তাঁরা সমস্যাটিকে এড়িয়ে যেতে চান।"

একদিন বন্দেমাতরম্ গানটি লইয়া কবির সঙ্গে আলোচনা হইল। কবি বলিলেন, "বন্দেমাতরম্ গানটি যেভাবে আছে, তোমরা মুসলমানেরা এ জন্য আপত্তি করতে পার। কারণ এ গানে তোমাদের ধর্মমত ক্ষুণ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে।"

এরপরে বন্দেমাতরম্ গান লইয়া হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে খুব বিরোধ চলিতেছিল। সেই সময়ে কলিকাতা মুসলিম ইন্স্টিটিউটে বন্দেমাতরম্ গান লইয়া মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে এক প্রতিবাদ-সভা বসে। সেই সভার কথা শুনিয়া শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদার সাম্প্রদায়িক মিলের উপর এক সুন্দর বক্তৃতা করেন। মুসলমান ছাত্রেরা খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করে এবং তাহাদের প্রতিবাদের বিষয়টিও তাঁহাকে বুঝাইয়া বলে। সেই সভায় আমি খুব অভিমানের সঙ্গেই বলিয়াছিলাম, "আজ বন্দেমাতরম্ গান নিয়ে আমাদের দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এক প্রকাণ্ড বিরোধের উপক্রম হয়েছে। কখন যে এই বিরোধ অগ্নি-দাহনে জ্বলে ওঠে, কেউ বলতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই গান নিয়ে আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল। কবি এ কথা স্বীকার করেছিলেন, বন্দেমাতরম্ গানে আপত্তি করবার মুসলমানদের যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু আজ জাতি যখন এই ব্যাপার নিয়ে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে, তখন কবি কেন নীরব আছেন? তিনি কেন তাঁর মতামত ব্যক্ত করছেন না?"

আমার বক্তৃতার এই অংশটি কোন পত্রিকায় উদ্ধৃত করিয়া উহার সম্পাদক আমাকে সাম্প্রদায়িক বলিয়া প্রমাণ করিতে এবং রবীন্দ্রনাথের বিরাগভাজন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ইহার অল্পদিন পরে কলিকাতায় যখন সর্বভারতীয় জাতীয় মহাসভার কার্যকরী সমিতির অধিবেশন বসে, তখন বন্দেমাতরম্ গান লইয়া তুমুল আন্দোলন হয়। সেই সময়ে একদিন বন্ধুবর সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বলিলাম, "রবীন্দ্রনাথ নিজে স্বীকার করেছেন, বন্দেমাতরম্ গানে মুসলমানদের আপত্তির কারণ আছে। আজ সারা দেশ এই গান নিয়ে একটা বিরাট সাম্প্রদায়িক কলহের সম্মুখীন হচ্ছে, এখন তো কবি একটি কথাও বলছেন না।" সৌমেন্দ্রনাথ বলিলেন, "জহরলাল নেহরু গানটি রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়েছিলেন। কবির পরামর্শের ফলে এ গানে তোমাদের আপত্তিজনক অংশটি কংগ্রেসের কোনো অনুষ্ঠানে আর গীত হবে না।"

রবীন্দ্র-জয়ন্তীর পর কবি কিছুদিন অসুস্থ হইয়া পড়েন। এই অসুস্থ অবস্থার মধ্যেই কবি শিল্পীদলের অভিনন্দন গ্রহণ করেন। এই অভিনন্দন-সভা ঠাকুরবাড়ির হলঘরে বসিয়াছিল। সেই সভায় নন্দলাল প্রমুখ শিল্পী প্রত্যেকে কবিকে এক একখানা করিয়া চিত্র উপহার দিয়াছিলেন। উহার পরে কিছুদিনের জন্য কবি আর কোনো অনুষ্ঠানে যোগদান করেন নাই। এই সময়ে আমি প্রায়ই কবির সঙ্গে দেখা করিতে যাইতাম। আমাকে দেখিলেই কবি সাম্প্রদায়িক ব্যাপার লইয়া আলোচনা করিতেন। তিনি বলিতেন, "কেন যে মানুষ একের অপরাধের জন্য অপরকে মারে! ও-দেশের মুসলমানেরা হিন্দুদের মারল, তাই

দেশের হিন্দুরা এখানকার নিরীহ মুসলমানদের মেরে তার প্রতিবাদ করবে, এই বর্বর মনোবৃত্তির হাত থেকে দেশ কীভাবে উদ্ধার পাবে বলতে পার? দেখ, কী সামান্য ব্যাপার নিয়ে কলহ হয়। গরু-কোরবানি নিয়ে, মসজিদের সামনে বাজনা নিয়ে। একটা পশুকে রক্ষা করতে কত মানুষকে মানুষ হত্যা করছে।"

এইসব আলোচনা করিতে কবি মাঝে মাঝে বড়ই উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন। একদিন আমি কবির সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছি, কবির পুত্র রথীন্দ্রনাথ আমাকে একান্তে ডাকিয়া বলিলেন, "এখন বাবার শরীর অসুস্থ। আপনাকে দেখলেই তিনি হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন তাতে মাঝে মাঝে বড়ই উত্তেজিত হয়ে পড়েন। অসুস্থ শরীরে এই উত্তেজনা খুবই ক্ষতিকর। আপনি কিছুদিন বাবার সঙ্গে দেখা করবেন না।"

আমি তখনকার মতো কবির সঙ্গে কিছুদিন দেখা করিলাম না।

মুসলমানদের সম্বন্ধে কবির মনে কিছু ভুল ধারণা ছিল। তিনি সাধারণত হিন্দু পত্রিকাগুলিই পড়িতেন। মুসলমানী পত্রিকার এক-আধ টুকরা মাঝে মাঝে কবির হাতে পড়িত।

কবির ভুল ধারণার প্রতিবাদ করিয়া উপযুক্ত কারণ দেখাইলেই কবি তাঁহার ভুল সংশোধন করিয়া লইতেন। কবির মনে একদেশদর্শী হিন্দুত্বের স্থান ছিল না। মুসলমানদের মধ্যে যাঁহারা স্বাধীন মতবাদ লইয়া ধর্ম ও সমাজব্যবস্থার সমালোচনা করিতেন, তাঁহাদের প্রতি কবির মনে প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। কিন্তু তাঁহাদের বিষয়ে কবির পক্ষে বেশি কিছু অনুসন্ধান করা সম্ভব ছিল না। কবির নিকটে যাঁহারা আসিতেন, কবি শুধু তাঁহাদিগকেই জানিতেন। এই বয়সে ইহার বেশি খবরাখবর লওয়া কবির পক্ষে সম্ভবও ছিল না।

একদিন কবি বলিতে লাগিলেন, "দেখ, জমিদারির তদারক করতে সাজাদপুরে যেতাম। আমাদের একজন বুড়ো প্রজা ছিল। যৌবনকালে সে অনেক ডাকাতি করেছে। বুড়ো বয়সে সে আর ডাকাতি করতে যেত না। কিন্তু ডাকাতরা তাকে বড়ই মানত। একবার আমাদের এক প্রজা অন্য দেশে নৌকা করে ব্যবসা করতে যায়। ডাকাতের দল এসে তার নৌকা ঘিরে ধরল। তখন সে আমাদের জমিদারির সেই বুড়ো প্রজার নাম করল। তারা নৌকা ছেড়ে চলে গেল। এই বলে চলে গেল, ও তোমরা অমুক দেশের অমুকের গাঁয়ের লোক। যাও, তোমাদের কোনো ভয় নেই। সেই বৃদ্ধ মুসলমান আমাকে বড়ই ভালবাসত। তখন নতুন বয়স। আমি জমিদারির তদারক করতে এসেছি। বুড়ো প্রায় পাঁচ শ প্রজা কাছারির সামনে ডেকে নিয়ে এসেছে। আমি বললাম, এত লোক ডেকে এনেছ কেন? সে উত্তর করল, ওরা আপনাকে দেখতে এসেছে। ওরে তোরা দেখ্। একবার প্রাণভরে সোনার চাঁদ দেখে নে। আমি দাঁড়িয়ে হাসতে লাগলাম।"

কবি বাংলা কবিতার একটি সংকলন বাহির করিবেন। আমাকে বলিলেন, "তোমার সংগ্রহ থেকে কিছু গ্রাম্য গান আমাকে দিও। আমার বইয়ে ছাপব।"

আমি কতকগুলি গ্রাম্য গান কবিকে দিয়া আসিলাম। তাহার চার-পাঁচ দিন পর শ্রীপ্রশান্ত মহলানবীশের গৃহে কবির সঙ্গে দেখা করিলাম। শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী মহলানবীশ তখন কবির কাছে ছিলেন। কবি আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "ওহে, তোমার সংগ্রহ করা গানগুলি পড়লাম। আমাদের দেশের রসপিপাসুরা ওগুলোর আদর করবে। কিন্তু আমি বইটি সংকলন করছি বিদেশী সাহিত্যিকদের জন্যে। অনুবাদে এগুলোর কিছুই থাকবে না। ময়মনসিংহ-গীতিকা থেকে কিছু নিলাম, আর ক্ষিতিমোহনের সংগ্রহ থেকেও কিছু নেওয়া গেল।"

আমি বলিলাম, "ময়মনসিংহ-গীতিকার গানগুলি শুধুমাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বইয়ে পাওয়া যায়। ময়মনসিংহে সাত-আট বৎসর গ্রাম হতে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছি, কোথাও এই ধরনের মাজাঘষা সংস্করণের গীতিকা পাওয়া যায় না। গ্রাম্য গাথার একটা কাঠামো সংগ্রহ করে চন্দ্রকুমার দে তার উপর নানা রচনা-কার্যের বুনট পরিয়ে দীনেশবাবুকে দিয়েছেন। তা-ই পল্লীর অশিক্ষিত কবিদের নামে চলে যাচ্ছে।"

কবি বলিলেন, "কিন্তু ময়মনসিংহ-গীতিকায় কোনো কোনো জায়গায় এমন সব অংশ আছে যা চন্দ্রকুমার দের রচিত বলে মনে হয় না।"

আমি উত্তর করিলাম, "এ কথা সত্য। এই অংশগুলি প্রচলিত ছোট ছোট গ্রাম্য-গান। চন্দ্রকুমার এগুলি সংগ্রহ করে সেই প্রচলিত পল্লীগীতিকার কাঠামোর মধ্যে ভরে দিয়েছেন। ময়ময়নসিংহ-গীতিকার সেই অংশগুলিই দেশ-বিদেশের সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তা ছাড়া পল্লীগীতিকার কাহিনীর যে কাঠামোটির উপরে এই ধরনের বুনট-কার্য হয়েছে, সেই গল্পাংশেরও একটা মূল্য আছে।"

আমি উত্তর করিলাম, "ক্ষিতিমোহনবাবুর সংগ্রহগুলি আমি দেখি নাই। 'প্রবাসী'তে "বাউল" নামক প্রবন্ধে চারুবাবু কতকগুলি গ্রাম্য গান প্রকাশ করেছেন। সেগুলি নাকি ক্ষিতিমোহনবাবুর সংগ্রহ হতে নেওয়া। তার থেকে কয়েকটি লাইন আপনাকে শুনাই—

কমল মেলে আঁখি, তার সঙ্গে মা দেখি
তারে অরুণ এসে দিল দোলা রাতের শয়নে,
আমি মেলুম্ না, মেলুম্ না নয়ন
যদি না দেখি তায় প্রথম চাওনে।

আপনি কি বলবেন, এসব লাইন কোনো অশিক্ষিত গ্রাম্য বাউলের রচিত হতে পারে? আপনার কবিতার ভাষা ও প্রকাশভঙ্গিমার সঙ্গে যাদের পরিচয় নেই, এমন লাইন তারা রচনা করতে পারে? ক্ষিতিমোহনবাবুর আরো একটি গানের পদ শুনুন—

ও আমার নিঠুর গরজী,
তুই মানস-মুকুল ভাজবি আগুনে।

এই মানস-মুকুল কথাটি কি কোনো অশিক্ষিত গ্রাম্য লোক জানে? এই গানটি কি আপনার "তোরা কেউ পারবি না রে পারবি না ফুল ফোটাতে" গানটি মনে করিয়ে দেয় না।"

কবি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর উত্তর করিলেন, "তাই তো ভাবি, এঁরা যদি আগেই এরূপ লিখে গেলেন, তবে আমাদের পরে আসার কি সার্থকতা থাকল?" আমি কবিকে বলিলাম, "আপনি কি কোনো প্রবন্ধে এইসব তথাকথিত গ্রাম্য-গানগুলির বিষয়ে আপনার অভিমত লিখবেন? আপনি যদি লেখেন, তবে দেশের বড় উপকার হবে। যাঁরা খাঁটি গ্রাম্য-গান সংগ্রহ করেন, তাঁদের সংগ্রহের আদর হবে।" কবি উত্তর করিলেন, "দেখ, ক্ষিতিমোহন আমার ওখানে আছে, তার সংগ্রহ-বিষয়ে আমি কিছু বিরুদ্ধ মত দিয়ে তার মনে আঘাত দিতে চাই নে।"

প্রশান্তবাবু আমাকে বলিলেন, "আপনি এ বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন না কেন?" আমি বলিলাম, "দীনেশবাবু আমার জীবনের সবচাইতে উপকারী বন্ধু। কত ভাবে যে তিনি আমাকে সাহায্য করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। আমি যদি এ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখি, তিনি বড়ই ব্যথা পাবেন।" পূর্বের কথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমি কবিকে বলিলাম, "আপনার সংকলন-পুস্তকে যদি এইসব গান গ্রাম্য-সাহিত্যের নামে চলে যায়, তবে এর পরে যাঁরা খাঁটি গ্রাম্য-গান সংগ্রহ করবেন, তাঁদের বড়ই বেগ পেতে হবে। কারণ এইসব সংগ্রহের সঙ্গে প্রচলিত

আধুনিক সাহিত্যের মিশ্রণ আছে বলে সাধারণ পাঠকের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়। তারা গানগুলি পড়ে বলে, 'দেখ, দেখ, অশিক্ষিত গ্রাম্য কবিরা কেমন আধুনিক কবিদের মতো লিখেছে'। যাঁরা বহু পরিশ্রম করে খাঁটি গ্রাম্য-গান সংগ্রহ করেন, তাঁদের সংগ্রহ পড়ে বিশেষজ্ঞেরা পর্যন্ত বলেন, 'অমুকের সংগ্রহের চাইতে তোমার সংগ্রহ অনেক নিম্নস্তরের'।"

এই সময়ে প্রশান্তবাবু বলিলেন, "আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না? আপনি তথাকথিত গ্রাম্য-গানগুলির বিষয়ে বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখে গুরুদেবের নিকট দাখিল করুন। গুরুদেব তার উপরে মন্তব্য লিখে দিলে লেখাটি গুরুদেবের মন্তব্য সহ সিল করে রাখা হবে। এর পর বহু বৎসর পরে প্রয়োজন হলে গুরুদেবের মন্তব্যসহ প্রবন্ধটি সাধারণের দরবারে হাজির করা যাবে।" এই প্রস্তাবে কবি রাজি হইলেন। ইহার পর নানা কাজের ঝঞ্ঝাটে আমি প্রবন্ধটি লিখিয়া কবিকে পাঠাইতে পারি নাই।

কবির সংকলন-পুস্তক ইহার কিছুদিন পরেই বাহির হয়। এই সংকলনে কবি ময়মনসিংহ-গীতিকা হইতে অংশবিশেষ গ্রহণ করিয়াছেন। ক্ষিতিমোহনবাবুর সংগ্রহ হইতেও কিছু কিছু লইয়াছেন।

রিপন কলেজে বাংলা ভাষার অধ্যাপকের পদ খালি হইল। এই পদের জন্য আমি দরখাস্ত করি। তখন রিপন কলেজের কার্য-পরিষদের সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত জে. চৌধুরী। শুনিতে পাইলাম, রবীন্দ্রনাথ এই পদের জন্য একজনকে সমর্থন করিয়া জে. চৌধুরীর নিকট সুপারিশপত্র দিয়াছেন। চৌধুরী মহাশয় কলিকাতা ল-রিপোর্টের সম্পাদক ছিলেন। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারক শ্রদ্ধেয় শ্রীফণীভূষণ চক্রবর্তী মহাশয় তখন তরুণ অ্যাডভোকেট, শ্রীযুক্ত চৌধুরীর সহকারী। তিনি আমাকে বড়ই ভালবাসিতেন। আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে গ্রাম্য-গান লইয়া আলোচনা করিতেন। রিপন কলেজের এই কাজটি যাহাতে আমার হয়, সেজন্য তিনি অশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমি এম. এ. পাস করিলাম ১৯৩১ সনে, কিন্তু ১৯৩৭ সন পর্যন্ত কোথাও কোনো চাকরি পাইলাম না। কোনো কলেজের বাংলার কালো পদ খালি হইলে সেই পদের সঙ্গে কিছু সংস্কৃত পড়ানোর কাজও জুড়িয়া দেওয়া হইত; সুতরাং কোনো গভর্নমেণ্ট কলেজে চাকরি পাইবার দরখাস্ত করিবার সুযোগ মিলিত না। বেসরকারি কলেজে বাংলা পড়ানোর পদ খালি হইলে তাঁহারা অভিজ্ঞ শিক্ষকের জন্য বিজ্ঞাপন দিতেন। শিক্ষাকার্যে অভিজ্ঞতা অর্জন করারও আমি কোনো সুযোগ পাইতাম না। তা ছাড়া কোনো কলেজে চাকরির তদ্বির করার মতো আমার কোনো অভিভাবকও ছিল না। কিন্তু রিপন কলেজের চাকরির জন্য ফণীবাবু ও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আমার জন্য নানাভাবে তদ্বির করিয়াছিলেন। একদিন ফণীবাবু আমাকে বলিয়া দিলেন, "তুমি যদি রবীন্দ্রনাথের নিকট থেকে শ্রীযুক্ত চৌধুরীর নামে কোনো সুপারিশপত্র আনতে পার, তবে এখানে তোমার চাকরি হতে পারে।" এই বিষয়ে আমি ধূর্জটিবাবুর সঙ্গে আলাপ করিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, "তুমি শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা কর। নিশ্চয় তিনি তোমাকে সুপারিশপত্র দেবেন।" আমি শান্তিনিকেতন রওয়ানা হইলাম।

রবীন্দ্রনাথ তখন 'শ্যামলী' নামক গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। শিল্পী নন্দলাল মাটি দিয়া তাঁর জন্য এই সুদৃশ্য গৃহটি নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

কবি অনেকগুলি কাগজপত্র বিছাইয়া লেখাপড়ার কাজে নিমগ্ন ছিলেন। সস্নেহে হাসিয়া আমাকে গ্রহণ করিলেন। কুশলপ্রশ্নের পর আমি কবিকে আমার আগমনের কারণ বলিলাম। কবি উত্তর করিলেন, "দেখ, আমার চিঠিতে কারো কোনো কাজ হয় না। তুমি মিছেমিছি কেন আমার চিঠির জন্য এতদূর এসেছ?" আমি সবিনয়ে উত্তর করিলাম, "এই কাজের জন্য

আপনি অপরকে সুপারিশপত্র দিয়েছেন। আমার যদি এখানে কাজ না হয় তবে মনে করব, আপনার চিঠির জন্যই এখানে আমার কাজটি হল না।"

কবি আমার কথার কোনোই উত্তর দিলেন না। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষার জন্য কতকগুলি ইংরেজি শব্দের বাংলা তর্জমা করিতেছিলেন। তাহা হইতে দুই একটি শব্দের বাংলা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে আমি তাহার সঠিক উত্তর দিতে পারিলাম। তখন কৌশলে আমি আবার সেই ব্যক্তিগত পত্রের কথা উল্লেখ করিলাম। কবিকে বলিলাম, "অতদূর থেকে আপনার কাছে এসেছি। আপনি সমুদ্র। এখানে এসে আমি শূন্য হাতে ফিরে যাব, এ দুঃখ আমার চিরজীবন থাকবে।" কবি একটু হাসিয়া তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারি শ্রীঅনিল চন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন, 'দেখ, মাইন্ড গোছের একটি চিঠি লিখে এনে দাও। ও কিছুতেই ছাড়বে না।"

অনিলবাবু ইংরেজিতে একটি চিঠি লিখিয়া আনিলেন, তাহাতে আমার গুণপনার পরিচয় দিয়া লিখিলেন, আমার উপর যেন সুবিচার করা হয়। যদিও সেটি ব্যক্তিগত পত্র, তবু এখানে আমার জন্য বিশেষ কোনো সুপারিশ করা হইল না। তাই কবিকে ধরিলাম, "এখানে বাংলা করে লিখে দিন, "জসীম উদ্‌দীনের যদি ওখানে কাজ হয় আমি সুখী হব।" কবি হাসিতে হাসিতে তাহাই লিখিয়া দিলেন। রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথও আমার জন্য সুপারিশ করিয়া শ্রীযুক্ত চৌধুরীর নামে একটি ব্যক্তিগত পত্র লিখিয়া দিলেন। সেই পত্র আনিয়া শ্রীযুক্ত চৌধুরী মহাশয়কে দিলাম।

রিপন কলেজে সেবার আমার চাকরি হইল না। রবীন্দ্রনাথ আগে যাহাকে ব্যক্তিগত পত্র দিয়াছিলেন, তাহার চাকরি হইল। রবীন্দ্রনাথের পত্রের জন্য তাহার চাকরি হইল না। তাহার চাকরি হইল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় তাঁহার স্থান আমার উপরে ছিল বলিয়া। তবে আমার মতো সাহিত্যিক খ্যাতি তখনো তাহার হয় নাই। ধূর্জটিপ্রসাদ এবং ফণীবাবুর চেষ্টায় এবং রবীন্দ্রনাথের পত্রের গুণে রিপন কলেজের কর্তৃপক্ষ আমার প্রতি খুবই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহারা আমাকে আপাতত রিপন স্কুলের একটি মাস্টারি দিতে চাহিয়াছিলেন এবং বলিয়া দিয়াছিলেন, এর পরে নতুন কোনো পদ খালি হইলে আপনাকে আমরা কলেজে শামিল করিয়া লইব। আমি তাহা গ্রহণ করি নাই।

সেবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে গবেষক নিয়োগ করা হয়। সেটা বোধহয় ১৯৩২ সন। তখন রবীন্দ্রনাথ বাংলা বিভাগের প্রধান কর্তা। শুনিলাম পাঁচ জনকে নিয়োগপত্র দেওয়া হইবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শান্তিনিকেতনের দুই জন ছাত্রের জন্য সুপারিশ করিবেন। বাকি তিন জনের মধ্যে অন্যান্য কর্তাব্যক্তিদের নিজস্ব লোক রহিয়াছে।

সুতরাং আমার সেখানে সূচ্যগ্র-প্রবেশেরও অধিকার নাই। পরলোকগত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের মুকুটহীন রাজা। আমি গিয়া রবীন্দ্রনাথকে ধরিলাম, "গ্রাম্য-গান নিয়ে আমি কিছু কাজ করেছি। গবেষকের কাজটি যদি পাই, আমার সেই অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করতে পারি। আপনি শ্যামাপ্রসাদবাবুকে সুপারিশ করে আমাকে একখানা পত্র লিখে দেন।"

কবি হাসিমুখে আমার জন্য শ্যামাপ্রসাদবাবুকে একখানি সুপারিশপত্র লিখিয়া দিলেন।

রবীন্দ্রনাথের পত্রের গুণে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহৎপ্রাণ মিন্টো-প্রফেসর প্রমথনাথ ব্যানার্জী ও স্যার হাসান সোহ্‌রাওয়ার্দীর চেষ্টায় আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-গবেষক নিযুক্ত হইলাম। নিয়োগপত্র পাইয়াই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিয়া বলিলাম, "আপনার পত্রের জন্যে আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ পেয়েছি।"

কবি বলিলেন, "তুমি আমাকে বড়ই আশ্চর্য করে দিলে হে! আমার কাছে কেউ কোনো উপকার পেয়ে কোনোদিন তা স্বীকার করে না।"

তখনকার দিনে দেশের সর্বত্র সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইয়া ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তার এতটুকুও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। যখনই যেজন্য তাঁহার নিকটে গিয়াছি, তিনি হাসিমুখে তাহা করিয়া দিয়াছেন। মুসলমান বলিয়া তিনি আমাকে দূরে সরাইয়া রাখেন নাই। এখানে একটি দৃষ্টান্ত দিব।

স্যার এ. এফ. রহমান সাহেব তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলর। তিনি আমাকে বলিলেন, "রবীন্দ্রনাথ অথবা অন্য কোনো নামকরা লোকের কাছ থেকে যদি কোনো ব্যক্তিগত পত্র আনতে পার, তবে এখানে বাংলা বিভাগে তোমার জন্য কাজের চেষ্টা করতে পারি।" এম. এ. পাস করিয়া তখন বহুদিন বেকার অবস্থায় চাকরির জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। আমি তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম।

কলিকাতায় আসিয়া বাংলা সাহিত্যের দুই জন দিকপালের সঙ্গে দেখা করিলাম। তাঁহারা কেহই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার নিয়োগ সমর্থন করিয়া কোনো পত্র দিতে চাহিলেন না। এক জন তো স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিলেন, "দেখ, আজকাল সাম্প্রদায়িকতার দিন। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার শত্রুর অভাব নাই। হয়তো কোনো হিন্দু এই কাজের জন্য চেষ্টা করছে। তোমাকে ব্যক্তিগত পত্র দিলে হিন্দু কাগজগুলি আমাকে গাল দিয়ে আস্ত রাখবে না।"

আমার তখন দুঃখে ক্ষোভে কাঁদিতে ইচ্ছা হইল। এঁরা আমাকে এত ভালবাসেন! আমি বেকার হইয়া চাকরির জন্য কত ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। এঁরা একটা চিঠি দিলেই এখানে আমার কাজ হইয়া যায়। অথচ যে হিন্দু প্রার্থীকে এঁরা চেনেন না, তারই সমর্থনে এঁরা আমাকে ব্যক্তিগত পত্র দিলেন না। একবার ভাবিলাম, রবীন্দ্রনাথের কাছে যাই। তিনি হয়তো আমাকে ব্যক্তিগত পত্র দিবেন। কিন্তু আবার ভাবিলাম, হয়তো তিনিও এদেরই মতো আমাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন। কী কাজ তাঁহার নিকটে গিয়া!

স্রোতে-পড়া লোক তৃণের আশাও ছাড়িতে চাহে না। আশার ক্ষীণ সূত্রটি কিছুতেই মন হতে ছুটিতে চাহে না। কে যেন আমাকে ঠেলিয়া শান্তিনিকেতনে লইয়া চলিল।

সকালবেলা। কবি বারান্দায় বসিয়া ছিলেন। পূর্ব গগনে রঙ্গিলা ভোর মেঘে মেঘে তার নকশার কাজ তখনো বুনট করিয়া চলিয়াছে। সামনের বাগানে পাখির গানে ফুলের রঙে আর সুবাসে আড়াআড়ি চলিয়াছে। সালাম জানাইয়া কবির সামনে গিয়া দাঁড়াইলাম। কুশলপ্রশ্নের উত্তর দিয়া কবিকে আমার আগমনের কথা বলিলাম। কবি তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী মহাশয়কে আমার জন্য একখানা সুপারিশপত্র লিখিয়া আনিতে নির্দেশ দিলেন। তখন আমি কবিকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম। কলিকাতার দুই জন সাহিত্যের দিকপাল শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক কারণে আমাকে যে সুপারিশপত্র দেন নাই, এ কথাও বলিলাম। সমস্ত শুনিয়া কবি বড়ই মনঃক্ষুণ্ন হইলেন।

বন্ধুবর অজিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিচের তলায় কয়েকখানি কুঠুরি ভাড়া লইয়া আমি প্রায় [illegible]খানেক ঠাকুরবাড়িতে ছিলাম। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা আসিলে প্রায়ই তাঁহার [illegible] দেখা করিতে যাইতাম। তখন কোন দিন কবির সঙ্গে কী আলাপ হইয়াছিল, স্পষ্ট মনে [illegible] তবে কয়েকটি টুকরো কথা উজ্জ্বল উপলখণ্ডের মতো মনের নদীতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহা এখানে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখি।

একদিন কথা প্রসঙ্গে কবি বলিলেন, "দেখ, আমার বিষয়ে লোকে যখন-তখন যা-কিছু বলতে পারে। কেউ কোনো উচ্চবাচ্য করে না।"

আমি বলিলাম, "আপনি কবি, সাহিত্যিক,—আপনাকে নিন্দা করেও সাহিত্য তৈরি হয়। তাই আপনার নিন্দা করা সহজ। কিন্তু এ কথা নিশ্চয় জানবেন, দেশের সহস্র লোক আপনার কবিতা পড়ে আনন্দ পায়—আপনাকে শ্রদ্ধা করে, আপনি তাদের দেখেন নি।" কবি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, পরে উত্তর করিলেন, "দেখ, মহাত্মা গান্ধীকে তো কেউ নিন্দা করতে সাহস করে না।"

আমি বিনীতভাবে উত্তর করিলাম, "মহাত্মা গান্ধী বিশিষ্ট ব্যক্তি হলেও তাঁকে নিন্দা করলে সাহিত্য তৈরি হয় না। আপনার সঙ্গে আপনার নিন্দুকেরাও কিছুদিন বেঁচে থাকতে চায়। ছুছুন্দরী কাব্যের লেখকের নাম আজ কে মনে রাখত যদি মাইকেলের অমর কাব্যের সঙ্গে এই কাব্য জড়িত না থাকত?"

এই আলোচনার পরে দেশে এমন দিনও আসিয়াছিল, যে-জনতা গান্ধীজীকে মহাত্মা না বলিলে ক্ষেপিয়া যাইত, তাহারাই তাঁহার গায়ে ইষ্টক নিক্ষেপ করিত—তাঁহার গাড়ি আক্রমণ করিত। পরিশেষে সেই জনতার একজনের হাতে গান্ধীজীকে জীবন পর্যন্ত দিতে হইল।

আর একদিন তিনি কথা প্রসঙ্গে বলিলেন, "দেখ, প্রায়ই আমার কলম চুরি যায়। কেউ কেউ মনে করে, আমার হাতের কলম হলে তাদের রচনা আমার রচনার মতো হবে। ওদের তাতে কোনোই উপকার হয় না, মাঝখান থেকে আমার কলমটি যায়।"

ঠাকুরবাড়ি থাকিতে এপ্রিল মাসের প্রথম তারিখে আমরা অনেক আজব কাণ্ড করিতাম। এই সুখী পরিবার কোনো-কিছু উপলক্ষ করিয়া হাসি-তামাশার সুযোগ পাইলে তাহা ছাড়িত না। আমার কোনো কবিবন্ধুকে ঠাট্টা করিয়া কবিতায় কোনো অজানা গুণগ্রাহিণীর তরফ হইতে একটি প্রেমপত্র লিখিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, কোনো কৌশলে তাহা বন্ধুবরের পকেটে রাখিয়া আসিব। ঠাকুরবাড়ির একটি ছোট ছেলে ছোঁ মারিয়া সেটা লইয়া গিয়া পত্রের নিচে আমার নাম লিখিয়া কবিকে দিয়া আসিল। আমি তো ভয়ে বাঁচি না। একে কবিতাটি রচনা হিসাবে একেবারে কাঁচা, তাহা ছাড়া বন্ধুকে লইয়া যে বিদ্রূপ করিয়াছি শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে লইয়া তাহা পারা যায় না। কবি আমাকে কী বলিবেন? আমার শিল্পীবন্ধু ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর গিয়া কবিকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। কবি আমাকে ডাকাইয়া লইয়া বলিলেন, "এতে তুমি এত মনঃক্ষুণ্ন হয়েছ কেন? আমি তো কিছু মনে করি নি, বরঞ্চ বেশ আনন্দ পেয়েছি।" তারপর যাহাতে এ জন্য আমার মনে লেশমাত্রও অনুতাপ না থাকে, কবি সস্নেহে আমার সঙ্গে অনেক গল্প করিলেন। অতি-আধুনিক কবিদের বিষয়ে আলোচনা হইল। আমি বলিলাম, "আজকাল একদল অতি-আধুনিক কবির উদয় হয়েছে। এরা বলে, সেই মান্ধাতার আমলের চাঁদ, জোছনা ও মৃগনয়নের উপমা আর চলে না। নতুন করে উপমা-অলঙ্কার গড়ে নিতে হবে। গদ্যকে এরা কবিতার মতো করে সাজায়। তাতে মিল আর ছন্দের আরোপ বাহুল্যমাত্র। এলিয়টের আর এজরা পাউন্ডের মতো করে এরা লিখতে চায়। বলুন তো একজনের মতন করে লিখলে তা কবিতা হবে কেন? কবির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যদি না থাকল তার প্রকাশে, তাকে কবি বলে স্বীকার করব কেন? দিনে দিনে এদের দল বেড়ে যাচ্ছে। এরা অনেকেই বেশ পড়াশুনা করে, বিশেষ করে ইংরেজি সাহিত্য। তারই দৌলতে এরা নিজের দলের সপক্ষে বেশ জোরালো প্রবন্ধ লেখে।"

কবি বলিলেন, "এ জন্য চিন্তা কোরো না। এটা একটা সাময়িক ঘটনা। মেকির আদর বেশি দিন চলে না। এ কথা জেনো, ভালো লেখকদের সংখ্যা সকল কালেই খুব কম। আর মন্দ লেখকেরা সংখ্যায় যেমন বেশি, শক্তির দাপটে তেমনি অজেয়। কিন্তু কালের মহাপুরুষ চিরকালই সেই অল্পসংখ্যক দুর্বল লেখকদের হাতে জয়-পতাকা তুলে দেন।"

আজ বহুদিন পরে মনের অস্পষ্ট স্মৃতি হইতে এইসব কথা লিখিতেছি। উপরের কথাগুলি কবি ঠিক এইভাবেই যে বলিয়াছিলেন, তাহা হলফ করিয়া বলিতে পারি না।

তখনকার দিনে রবীন্দ্রনাথের গানের তেমন আদর হয় নাই। রবীন্দ্রসঙ্গীত রেকর্ড হইলে দুই-শ আড়াই-শ'র বেশি বিক্রয় হইত না। একদিন কবির সঙ্গে তাঁর গানের সুরের বিষয়ে আলোচনা হইল। আমি বলিলাম, "আজকাল আধুনিক গায়কেরা আপনার গান গাইতে চায় না। আপনার গানের ভিতরে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকার্য আছে, তা আমাদের অবচেতন মনে প্রভাব বিস্তার করে। সাধারণ গায়কেরা সেই সূক্ষ্ম কারুকার্যের আদর করিতে জানে না। তারা গানের সুরে স্থূল ধরনের কারুকার্য চায়, যা হলে শ্রোতারা বাহবা দিতে পারে। তাই দেখতে পাই, আপনার গানের ভাষার অনুকরণে যারা গান লেখে, সেইসব গানে স্থূল ধরনের সুর লাগিয়ে তারা আসর সরগরম করতে চায়।"

কবি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "এটাও একটা সাময়িক ব্যাপার। এগুলোর আদর বেশি দিন টিকবে না।"

একবার কথাপ্রসঙ্গে কবিকে বলিলাম, "আপনার কবিতার ভাষায় এমন অপূর্ব ধ্বনিতরঙ্গ তোলে—কোথাও এমন একটি শব্দ আপনি ব্যবহার করেন নি, যেটাকে বদলিয়ে আর একটি বসানো যায়। এত লিখেছেন, কোনো লেখার একটি শব্দও মনে হয় না অস্থানে পড়েছে। আপনার ঐ যে গানে—

গ্রাম-ছাড়া ওই রাঙ্গামাটির পথ
আমার মন ভুলায় রে—

কী সুন্দর রহস্যলোকে মন উধাও হয়ে যায় শব্দের আর সুরের পাখায়। কিন্তু যেখানটিতে আপনি লিখেছেন,

সে যে আমায় নিয়ে যায় রে
নিয়ে যায় কোন চুলায় রে—

এখানে চুলায় কথাটি শুনতে কল্পনার আকাশখানি যেন মাটিতে পড়ে যায়।"

কবি কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "তা চুলায় বলেছি তো হয়েছে কী? চুলোয় কথাটি তোদের বাঙাল দেশে হয়তো তেমন প্রচলন নেই অথবা অন্যভাবে আছে।"

আমি সেদিন কবির সঙ্গে তাঁর আরো কোনো কোনো কবিতার বিষয়ে আলোচনা করিতে চাহিয়াছিলাম। কবি আমাকে বলিলেন, "যা, এখন যা। আমার অনেক কাজ আছে। আগে তুই প্রফেসার হ, তখন এসব তোকে বলব।"

আমার 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' ছাপা হইলে কবিকে পড়িতে দিলাম। পড়িয়া তিনি খুব প্রশংসা করিলেন। আমি সবিনয়ে বলিলাম, "আপনি যদি এই বইয়ের বিষয়ে কিছু লিখে দেন, আমি ধন্য হব।"

শান্তিনিকেতনে গিয়া কবি পত্র লিখিলেন—"তোমার সোজন বাদিয়ার ঘাট অতীব প্রশংসার যোগ্য। এ বই যে বাংলার পাঠকসমাজে আদৃত হবে সে বিষয়ে আমার লেশমাত্র সন্দেহ নাই।"

কবির ঐ ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হইয়াছে।

কবি যখন আমার সঙ্গে কথা বলিতেন, মনে হইত, তিনি যেন কোনো শিশুর সঙ্গে কথা বলিতেছেন। কখনো তুমি বলিতেন, কখনো তুই বলিতেন। কবির কাছ হইতে যখন ফিরিয়া আসিতাম, মনে হইত যেন কোনো মহাকাব্য পাঠ করিয়া এই ক্ষণে উঠিয়া আসিতেছি। সেই মহাকাব্যের সুরলহরী বহুদিন অন্তরকে সুখস্বপ্নে ভরিয়া রাখিত। তাঁর নিকট হইতে আসিলে

মনে হইত, কী যেন অমূল্য সম্পদ পাইয়া আসিয়াছি। আপন–পরের জ্ঞান তাঁর থাকিত না। তাঁর ভক্তেরা দিন–রজনী পাহারা দিয়াও কবির নিকটে সেই পর–মানুষের আসা ঠেকাইয়া রাখিতে পারিত না। কেহ দেখা করিতে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে জানিলে কবি বড়ই মনঃক্ষুণ্ন হইতেন। সেইজন্য তাঁহার ভক্তগোষ্ঠী দিনে দিনে বাড়িত। পুরাতনেরা নূতনকে বাধা দিতে পারিত না। কবির অসুখবিসুখ হইলে তাঁহার শুভানুধ্যায়ীরা সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিতেন, পাছে অভ্যাগত কেহ আসিলে কবি তাহা জানিয়া ফেলেন। কারণ ডাক্তারের নিষেধ ছিল, কবির সঙ্গে যেন কেহ দেখা না করে। এত যে ব্যস্ত থাকিতেন তিনি, কিন্তু প্রত্যেকখানা পত্রের উত্তর দিতেন। আমাদের বিবাহের আগে কবিকে নিমন্ত্রণ করিলাম। কবি একটি সুন্দর আশীর্বাদ রচনা করিয়া পাঠাইলেন।

অনেক সময় কবির কাব্য আর কবিকে ভাবি। আমার মনে হয়, কবির জীবনের কিছু শক্তি আর অর্থের অপচয় ঘটিয়াছে তাঁর শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী পরিগঠনে। এ কাজ কবি না করিলেও অপরে করিতে পারিত। কিন্তু এই দুটো প্রতিষ্ঠান না থাকিলে কবি হয়তো আরো অনেক অনেক সাহিত্যিক দান রাখিয়া যাইতেন। সারা পাক–ভারতে আজ রবীন্দ্রনাথের কোনো উত্তরাধিকারী নাই। এমন সাহিত্যপ্রতিভা কোথাও দেখি না, যে রবীন্দ্রনাথের ধারেকাছেও যাইতে পারে। বিশ্বভারতী আর শান্তিনিকেতনের কাজে কবির সব সময় ব্যয় হইয়াছে। সেই সময় হয়তো তিনি তাঁর সমধর্মী সাহিত্যিকদের জন্য দিতে পারিতেন। সমালোচনা করিয়া ভুলত্রুটি সংশোধন করিয়া তাহাদিগকে তিনি বড় সাহিত্যিকরূপে গড়িয়া তুলিতে পারিতেন। যেমন করিয়াছিলেন তিনি তাহার প্রথম যৌবনে।

যাহা হয় নাই, তাঁহার জন্য দুঃখ করিয়া লাভ নাই।

কবি চলিয়া গিয়াছেন সুদীর্ঘকাল। বহু ব্যক্তি বহুভাবে কবির সাহচর্য লাভ করিয়াছেন। কবির মৃত্যু নাই—এ কথাও সত্য, কিন্তু কবির সংস্পর্শে আসার সুযোগ যাহাদের হইয়াছে, তাহাদের মনের শূন্যতা কেহ কোনোদিন পূরণ করিতে পারিবে না।

মুহম্মদ আবদুল হাই

ভাষাতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ

বছর তিরিশেক আগেও পাক-ভারত উপমহাদেশে ভাষাতত্ত্ব বলতে সাধারণত আমরা তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বই বুঝতাম। আর বহুভাষাবিদ ব্যক্তিই সাধারণ্যে ভাষাতাত্ত্বিক নামে পরিচিত হতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে এরকম একটা ধারণা ছিল। Comparative Philology বা তুলনামূলক ভাষা-আলোচনাই ছিল এ শতাব্দীর ইউরোপীয় ভাষাবিজ্ঞানের লক্ষ্য।

১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে স্যার উইলিয়ম জোন্স কর্তৃক সংস্কৃত ভাষার আবিষ্কার ইউরোপীয় তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের পঠনপাঠনে বিশেষভাবে সহায়তা করে। ফলে গ্রিক, ল্যাটিন, প্রাচীন পারশি ও সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষাগুলোর মধ্যে এক আশ্চর্য দৈহিক ও আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হয়।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে ভিন্ন খাতে ভাষাবিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়। এ শতাব্দীর ভাষা-আলোচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ইতিহাসভিত্তিক। যে কোনো একটি ভাষার বিবর্তন এবং তার শব্দাবলির বিকাশকাহিনী বর্ণনাই এ বিজ্ঞানের মুখ্য আলোচ্য বিষয় ছিল।

ভাষা-আলোচনার স্বাভাবিক বিবর্তনের পথ ধরে বিংশ শতাব্দীর ইউরোপে বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানের (Descriptive Linguistics) সূত্রপাত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপের লন্ডন, এডিনবরা, লিড্‌স, প্যারিস, প্রাগ, কোপেনহেগেন এবং আমেরিকার হার্ভার্ড, মিশিগান, পেনসিলভ্যানিয়া প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানের চর্চা এবং তার দ্রুত উন্নতি ও বিস্তার সাধিত হতে দেখি। বর্তমানে ইউরোপ-আমেরিকায় তুলনামূলক এবং ইতিহাসভিত্তিক ভাষা-আলোচনা যে একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে তা নয়, তবে তার পূর্বপ্রভাব আর নেই। সেখানে বিগত চল্লিশ বছর ধরে বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানেরই দ্রুত উন্নতি সাধিত হয়ে চলেছে।

ভাষা সমাজজীবন গঠন ও রচনার প্রধান উপকরণ। সে জন্যে জীবন্ত মানুষের মুখে ভাষার ব্যবহার তার সজীবতারই পরিচয় বহন করে। তুলনামূলক এবং ইতিহাসভিত্তিক ভাষাতত্ত্ব ভাষার অতীত রূপের আলোচনা করে। ভাষাবিজ্ঞানের এ দ্বিবিধ শাখায় ভাষার সামগ্রিক রূপের পরিবর্তে প্রধানত ভাষার শব্দাবলির এবং ক্ষেত্রবিশেষে তার ধ্বনি-পরিবর্তন এবং বিবর্তনের ইতিহাসই আলোচিত হতে দেখি। সেখানে ভাষাবিশেষের ধ্বনিসমষ্টি থেকে শুরু করে শব্দগঠন, বাক্যরীতি এবং সমাজজীবনে তার প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ের সামগ্রিক

আলোচনা থাকে না। এ জন্যে একালে আটলান্টিকের উভয়পারে বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানের সমধিক সমাদর দেখতে পাই।

অথচ পাক-ভারত উপমহাদেশেই এ বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানের সূত্রপাত হয়েছিল। এখন থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে যাস্ক, পাণিনি ও পতঞ্জলি প্রমুখ ধ্বনিবিদ এ উপমহাদেশে সংস্কৃত ভাষার চুলচেরা বিশ্লেষণের ভেতর দিয়ে ভাষাবিজ্ঞানের এ শাখার সূত্রপাত করেছিলেন। এখনো ইউরোপ-আমেরিকায় পাণিনির ব্যাকরণকে মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধির চূড়ান্ত আদর্শ বলে গণ্য করা হয়। পাণিনি পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্বর্তী আটক থেকে মাইল দশেক দূরে সিন্ধুনদীর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত প্রাচীন সালাতুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি তাঁর মুখের ভাষার অর্থাৎ সেকালের পুরুষপুর ও তক্ষশীলার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রচলিত প্রাচীন কথ্য আর্য ও সংস্কৃত ভাষার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছিলেন। তাঁর ভাষা-আলোচনার পদ্ধতি এবং পরিভাষা আজো বর্ণনাভিত্তিক ভাষা-আলোচনায় আদর্শস্থানীয় হয়ে রয়েছে। বর্তমান শতাব্দীতে ইউরোপ ও আমেরিকায় এ শাখার ভাষা-আলোচনা তাঁরই প্রদর্শিত পথ ধরে চরম উন্নতি লাভ করেছে।

দুই

ভাষার বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। এতে যে কোনো একটি ভাষার বিশেষ কালের বিশেষ রূপের বর্ণনা করা হয়। ফলে একটি ভাষাভাষী অঞ্চলের একটি ভাষার বিশেষ প্রাদেশিক রূপ তথা উপভাষার আলোচনাই এ শৃঙ্খলার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। এক উপভাষাভাষী অঞ্চলের যে কোনো একজনের মুখের ভাষাই উক্ত উপভাষা বর্ণনার জন্যে আদর্শ হিসেবে এতে গৃহীত হয়। এমনিভাবে সেই বিশেষ ভাষার যাবতীয় উপভাষার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের সাহায্যে উক্ত ভাষার সামগ্রিক বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে। অন্য কথায় বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞান 'ভাষার বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ শাস্ত্র' তথা ব্যাকরণেরই নামান্তর। এ শাস্ত্র ভাষার ঔচিত্য ও অনৌচিত্যের প্রশ্ন নির্ণয় করে না, মানুষের মুখের ভাষা যেমনটি ব্যবহৃত হয় ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের দ্বারা তারই স্বরূপ উদ্ঘাটন করে। সেজন্যে ব্যাকরণের মতোই এ শাস্ত্রে (১) ধ্বনিতত্ত্ব, (২) রূপতত্ত্ব, (৩) বাক্যরীতি এবং (৪) বাগর্থ (শব্দার্থবিজ্ঞান) এ চারটি প্রধান ভাগ দেখা যায়। ভাষার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণের জন্যে এ চারটি প্রধান শাখার প্রত্যেকটিরই আবার বহু প্রশাখা রয়েছে। যেমন ধ্বনিতত্ত্বের (Phonology) মধ্যে (১) ভাষার ধ্বনিগুলোর উচ্চারণ (Phonetics), (২) তাদের ব্যবহার ও বণ্টন, (৩) সন্ধি ও সঙ্গতি, (৪) ছন্দোবিধি, (৫) লিখন পদ্ধতিতে শুদ্ধ বর্ণবিন্যাস এবং (৬) যতিচ্ছেদ বিধান ইত্যাদি; রূপতত্ত্বের (Morphology) মধ্যে শব্দের গঠন-সম্পর্কিত নিয়ম তথা শব্দ ও পদসাধন,—(১) শব্দের নিম্নতম অংশ বা কণিকা-নির্ণয় যেমন,—ধাতু প্রত্যয় (কৃৎ ও তদ্ধিত), উপসর্গ, অনুসর্গ, বিভক্তি ইত্যাদি, (২) সমাস, (৩) সুঙ্-তিঙ্ তথা অব্যয় বা নিপাত ইত্যাদি; বাক্যরীতির (Syntax) মধ্যে শব্দ ও পদের ক্রম এবং বাক্য-বিশ্লেষণের ধারা; এবং শব্দার্থবিজ্ঞান (Semantics) বা বাগর্থের মধ্যে বাক্যে ব্যবহৃত শব্দের অর্থ-নির্ধারণ এবং তার প্রক্রিয়া-নির্ণয়।

যে কোনো ভাষার বর্ণনাত্মক আলোচনায় মোটামুটি এ বিধিগুলোই প্রয়োগ করা হয়। যে কোনো একটি ভাষার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যায় যে সে ভাষাটি আশ্চর্যভাবে স্বতন্ত্র। অন্যান্য ভাষার ধ্বনি বা ব্যবহার-বিধির সঙ্গে ক্ষেত্রবিশেষে তার আপাত মিল দেখা গেলেও, এমনকি ভাষাবিশেষের বিবর্তনের পথে তার অব্যবহিত পূর্বরূপের সঙ্গে

পারস্পরিক পরের উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য থাকলেও, শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, প্রতিটি ভাষাই বিস্ময়করভাবে তার পার্থক্য বজায় রেখেছে। ভাষাবিশেষের এ যাবতীয় স্বাতন্ত্র্যের—অন্য কথায়, তার মূলধ্বনি থেকে শুরু করে সে ভাষা একটি বিশেষ সমাজজীবনে কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, ফলে তার এক-একটি শব্দের কত বিচিত্র ব্যবহার এবং রং, রূপ, রেখার সমন্বয়ে তার ব্যঞ্জনাময় প্রয়োগের বিস্ময়করতা উদ্ধারই ভাষাবিজ্ঞানের এ শাখার অন্যতম লক্ষ্য।

তিন

পাণিনি, পতঞ্জলি প্রমুখ ধ্বনিবৈজ্ঞানিক এ উপমহাদেশের ভাষাতত্ত্বের বর্ণনামূলক শাখার আলোচনার প্রবর্তন এবং তার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত শুধু এ ধারার অনুবর্তন নয়, ভাষা-আলোচনা তথা ভাষাবিজ্ঞানের সাধনা কালক্রমে এ দেশ থেকে একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়। ফলে বিগত দেড় হাজার বছরে এ উপমহাদেশে ভাষার কোনো রকম আলোচনাই হতে দেখি না।

বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপ-আমেরিকায় বিগত তিরিশ বছরে ভাষার বিজ্ঞানভিত্তিক বর্ণনামূলক আলোচনা যেখানে দ্রুত প্রসার এবং বিস্তৃতি লাভ করে, এ উপমহাদেশে সেখানে বিগত এবং বর্তমান শতাব্দীতে জনকয়েক মনীষী প্রধানত ভাষার ইতিহাসভিত্তিক আলোচনাতেই নিজেদের নিয়োজিত রাখেন। বীম্‌সের *Comparative Grammar of Modern Aryan Languages,* রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের *Wilson Philological Lectures,* হর্নলির *Comparative Grammar of the Gaudian Language* এবং স্যার জর্জ গ্রিয়ারসনের *Linguistic Survey of India* এদিক থেকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ট্রাম্পের *Sindhi Grammar* এবং কেলগের *Hindi Dialects* ছাড়া বিগত শতাব্দীতে স্বতন্ত্র ভাষার বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায় না।

বাংলাদেশে বিজয়চন্দ্র মজুমদার, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এবং ডক্টর সুকুমার সেনই এ বিষয়ে অগ্রণী। বিজয়চন্দ্র মজুমদারের *History of the Bengali Language* (১৯২০), ১৯২৬ সালে প্রকাশিত সুনীতিবাবুর *Origin and Development of the Bengali Language* (দুই খণ্ড), শহীদুল্লাহ্ সাহেবের 'বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত' এবং দেশী ও বিদেশী বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত ভাষাতত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধাবলি এবং সুকুমার সেনের 'ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৩৯) এক্ষেত্রে আমাদের উল্লেখযোগ্য সম্পদ। গ্রিয়ারসনের *Linguistic Survey of India*-য় এ উপমহাদেশের ৮০০টি ভাষা এবং উপভাষার আলোচনার পরিকল্পনা থাকলেও শেষ পর্যন্ত ১৭৯টি ভাষা এবং ৫৪৪টি উপভাষার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য এখানে ধরিয়ে দেওয়া হয়। বর্তমান যুগে ভাষাবিজ্ঞানের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়েছে বলে *Linguistic Survey of India*-র নানা ত্রুটিবিচ্যুতি চোখে পড়ে এবং তার আলোচনা ও উপকরণ-সংগ্রহণের অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নানা খুঁটিনাটি প্রশ্নের সমাধানে আমাদের কোনো সহায়তা করে না, তবু এ উপমহাদেশের ভাষার জরিপঘটিত গ্রিয়ারসনের এ অমূল্য গ্রন্থাবলি ভবিষ্যৎ কালের ভাষাতাত্ত্বিকদের কাছেও নানাভাবে আদর্শস্থানীয় হয়ে থাকবে।

ওপরের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়, বাংলা ভাষার ইতিহাসভিত্তিক যে আলোচনা এ পর্যন্ত হয়েছে, তার মূল্য নিতান্ত কম নয়। এর তুলনায় বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানে আমাদের ভাষাতাত্ত্বিকদের দান নগণ্য বললে অত্যুক্তি হয় না। গ্রিয়ারসনের *Linguistic Survey of India,* vol. V-এ বাংলা ভাষার বিভিন্ন উপভাষা-সংক্রান্ত আলোচনা, ১৩০৮ (১৯০১) সাল

থেকে ১৩১৩ (১৯০৭) সালের মধ্যে বঙ্গীয় 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় প্রকাশিত এবং 'শব্দকথা' (১৩২৪ সাল, ১৯১৭ খ্রিঃ) গ্রন্থে সংকলিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর "বাঙ্গালা ব্যাকরণ", "বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিৎ", "না", "কারক প্রকরণ" এবং "ধ্বনি-বিচার" প্রভৃতি প্রবন্ধ, সুনীতিবাবুর *Bengali Phonetic Reader* (১৯২৮) এবং *Sutton Page*-এর *Colloquial Bengali* বাংলা ভাষা-সংক্রান্ত বর্ণনাত্মক আলোচনার একরকম দিগদর্শন।

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যাঁকে আমরা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি এবং বাংলা ভাষার অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ কবি বলে জানি, সেই কবি রবীন্দ্রনাথই বাংলা ভাষার বর্ণনাভিত্তিক আলোচনার জনক এবং পথিকৃৎ হয়ে রয়েছেন। ভাষাবিজ্ঞানের এ শাখার আলোচনা বিজ্ঞান-সাধনারই নামান্তর; অথচ কবিরা সাধারণত বৈজ্ঞানিক হন না। তাই এ পথে রবীন্দ্রনাথকে নামতে দেখে বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে উঠি। তাঁর 'শব্দতত্ত্ব' (গদ্য গ্রন্থাবলির পঞ্চদশ ভাগরূপে ১৩১৫ (১৯০৯) সালে প্রকাশিত) এবং 'বাংলাভাষা-পরিচয়' (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯৩৮ সালে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত) নামক গ্রন্থ দুটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য শুধু নয়, অবিস্মরণীয়।

'শব্দতত্ত্ব' ইংরেজি ১৯০৯ সনে গ্রন্থ হিসেবে প্রথম প্রকাশিত হলেও তার বহু আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথ এ গ্রন্থে মুদ্রিত প্রবন্ধাবলি লিখতে শুরু করেন। 'বালক'-এ ১২৯২ (১৮৮৫ খ্রিঃ) সালের আশ্বিন মাসে তাঁর এ-সম্পর্কিত প্রথম প্রবন্ধ "বাংলা উচ্চারণ" প্রকাশিত হয়। ১২৯৯ (১৮৯২ খ্রিঃ) সালের আষাঢ়, কার্তিক এবং অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'সাধনা'য় যথাক্রমে প্রকাশিত হয় "স্বরবর্ণ অ", "স্বরবর্ণ এ" এবং "টা, টো, টে"। তারপর ১৩০৫ (১৮৯৮) থেকে ১৩১১ (১৯০৪ খ্রিঃ) সালের মধ্যে তিনি "বালক', 'সাধনা', 'ভারতী', 'বঙ্গদর্শন', এবং 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় বাংলার ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্ব তথা বাংলা ব্যাকরণ-বিষয়ক বহু জটিল প্রশ্নের আলোচনা করেন।

একালেও যে বাংলা ভাষার 'বিশুদ্ধ বাংলা ব্যাকরণ' লিখিত হয়েছে, তা বলা যায় না। বাজারে প্রচলিত একালের অধিকাংশ বাংলা ব্যাকরণই সংস্কৃত ব্যাকরণের ছাঁচে ঢালা এবং সংস্কৃত ভাষা বিশ্লেষণের সূত্রাদিতে ভরা, অথচ কোন্ ভাষাবিদ না জানেন যে, সংস্কৃত থেকে বিবর্তনের পথে বাংলা উদ্ভূত হলেও সংস্কৃত থেকে বাংলা সম্পূর্ণ আলাদা প্রকৃতির ভাষা। অন্যান্য ভাষা থেকে বাংলা ভাষা যেমন ঋণ গ্রহণ করেছে, সংস্কৃত থেকেও তেমনি কিংবা পরিমাণে কিছু বেশি শব্দ সে গ্রহণ করেছে। কিন্তু এককালে ইংরেজি ব্যাকরণ যেমন ল্যাটিন ভাষার ব্যাকরণের ছাঁচে ঢালাই করা হত, বাংলা গদ্য প্রথমত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সংস্কৃত পণ্ডিতদের হাতে গড়ে ওঠার জন্যে এবং সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার সগোত্রতার জন্যে তেমনি বাঙালি পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষার ব্যাকরণ লিখতে গিয়ে সংস্কৃত ভাষার সূত্রাদির ভিত্তিতে তার প্রকৃতি বিচার করতেন। এমনকি দেশজ, দ্বিত্ববোধক ধ্বন্যাত্মক প্রভৃতি বাংলা ভাষার অবিমিশ্র শব্দাবলির ব্যবহার বাংলায় অপাঙ্‌ক্তেয় বলে ভাষার শাস্ত্র তথা ব্যাকরণে তাদের উল্লেখও দূষণীয় মনে করতেন।

এ জন্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌কে কেন্দ্র করে ১৩০৮ (১৯০১ খ্রিঃ) সালে বাংলা ব্যাকরণ সম্পর্কিত একটি আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এ আন্দোলনের অগ্রণী ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্য পরিষদের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে (১১ই শ্রাবণ ১৩০৮) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী "বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অনুগত বাংলা ব্যাকরণ প্রণয়নের আবশ্যকতা অতি সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করেন"। শাস্ত্রী মহোদয়ের প্রবন্ধ উপলক্ষ করে সেই অধিবেশনে যে 'বিচার বিতর্ক' উপস্থিত হয় তাতে অংশগ্রহণ করেন বীরেশ্বর পাঁড়ে, চারুচন্দ্র ঘোষ,

সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যোগীন্দ্রনাথ বসু এবং সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সেদিন "বাংলা ব্যাকরণের উদ্দেশ্য" সুন্দর করে বুঝিয়ে বলেছিলেন :

আমাদের বাংলা ভাষার ব্যাকরণ যাঁহারা গড়িতে যাইবেন তাঁহাদের ইহা মনে রাখা উচিত যে, তাঁহারা ভাষার যাহা আছে তাহারই প্রয়োগ প্রকৃতি, গঠনপ্রণালীর নিয়মাদি কিরূপ তাহা ব্যাখ্যা করিবেন মাত্র; কেহ কিছু গড়িবেন না।

...শিক্ষার বিস্তারের জন্য রচনার ভাষা যত কথিত ভাষার নিকটবর্তী হইবে ততই সুফল ফলিবে। ভাষা অর্থে যদ্দ্বারা ভাষণ করা যায়, সুতরাং তাহা কথিত ভাষার নিকটবর্তী হওয়াই উচিত।*

বাংলা ব্যাকরণ সম্পর্কিত এ আন্দোলন ও বাদানুবাদে এবং শব্দতত্ত্বের প্রবন্ধাবলি লেখার পেছনে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল তা তাঁর কথার উদ্ধৃতি দিয়েই ভালো বোঝানো যায় :

বাংলা ভাষা বাংলা ব্যাকরণের নিয়মে চলে এবং সে-ব্যাকরণ সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত ব্যাকরণের দ্বারা শাসিত নহে।

(শব্দতত্ত্ব, রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, পৃঃ ৫৭৮)

...যে-কথাগুলি লইয়া আমি আলোচনা করিয়াছিলাম, তাহাদিগকে বাংলায় রাখা বা বাংলা হইতে খারিজ করিয়া দেওয়া আমার বা আর কাহারও সাধ্যই নহে। তাহারা আছে, এবং কাহারও কথায় তাহারা নিজের স্থান ছাড়িবে না। জগতে যে-কোনো জিনিসই আছে, তাহা ছোটো হউক আর বড়ো হউক, কুৎসিত হউক আর সুশ্রী হউক, প্রাদেশিক হউক আর নাগরিক হউক, তাহার তত্ত্বনির্ণয় বিজ্ঞানের কাজ। শরীরতত্ত্ব কেবল উত্তমাঙ্গেরই বিচার করে এমন নহে, পদাঙ্গুলিকেও অবজ্ঞা করে না। বিজ্ঞানের ঘৃণা নাই, পক্ষপাত নাই।

(ঐ, পৃ ৫৬৫)

ভাষায় যাহা আছে আমি তাহাই ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

(ঐ, পৃ ৬৩৭)

বৈয়াকরণের যে-সকল গুণ ও বিদ্যা থাকা উচিত তাহা আমার নাই। শিশুকাল হইতে স্বভাবতই আমি ব্যাকরণভীরু; কিন্তু বাংলা ভাষাকে তাহার সকল প্রকার মূর্তিতেই আমি হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করি। এই জন্য তাহার সহিত তন্নতন্ন করিয়া পরিচয়সাধনে আমি ক্লান্তিবোধ করি না। এই চেষ্টার ফলস্বরূপে ভাষার ভাণ্ডার হইতে যাহা কিছু আহরণ করিয়া থাকি, মাঝে মাঝে তাহার এটা, ওটা সকলকে দেখাইবার জন্য আনিয়া উপস্থিত করি; ইহাতে ব্যাকরণকে চিরঋণে বদ্ধ করিতেছি বলিয়া স্পর্ধা করিব না, ভুলচুক অসম্পূর্ণতাও যথেষ্ট থাকিবে। কিন্তু আমার এই চেষ্টায় কাহারও মনে যদি এরূপ ধারণা হয় যে, প্রাকৃত বাংলা ভাষার নিজের একটি স্বতন্ত্র আকারপ্রকার আছে এবং আকৃতিপ্রকৃতির তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া শ্রদ্ধার সহিত অধ্যবসায়ের সহিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনায় যদি যোগ্য লোকের উৎসাহ বোধ হয়, তাহা হইলে আমার এই বিস্মরণযোগ্য ক্ষণস্থায়ী চেষ্টা সার্থক হইবে।

(ঐ, পৃ ৪০৯-১০)

এ-কালে ইউরোপ-আমেরিকায় বর্ণনাভিত্তিক বিজ্ঞানের সাহায্যে ভাষার যে চুলচেরা বিশ্লেষণ হচ্ছে কিংবা এ উপমহাদেশে পাণিনি প্রমুখ বৈয়াকরণ সেকালের সংস্কৃত ভাষার যেভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার তেমন আলোচনা করেন

---

*রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, গ্রন্থ-পরিচয়, পৃ ৬৩১—৩২।

নি। বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানের ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যরীতি এবং বাগর্থ ইত্যাদি প্রকরণের সাহায্যে একটি ভাষার যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয় এবং এ পদ্ধতিতে প্রাপ্ত তত্ত্ব ও তথ্যাদির গবেষণাগারে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শব্দতত্ত্ব' এবং 'বাংলাভাষা-পরিচয়ে' বাংলা ভাষার তেমন খুঁটিনাটি বিচার বিশ্লেষণও করেন নি। কারণ সে শিক্ষা তাঁর ছিল না এবং প্রয়োজনও ছিল না। সাহিত্যিক প্রয়োজনে বাংলা ভাষা নিয়ে সাধনা করতে গিয়ে প্রখর মনীষা এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে এ ভাষার যে নিগূঢ় পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন এবং প্রতিদিনের ব্যবহারে এ ভাষার রূপ তাঁর কাছে যেভাবে খুলে গিয়েছিল, তিনি তারই সহজ ও স্বাভাবিক বিবৃতি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর এ গ্রন্থ দুটিতে। তাঁর 'শব্দতত্ত্ব' তবু নিছক কবির লেখা নয়, তা বিজ্ঞানীর সাধনার তত্ত্ব ও তথ্যনির্ভর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। এবং সে আলোচনা বর্ণনাত্মক এবং ক্ষেত্রবিশেষে ইতিহাসভিত্তিক ভাষাবিজ্ঞানের পথ ধরেই অর্থাৎ ভাষার ধ্বনি, তার শব্দগঠন, বাগ্‌বিধি, অর্থবিচার এবং প্রয়োগ-মাধুর্যের আবিষ্করণের ওপরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে।

চার

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ধ্বনি সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন, প্রথমে তারই বিচার করা যাক। যে কোনো ভাষার বাক্‌ধ্বনি স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির সমষ্টি। সুতরাং ভাষাবিশেষের প্রতিটি স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনিরই একটি উচ্চারণ স্থান ও প্রক্রিয়া রয়েছে। কিন্তু বাক-প্রবাহে শব্দ ও বাক্যের মধ্যে যে কোনো একটি বিশেষ ধ্বনির কিছু না কিছু স্বধর্মচ্যুতি ঘটে। এ কথা স্বর ও ব্যঞ্জন উভয় জাতীয় ধ্বনি সম্পর্কেই সমানভাবে প্রযোজ্য। ধ্বনিবৈজ্ঞানিক এ কথার যাথার্থ্য যতটা উপলব্ধি করেন, অন্যের কাছে এর গুরুত্ব ততটা পরিস্ফুট হয় না। তবু ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় স্বরধ্বনির পরিবর্তনটা সাধারণ লোকেরও চোখে পড়ে। বাংলা ধ্বনি সংক্রান্ত আলোচনায় এ কারণেই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ ব্যঞ্জনধ্বনির তেমন আলোচনা না করে স্বরধ্বনির মধ্যেই তাঁর আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন।

ইংরেজির মতো বানান ও লিখন পদ্ধতিতে এমন অসঙ্গতি অন্য কোনো ভাষাতে বোধহয় আর নেই। 'ইংরেজ লেখে এক রূপ, পড়ে অন্যরূপ।' বাংলা বানান এবং লিখনপদ্ধতি সেদিক থেকে অনেক উন্নত। কিন্তু তা বলে বাংলাও যে ত্রুটিমুক্ত এমন নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "বাংলাতেও অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে বানানের সহিত উচ্চারণের পার্থক্য আছে, তাহা সহসা আমাদের মনে উদয় হয় না।" এ পার্থক্য যেমন স্বরধ্বনির জন্যে তেমনি স্বরধ্বনিতেই বিশেষভাবে মূর্ত হতে দেখি। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শব্দতত্ত্ব' এবং 'বাংলাভাষা-পরিচয়' গ্রন্থ দুটিতে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।*

রবীন্দ্রনাথের কথায়, "বাংলা উচ্চারণে ইকার এবং উকার খুব কর্মিষ্ঠ, একার এবং ওকার ওদের শরণাগত, বাংলা অকার এবং আকার উৎপাত সইতেই আছে।" আমরা লিখি অতি, মতি, গতি, সরু, জরু, গরু, কলু ইত্যাদি কিন্তু পড়ি ওতি, মোতি, গোতি, সোরু, জোরু, গোরু, কোলু। আমরা লিখি বক্ষ, রক্ষা, সত্য, গদ্য, মন, বন, ধন ইত্যাদি, কিন্তু পড়ি বোক্ষ, রোক্ষা, সোত্তো, গোদ্দো, মোন, বোন, ধোন। আমরা লিখি খেলা, দেখা, বেচা ইত্যাদি কিন্তু পড়ি খ্যালা, দ্যাখা, ব্যাচা। আবার সুবিধা ও শ্রুতিমাধুর্যের দিক থেকে

---

* দ্রষ্টব্য শব্দতত্ত্ব, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ ৩৩৪—৩৫৭; বাংলাভাষা-পরিচয়, রবীন্দ্র রচনাবলী, ষড়বিংশ খণ্ড, পৃ ৪০৮—৪২০।

আমাদের হিসাব হয় হিসেবে, মাহিনা—মাইনে, ভিক্ষা—ভিক্ষে, নিন্দা-নিন্দে, চিঁড়া—চিঁড়ে, বিলাত—বিলেত, কৈলাস—কৈলেস, অভ্যাস—অভ্যেস, কন্যা—কন্যে, হত্যা—হত্যে, ফুটা—ফুটো, মুঠা—মুঠো, কুলা—কুলো, চুমা—চুমো, নৌকা—নৌকো, কৌটা—কৌটো ইত্যাদি। আবার শব্দের শেষে টা, টি, খানা, খানি, গাছা, গাছি প্রভৃতি যুক্ত হলে তার পূর্বে স্বরেও নানা রকম পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন 'টা'র পূর্বে এক—এ্যাকই থাকে, তার উচ্চারণ পাই এ্যাকটা। কিন্তু টির পূর্বে হয় একটি। তেমন দুইটা হয় দুটো, তারপর দুটি। বানান এবং উচ্চারণের এ অসঙ্গতি লক্ষ করেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"যদি কোনো বাংলা ব্যাকরণে এই সাধারণ নিয়ম লিখিত থাকিত যে, ইকার, উকার, ক্ষ, এবং ণ ও ন-র পূর্বে প্রায় সর্বত্রই অকারের উচ্চারণ ওকারবৎ হইয়া যায়, তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গ-প্রচলিত উচ্চারণের আদর্শ তাঁহাদের পক্ষে সুগম হইতে পারিত।" ("বীমসের বাংলা ব্যাকরণ", রচনাবলী, ১২ খণ্ড, পৃ ৩৫২)

রবীন্দ্রনাথ বাংলা স্বরধ্বনির কোথায় কোন্ পরিবর্তন হয় আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে তার উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ইকার এবং উকারের পূর্বে অ কেন ও-তে পরিণত হয়, আ-র পূর্বে ই কেন এ এবং এ কেন এ্যা হয়ে যায়, এ-সবের কারণ তিনি নির্ধারণ করবার প্রয়াস পান নি। এগুলো এ-কালের বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞান-মতে চলিত বাংলায় স্বরসন্ধি তথা স্বরসঙ্গতির উদাহরণ। ই এবং উ যথাক্রমে সম্মুখ ও পশ্চাৎ সংবৃত স্বরধ্বনি আর অ পশ্চাৎ অর্ধবিবৃত স্বরধ্বনি। তাদের পাশাপাশি উচ্চারণে জিহ্বার দ্রুত অবস্থান্তর কিছুটা অসুবিধাজনক বলে সংবৃত স্বরধনি ই বা উ তার পূর্ববর্তী অর্ধবিবৃত অ-কে তবু কিছু কাছাকাছি টেনে নিয়ে পশ্চাৎ অর্ধসংবৃত স্বরধ্বনি ও-তে পরিণত করে। অ-র পর ই বা উ যে উচ্চারণ করা যায় না তা নয়। মানুষের অসাধ্য কিছুই নেই; তবু মানুষ স্বভাবত আরামপ্রিয় বলে ভাষার উচ্চারণ ব্যাপারেও সে একটা সহজ স্বাভাবিকতার পথ খুঁজে ফেরে। সেজন্য একই শব্দের পাশাপাশি স্বরধ্বনিগুলো তাদের গঠনপ্রকৃতির দিক দিয়ে একরকম কিংবা প্রায় একরকম কাছাকাছি হয়ে উচ্চারিত হতে চায়। এ জন্যেই আমরা গরু থেকে গোরু, অতি থেকে ওতি, গতি থেকে গোতি, বিলাতি থেকে বিলেতি এবং তারপরে বিলিতি, দেশী থেকে দিশি, উড়ানি থেকে উড়ুনি, নিড়ানি থেকে নিড়ুনি, এখনি থেকে এখুনি, চিরনি থেকে চিরুনি, উনান থেকে উনুন, কুড়াল থেকে কুড়োল তা থেকে কুড়ুল, জুতা থেকে জুতো, পূজা থেকে পুজো, গুঁতা থেকে গুঁতো, কুমার থেকে কুমোর, পুতল থেকে পুতুল ইত্যাদি উচ্চারণ পাই। চুমা এ কারণে হল চুমো আর অতি আবেগে চুমু। এ নিয়ম ধরে কিছু দিনের মধ্যে জুতো যদি জুতু আর পুজো পুজু হয়ে যায় তাতে বিস্মিত হব না। কোনো কোনো ভাষায় স্বতন্ত্র ধ্বনি হিসেবে দীর্ঘ ঈ এবং দীর্ঘ ঊর অস্তিত্ব আছে। ভাষার একটি ধ্বনি একটি স্বতন্ত্র অর্থবোধক শব্দ গঠন করতে পারে কি না উক্ত ভাষার স্বতন্ত্র ধ্বনির অস্তিত্ব বিচারে সেটিই সবচেয়ে বড় মাপকাঠি। আমাদের পরিচিত ইংরেজি ভাষা থেকেই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন ইংরেজি fill এবং feel, sit এবং seat, কিংবা full এবং fool ইত্যাদি শব্দ। এ উদাহরণগুলো থেকে ইংরেজি ভাষার স্বতন্ত্র অর্থবোধক হ্রস্ব i এবং দীর্ঘ iː, হ্রস্ব u এবং দীর্ঘ uː র অস্তিত্বের কথা জানা যায়। বাংলা বর্ণমালায় হ্রস্ব ই এবং দীর্ঘ ঈ, হ্রস্ব উ এবং দীর্ঘ ঊ থাকলেও স্বতন্ত্র শব্দগঠনে সহায়ক মূলধ্বনি বা phoneme হিসেবে বাংলায় হ্রস্ব বা দীর্ঘ 'ই' বা 'উ'র কোনো অস্তিত্ব নেই। বাংলায় আছে শুধু 'ই' বা 'উ'। গবেষণাগারের পরীক্ষা করেই আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। তবে স্থানবিশেষে ই এবং উ কোথাও হ্রস্ব এবং কোথাও দীর্ঘভাবে উচ্চারিত হয়। কোথায় হ্রস্ব এবং কোথায় দীর্ঘ হয় তার

বিচার স্বতন্ত্র আলোচনাসাপেক্ষ। রবীন্দ্রনাথ বহু পূর্বেই এ সত্য হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন :

> সাধারণত বাংলায় স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ নেই। তবু কোনো কোনো স্থলে স্বরের উচ্চারণ কিছু পরিমাণে দীর্ঘ হয়ে থাকে। হসন্ত বর্ণের পূর্ববর্তী স্বরবর্ণের দিকে কান দিলে সেটা ধরা পড়ে, যেমন 'জল'। এখানে 'জ' এ যে অকার আছে তার দীর্ঘতা প্রমাণ হয় 'জলা' শব্দের 'জ'-এর সঙ্গে তুলনা করে দেখলে। 'হাত' আর 'হাতায়' প্রথমটির হা দীর্ঘ, দ্বিতীয়টির হ্রস্ব। 'পিঠ' আর 'পিঠে', 'ভূত' আর' ভূতো', 'ঘোল' আর ঘোলা'—তুলনা করে দেখলে কথাটা স্পষ্ট হবে। সংস্কৃতে দীর্ঘ স্বরের দীর্ঘতা সর্বত্রই, বাংলায় স্থানবিশেষে। কথায় ঝোঁক দেবার সময় বাংলা স্বরের উচ্চারণ সব জায়গাতেই দীর্ঘ হয়, যেমন : ভা—রি তো পণ্ডিত, কে—বা কার খোঁজ রাখে, আ—জই যাবো, হল—ই বা, অবা—ক করলে, হাজা—রো লোক, কী—যে বকো, এক ধা—র থেকে লাগা—ও মার। যুক্তবর্ণের পূর্বে সংস্কৃতে স্বর দীর্ঘ হয়, বাংলায় তা হয় না।
>
> (বাংলাভাষা-পরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২৬ খণ্ড, পৃ ৪১৬)

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শব্দতত্ত্ব' এবং 'বাংলাভাষা পরিচয়'-এ বাংলা ভাষার রূপতত্ত্ব (morphology) ঘটিত কোনো ব্যাকরণবিদ কিংবা আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিকের মতো এর খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করেন নি। ধ্বনিতত্ত্ব-বিষয়ক আলোচনায় কয়েকটি উচ্চারণঘটিত সমস্যার ওপরে যেমন তিনি আলোকপাত করেছেন, এ ভাষার রূপতত্ত্বের আলোচনা করতে গিয়েও তেমনি অল্প কয়েকটি বিষয় নির্বাচন করে নিয়েছেন। বাংলা 'বহুবচন,' সম্বন্ধে 'কার', 'কৃৎতদ্ধিৎ', 'উপসর্গ সমালোচনা' এবং 'কর্ম ও সম্প্রদান কারক'ই তাঁর বিচার্য বিষয়গুলোর মধ্যে মুখ্য।

"বাংলা বহুবচন" (রচনাবলী, ১২ খণ্ড, পৃ ৩৫৮) এবং "উপসর্গ সমালোচনা" (ঐ, পৃ ৫৫১) প্রবন্ধ দুটি যতটা ইতিহাসভিত্তিক ততটা বর্ণনামূলক আলোচনা নয়। প্রথমটিতে তিনি বাংলা বহুবচন নির্দেশক বিভক্তি 'রা' 'গুলা' 'গুলি'র ব্যুৎপত্তি এবং বিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ঐতিহাসিক ভাষাতাত্ত্বিকের মতো তিনিও যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তা উল্লেখযোগ্য :

> রা বিভক্তি বহুবচন বাচক বটে কিন্তু উহা মূলে সম্বন্ধবাচক। 'পাখিরা সব' অর্থ পাখি সম্বন্ধীয় সমষ্টি।
>
> বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কর্তৃকারক এবং সম্বন্ধে বহুবচনে বাংলা প্রায় সমুদয় গৌড়ীয় ভাষা হইতে স্বতন্ত্র। কেবল রাজপুতানি নেপালি হিন্দির সহিত তাহার কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। কিন্তু মনোযোগপূর্বক অনুধাবন করিলে অন্যান্য গৌড়ীয় ভাষার সহিত বাংলার এই সকল বহুবচন রূপের যোগ পাওয়া যায়, এই প্রবন্ধে তাহারই অনুশীলন করা গেল।

"উপসর্গ সমালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৩০৬ (১৮৯৯) সালে। এখানে তিনি লিখেছেন :

> এইরূপ আর্য ভাষার নানা শাখার আলোচনা করিয়া উপসর্গের মূলে উপনীত হইতে যে পাণ্ডিত্য অবকাশ এবং প্রামাণিক গ্রন্থাদির সহায়তা আবশ্যক, আমার তাহা কিছুই নাই। যাঁহাদের সেই ক্ষমতা ও সুযোগ আছে এ সম্বন্ধে তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ ছাড়া আমার দ্বারা আর কিছুই সম্ভবে না। স্বল্প প্রমাণ ও বহুল অনুমান আশ্রয় করিয়া কয়েকটি কথা বলি, তাহা অসম্পূর্ণ হইলেও তদ্দ্বারা যোগ্যতর লোকের মনে উদ্যম সঞ্চার করিয়া দিতে পারে, এই আশা করিয়া লিখিতে স্পর্ধিত হইতেছি।

ভাষাতাত্ত্বিক না হওয়ার স্বাভাবিক কুণ্ঠা এ কথাগুলোতে প্রকাশ পেলেও রবীন্দ্রনাথ এ

সম্বন্ধে গ্রিক, ল্যাটিন প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষার উপসর্গাদির সঙ্গে তুলনা করে বাংলা ও সংস্কৃতের কয়েকটি উপসর্গের যে বিবর্তন দেখিয়েছেন তা বিস্ময়করভাবেই পাণ্ডিত্যপূর্ণ।

'শব্দতত্ত্বে'র "সম্বন্ধে কার" শীর্ষক প্রবন্ধটি কিছুটা ইতিহাসভিত্তিক আর কিছুটা বর্ণনামূলক ও বাগর্থবোধক। "সংস্কৃত 'কৃত' এবং তাহার প্রাকৃত অপভ্রংশ 'কের' শব্দ হইতে বাংলা ভাষায় সম্বন্ধে 'র' বিভক্তির সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় "কৃত শব্দের অপভ্রংশ কার কেনই বা কোনো কোনো স্থলে অবিকৃত রহিয়াছে এবং কেনই বা অন্যত্র কেবলমাত্র তাহার র অক্ষর অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। ভাষা ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট জীবের মতো কেন যে কী করে তাহার সম্পূর্ণ কিনারা করা যায় না।"

এ বলে কোথায় কোথায় বাংলায় সম্বন্ধে 'কার' বিভক্তির ব্যবহার হয় তিনি তার একটি তালিকা দিয়েছেন, যেমন, এখনকার, তখনকার, এ-বেলাকার, ও-বেলাকার, এদিককার, ওদিককার, সেদিককার, আজকেকার, কালকেকার, পরশুকার, ভিতরকার, বাহিরকার ইত্যাদি।

এ থেকে সময় ও অবস্থান (position) সূচক বিশেষ্য ও বিশেষণের সঙ্গেই যে কার বিভক্তির ব্যবহার হয়, তিনি তা-ই প্রমাণ করতে চেয়েছেন। এর গুটিকতক ব্যতিক্রমের কথাও যে তিনি বলেন নি তা নয়—যেমন মনুষ্য সংখ্যাবাচক একজনকার, দুইজনকার ইত্যাদি। এরই সঙ্গে সকলকার এবং সত্যকারও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু "আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সকলকার হয় কিন্তু সমস্তকার হয় না (প্রাচীন বাংলায় সভাকার), সত্যকার হয় কিন্তু মিথ্যাকার হয় না।"

"বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিৎ" শীর্ষক প্রবন্ধটিতে প্রাকৃত বাংলায় কৃৎ তদ্ধিৎ প্রত্যয় কীভাবে ব্যবহৃত হয় তিনি তার সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। সংস্কৃত কৃৎ ও তদ্ধিৎ বাংলা কৃৎ-তদ্ধিৎ থেকে গঠনে ও ব্যবহারে সম্পূর্ণ পৃথক, আমাদের ব্যাকরণবিদেরা এ কথা অনেক সময় ভুলে যান বলেই যত গোলযোগের সূত্রপাত। রবীন্দ্রনাথ এ কথাটার ওপরেই বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে নিছক বাংলা কৃৎ-তদ্ধিৎ সম্পর্কেই তাঁর আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছেন। তাঁর আলোচ্য বাংলা প্রত্যয় যথাক্রমে এগুলো :

অ : "আসন্ন প্রবণতা বুঝাইবার জন্য শব্দদ্বৈত যোগে যে বিশেষণ হয় তাহাতে এই অ প্রত্যয়ের হাত আছে, যথা, পড়্ ধাতু হইতে পড়-পড়, পাক্ ধাতু হইতে পাক-পাক, কাঁদ্ ধাতু হইতে কাঁদ-কাঁদ" ইত্যাদি।

আ : "বাংলায় অনেক শব্দ আছে, যাহা কখনো বা স্বার্থে আ প্রত্যয় গ্রহণ করিয়াছে, কখনো করে নাই, যেমন বাঘ বাঘা, থাল থালা, ল্যাজ ল্যাজা, চোঙ চোঙা, পাত পাতা, ভাই ভাইয়া (ভায়া), বাদল বাদলা, ইলিশ ইলশা" ইত্যাদি।

"এই আ প্রত্যয়যোগে অনেক স্থলে অবজ্ঞা বা অতি পরিচয় জ্ঞাপন করে, বিশেষত মানুষের নাম সম্বন্ধে, যথা রাম রামা, শাম শামা, হরি হরিয়া (হরে) ইত্যাদি।"

"আন্ প্রত্যয়ের দৃষ্টান্ত : যোগান্, চাপান্, চালান্, জানান্, হেলান্, ঠেসান্, মানান্ ইত্যাদি।"

আন্ + অ প্রত্যয় : চুলকান (উচ্চারণে চুলকানো), কাম্ড়ান্ (উচ্চারণে কামড়ানো), হাত থেকে হাতানো, পিট থেকে পিটান (পিটোনো) ইত্যাদি।

অন্ প্রত্যয়ের দৃষ্টান্ত : চলন্, কাঁদন্, গড়ন্, মাজন্, ফোড়ন্ ঝোঁটন্, পাঁচন্ ইত্যাদি।

অন + আ প্রত্যয় : যেমন পাওন থেকে পাওনা, দেওন থেকে দেনা। মাগন্ থেকে মাগনা, ফেলন থেকে ফেল্না, তেমন বাটনা, কুটনা ইত্যাদি।

ই প্রত্যয় : ধর্ম ও ব্যবসায় অর্থে—যেমন চালাকি, চাকরি, চুরি, ডাক্তারি।

অনুকরণ অর্থে —সাহেবি, নবাবি।
দক্ষ অর্থে—হিসাবি, আলাপি।
বিশিষ্ট অর্থে—দামি, দাগি, রাগি, ভারি।
ক্ষুদ্র অর্থে—হাঁড়ি, পুঁটুলি, কাঠি (ইহাদের বৃহৎ—হাঁড়া, পোঁটলা, কাঠ)।
দেশীয় অর্থে—মারাঠি, গুজরাটি, আসামি, পাট্‌নাই, বসরাই ইত্যাদি।
স্বার্থে—হাস, হাসি, ফাঁস, ফাঁসি।
দিন নির্দেশ অর্থে—পাঁচই, ছয়ই, সাতই ইত্যাদি।

আ + ই প্রত্যয় : ক্রিয়াবাচক—বাছাই, যাচাই, দলাই-মলাই, খোদাই, ঢালাই, ধোলাই ইত্যাদি।

পদার্থবাচক—মরাই (ধানের), বালাই (বালকের অকল্যাণ), মিঠাই।
মানুষের নাম—বলাই, কানাই, নিতাই, জগাই, মাধাই ইত্যাদি।
ধর্ম—বড়াই, ধামনাই, পোষ্টাই ইত্যাদি।

ই + আ প্রত্যয় : জাল শব্দ ই প্রত্যয় যোগে জালি, স্বার্থে আ—জালিয়া (জেলে), কোঁদালিয়া (কুঁদুলে), জঙ্গলিয়া (জঙ্গুলে), গোবরিয়া (গুবরে), স্যাঁতস্যাঁতিয়া (স্যাঁতসেঁতে) ইত্যাদি।

উ প্রত্যয় : চালু, ঢালু, নিচু, কলু, গাড়ু ইত্যাদি।

উ + আ প্রত্যয় : বিশিষ্ট অর্থে—জলাবিশিষ্ট জলুয়া (জোলো), পাঁকুয়া (পেঁকো), বাতুয়া (বেতো), পড়ুয়া (পোড়ো)।

সম্বন্ধ অর্থে—মাছুয়া (মেছো), বুনুয়া (বুনো), ঘরুয়া (ঘোরো), মাঠুয়া (মেঠো)।
নির্মিত অর্থে—কাঠুয়া (কেঠো), ধানুয়া (ধেনো) ইত্যাদি।

আ + ও প্রত্যয় : ঘেরাও, চড়াও, উধাও, ফেলাও ইত্যাদি।

ও + আ প্রত্যয় : বাঁচোয়া, ঘরোয়া, চড়োয়া, ধরোয়া, আগোয়া ইত্যাদি।

অন + ই প্রত্যয় : যেমন মাতনি (মাতুনি), কাঁপনি (কাঁপুনি), দাপানি (দাপুনি), আঁটনি (আঁটুনি) ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন অন + ই প্রত্যয়সিদ্ধ অধিকাংশ ক্রিয়াবাচক শব্দই অপ্রিয় ভাব ব্যক্ত করে; যেমন বকুনি, ধমকানি, হাঁপানি, শাসানি, টাটানি, গোঙানি, নাকানি, চোবানি ইত্যাদি।

অসুখব্যঞ্জক ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলো সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য; যেমন টন্‌টনানি, ছট্‌ফটানি, ঝন্‌ঝনানি, কন্‌কনানি ইত্যাদি।

না : পাখনা, জাবনা, ছোটনা ইত্যাদি।

আনা : সাহেবিয়ানা, মুন্সিয়ানা ইত্যাদি।

ল্ : হাবল, খাবল, পাগল, পাকল, হাতল, মাতল ইত্যাদি।

র্ : ধ্বন্যাত্মক শব্দের সঙ্গে অবিরামতা-বোধক, যেমন বকর্ বকর্, গজর গজর, নড়রবড়র, ঘ্যানর্ ঘ্যানর্, কুটুর কুটুর ইত্যাদি।

আল্ : দয়াল্, কাঙাল্, আড়াল্, মিশাল্ ইত্যাদি।

ল্ + আ : মেঘলা, বাদলা, পাতলা, শামলা, দোকলা, একলা ইত্যাদি।

ল্ + ই + আ : দীঘলিয়া (দীঘ্‌লে), আগলিয়া (আগ্‌লে), পাহলিয়া (পাহলে) ইত্যাদি।

আড়্ : জোগাড়্, লাগাড়্ (নাগাড়), সাবাড় ইত্যাদি।

আড়্ + ই + আ : বাসাড়িয়া (বাসাড়ে), জোগাড়িয়া (জোগাড়ে), মজাড়িয়া (মজাড়ে),

হাতুড়িয়া (হাতুড়ে), কাঠুরে, হাটুরে ইত্যাদি।

রা ও ড়া : টুকরা, চাপড়া, ঝাঁকড়া, পেটরা, চামড়া ইত্যাদি।

বহু অর্থে—রাজরাজড়া, গাছগাছড়া ইত্যাদি।

আরি : জুয়ারি, কাঁসারি, ভিখারি ইত্যাদি।

আরু : সজারু, লাফারু, দাবাড়ু ইত্যাদি।

ক্ : মড়ক্, মোড়ক্, চড়ক্, চমক্ ইত্যাদি।

আক্, উক, ইক : তড়াক্, কুড়ুক, চিড়িক্, ঝিলিক্ ইত্যাদি।

ক + আ : মট্কা, বোঁচকা, হোঁৎকা ইত্যাদি।

ক + ই + আ : শুট্কিয়া (শুট্কে), পুঁটকিয়া (পুঁটকে), ছুটকিয়া (ছুটকে) ইত্যাদি।

উক্ : মিথ্যুক, লাজুক।

গির + ই : মুটেগিরি, বাবুগিরি, মুচিগিরি ইত্যাদি।

দার : দোকানদার, চৌকিদার, রংদার, জেল্লাদার, চড়নদার ইত্যাদি।

দান : বাতিদান, শামাদান, আতরদান ইত্যাদি।

সই : হাতসই, মাপসই, লাগসই, জুতসই, ট্যাকসই ইত্যাদি।

পনা : বুড়াপনা, ন্যাকাপনা, গিন্নিপনা ইত্যাদি।

ওলা বা ওয়ালা : কাপড়ওয়ালা, ছাতাওয়ালা ইত্যাদি।

তর : এমনতর, যেমনতর, কেমনতর ইত্যাদি।

অৎ : মানৎ, বসৎ, ফেরৎ, গলৎ ইত্যাদি।

অৎ + আ : ধরতা, ফেরতা, পড়তা, জানতা ইত্যাদি।

তা : পানতা, নোন্তা, তল্তা, নাম্তা, আওতা ইত্যাদি।

অৎ + ই : ফিরতি, চলতি, চাল্তি, চাক্তি, ঘাটতি ইত্যাদি।

অৎ + আ + ই : খোলতাই, ধরতাই।

অন্ত : ফুটন্ত, জিয়ন্ত, চলন্ত।

মন্ত : লক্ষ্মীমন্ত, বুদ্ধিমন্ত, আক্কেলমন্ত।

অন্দা : বাসন্দা (অধিবাসী), মাকন্দা (গুম্ফশ্মশ্রুবিহীন। রবীন্দ্রনাথ এ প্রত্যয়টির প্রতি [illegible] প্রকাশ করেছেন।

ট্ : চপট্ (চৌপাট), সাপট্, ঝাপ্ট, দাপ্ট।

ট + ই : চিমটি।

আ + ট্ : জমাট্, ভরাট্, ঘেরাট্ ইত্যাদি।

টা : চ্যাপটা, ল্যাপ্টা, ঝাপটা, চিমটা, শুক্টা ইত্যাদি।

আট্ + ই + আ : রোগাটিয়া (রোগাটে), বোকাটিয়া (বোকাটে) ইত্যাদি।

অং আং, ইং : ভড়ং, ভুজং, ভাজাং, পেং, তিড়িং ইত্যাদি।

অঙ্গ, আঙ্গ, আঙ্গিয়া : সুরঙ্গ, সুড়ুঙ্গি, কুলঙ্গি, ধিঙ্গি ইত্যাদি।

চ, চা, চি : আলগচ্, ল্যাংচা, ভ্যাংচা, ভাংচি, খামচি, ত্যাড়চা।

ক্ষুদ্র অর্থে—ব্যাঙাচি, ঘামাচি, মোচার ক্ষুদ্র মুচি ইত্যাদি।

অস্ : ধপাস্, ধড়াস, পটাস্ ইত্যাদি।

সা : চোপ্সা, গোম্সা, ভাপ্সা, চিম্সা, পানসা, খোলসা ইত্যাদি।

সা + ইয়া : ফ্যাকাসিয়া (ফ্যাকাসে), কালসিটে (কাল্ + সা + ইয়া + টা) কালসিয়াটা, [illegible]সিটে।

আম : অনুকরণ অর্থে —বুড়ামো, ছেলেমো ইত্যাদি।
ভাব অর্থে—মাতলামো, ঢিলেমো, আলসেমো, পাগলামো ইত্যাদি।
স্ত্রীলিঙ্গে ই : ছুঁড়ি, ছুক্‌রি, বেটি, খুড়ি, মাসি, পিসি, দিদি, বামনি ইত্যাদি।
স্ত্রীলিঙ্গে নি : তেলেনি, কলুনি, ঠাকুরানি, চাকরানি, জেলেনি, খোট্টানি ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ এ প্রবন্ধটিও ১৩০৮ সালে (১৯০১ খ্রিঃ) লিখেছিলেন। প্রত্যয়গুলোর শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যাখ্যা কিংবা প্রয়োগ দেখানো এখানে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। বাংলা ভাষার বহুবিধ ব্যবহার করতে গিয়ে এ ভাষার শব্দগঠন–প্রণালী তাঁর মনকে যেভাবে নাড়া দিয়েছে তারই প্রেরণায় স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে এ প্রবন্ধে তার কতকগুলো প্রত্যয় বা উপাদান তিনি পরিবেশন করেছেন। সেজন্যে আমিও এগুলোকে অর্থ কিংবা ধ্বনি অনুসারে সাজানোর ব্যর্থ প্রয়াস করি নি। প্রবন্ধটি থেকে তাঁর প্রদত্ত তালিকাটিই এখানে উদ্ধৃত করে দিয়েছি। বাংলায় ব্যবহৃত যাবতীয় কৃৎ–তদ্ধিৎ প্রত্যয়ের তালিকা তিনি দেন নি, দিয়েছেন বলে দাবিও করেন নি। যে কোনো একটি প্রত্যয়ের কথা ধরলেই দেখা যাবে যে, সেটি কয়েকটি শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত হচ্ছে, যাবতীয় শব্দের সঙ্গে নয়। রবীন্দ্রনাথও কৌতূহলবশত এদের ব্যবহারবিধি থেকে এ সত্যটি উপলব্ধি করেছেন। এটি এ কালের ভাষাতত্ত্বের সাধারণ কথা। শব্দের ব্যবহার লক্ষ করলেই আমরা দেখতে পাব যে, কতকগুলো বাক্‌বিধি কতকগুলো নির্দিষ্ট শব্দ বা শব্দপ্রকৃতির সঙ্গেই ব্যবহৃত হয়, সবগুলোর সঙ্গে হয় না। এ থেকে প্রমাণিত হয় প্রত্যেক ভাষার শব্দগুলির একটি সাহচর্যজনিত পরিমণ্ডল রয়েছে। প্রতিটি শব্দ তার আপন পরিমণ্ডলের মধ্যেই বিহার করে। তবে কোন্ শব্দ কোন্ কক্ষে ঘোরাফেরা করে সেটি গবেষণা করে ধরা যেতে পারে। প্রত্যয়গুলো সম্পর্কেও এ কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথ এ কারণে লিখেছিলেন :

> প্রত্যয়গুলির মধ্যে পক্ষপাতিত্বের ভাব দেখা যায়, তাহারা কেন যে কয়টি মাত্র শব্দকে বাছিয়া লয়, বাকি সমস্তকেই বর্জন করে তাহা বুঝা কঠিন। তালিকা হইতে তাহার নিয়ম আবিষ্কারের আশা করা যাইতে পারে।
>
> (শব্দতত্ত্ব, ঐ, পৃ ৩৯৫)

রবীন্দ্রনাথের বাংলা কৃৎ–তদ্ধিৎ সম্পর্কিত এ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হতে না হতেই শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী ১৩০৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'ভারতী' পত্রিকায় এ প্রবন্ধটির একটি বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা করেন। তাঁর মূল বক্তব্য ছিল রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত কৃৎ–তদ্ধিৎ প্রত্যয়গুলোর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করে ভাষায় সেগুলোর স্বীকৃতি দিয়ে "বাংলা ভাষাটাকেই মাটি করবার কাজে লেগেছেন"। রবীন্দ্রনাথ উক্ত সালেরই পৌষ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' "বাংলা ব্যাকরণ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে পণ্ডিত শরচ্চন্দ্রের প্রবন্ধের জবাব দেন। তাতে বাংলা ভাষা যে সংস্কৃত ভাষার ছাঁচে ঢালা নয়, বাংলায় কারক, ক্রিয়া, লিঙ্গ, বচন এবং প্রত্যয়াদির ব্যবহারে এ ভাষা যে সংস্কৃত থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির এবং সেই স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতেই যে বাংলা ভাষার বিশ্লেষণ তথা ব্যাকরণ লিখিত হওয়া উচিত তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। উদাহরণস্বরূপ কর্ম ও সম্প্রদান কারক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোজ্ঞ আলোচনাটি এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। সংস্কৃতে, অর্থ ও বিভক্তি প্রয়োগের দিক থেকে কর্ম ও সম্প্রদান কারক সম্পূর্ণ পৃথক। সেজন্যে সংস্কৃত ভাষায় এ দুই কারকের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার না করে উপায় নেই। সংস্কৃতের অনুকরণে আজো আমাদের বাংলা ব্যাকরণগুলোতে কর্ম ও সম্প্রদান কারককে পৃথকভাবে দেখানো হয়। মধ্যযুগের বাংলায় "মানুষ নিয়োজিল মারিবাক তায়" (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন) এবং আধুনিক বাংলা প্রয়োগ "তিনি হজে যাবেন" প্রভৃতি বাক্যে নিমিত্তার্থে চতুর্থী এবং "ভিখেরিকে কাপড় দিলাম" প্রভৃতি বাক্যে স্বত্বত্যাগ করে কাউকে কিছু

দান কথার মধ্যে আমাদের বৈয়াকরণেরা সম্প্রদান কারকের অস্তিত্ব দেখতে পেয়েছেন। তা ছাড়া আধুনিক বাংলায় কর্মকারকে বিভক্তিলোপের দৃষ্টান্ত আছে, অথচ সম্প্রদান কারকে কখনও বিভক্তি লোপ হয় না। এ কারণেও এ দুই কারকের পার্থক্য প্রাচীনপন্থী বৈয়াকরণেরা স্বীকার করতে চান। এখানেই রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য :

> সংস্কৃত ভাষায় সম্প্রদান কারক বলিয়া একটা স্বতন্ত্র কারক আছে, বিভক্তিতেই তাহার প্রমাণ। বাংলায় সে কারক নাই, কর্মকারকের মধ্যে তাহা সম্পূর্ণ লুপ্ত। তবু সংস্কৃত ব্যাকরণের নজিরে যদি বাংলা ব্যাকরণে সম্প্রদান কারক জবরদস্তি করিয়া চালাইতে হয়, তবে এ-কথাই বা কেন না বলা যায় যে, বাংলায় দ্বিবচন আছে। যদি 'ধোপাকে কাপড় দিলাম' কর্ম এবং 'গরিবকে কাপড় দিলাম' সম্প্রদান হয়, তবে এক বচনে 'বালক' দ্বিবচনে 'বালকেরা' ও বহুবচনেও 'বালকেরা' না হইবে কেন। তবে বাংলা ক্রিয়াপদেই বা একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন, ছাড়া যায় কী জন্য। তবে ছেলেদের মুখস্থ করাইতে হয়—একবচন 'হইল', দ্বিবচন 'হইল', বহুবচন 'হইল', একবচন 'দিয়াছে', দ্বিবচন 'দিয়াছে', ইত্যাদি। 'তাহাকে দিলাম' যদি সম্প্রদান কারকের কোটায় পড়ে তবে 'তাহাকে মারিলাম' সন্তাড়ন কারক; 'ছেলেকে কোলে লইলাম' সংলালন কারক; 'সন্দেশ খাইলাম' সম্ভোজন কারক'; 'মাথা নাড়িলাম' সঞ্চালন কারক এবং বাংলা কর্মকারকের গর্ভ হইতে এমন সহস্র সঙের সৃষ্টি হইতে পারে।
>
> ("বাংলা ব্যাকরণ", শব্দতত্ত্ব, র-র, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ ৫৬৫—৬৬)

যে কোনো ভাষার সর্বনাম এবং ক্রিয়াপদই উক্ত ভাষার নিজস্ব ধর্মের পরিচয় বহন করে। সেজন্যে সাধারণত বিদেশী ভাষা থেকে ঋণ হিসেবে ক্রিয়া সর্বনাম কোনো ভাষাতেই গৃহীত হয় না। ক্রিয়া উদ্যমশীল সেনাবাহিনীর মতো ভাষার চলতা ধর্মকে রক্ষা করে, তাকে কার্যতা ও গতিদান করে দেখে ক্রিয়াই ভাষাবিশেষের যথার্থ পরিচায়ক। ভাষাতাত্ত্বিক কৌতূহলবশত রবীন্দ্রনাথ এ সত্যও উপলব্ধি করেছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে ১৩০৮ সালে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত রচনাবলির দ্বাদশ খণ্ডে 'শব্দতত্ত্ব" গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে পুনর্মুদ্রিত তাঁর বাংলা ক্রিয়াপদের তালিকাটি তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। বলা বাহুল্য বাংলা ক্রিয়াপদের এ তালিকাটি প্রায় পূর্ণাঙ্গ।

ভাষাবিশেষের উপভাষাগুলির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। এ জন্যে একটি উপভাষার বিশ্লেষণ অন্যান্য উপভাষার—অন্য কথায় সমগ্র ভাষার—বৈশিষ্ট্য নির্ণায়ক নয়। সে জন্যে এ-কালের বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞান একটি লোকের মুখের ভাষা বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি উপভাষারই যাবতীয় তত্ত্ব ও তথ্য উদ্ঘাটনে বিশেষভাবে আস্থাশীল। এমনিভাবে ভাষাবিশেষের যাবতীয় উপভাষার পৃথক পৃথক বিশ্লেষণ করেই উক্ত ভাষার সামগ্রিক রূপের পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। বাংলা ভাষার সামগ্রিক রূপের পরিচয় উদ্ঘাটনে এ-কালের বর্ণনাত্মক ভাষা আলোচনার এ সাধারণ মূল নীতিটির গুরুত্ব রবীন্দ্রনাথের এ কথাগুলোর মধ্যে প্রতিফলিত হতে দেখি :

> বাংলা দেশে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষাগুলির একটি তুলনামূলক ব্যাকরণ যদি লিখিত হয় তবে বাংলা ভাষা বাঙালির কাছে ভালো করিয়া পরিচিত হইতে পারে। তাহা হইলে বাংলা ভাষার কারক ক্রিয়া ও অব্যয় প্রভৃতির উৎপত্তি ও পরিণতির নিয়ম অনেকটা সহজে ধরা পড়ে। (শব্দতত্ত্ব, ঐ, পৃ ৩৯৮)

৩

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্বে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে (১৩৪৫ সাল) তাঁর সাতাত্তর বৎসর বয়সে 'বাংলাভাষা-পরিচয়' বইটি প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের মতো এত বড় ভাষাশিল্পী

সমগ্র বাংলা ভাষাতে তো নয়ই, বিশ্বের অন্যান্য ভাষাতেও খুব কম জন্মেছেন। শুধু তাই না কোনো এক ভাষাশিল্পীর এত দীর্ঘকাল (প্রায় পৌনে এক শতাব্দী) ধরে ভাষা নিয়ে সাধনা উদাহরণও বড় বিরল। সে জন্যে বাংলা ভাষার কারবারি রবীন্দ্রনাথের বাংলা ভাষা সম্পর্কে একটা যে গভীর এবং তুলনারহিত অন্তর্দৃষ্টি জন্মাবে তা বিস্ময়করভাবেই সত্য। রবীন্দ্রনাথ এ কারণেই তাঁর 'বাংলাভাষা-পরিচয়'-এর ভূমিকায় বলেছেন, "বাংলাভাষা-পরিচয়' 'তত্ত্বে পরিচয় নিয়ে নয়, রূপের পরিচয় নিয়ে।" এ ভাষার তত্ত্বঘটিত যা কিছু আলোচনা তিনি তাঁ 'শব্দতত্ত্বে'ই সীমাবদ্ধ রেখেছেন, এখানে তত্ত্বের যদি কিছু অবতারণা করে থাকেন, তাকে ছাপিয়ে উঠেছে তার রসমাধুর্য।

তাঁর কথায় এ গ্রন্থটি লেখার কারণ,

"ভাষার ক্ষেত্রে চলতে চলতে যাতে আমাকে খুশি করেছে, ভাবিয়েছে, আশ্চর্য করেছে, তার কৌতুকের ভাগ সকলকে দেব বলেই লেখবার ইচ্ছে হল। বিষয়টাকে যাঁরা ফলাও করে দেখছেন ও তলিয়ে বুঝেছেন, এ লেখায় তাঁদের কাছে দুটো-চারটে খুঁত বেরোবেই। কিন্তু তা নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত হবার দরকার নেই। চলতে চলতে যা আমার চোখে পড়েছে এবং যে ভাবনা উঠেছে আমার মনে, সেই খাপছাড়া দৃষ্টির অভিজ্ঞতা নিয়ে যখন যা মনে আসে আমি বলে যাব। তাতে করে মনে তোমরা সেই চলে বেড়াবার স্বাদটা পাবে। তারও দাম আছে।"

ভাষার ধ্বনি থেকে নিয়ে তার শব্দগঠন ও বাক্য-প্রয়োগের বিধির খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানে সাধারণ ব্যাপার। এ না হলে চলে না। এগুলো ভাষারও যেমন মূল কাজ নয়, তেমনি বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানের এটি মূল অংশ নয়। ভাষার সবচেয়ে বড় পরিচয় মানুষের কাছে মানুষের মন জানাজানি নিয়ে। এই মন জানাজানির ভেতর দিয়ে গড়ে উঠে তার পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, বিশ্বসংঘ ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের কথায়—"সমাজ এবং সমাজের লোকদের মধ্যে এই প্রাণগত মনোগত মিলনের ও আদানপ্রদানের উপায়স্বরূপে মানুষের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যে সৃষ্টি সে হচ্ছে তার ভাষা। এই ভাষার নিরন্তর ক্রিয়ায় সমস্ত জাতকে এক করে তুলেছে; নইলে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে মানবধর্ম থেকে বঞ্চিত হত।"

ভাষা মানবসমাজের এই বিস্ময়কর ঐক্যের যে প্রতিষ্ঠা করছে সে তার শব্দ, শব্দযোজনা এবং তার অর্থের প্রয়োগ দিয়ে। শব্দার্থের এই কলমুখরতা এবং নিত্য আভিধানিক অর্থকে অতিক্রম করে ব্যঞ্জনা সৃষ্টির অপরূপ শক্তিই মানুষের চিত্তকে পদে পদে অবশ বিবশ করে দিয়ে যাচ্ছে : প্রতি পদে দোলা লাগছে তার মনে। শব্দের এই ব্যঞ্জনা ভাষাকে কাব্যিক সৌন্দর্য ও কলাকুশলতা দান করেছে, একটি সামগ্রিক ঐক্য ও মাধুর্যে অভিষিক্ত করেছে। শব্দের সেই অর্থোদ্ধারই বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানের রোমাঞ্চকর অংশ তা শব্দার্থবিজ্ঞানের কাজ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাংলাভাষা-পরিচয়'-এ খাঁটি বাংলা ভাষা নিরলঙ্কার ও টুকিটাকি শব্দ ও শব্দকণিকার পেছনে যে কী ব্যঞ্জনা নিহিত আছে জহুরির মতো তার পরিচয় দিয়েছেন।

কোনো ভাষাভাষীই একটি শব্দ সব জায়গায় এবং ভাষার যাবতীয় শব্দ এক জায়গায় ব্যবহার করে না। এমনকি একই শব্দের বিভিন্ন প্রকারের অগণিত প্রয়োগও হয় না। দীর্ঘ কাল ধরে সমাজের অগণিত মানুষের মনের স্পর্শলাভ করে এক একটি শব্দ গড়ে ওঠে, লালিত ও বর্ধিত হয় বলে একটি শব্দের মধ্যে বহু অর্থ ও তার ব্যঞ্জনা জড়িয়ে যায়। তার স্বরূপ ও মহিমা উপলব্ধি করতে হলে বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় বাক্যে ব্যবহৃত তার পার্শ্ববর্তী অন্যান্য শব্দের লাবণ্য ও সুষমার ভেতর থেকেই উক্ত শব্দের অর্থ উদ্ধার করতে হয়। এ ধরনের Cultural ও Collocational Context-এর সাহায্যেই বাগর্থবিজ্ঞান

[illegible] বিশেষ শব্দের অর্থ উদ্ধার করে। কবিরা সাধারণত ভাষাবিজ্ঞানী নন, কিন্তু বিধিদত্ত [illegible] ও অন্তরশক্তির সাহায্যেই তাঁরা যেমন শব্দের এহেন প্রয়োগজাত অর্থ উদ্ধার করতে পারেন, তেমনি সহজাত চেতনা ও মনীষার সাহায্যে শব্দবিশেষের প্রয়োগক্ষেত্র বৃদ্ধি করে তার মধ্যে প্রাণাবেগ সঞ্চার করে শব্দকে অভাবিতপূর্ব অর্থের গৌরবে শিহরিত করে তুলতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের 'বাংলাভাষা–পরিচয়' প্রধানত বাংলা শব্দের অর্থগৌরবের এ পরিচয়ই উদ্ঘাটন করেছে। সে জন্যে এটি বাংলা ভাষার আলোচনা–সংক্রান্ত যাবতীয় গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে মধুর এবং সুখপাঠ্য।

ভাষায় সাধারণত বস্তুক (concrete) এবং নির্বস্তুক (abstract) এ দুরকম শব্দ পাওয়া যায়। বস্তুক তথা পদার্থবাচক শব্দগুলো একটু না একটু জায়গা জুড়ে থাকে, সে জন্যে তারা প্রত্যক্ষ; কিন্তু নির্বস্তুক শব্দগুলো আকারপ্রকারহীন গুণদোষের আকর বলে এগুলোকে ইশারায় করে মানুষের মন এত দূরে চলে যেতে পেরেছে যত দূরে তার ইন্দ্রিয়শক্তি যেতে পারে না, যত দূরে কোনো যানবাহন পৌঁছোয় না।" এই আকারপ্রকারহীন 'ইশারা'র বা [illegible]'র ভাষার প্রয়োগ ও তার অর্থ উদ্ধারই ভাষায় এনেছে চমৎকারিত্ব, বাড়িয়েছে তার [illegible]বেগ।

রবীন্দ্রনাথ কীভাবে এরকম একটি শব্দের অর্থ উপলব্ধি ও তার ব্যাখ্যা করেছেন তা [illegible]যোগ্য :

> ভালো লাগা বোঝাতে কবি বললেন, 'পাষাণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে'। বললেন, 'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনি বহিয়া যায়'। এখানে কথাগুলোর ঠিক মানে নিলে পাগলামি হয়ে দাঁড়াবে। কথাগুলো যদি বিজ্ঞানের বইয়ে থাকত তা হলে বুঝতুম, বিজ্ঞানী নতুন আবিষ্কার করেছেন এমন একটা দৈহিক হাওয়া যার রাসায়নিক ক্রিয়ায় পাথর কঠিন থাকতে পারে না, গ্যাস রূপে হয় অদৃশ্য। কিংবা কোনো মানুষের শরীরে এমন একটি রশ্মি পাওয়া গেছে যার নাম দেওয়া হয়েছে লাবণি, পৃথিবীর টানে যার বিকিরণ মাটির উপর দিয়ে ছড়িয়ে যেতে থাকে। শব্দের অর্থকে একান্ত বিশ্বাস করলে এইরকম একটা ব্যাখ্যা ছাড়া উপায় থাকে না। কিন্তু এ–যে প্রাকৃত ঘটনার কথা নয়, এ–যে মনে–হয়–যেন'র কথা। শব্দ তৈরি হয়েছে ঠিকটা–কী জানাবার জন্যে; সেইজন্যে ঠিক–যেন–কী বলতে গেলে তার অর্থকে বাড়াতে হয়, বাঁকাতে হয়। ঠিক–যেন–কী'র ভাষা অভিধানে বেঁধে দেওয়া নেই, তাই সাধারণ ভাষা দিয়েই কবিকে কৌশলে কাজ চালাতে হয়। তাকেই বলা যায় কবিত্ব। বস্তুত কবিত্ব এত বড় জায়গা পেয়েছে তার প্রধান কারণ, ভাষার শব্দ কেবল আপন সাদা অর্থ দিয়ে সব ভাব প্রকাশ করতে পারে না। তাই কবি লাবণ্য শব্দের যথার্থ সংজ্ঞা ত্যাগ করে বানিয়ে বললেন, যেন লাবণ্য একটা ঝরনা, শরীর থেকে ঝরে পড়ে মাটিতে। কথার অর্থটাকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে দিয়ে এ হল ব্যাকুলতা; এতে বলার সঙ্গে সঙ্গেই বলা হচ্ছে 'বলতে পারছি নে'। এই অনির্বচনীয়তায় সুযোগ নিয়ে... প্রচলিত শব্দকে অপ্রচলিতের চেহারা দিয়ে ভাষার আভিধানিক সীমানাকে অনির্দিষ্টভাবে বাড়িয়ে দেওয়া হল। (বাংলা ভাষাপরিচয়, র–র, ২৬ খণ্ড, পৃ ৩৮১–৮২)

কবিতা থেকে শব্দার্থ কীভাবে উদ্ধার করতে হয় অর্থবিজ্ঞানের নিয়ম ধরেই তাতে [illegible] লাগিয়ে তিনি তার দিক নির্ণয় করেছেন। কবিতা কিন্তু ব্যবহারিক জীবনের ভাষা নয়, সেজন্যে তার রূপ চিত্তহারী হলেও তার গতি সীমাবদ্ধ। ভাষার গদ্যরূপ সেখানে আসে [illegible] জীবনকে কেন্দ্র করে। সে জন্য গদ্যে ব্যবহৃত ভাষার রূপই তার স্বভাবসুন্দর রূপ। সেখানে শব্দের ব্যবহার, শব্দ সংযোজন যে অর্থমাধুর্য সৃষ্টি করে তা থেকেই মানুষের চলমান [illegible]জীবনের যথার্থ সম্পর্ক অনুধাবন করা যায়। বহু স্বদেশী ও বিদেশী নির্ভার শব্দ, শব্দ

সংযোজন, প্রত্যয় ও বাগবিধির অর্থসৌন্দর্যও সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায় নি। তাদের চটুলতা ও মনোহারিত্বও তিনি সমভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন :

> এটা হতে পেরেছে তার কারণ, সীমাসরহদ্দ নিয়ে মামলা করে না চলতি ভাষা। স্বদেশী বিদেশী হালকা ভারী সব শব্দই ঘেঁষাঘেঁষি করতে পারে তার আঙিনায়। সাধু ভাষায় তাদের পাসপোর্ট মেলা শক্ত। পার্সি আরবি কথা চলতি ভাষা বহুল পরিমাণে অসংকোচে হজম করে নিয়েছে। তারা এমন আতিথ্য পেয়েছে যে তারা যে ঘরের নয় সে কথা ভুলেই গেছি। 'বিদায়' কথাটা... সংস্কৃত পোশাক পরে বসেছে। 'হয়রান করে দিয়েছে' বললে ক্লান্তি ও অসহ্যতা মিশিয়ে যে ভাবটা মনে আসে কোনো সংস্কৃতের আমদানি শব্দে তা হয় না। অমুকের কাছে গানে 'দরদ' লাগে না, বললে ঠিক কথাটি বলা হয়, ও ছাড়া আর-কোনো কথাই নেই। গুরুচণ্ডালির শাসনকর্তা যদি দরদের বদলে 'সংবেদনা' শব্দ চালাবার হুকুম করেন তবে সে হুকুম অমান্য করলে অপরাধ হবে না। (ঐ, পৃ. ৩৯৬)
>
> কিন্তু এ কথাও জেনে রাখা ভালো, খাস বাংলায় এমন-সব বলবার ভঙ্গী আছে যা আর কোথাও পাওয়া যায় না। শব্দকে দ্বিগুণ করবার একটা কৌশল কথ্য বাংলায় চলতি, কোনো অর্থবান শব্দে তার ইশারা দেওয়া যায় না। মাঠ ধূ ধূ করছে, রৌদ্র করছে ঝাঁ ঝাঁ : মানেওয়ালা কথায় এর ব্যাখ্যা অসম্ভব। তার কারণ, অর্থের চেয়ে ধ্বনি সহজে মনে প্রবেশ করে : উস্‌খুস্‌, নিস্‌পিস্‌, ফ্যালফ্যাল, কাঁচুমাচু শব্দের ধরাবাঁধা অর্থ নেই। তাদের কাছ থেকে যেন উপরি পাওনা আদায় হয়, তাতে ব্যাকরণী টাঁকশালের ছাপ নেই।
>
> বাংলায় আর-একরকম শব্দদ্বৈত আছে তাদের মধ্যে অর্থের আভাস পাই, কিন্তু তারা যতটা বলে তার চেয়ে আঙুল দেখিয়ে দেয় বেশি। সংস্কৃতে আছে 'পতনোন্মুখ', বাংলায় বলে 'পড়ো-পড়ো'। সংস্কৃতে যা 'আসন্ন' বাংলায় তা 'হব-হব'। সেইরকম : গেল-গেল, যায় যায়। সংস্কৃতে যা 'বাষ্পাকুল' বাংলায় তা 'কাঁদো-কাঁদো'। সংস্কৃতে বলে 'অবরুদ্ধস্বরে', বাংলায় বলে 'বাধো-বাধো গলায়'। বাংলায় ঐ কথাগুলোতে কেবল যে একটা ভাব পাওয়া যায় তা নয়, যেন ছবি পাই। একটা শ্লোক বলা যাক—
>
> যাব-যাব করে, চরণ না সরে,
> ফিরে-ফিরে চায় পিছে,
> পড়ো-পড়ো জলে ভরো-ভরো চোখ
> শুধু চেয়ে থাকে নীচে।
>
> ঠিক এ রকম এক টুকরো রেখালেখ্য এই বাধো-বাধো ভাষাতেই বানানো চলে।
>
> (ঐ, পৃ. ৪২৩)

বাংলার টুকরো-টুকরো শব্দকণিকা—স্বতন্ত্রভাবে যাদের তেমন কোনো অর্থ নেই কিংবা থাকলেও যাদের অর্থে কোনো মিষ্টতা নেই তারাই—বাক্যে অন্য শব্দের আগে-পরে বসে ভাষাকে করে মিষ্টি, অর্থে যোগ করে মনকে জানা থেকে অজানায় টেনে নিয়ে যাবার ইশারা। রবীন্দ্রনাথ এগুলোর অগণিত উদাহরণ দিয়েছেন।

যেমন—কেন, কেন বা, কেনই বা; যেন (যেখানে এর প্রয়োগে বিদ্রূপের ভঙ্গি লাগানো হয়) যেমন 'যেন কার্তিকটি', 'যেন আহ্লাদে পুতুল', 'যেন নবাব খাঞ্জে খাঁ' ইত্যাদি। কেন, কেন যে, কি, কী যে ইত্যাদি। তেমনি 'গে'র ব্যবহার। যেমন, হোক গে, করুক গে, মরুক গে, কিন্তু আবার 'গে' 'গো' হয়ে দাঁড়ালে তা থেকে অন্যরকম মিষ্টতা ঝরে পড়ে, যেমন কিগো, বলি কিগো, ওগো, হাঁগো, ইত্যাদি। 'তেমনি ক্রিয়াপদের অনুজ্ঞায় অসংগতভাবে 'না' অব্যয়টির ব্যবহার। এর কাজ হচ্ছে আদেশ বা অনুরোধকে অনুনয়ে নরম করে আনা।

যেমন হোক না, করুক না। এরই সঙ্গে 'না' অর্থে 'হাঁ'–এর অর্থ প্রকাশ করার ইশারাও লক্ষযোগ্য, যেমন, বলো না! করো না! দাও না! ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ এ কারণেই বলেছেন 'ক্রিয়াপদের এতরকম ইশারা বোধহয় আর কোনো ভাষায় নেই।'

পরিশেষে বাংলার টা, টি, টু, টুকু, টুকুন, খানা, খানি, গোছা, গাছা, গাছি প্রভৃতি নির্দেশবাচক প্রত্যয়ের ব্যবহারের কথা উল্লেখ করতে হয়। এগুলোর কোথায় কী ব্যবহার তা রবীন্দ্রনাথ তার কিছু দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। বাংলা ভাষার ধ্বনিসম্পদ ও শব্দাবলির অর্থমাধুর্যের যথার্থ স্বাদ না পেলে এই টুকিটাকি প্রত্যয়গুলোর মধ্যে বাংলা শব্দের যে কী সূক্ষ্ম অনির্বচনীয়তা নিহিত আছে তা কেউ ধরতে পারে না। বাংলায় কোথায় যে টা কোথায় টি, কোথায় টুকু আর টুকুন, কোথায় খানা আর কোথায় বা খানি ব্যবহার করতে হয় এবং তাদের যথাযথ ব্যবহারে অর্থের ব্যঞ্জনা যে কীভাবে গতিবহুল হয়ে ওঠে তা বাংলা ভাষাশিল্পীদের মধ্যে বোধহয় রবীন্দ্রনাথ এবং অবনীন্দ্রনাথই সার্থকভাবে ধরতে পেরেছিলেন।

জীবনব্যাপী সাধনায় বাংলা ভাষার এ মাধুর্যের পূর্ণ পরিচয় পেয়েছিলেন বলেই বাংলা ভাষা আলোচনার শেষ প্রান্তে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ এমনতর উক্তি করতে পেরেছিলেন—'বাংলা ভঙ্গিওয়ালা ভাষা। ভাব প্রকাশের এমন সাহিত্যিক রীতি অন্য কোনো ভাষায় আমার জানা নেই।'

মুহাম্মাদ কুদরাত-এ-খুদা

শিক্ষাসমস্যা ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তা

১৯৩৬ সালে কলিকাতায় একবার প্রাদেশিক শিক্ষা সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সময়ে রবীন্দ্রনাথ দেশের শিক্ষার কথা কিছুটা আলোচনা করেন। বর্তমান নিবন্ধ তারই ওপর ভিত্তি করে লিখিত।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। চীনের ছাত্ররা বলে রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়বার জন্য তারা বাংলা শিখতে আগ্রহী। তেমনি রাশিয়াতেও বাংলার আলোচনা হয় রবীন্দ্রসাহিত্যকে জানবার আগ্রহে। নিজ দেশে রবীন্দ্রনাথ বর্তমানে যেন তাঁর প্রভাব হারাতে বসেছেন। এর ফলে দেশেরই দুর্ভাগ্য নেমে এসেছে। এক শ্রেণীর লোক রবীন্দ্রনাথকে যেরকম অবহেলা দেখাচ্ছেন, তাতে মনে হয়, আমরা বাংলা সাহিত্যের প্রাণবস্তুকে বাদ দিয়ে সাহিত্য রচনার ভান করছি। এও কি সম্ভব? আজ তাই দেশের শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর দু-একটা কথা লিখে দেশের কাছে প্রদত্ত তাঁর বাণী সম্বন্ধে আমাদের নবীন যুবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন মনে করছি।

সেদিন রবীন্দ্রনাথ বলেন, ''আমাদের দেশে আর্থিক দারিদ্র্য দুঃখের বিষয়, লজ্জার বিষয় আমাদের শিক্ষার অকিঞ্চিৎকরত্ব। এই অকিঞ্চিৎকরত্বের মূলে আছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার অস্বাভাবিকতা, দেশের মাটির সঙ্গে এই ব্যবস্থার বিচ্ছেদ।'' এ-কথা তিনি কেন বলেন, তা বর্তমানে কারো অবিদিত নয়। দেশের আর্থিক অসচ্ছলতা যেমন তাঁর সময়ে অতি প্রকটভাবে সমাজের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল, আজও আমাদের স্বাধীনতা-উত্তর যুগে সেই একই দুর্ভোগের কথা ভাবতে হয়। এখনো শিক্ষার জন্য যথেষ্ট অর্থ দেশে পাওয়া যায় না, ফলে প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে শিক্ষকদের আর্তক্রন্দন শুনতে পাওয়া যায়। তাঁরা অর্থের অভাবে সুষ্ঠু জীবন যাপন করতে অক্ষম। আজও ছাত্রসমাজ শিক্ষার ব্যয়ভারে অত্যন্ত বিব্রত, অথচ বর্তমানে অধীনতাপাশমুক্ত দেশগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাই, ঈজিপ্ট দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এমনভাবে পরিচালনা করছে যে, ছাত্রসমাজে আর্থিক দৈন্য তথায় কোনো ছাত্রকে শিক্ষার পথ থেকে কখনো পিছপা হতে দেয় না। সে দেশের আর্থিক অবস্থা এমন কিছু সচ্ছল নয়, অথচ সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বিশ্ববিদ্যার স্তর পর্যন্ত সর্ববিধ শিক্ষা বিনা বেতনে সকলেই লাভ করছে। চীনের শিক্ষাব্যবস্থায় অর্থের অভাব লোককে বিব্রত করে না। অবশ্য চীনের রাষ্ট্রীয় অবস্থা আমাদের তুলনায় আলাদা, কিন্তু যদি ইংলণ্ডের দিকে চেয়ে দেখি, তা হলেও বুঝতে পারি শিক্ষাজগতে সেখানকার ব্যবস্থা অভিন্ন। ছোট ছেলেদের জন্য

সেখানে শিক্ষার ব্যবস্থা অবৈতনিক শুধু নয়, পরন্তু প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েকে বাধ্যতামূলকভাবে স্কুলে যেতে হয় এবং তা না পাঠালে পিতামাতাকে, অভিভাবকবর্গকে শাস্তি গ্রহণ করতে হয়। আমাদের দেশের শিক্ষাও এই আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন ছিল, কিন্তু কে তার কথা ভেবেছে? আজ স্বাধীনতা-উত্তরকালের বিংশ বর্ষেও রবীন্দ্রনাথ-কথিত আমাদের সেই শিক্ষার অকিঞ্চিৎকরত্ব এখনো তেমনি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। কবে যে আমরা এর দুর্ভোগ থেকে নিষ্কৃতি পাব, তা আজও জানি না।

রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছেন, "আমাদের ভাষা, আমাদের আর্থিক অবস্থা, আমাদের অনিবার্য অশিক্ষার সঙ্গে রাষ্ট্রশাসনবিধির বিপুল ব্যবধানবশত পদে পদে যে দুঃখ ও অপব্যয় ঘটে তার পরিমাণ প্রভূত। তবু বলতে পারি এটা বাহ্য। কিন্তু শিক্ষা ব্যাপার দেশের প্রাণগত আপন জিনিস না হওয়া তার চেয়ে মর্মান্তিক।" আমাদের রাষ্ট্রবিধানে আজ প্রভূত পরিবর্তন ঘটেছে। শুনতে পাই রাষ্ট্রনায়করা বলেন, প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় কর্মচারীর আজ চিন্তা করা দরকার যে, তাঁরা দেশের সেবক, সুতরাং দেশবাসীর উন্নতিকল্পে সর্ববিধ কার্যের অনুষ্ঠান করা তাঁদের কর্তব্য। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় কেউই দেশবাসীর কথা ভাবেন না। বর্তমানে লোকেদের ধারণা হয়েছে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, সুতরাং তাদের দায়িত্ব দেশবাসীর কাছে নয়, তাদের দায়িত্ব লোকবিশেষের কাছে। ফলে শাসনবিধির সঙ্গে সমাজের ব্যবধান তেমনি রয়ে গেছে। আর আমাদের অশিক্ষার যুগ এখনো কেটে যায় নি, আশার আলোক নিয়ে জীবনে নবীন উষার আগমন এখনো বহু দূরে।

একটা কথাই ধরা যাক। আমাদের ভাষা ও দেশের শিক্ষার ভাষার তারতম্য অনেকখানি। স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে যে ভাষাকে পরিহার করবার জন্য সারা দেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, যে ভাষার প্রতি ধীরে ধীরে যুগে যুগে বিরাট একটি বিতৃষ্ণা জেগে উঠেছিল, যাকে ত্যাগ করবার জন্য প্রভূত মানসিক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামকালে যে ভাষাকে আশু পরিত্যাগের জন্য সারা যুবসম্প্রদায় চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, আজও দেখি স্বাধীনতা-উত্তর গত বিশ বৎসরেও এই পরিবর্তনের কোনো ব্যবস্থা বিশেষভাবে কেউ করছে না। অথচ যেমন রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, তেমনিভাবে চীন বিদেশী ভাষার অস্বাভাবিক অনিষ্টকর প্রভাব অন্তর দিয়ে বুঝেছিল বলে ১৯৪৯ সালে নিজেদের কার্যবিধি, শিক্ষা ইত্যাদি নিজের ভাষায় পরিচালিত করতে লেশমাত্র দ্বিধা করে নি। আজ তার সুফল সারা বিশ্ব দেখতে পাচ্ছে। চীন আজ বিশ্বে তার বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে চলেছে। তারা শিক্ষার ভাষা পরিবর্তন করে প্রায় স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু আমরা তাদের দু বছর আগে শাসননিয়ন্ত্রণের সুবিধা পাই, তথাপি এমনিভাবে আমরা বিদেশী ভাষার দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি যে, আজও আমরা তার অপ্রপ্রভাব বুঝতে পারি না, পরন্তু ওকে দেহের আভরণস্বরূপ ধরে নিয়েছি এবং ইংরাজ-দাসত্বের পরিবর্তে ইংরেজির দাসত্বকে সমাজজীবনের আবশ্যিক ব্যবস্থা মনে করতে কুণ্ঠিত হই না। আজ তাই কোনো শিক্ষিত লোকের মুখে যখন শুনি আমরা ইংরেজি পরিহার করতে পারব না, তখন মনে করি যে, সে লোকের শিক্ষা কোনো দিনই সম্পূর্ণতা পায় নি। পরন্তু তাঁরা সেই কুশিক্ষার জালে আবদ্ধ যা তাদের নিশ্চিতরূপে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে, এবং তাঁদের অনুবর্তীগণ সারা দেশে বিরাট অশান্তির সৃষ্টি করবে। দেশের উন্নতি পদে পদে ব্যাহত হবে।

রবীন্দ্রনাথ আরো বলেন, "শিক্ষা সম্বন্ধে সবচেয়ে স্বীকৃত এবং সবচেয়ে উপেক্ষিত কথাটা এই যে, শিক্ষা জিনিসটা জৈব, ওটা যান্ত্রিক নয়। এ সম্বন্ধে কার্যপ্রণালীর প্রসঙ্গ পরে আসতে পারে, কিন্তু প্রাণক্রিয়ার প্রসঙ্গ সর্বাগ্রে।" এই যে সবচেয়ে স্বীকৃত বিষয়টির কথা

তিনি উল্লেখ করেছেন সেটা তাঁর বহুদর্শী দৃষ্টির পরিচয়। বিভিন্ন স্বাধীন দেশে এই স্বীকৃতি দেখেই তাকে স্বাভাবিকভাবে নিজের দেশের জন্যও তিনি গ্রহণ করেন যে, শিক্ষা জিনিসটা জৈব, এর প্রয়োগটা যন্ত্রযোগে হয় না। মানুষের জীবনে এই জৈবশক্তি সর্বস্তরে কার্যকরী না হলে তার গঠনই সম্পূর্ণ হত না। কিন্তু শিক্ষাও যে তেমনি জৈব প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে স্নেহ ও ভালবাসার সঙ্গে প্রয়োগ করতে হবে, সে কথা আমাদের দেশে কয়জন ভাবে? এখানে মনে হয় spare the rod and spoil the child এখনো শিক্ষা প্রয়োগের নীতি। আজ সারা স্বাধীন বিশ্ব একে জঙ্গলের নীতি বলে পরিত্যাগ করেছে, কিন্তু আমাদের দেশের বিধান অন্যরকম। এই জন্য অতিশয় পীড়া পাই যখন আইনবলে শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা হয়। আইন যান্ত্রিক নীতি, কিন্তু শিক্ষার নীতি হবে জৈব। তাকে ভালবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং স্নেহের পরশ দিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। যদি কেউ মনে করেন শিক্ষার্থীকে আইনের কাঠগড়ায় ফেলে শিক্ষার প্রতিষ্ঠা করবেন, তা যেমন প্রমাদপূর্ণ হবে, তেমনি হবে সর্বনাশী। প্রকৃত শিক্ষা এই বিধি দ্বারা সম্পন্ন হয় না। বর্তমানে কোনো শিক্ষাবিৎই ঐ পথে শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের কথা ভাবতে পারেন না। কিন্তু আমাদের মতো অশিক্ষিতের দেশে কজন সেসব কথা চিন্তা করেন? এইজন্যই আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বিশাল। যেমন প্রাথমিক ক্লাসের ছেলেমেয়েরা শিক্ষকের স্নেহের স্পর্শ না পেয়ে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে "ওয়েস্টেজে"র অন্তর্ভুক্ত হয়, তেমনি উচ্চতর স্তরে ছেলেমেয়েরা আদর্শের অভাবে শিক্ষার সুষ্ঠু প্রয়োগের কথা জানতে পারে না। কাজেই সেদিন রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বকে শিক্ষার জৈবিক সত্য যেমন দোলা দেয় তেমনিভাবে তাঁকে মুখর করে তোলে; কিন্তু পরিতাপের কথা এই যে, যেমন তখনকার দিনে তাঁর বাণী মানুষকে সচেতন করতে পারে নি তেমনি আজ আমরা তাঁর এই বাণীর সার্থকতা প্রাণ দিয়ে বুঝতে না পেরে শিক্ষার জন্য একটা গতানুগতিক পন্থা অবলম্বন করেছি—যা অত্যন্ত অপ্রযোজ্য।

রবীন্দ্রনাথ বহু দেশ ভ্রমণ করেন, সে-কথার উল্লেখ করেছি। এই ভ্রমণকালে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, তার ফলে বলেন : "শিক্ষার ঐক্যযোগে বিত্তের ঐক্যরক্ষাকে সভ্য সমাজমাত্রই একান্ত অপরিহার্য বলে জানে। ভারতের বাইরে নানা স্থানে ভ্রমণ করেছি, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মহাদেশে। দেখে এসেছি এশিয়ার নবজাগরণের যুগে সর্বত্রই জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রচারের দায়িত্ব একান্ত আগ্রহের সঙ্গে স্বীকৃত। বর্তমান যুগের সঙ্গে যেসব দেশ বিত্তের ও চিত্তের আদান প্রদান বুদ্ধি বিচারের সঙ্গে চালনা করতে না পারবে, তারা কেবলই হটে যাবে, কোণঠাসা হয়ে থাকবে। এই শঙ্কার কারণ দূর করতে কোনো ভদ্র দেশ অর্থাভাবের কৈফিয়ত মানে নি। আমি যখন রাশিয়ায় গিয়েছিলুম তখন সেখানে আট বছর মাত্র স্বরাজতন্ত্রের প্রবর্তন হয়েছে, তার প্রথম ভাগে অনেক বিদ্রোহে বিপ্লবে দেশ ছিল শান্তিহীন, অর্থসচ্ছলতা ছিল না। তবু এই স্বল্পকালেই রাশিয়ার বিরাট রাজ্যে প্রজাসাধারণের মধ্যে যে অদ্ভুত দ্রুতগতিতে শিক্ষাবিস্তার হয়েছে, সেটা ভাগ্যবঞ্চিত ভারতবাসীর কাছে অসাধ্য ইন্দ্রজাল বলেই মনে হল।"

শিক্ষার সঙ্গে বিত্তের ঐক্যরক্ষা সর্বত্রই অপরিহার্য, কিন্তু এও সত্য যে, শিক্ষার প্রসার একদিকে যেমন বিত্তসংগ্রহে সাহায্য করে, তেমনি আর একদিকে শিক্ষিতের অভিজ্ঞতা বিভিন্ন উপায়ে বিত্ত সংরক্ষণের সাহায্যও করে থাকে। নতুন বিত্তও শিক্ষিত দল আনয়ন করেন। মনে পড়ে কিছুদিন পূর্বে নেতৃস্থানীয় কেউ কেউ বলতে শুরু করেন যে, উচ্চশিক্ষা দেশে সীমিত হওয়া প্রয়োজন, কারণ উচ্চশিক্ষিতদের সংখ্যাধিক্যে দেশে অনিয়োগের প্রশ্ন দেখা দেবে, সেইসঙ্গে আন্দোলনের প্রসার বাড়বে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা তাঁরা ভেবে দেখেন

না যে, উচ্চশিক্ষিত লোকেরাই রোজগারের নতুন পন্থা আবিষ্কার করতে পারেন এবং ফলে দেশে নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, যার ফলে কেবল উচ্চশিক্ষিতরাই কাজ পান না, পরন্তু আরো পাঁচ শ লোকের নতুন রোজগারের পথ তাঁরা খুলে দেন। নতুন কাজের প্রচেষ্টা এমনি করেই বাড়ে। বর্তমান যুগে সভ্য দেশমাত্রেই দেশের প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েকে প্রায় দশ বৎসরের জন্য স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থা আবশ্যিকভাবে কিন্তু বিনা খরচায় গ্রহণ করার সুবিধা রাষ্ট্র দিচ্ছে। আজও এদেশে তেমন ব্যবস্থা করবার কথা কেউ মনে করে না। আজ বিশ্বের অবস্থা অন্যরূপ। কোনো দেশ একা একা বাস করতে পারে না। পরস্পরের সঙ্গে আদান-প্রদান অতিশয় আবশ্যক, কাজেই প্রত্যেক দেশের শিক্ষার মানে সমতার প্রয়োজন। অতি দুঃখের কথা, এই সমতা এখনো আমরা অর্জন করতে পারি নি, পরন্তু কোনো কোনো দেশের তুলনায় আমরা অনেকখানি পেছনে পড়ে আছি। সে একদিন ছিল যখন লণ্ডনে উচ্চতর শিক্ষার জন্য যারা গিয়েছে, তাদের সোজাসুজি পিএইচ. ডি. করবার জন্য সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয় অনুমতি দিতে দ্বিধা করত না। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর কালে এখানকার এম. এ. বা এম. এসসি.-দের তারা বি. এ. বা বি. এসসি. করবার জন্য প্রথমে পীড়াপীড়ি করেন। পরিশেষে এখানকার এম. এ. বা এম. এসসি.-রা সেখানে পিএইচ. ডি.র জন্য অন্ততঃপক্ষে তিন বৎসর কাজ করতে বাধ্য হয়, যেখানে সেখানকার ছাত্ররা এই ডিগ্রীর জন্য বি. এ. বা বি. এসসি.র পর মোট দু বৎসর খাটে। কাজেই বলতে হয় এখানে শিক্ষার মানের অবনতি হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছিলেন, আমরা অন্য দেশের সমকক্ষতা করতে পারি না, আর সে চেষ্টা নেই বলে কতদিনে যে তা পারব, তার স্থিরতাও নেই।

বর্তমান বিশ্বে সায়ান্সের যুগ চলেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'কিন্তু সায়ান্সে গড়া পাশ্চাত্য বিদ্যার সঙ্গে আমাদের দেশের মনের যোগ হয় নি—জাপানে সেটা হয়েছে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে। তাই পাশ্চাত্য শিক্ষার ক্ষেত্রে জাপান স্বরাজের অধিকারী। এটা তার পাশকরা বিদ্যা নয়, আপনকরা বিদ্যা। সাধারণের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক, সায়ান্সে ডিগ্রিধারী পণ্ডিত এদেশে বিস্তর আছে, যাদের মনের সায়ান্সের জমিনটা তলতলে, গড়াগড়ি যা-তা বিশ্বাস করতে তাদের অসাধারণ আগ্রহ; মেকি সায়ান্সের মন্ত্র পড়িয়ে অন্ধ সংস্কারকে তারা সায়ান্সের জাতে তুলতে কুণ্ঠিত হয় না।' আমাদের দেশের বর্তমান বিজ্ঞানীদের এমনি করে রবীন্দ্রনাথ বিদ্রূপ করে গেছেন। সত্যিই কি আমাদের অবস্থা এমনি? একটু প্রণিধান করে দেখলে কথাটি স্পষ্ট বোঝা যাবে। এমন বহু লোককে দেখা যায়, যাঁরা সায়ান্সের পাঠ উচ্চস্তর পর্যন্ত সম্পন্ন করলেও তার প্রকৃত প্রভাবে মনকে প্রভাবান্বিত করতে সমর্থ হন নি, আজও নানাবিধ কুসংস্কার তাঁদের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। আমার এ বিষয়ে একটু প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করবার সুযোগ ঘটে। তখন আমি পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো স্থানে বাস করি এবং কিছুদিন পর্যন্ত ভূতের অভিনয়ে নিব্রত থাকি। অভিনয়টি ছিল বাড়িতে অন্ধকারে ঢিল পড়ার। ঐ সময়ে দেখেছি কত বিজ্ঞান পাশকরা লোক আমাকে সাহায্য করতে আসেন। কিন্তু শিক্ষা তাঁদের সংস্কারকে দূর করতে পারে নি, বিজ্ঞানীরাও ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন দেখেছি। এখনো অনেক লোক দেখা যায় যারা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসারও বিজ্ঞানী সমর্থন দিতে চান। পরমাণু তেজে যেখানে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হতে পারে সেখানে হোমিওপ্যাথের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিমাণ ঔষধে কেন রোগের চিকিৎসা হবে না! এমনি কত কথাই না দেশের বিজ্ঞানশিক্ষিতের মধ্যে চলিত রয়েছে। কাজেই তাদের সায়ান্স-পাঠ যে মেকি সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কোথায়?

সায়ান্স-শিক্ষা আমরা জাপানের মতো আপন করতে পারি নি কেন, তারও যথার্থ কারণের প্রতি তিনি ইঙ্গিত করেছেন। দেশবাসী সেই ইঙ্গিত গ্রহণ করে দেশে সায়ান্সের

শিক্ষাকে সার্থক করে তুলুন, সে ইচ্ছাও তিনি প্রকাশ করে গিয়েছেন। তিনি বলেন, 'শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ, জগতে এই সর্বজনস্বীকৃত নিরতিশয় সহজ কথাটা বহুকাল পূর্বে একদিন বলেছিলেম, আজও তার পুনরাবৃত্তি করবো। সেদিন যা ইংরাজী শিক্ষার মন্ত্রমুগ্ধ কর্ণকুহরে অশ্রাব্য হয়েছিল, আজও যদি তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, তবে আশা করি, পুনরাবৃত্তি করবার মানুষ বারে-বারে পাওয়া যাবে।' কথাটি এত সত্য এবং স্পষ্ট যে, এ নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন করে না। তবু দেশে এখন তেমন লোকের অভাব নেই যাঁরা রবীন্দ্রনাথের কথায়, ইংরেজির মন্ত্রমুগ্ধ কর্ণকুহরে একে অশ্রাব্য মনে করেন। দুঃখ হয় এই জন্য যে, এমনি কথা আমাদের দুর্ভাগ্যবশত কোনো কোনো দায়িত্বজ্ঞানশীল নেতৃস্থানীয় লোকের মুখ থেকে এখন শুনতে হয় যে, ইংরেজি আমাদের দেশে নাকি অপরিহার্য।

ইংরেজির অত্যাচারে এখনো দেশের শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করতে পারছে না। আমাদের শিক্ষা যে ক্রমে অবনতির দিকে চলেছে তার প্রধান কারণ, ইংরেজির চাপে কোনো ছেলেমেয়েই তার শিক্ষণীয় বিষয়গুলি পূর্ণতরভাবে আয়ত্ত করতে পারে না। প্রতিটি পরীক্ষায় দেখা যায় ইংরেজির জন্য শতকরা ৫০ থেকে ৬০ ভাগ ছেলেমেয়ে অকৃতকার্য হয়। যারা অকৃতকার্য হয়ে শিক্ষার পথ ত্যাগ করে তাদের কথা বাদ দিলেও দেখতে পাই ইংরেজির জন্য প্রচুর সময় নষ্ট করায় অন্যেরা ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বোটানি, যুঅলজি—কোনো বিষয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সময় অধ্যয়নে দিতে পারে না। ফলে এইসব শিক্ষার বিশিষ্ট শাখায় তাদের অর্জিত ফল সমুচিত হয় না—সব বিষয়েই তারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল থেকে যায়। এটাই ভবিষ্যৎ জীবনে তাদের শিক্ষার প্রসার লাভ করার পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। আজও কিন্তু দেশের দায়িত্বসম্পন্ন লোক এ বিষয়ে ঠিক অবহিত নন, পরন্তু তাঁরা আজও শিক্ষা ব্যাপারে দারুণভাবে গড়িমসি করছেন। অথচ যেসব দেশ সদ্য স্বাধীনতা লাভ করেছে তারা প্রথমেই তাদের শিক্ষার পথের প্রধান বিঘ্নকে ত্বরায় অতিক্রম করেছে। আজ তাই দেখি ঈজিপ্টে শিক্ষার ধারা মাতৃভাষা আরবিতে সম্পন্ন হয়। মধ্যপ্রাচ্যের যাবতীয় দেশে একই ব্যবস্থা অনুষ্ঠিত হয়েছে, উত্তর আফ্রিকার সদ্য স্বাধীন দেশগুলিতেও এই একই ব্যবস্থা লক্ষ করা যায়। সেদিন চীন এই ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে তাদের দেশে বিজ্ঞান ও শিল্পের উন্নতি এত দ্রুত হতে পারত না। এইসব উদাহরণ আমাদের চোখের সামনে সর্বদাই উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। তথাপি কেন যে আমরা এর থেকে সেই শিক্ষা গ্রহণ করি না যা দেশের জন্য অতি প্রয়োজনীয় এবং বিজ্ঞানের প্রয়োগের জন্য নিরতিশয় আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথ বহু পূর্বেই এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গেছেন। তখন অবশ্য দেশে ইংরেজ শাসকের প্রভাব চতুর্দিকে ছিল। আজ আমরা পরাধীনতার নিগড় দূরে সরাতে পেরেছি কিন্তু কিসের প্রভাব এখনো আমাদের স্বাধীনতার সুফল থেকে বঞ্চিত রেখেছে জানি না। রবীন্দ্রনাথই ইঙ্গিত করে গেছেন যে, ভবিষ্যতে এ বিষয়ে কথা বলবার লোকের অভাব হবে না। কিন্তু এখনো যদি সেই কথা বারবার বলতে হয় তা হলে এই মনে করা স্বাভাবিক হবে যে, স্বাধীনতার সংগ্রাম স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে যতই করি না কেন, এখনো সেই সংগ্রামের প্রয়োজন মেটে নি, এখনো আমরা প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করি নি।

আবুল ফজল

রবীন্দ্র-সাহিত্যে দার্শনিক চেতনা

দর্শন রবীন্দ্রনাথের কাছে নীরস, শুষ্ক এক তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা মাত্র ছিল না। তা ছিল তাঁর কবি-সত্তার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাঁর কবি-প্রতিভার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দার্শনিক দৃষ্টি আর দার্শনিক সত্তারও ঘটেছে উৎপত্তি আর বিকাশ। তাঁর দর্শন বই-পড়া বা বাইরে থেকে পাওয়া নয়—তা তাঁর কবিতার মতো তাঁর জীবন আর জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই গড়ে ওঠা। যদিও ঔপনিষদীয় দর্শনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আজন্মের তবুও তাঁর দর্শন অবিকল উপনিষদের দর্শন নয়—তা পুরোপুরি তাঁর নিজস্ব। রূপে আর স্বরূপে, উপলব্ধি আর প্রকাশে তা নির্ভেজাল রাবীন্দ্রিক। তাঁর সাহিত্যের মতো তাঁর দর্শনও তাঁর হৃদয় আর মননরসেই জারিত। তিনি মূলত, প্রধানত ও আদতে কবি—তাই তাঁর দার্শনিক ধ্যান-ধারণাও গদ্যে যতখানি রূপ পেয়েছে তার অনেক বেশি রূপায়িত হয়েছে তাঁর অসংখ্য কবিতা আর গানে এবং অনেকগুলি প্রতীক নাটকেও। বিভিন্ন ভাষণ আর প্রবন্ধেও তিনি তা ব্যাখ্যা করেছেন বারে-বারে। তাঁর ভাষা আর প্রকাশশৈলীও পেশাদার দার্শনিকের নয় মোটেও—তা পুরোপুরি কবির। অলঙ্কারে, উপমায়, বলার ভঙ্গি আর শব্দ-প্রয়োগের সাবলীল সৌন্দর্যে তাতে সাহিত্যরসই অধিকতর উৎসারিত।

বলা বাহুল্য, সব মহৎ কবিই একাধারে দার্শনিকও। কোনো একটা দর্শনের কঠিন মাটির উপর পা না রাখলে গভীরতর জীবন-সত্যের অভিব্যক্তি ঘটে না। মিছরির মধ্যকার সরু সুতার মতো, জীবন-সত্য বা দার্শনিক প্রত্যয়ের সূক্ষ্ম সূত্রটিও কবি, শিল্পী ও চিন্তাবিদদের মনের কেন্দ্রীয় অবলম্বন। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সামুদ্রিক ব্যাপ্তির মাঝখানেও তেমন একটি কেন্দ্রবিন্দু রয়েছে, যাকে তিনি নানাভাবে, নানা রূপে আর নানা নামে অভিহিত করেছেন—তার কবি-সত্তায় উপলব্ধিও করেছেন সেভাবে, বিচিত্রভাবে। বিচিত্ররূপিণী হয়েই তা দেখা দিয়েছে তাঁর কবি-মানসে। 'জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে, তুমি বিচিত্ররূপিণী'। এ বৈচিত্র্য-বোধ তাঁর জীবন-দর্শনেরও উৎসমুখ। কবির দর্শন আর পেশাদার দার্শনিকের দর্শনে তফাৎ দুস্তর। দার্শনিকের দর্শন রূপহীন আর ব্যক্তি-নিরপেক্ষ কবির দর্শন মোটেও তা নয়—তা একদিকে যেমন রূপময় তেমনি অন্যদিকে তা কবির ব্যক্তি-জীবনেরই ফসল, তাঁরই উপলব্ধ সত্য। রবীন্দ্র-দর্শনেরও গোড়ায় আছে তাঁর জীবনচেতনা, সার্বিক বিশ্বানুভূতি যার আর এক নাম। তাঁর দর্শন বিতর্কের দর্শন নয়, মতবাদ কিংবা কেতাবি লজিক-ভিত্তিক দর্শনও নয় তা। কবির দর্শন উপলব্ধির দর্শন, আত্মচেতনা আর আত্মবিকাশের দর্শন।

বিশ্বানুভূতি বা সার্বিক চেতনা শুধু রবীন্দ্র-দর্শনের নয়, রবীন্দ্র-কাব্যেরও মূল সুর। এর প্রথম উপলব্ধি এবং অভিব্যক্তিও তাঁর সুবিখ্যাত 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায়। এ কবিতা লেখার পটভূমি সাহিত্য-পাঠকদের অজানা নয়। কবি নিজেই লিখেছেন, এ কবিতার জন্মলগ্নে—'এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল'। 'জীবনস্মৃতি'র পাণ্ডুলিপিতে কবির নিম্নলিখিত স্বীকার-উক্তিও তাৎপর্যপূর্ণ—'সেদিন কে জানিত এই কবিতায় আমার সমস্ত কাব্যের ভূমিকা লেখা হইতেছে'। এ কবিতার দুটি চরণ :

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসিয়া সেথা করিছে কোলাকুলি।

তাঁর দর্শনের যে মূলভিত্তি বিশ্বানুভূতি এভাবে সেই 'প্রভাতসঙ্গীতে'র (১২৯০) যুগেই তার সূচনা দেখা দিয়েছিল। এ কবিতা প্রসঙ্গে কবির এ মন্তব্যটুকুও স্মরণীয় : "শিশুকাল হইতে কেবল চোখ দিয়া দেখাই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ যেন একেবারে সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম।' এ 'সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখাই' দার্শনিকের আর সত্যদ্রষ্টা কবি-ঋষির দেখা। রবীন্দ্রনাথ দুই-ই ছিলেন। সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যই 'সমস্ত চেতনা' দিয়ে দেখার সাহিত্য। তাঁর প্রতিটি রচনায় রয়েছে তার স্বাক্ষর।

আদি দার্শনিক সক্রেটিস শিষ্য ক্রিটোকে বলেছিলেন : 'Do you then be reasonable, and do not mind whether the teachers of philosophy are good or bad, but think only of philosophy herself. Try to examine her well and truly; and if she be evil, seek to turn away all men from her; but if she be what I believe she is, then follow her and serve her, and be of good cheer.' আমাদের সৌভাগ্য রবীন্দ্র-জীবন, রবীন্দ্র-কাব্য আর রবীন্দ্র-দর্শন এক দেহ-মানসেই হয়েছে লীন, আর এ তিন ক্ষেত্রেই এ মহা-প্রতিভা ছিল চূড়ান্ত শিল্পী। তাই রবীন্দ্র-দর্শনও রবীন্দ্র-কাব্যের মতোই উপভোগ্য আর রবীন্দ্র-জীবনের মতোই মনোজ্ঞ। এমন মণিকাঞ্চন সংযোগ সাহিত্যের ইতিহাসে দুর্লভ।

রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রিয় লেখক এমিয়েল (Henri Frederic Amiel, 1821-81, যাঁর *Journal* ইউরোপীয় সাহিত্যে এক সুবিখ্যাত বই) দর্শনের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে : 'Philosophy means the complete liberty of the mind and therefore independence of all social, political, or religious prejudice... it is critical and impartial; it loves one thing only—truth.' এ সার্বিক সর্বসংস্কারমুক্ত সত্যানুভূতিই রবীন্দ্র-সাহিত্য আর রবীন্দ্র-দর্শনেরও মূল কথা। যদিও পারিবারিক আর ঐতিহ্যগত কিছুটা কঠোর সেকেলে সাংস্কারিক পরিমণ্ডলেই তাঁর জন্ম, কিন্তু কালক্রমে ধাপে ধাপে সব সংস্কার থেকেই তিনি নিজেকে নিয়েছিলেন মুক্ত করে। তাঁর সাহিত্য আর জীবন এ বিবর্তনেরই এক অভ্রান্ত দলিল। তাঁর কবি-জীবনের সূচনা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ক্রমাগতই তাঁর মধ্যে বিকাশ আর বিবর্তন ঘটেছে। তাঁর মন আর তাঁর রচনা কখনো স্থির হয়ে থাকে নি—তা অনবরতই রূপ থেকে রূপান্তরে আবর্তিত হয়েছে। এরই সাক্ষাৎ ফলশ্রুতি তাঁর বিরাট সাহিত্য, যাকে ইংরেজ কবি ড্রাইডেনের ভাষায় বলা যায়, 'ঐশ্বরিক প্রাচুর্য' (God's plenty)। এমন 'সহস্রমনা'-প্রতিভার পরিচয় বাস্তব জীবনের খণ্ড-চিত্রে সন্ধান করলে বিড়ম্বিত হতে হবে। তাঁর এ ক্রমবিবর্তিত মনের প্রতিফলন তথা তাঁর 'সমস্ত চৈতন্যের' অভিব্যক্তি যে কাব্য আর সাহিত্যে ঘটেছে—তাঁর কবি-সত্তার পরিচয় সেখানেই নিহিত। তাই তাঁর কণ্ঠে সতর্কতার

বাণী : 'কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহি রে'। তাঁর কণ্ঠ আরো স্পষ্টতর এসব পঙ্‌ক্তিতে :

মানুষ-আকারে বদ্ধ যে-জন ঘরে,
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমিষের ভরে,
যাহারে কাঁপায় স্তুতিনিন্দার জ্বরে
কবিরে খুঁজিছ তাহারি জীবন-চরিতে?

অর্থাৎ কবির আসল সত্তাকে দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ ঘটনাবলির ইতিকথায় সন্ধান করলে ব্যর্থ হতে হবে। রবীন্দ্র-মানসের বিচারে একটি বড় কথা—পরিণতি। শুরু থেকে তিনি ক্রমে একটা পরিণতিতে পৌঁছেছেন—এ পরিণতি-সন্ধান রবীন্দ্র-প্রতিভার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং শ্রেষ্ঠতম সাধনাও। তাই তাঁর দর্শন কোনো অর্থেই স্থির বা স্থাণু নয়—তা সবসময় গতিশীল। ফরাসি দার্শনিক বার্গসঁ-র সাথে এখানেই তাঁর সাদৃশ্য। বার্গসঁ-দর্শনেরও গোড়ার কথা গতিশীলতা— change, change, constant change is life। রবীন্দ্র-মানসের চির গতিশীলতা, অনবরত পালাবদল কার না নজরে পড়েছে? এ গতিশীলতার দর্শন 'বলাকা'য় পেয়েছে অপূর্ব কাব্যরূপ :

শুনিলাম, মানবের কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।
শুনিলাম, আপন অন্তরে
অসংখ্য পাখির সাথে
দিনে রাতে
এই বাসা-ছাড়া পাখি ধায় আলো-অন্ধকারে
কোন্ পার হতে কোন্ পারে।
ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে—
'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে!'

স্বয়ং এ কাব্যের মর্মব্যাখ্যা করেছেন তিনি এভাবে : " 'বলাকা' নামের মধ্যে এ ভাবটা আছে যে, বুনো হাঁসের দল নীড় বেঁধেছে, ডিম পেড়েছে; তাদের ছানা হয়েছে, সংসার পাতা হয়েছে—এমন সময়ে তারা কিসের আবেগে অভিভূত হয়ে পরিচিত বাসা ছেড়ে পথহীন সমুদ্রের উপর দিয়ে কোন্ সিন্ধুতীরে আর এক বাসার দিকে উড়ে চলেছে।'' এ উড়ে চলা, কোথাও স্থির হয়ে না থাকা, এমনকি কোনো একটা ভাবের চৌহদ্দিতে গণ্ডিবদ্ধ হয়ে না পড়া রবীন্দ্র-মনের ধর্ম—'বলাকা' তো তাঁর মনেরই এক প্রতীক। ঐ গ্রন্থের সুবিখ্যাত 'শাজাহান' কবিতারও মর্মবাণী গতি-ধর্মিতা, জীবনের চলিষ্ণুতা—

জীবনেরে কে রাখিতে পারে?
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।

স্বর্গ গতিহীন, অচল, স্থাণু, তাতে নেই ভাব, অনুভূতি আর বিচিত্র আবেগের কোনো তরঙ্গ-মালা, নেই সুখ-দুঃখ কিংবা কান্না-হাসির পালা-বদল। অমন স্বর্গের প্রতি তাই রবীন্দ্রনাথের কোনো আকর্ষণ ছিল না। রবীন্দ্র-মানসের আরো একটি বৈশিষ্ট্য—স্রেফ নির্জলা দুঃখ কখনো তাঁর মন-মানসে স্থান পায় নি, তিনি চেয়েছেন আনন্দ। বলা বাহুল্য, আনন্দ

কর্মের সহযোগী, ত্যাগ-সাধনায় যা লভ্য আর সুখ আলস্য আর নিষ্ক্রিয়তায়। স্বর্গ নিষ্ক্রিয় ও আবেগ-অনুভূতিহীন এক সুখ-নিকেতন শুধু। জীবনবাদী কবির এমন স্বর্গের প্রতি লোভ থাকার কথা নয়। তাই 'স্বর্গ হইতে বিদায়'র মতো অবিস্মরণীয় কবিতা লেখা তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়েছে :

থাকো স্বর্গ, হাস্যমুখে—করো সুধাপান
দেবগণ। স্বর্গ তোমাদেরি সুখস্থান—
মোরা পরবাসী। মর্তভূমি স্বর্গ নহে,
সে যে মাতৃভূমি—তাই তার চক্ষে বহে
অশ্রুজলধারা, যদি দু'দিনের পরে,
কেহ তারে ছেড়ে যায় দু'দণ্ডের তরে।...
স্বর্গে তব বহুক অমৃত,
মর্তে থাক সুখে দুঃখে অনন্তমিশ্রিত
প্রেম-ধারা—অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি
ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি।

এ মর্ত্যজীবনের প্রতি আকর্ষণ তাঁর আরো বহুতর কবিতায় রূপ পেয়েছে। তাঁর এ সব পঙ্‌ক্তিও সুবিখ্যাত :

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।।
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।...
ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যে-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।।

রবীন্দ্রনাথের জীবন-বোধের তথা বিশ্বানুভূতির বৃত্তরেখা এ মর্ত্যপ্রেমকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। তাই 'মধুময় পৃথিবীর ধূলি'র মতো কবিতা বেরিয়েছে তাঁর কলম থেকে যখন তাঁর জীবন-পরিক্রমা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে :

এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি,
এই মহামন্ত্রখানি
চরিতার্থ জীবনের বাণী।
দিনে দিনে পেয়েছিনু সত্যের যা-কিছু উপহার
মধুরসে ক্ষয় নাই তার।...
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মুরতি,
এই জেনে এ ধূলায় রাখিনু প্রণতি।

রবীন্দ্র-মানসের সঠিক পরিচয় পেতে হলে এ কথাও জানা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সর্বতোভাবে বিজ্ঞানমুখীন। জীববিজ্ঞানের এক বড় কথা 'বিবর্তনবাদ'—রবীন্দ্রনাথ বিবর্তনে বিশ্বাসী ছিলেন। এ বিবর্তনবাদের সঙ্গে তাঁর মর্ত্যপ্রেমের রয়েছে এক নিবিড় সম্পর্ক। এ বিশ্বপ্রকৃতি থেকেই মানুষের উদ্ভব, তাই এর প্রতি অণুপরমাণুর সঙ্গে রয়েছে তাঁর নাড়ির সংযোগ। এ উপলব্ধির অপূর্ব কাব্য-ফসল তাঁর 'বসুন্ধরা', 'সমুদ্রের প্রতি' ইত্যাদি কবিতা।

বিকাশের উচ্চতম ধাপে পৌঁছেও মানুষ তার জন্মসূত্র থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়, রয়ে গেছে সে এখনো মা বসুন্ধরার কোলের সন্তান। কবিকণ্ঠে এ সত্যেরই প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই :

আমারে ফিরায়ে লহ, অয়ি বসুন্ধরে,
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে
বিপুল অঞ্চল-তলে। ওগো মা মৃন্ময়ী,
তোমার মৃত্তিকা-মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই,
দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মতো;...
আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের, তোমার মৃত্তিকা সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনীদিন
যুগযুগান্তর ধরি' আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্রফুলফল গন্ধরেণু।

বাংলা কাব্যে প্রকৃতির সঙ্গে এমন একাত্মতাবোধ ইতিপূর্বে আর কখনো দেখা যায় নি। এ প্রাণ দিয়ে অনুভব, এর মধ্যে কৃত্রিমতার কোনো স্পর্শ নেই। 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায়ও সে একই সুর আরো তীব্র হয়ে বেজেছে :

হে আদিজননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার,
একমাত্র কন্যা তব কোলে। তাই তন্দ্রা নাহি আর
চক্ষে তব, তাই বক্ষ জুড়ি সদা শঙ্কা, সদা আশা,
সদা আন্দোলন;

আমাদের এ পৃথিবী কায়া নিয়ে জেগে ওঠার আগে—'অনাগত মহাভবিষ্যৎ লাগি', সমুদ্র যেমন ছিল 'আসন্ন প্রতীক্ষাপূর্ণ', তেমনি কবি-মনও মানুষের মহত্তর ভবিষ্যৎ কল্পনায়, এক 'নব মহাদেশ সৃজনের' স্বপ্নে হয়ে উঠেছে আশা-আকাঙ্ক্ষায় অধীর-উন্মুখ :

আমারো চিত্তের মাঝে তেমনি অজ্ঞাতব্যথাভরে,
তেমনি অচেনা প্রত্যাশায়, অলক্ষ্য সুদূর-তরে
উঠিছে মর্মর স্বর। মানবহৃদয়-সিন্ধুতলে
যেন নব মহাদেশ সৃজন হতেছে পলে পলে,
আপনি সে নাহি জানে।

চিত্তের এ নব মহাদেশের স্বপ্ন-প্রত্যাশার সাথে কবি তুলনা দিয়েছেন আসন্নপ্রসবা মাতা জননীর আশা-আকাঙ্ক্ষা আর আনন্দ-বেদনার সঙ্গে। জননীর আশা যেমন নিঃসংশয় ও সুনিশ্চিত, কারণ নিজের দেহানুভূতির মধ্যেই রয়েছে তার স্বাক্ষর তেমনি কবি-মনের এই 'তৃপ্তিহীন মহা আশা'ও সব দ্বিধা-দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে, সন্দেহাতীত আর অপ্রতিরোধ্য। এ প্রত্যয়ে কবির মন অনুরণিত হয়েছে বারে-বারে। মানুষের ভবিষ্যৎ তথা মানুষের ওপর এমন এ অবিচলিত আস্থা রবীন্দ্র-সাহিত্যের তথা রবীন্দ্র-দর্শনের এও এক বড় দিক। শেষ মুহূর্তেও তাই তিনি মানুষের 'অভ্যুদয়'কে জানিয়েছেন অভিনন্দন :

উদয় শিখরে জাগে 'মাভৈঃ মাভৈঃ'
নবজীবনের আশ্বাসে,
'জয় জয় জয়রে মানব-অভ্যুদয়'
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।

মানুষকে বাদ দিয়ে কোনো দর্শনই তাঁর মনে স্থান পায় নি। এমনকি তৎকালীন পিউরিটান ধর্ম-পরিমণ্ডলে মানুষ হয়েও ধর্মীয় কি শাস্ত্রীয় দর্শন বা তার কোনো রকম আবেদন তাঁর কবি-সত্তায় কোনো আলোড়ন জাগাতে পারে নি। তাঁর নিজের স্বীকারোক্তি : '...my religion is a poet's religion, and neither that of an orthodox man of piety nor that of a theologian.' পরবর্তী স্বীকারোক্তিটি আরো তাৎপর্যপূর্ণ : 'My religious life has followed the same mysterious line of growth as has my poetical life.' এ কারণেই আমরা বলেছি রবীন্দ্রনাথের দর্শন কবির দর্শন—শাস্ত্রবিদের দর্শন নয়। তাঁর কাব্য-জীবন আর দার্শনিক-জীবন এক ও অভিন্ন। সাধারণত ব্যক্তি-বিশেষের ধর্ম-চেতনার মধ্যেই আমরা তার দর্শনেরও সন্ধান করে থাকি, রবীন্দ্রনাথের বেলায় তা করলে ভুল করা হবে। তাঁর কবিসত্তার মধ্যেই খুঁজতে হবে তাঁর দর্শনকেও—কবি-সত্তায় তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্তপুরুষ—কোনো আগড়-নিগড়ে তিনি পড়েন নি বাঁধা। মন আর বুদ্ধি তাঁর এত মুক্ত ছিল যে এমন কথা বলতেও তিনি কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নি : 'মানুষের বুদ্ধিকে ভূতের উপদ্রব এবং অদ্ভুতের শাসন থেকে মুক্তি দেবার ভার যে পেয়েছে তার বাসাটা পূর্বেই হোক, আর পশ্চিমেই হোক, তাকে ওস্তাদ বলে কবুল করতে হবে।' মনের এই দৃষ্টিভঙ্গিই রবীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথ তথা বিশ্বকবি হতে সহায়তা করেছে। রবীন্দ্রনাথের সব দর্শন আর দার্শনিক উপলব্ধি ঘুরে ফিরে এক অখণ্ড মানবিক চেতনায় পেয়েছে আশ্রয়। নানাভাবে, নানারূপে এ মানবিকতারই জয় ঘোষণা করেছেন তিনি তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্য-জীবনভর। তাঁর এ জীবন-দর্শন ও অন্তরের গভীরতম প্রত্যয় প্রকাশে তিনি ছিলেন সব সময় অকুণ্ঠ : 'আমি ভালবেসেছি এ জগৎকে, আমি প্রণাম করেছি মহৎকে! আমি কামনা করেছি মুক্তিকে, যে মুক্তি পরম পুরুষের কাছে আত্মনিবেদনে... আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে—এখানে সর্বদেশ সর্বজাতি ও সর্বদলের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নর-দেবতা,—তাঁরি বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহংকার আমার ভেদবুদ্ধি স্খালন করার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।'

এ 'দুঃসাধ্য চেষ্টা'র পথেই তিনি দেখা পেয়েছেন তাঁর 'জীবনদেবতা'র—রবীন্দ্র-মানসে এও এক গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধি। পরিভাষা যাই হোক এ কোনো পরিচিত বা নির্দিষ্ট দেবতা নয়, এ স্রেফ কবির নিজস্ব জীবন-চেতনা, আপন বোধ ও উপলব্ধি। তাঁর নিজের ভাষায় : "যিনি আমার সমস্ত ভালো-মন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি 'জীবনদেবতা' নাম দিয়াছি।" কোনো কোনো সমালোচক 'জীবনদেবতা' মানে কবি-প্রতিভারই আর এক নাম বলে উল্লেখ করেছেন। এ কবিতার প্রথম স্তবক :

ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ আসি অন্তরে মম?
দুঃখসুখের লক্ষ ধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়,
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ দলিত দ্রাক্ষাসম।

কত যে বরন, কত যে গন্ধ,
কত যে রাগিণী, কত যে ছন্দ,
গাঁথিয়া গাঁথিয়া করেছি বয়ন বাসরশয়ন তব—
গলায়ে গলায়ে বাসনার সোনা
প্রতিদিন আমি করেছি রচনা
তোমার ক্ষণিক খেলার লাগিয়া মুরতি নিত্যনব।।

এ 'জীবনদেবতা'র স্বরূপ 'আত্মপরিচয়ে' তিনি আরো স্পষ্ট ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন : 'যখন যাহা লিখিতেছিলাম তখন সেইটেকেই পরিণাম বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। এই জন্য সেইটুকু সমাধা করার কাজেই অনেক যত্ন ও অনেক আনন্দ আকর্ষণ করিয়াছে। আমিই তাহা লিখিতেছি এবং একটা কোনো বিশেষ ভাব অবলম্বন করিয়া লিখিতেছি এ সম্বন্ধেও সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু আজ জানিয়াছি, সে সকল লেখা উপলক্ষমাত্র, তাহারা যে অনাগতকে গড়িয়া তুলিতেছে, সেই অনাগতকে তাহারা চেনেও না। তাহাদের রচয়িতার মধ্যে আর একজন কে রচনাকারী আছেন, যাঁহার সম্মুখে সেই ভাবী তাৎপর্য প্রত্যক্ষ বর্তমান।'

মহৎ প্রতিভার এ আত্মোপলব্ধিই 'জীবনদেবতা'। রবীন্দ্রনাথের সুবিপুল সাহিত্য-কর্মের অবকাশে যে উপলব্ধি তা বারে-বারেই সোচ্চারিত হয়েছে। কাজেই এ সম্বন্ধে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কোনো সুযোগ নেই। প্রতিভার একটা বড় ধর্ম আত্মসচেতনতা—'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র যুগ থেকেই রবীন্দ্রনাথ নিজের প্রতিভা আর প্রতিভার দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। সেই সচেতনতাই তাঁর কাব্যে 'জীবনদেবতা' হয়ে দেখা দিয়েছে। শেলী তাঁর *A Defence of Poetry*-তে কবি-ধর্মের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা-উপলব্ধির সাদৃশ্য লক্ষ করার মতো : 'The poet not only beholds intensely the present as it is, and discovers those laws according to which present things ought to be ordered, but he beholds the future in the present and his thoughts are the germs of the flower and the fruit of latest time... A Poet participates in the eternal, the infinite and the one.' এ অসীমের সন্ধান আর অভিসার রবীন্দ্র-কাব্যের অন্যতম সাধনা। এ প্রসঙ্গে 'এবার মোরে ফিরাও' কবিতার এ কয়টি পঙ্‌ক্তিও স্মরণীয় :

মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা,
মৃত্যুরে না করি শঙ্কা। দুর্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি—তারি মাঝে যাব অভিসারে
তার কাছে, জীবনসর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি।

মানব-ভাষায় এ শক্তির বা 'জীবনদেবতা'র পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়, তবে সে যে সব কাব্য প্রেরণা-উৎস, কবিকে ভাবের গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে, বন্দর থেকে বন্দরে পরিচালিত করেছে এ সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ। তাঁর মনের এ এক গভীর প্রত্যয়—মনে হয় অকৃত্রিম অনুভূতিরই এ ফল। তাঁর কাব্য-সাধনার মূলে যে সত্য-সাধনা সে কথা তাঁর জবানিতেই শোনা যেতে পারে : 'জীবনে জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে অনেক অনেক মিথ্যাচারণ করা যায় কিন্তু কবিতায় কখনো মিথ্যা কথা বলিনে—সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয়স্থান।' তাঁর কাব্যে আর দর্শনে এ 'গভীর সত্যই' রূপ পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে এমিয়েলের এই ব্যাখ্যা স্মরণীয়। দার্শনিক পরিভাষায় যাকে সর্বেশ্বরবাদ বলা হয় রবীন্দ্র-কাব্যে তারও

অস্তিত্ব স্পষ্টতর—কিন্তু তাঁর সর্বেশ্বরবাদ তাঁর বিশ্বানুভূতিরই পরিণতি, তাঁর অনুভব-অনুভূতি দিয়েই তা উপলব্ধ। বেদান্তেও সর্বেশ্বরবাদ ঘোষিত হয়েছে আর বেদান্তের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় যে গভীর ছিল তাও তাঁর পাঠকদের ভালো করেই জানা। কিন্তু বেদান্তের সর্বেশ্বরবাদ ব্যক্তিনিরপেক্ষ এক তত্ত্বকথা মাত্র। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সর্বেশ্বরবাদ অর্থাৎ সব কিছুতেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব-কল্পনা তাঁর অনুভব-অনুভূতিরই বস্তু। ধর্ম যেমন রবীন্দ্রনাথের কাছে ব্যক্তি-নিরপেক্ষ শাস্ত্রীয় ব্যাপার নয় মোটেও, তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধিরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তাঁর দর্শনও তাই। ব্যক্তিসত্তা আর বিশ্বসত্তা এ দুয়েরই স্বতন্ত্র উপলব্ধিতে তাঁর সর্বশ্বেরবাদ এক অপূর্ব সমন্বয়ে সার্থক হয়ে উঠেছে। এ দুই সত্তাই পরস্পরের পরিপূরক—এ উপলব্ধি আর তাকে কাব্যে রূপায়ণ রবীন্দ্রনাথের এক বিশেষ অবদান। রবীন্দ্র-দর্শনে একেশ্বরবাদ আর সর্বেশ্বরবাদ প্রায় এক হয়ে মিশে গেছে—মিশে গিয়ে স্রষ্টা আর সৃষ্টি একে অন্যকে সার্থক আর পূর্ণ করে তুলেছে। স্রষ্টা এখানে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা নন—তিনি আনন্দ আর বিকাশেরই সহায়ক। নিজেও তিনি সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হয়ে ওঠেন, ওঠেন পূর্ণ হয়ে। স্রষ্টা ও সৃষ্টির এ সম্বন্ধকে রবীন্দ্রনাথ কোথায় যেন 'প্রেমের গীতিকবিতা' রচনা বলেই অভিহিত করেছেন। এ প্রেমবিনিময়ের এক অপূর্ব ছবি এঁকেছেন তিনি তাঁর এক গানের এ কলিগুলিতে :

আকাশে দুই হাতে প্রেম বিলায় ও কে?
সে সুধা গড়িয়ে গেল লোকে লোকে।।
গাছেরা ভরে নিল সবুজ পাতায়,
ধরণী ধরে নিল আপন মাথায়।
ফুলেরা সকল গায়ে নিল মেখে,
পাখিরা পাখায় তারে নিল এঁকে।
ছেলেরা কুড়িয়ে নিল মায়ের বুকে,
মায়েরা দেখে নিল ছেলের মুখে।

'বলাকা'র এক কবিতায় এর বিপরীত ভাব অর্থাৎ সৃষ্টি কী করে স্রষ্টাকে সার্থক করে তোলে তার প্রকাশ ঘটেছে অপূর্ব ভাষা আর ছন্দে :

আমি এলেম ভাঙল তোমার ঘুম
শূন্যে শূন্যে ফুটল আলোর আনন্দ-কুসুম।
আমায় তুমি ফুলে ফুলে
ফুটিয়ে তুলে
দুলিয়ে দিলে নানা রূপের দোলে।
আমায় তুমি তারায় তারায় ছড়িয়ে দিয়ে কুড়িয়ে নিলে কোলে।
আমায় তুমি মরণ মাঝে লুকিয়ে ফেলে
ফিরে ফিরে নতুন করে পেলে।...
আমি এলেম তাই তো তুমি এলে
আমার মুখে চেয়ে
আমার পরশ পেয়ে
আপন পরশ পেলে।

অর্থাৎ সৃষ্টিহীন স্রষ্টাও অবাস্তব, অকল্পনীয় ও অসার্থক। স্রষ্টাও নিজেকে খুঁজে পান সৃষ্টির মাঝে। স্রষ্টা ও সৃষ্টি আর তার সম্বন্ধ চিরকালই দর্শনের বিষয়বস্তু। রবীন্দ্র-দর্শনে তাঁর যে উপলব্ধি ও অভিব্যক্তি আমরা এখানে দেখতে পেলাম তার সঙ্গে পেশাদারী দর্শনের কোনো

সম্পর্ক নেই। গ্রহণ, বিচার ও উপলব্ধির যে তিনটি দ্বার মানুষের করায়ত্ত যথা ইন্দ্রিয়, মন আর হৃদয়, তার মধ্যে কবিদের বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের মতো কবিদের প্রধান অবলম্বন হৃদয়, হৃদয়ের পথেই তাঁদের সব কিছুর উপলব্ধি ও অন্বেষা। রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যদর্শী ও মননশীল শিল্পী যে ছিলেন না তা নয়, তবে তিনি ছিলেন প্রধানত হৃদয়ধর্মী কবি, হৃদয় দিয়েই তাঁর গ্রহণ ও উপলব্ধি ঘটেছে সবচেয়ে বেশি। তাঁর দর্শনের বিচারও এ মাপকাঠিতেই হওয়া উচিত। তাঁর সর্বেশ্বরবাদ এ কারণে ইউরোপের Pantheism থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

ব্যক্তিসত্তা আর বিশ্বসত্তার ঐ দ্বৈত-বোধ মা আর তাঁর গর্ভস্থ সন্তানের উপমা দিয়ে কী চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি 'বলাকা'র বাইশ নম্বর কবিতায় :

গর্ভ ছেড়ে মাটির 'পরে
যখন পড়ে
তখন ছেলে দেখে আপন মাকে।
তোমার আদর যখন ঢাকে,
জড়িয়ে থাকি তারই নাড়ীর পাকে,
তখন তোমায় নাহি জানি।
আঘাত হানি
তোমারই আচ্ছাদন হতে যেদিন দূরে ফেলাও টানি
সে-বিচ্ছেদে চেতনা দেয় আনি,
দেখি বদনখানি।।

রবীন্দ্র-দর্শনে তথা রবীন্দ্র-কাব্যে এ দ্বৈত-চেতনা নানাভাবে রূপ নিয়েছে। তাঁর এ চেতনা নৈর্ব্যক্তিক নয়, সন্ন্যাস বা জীবন-বিচ্ছিন্ন নয়—মানুষের সঙ্গে কল্যাণের সূত্রে আবদ্ধ বলেই তার সার্থকতা :

বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।

এ চেতনাই তাঁর সাহিত্যে 'সীমার মাঝে অসীমে'র মিলন নামেও অভিহিত হয়েছে।

তাঁর বিশ্বানুভূতি মানবিকতার সঙ্গে একসূত্রে বাঁধা। তাঁর *Religion of Man* নামক গ্রন্থে তিনি মানুষের বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করে শেষকালে মন্তব্য করেছেন : 'এইভাবেই মানুষের হৃদয়বৃত্তির যা শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, ভালবাসার, প্রেম বিলাবার ক্ষমতা,—তার উৎপত্তি হল। বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপনের এই শক্তি তাঁর মতে মানুষের প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই প্রেমবৃত্তির উন্নততর বিকাশের মাঝখানেই তিনি মানুষের জীবনের পরমার্থের সন্ধান পেয়েছেন। এই পথে মানুষের স্বাভাবিক মুক্তিস্পৃহা মুক্ততম ক্ষেত্রে বিস্তার লাভ করে। এই দার্শনিক উপলব্ধিই তাঁর ধারণায়, তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার।'[১]

এর শ্রেষ্ঠত্ব এ কারণে যে, এ মানুষের স্বোপার্জিত, পড়ে পাওয়া নয়, নয় প্রকৃতির দানও। জ্ঞান বা উপাসনাও দিতে পারে না এ সম্পদ। এ কারণে জ্ঞান-মার্গ কিংবা ভক্তি-মার্গ রবীন্দ্রনাথকে কখনো আকর্ষণ করে নি। একমাত্র ব্যক্তিগত সাধনা আর কর্ষণের সাহায্যেই হৃদয় বৃত্তির বিকাশ সম্ভব—যা মানুষকে মানুষের সাথে মিলায়। 'দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু, পরকে করিলে ভাই'—এ চেতনা জ্ঞান বা উপাসনার ফল নয়, এ স্রেফ হৃদয়বৃত্তিরই অবদান। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজের মন্তব্য : 'জ্ঞানের বস্তুগুলি আমাদের তাদের জ্ঞাতাদের থেকে,

---

১. 'রবীন্দ্র-দর্শন' : হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ৮১।

অনন্তব্যবধান রক্ষা করে চলে। কারণ, জ্ঞান মিলন আনতে সক্ষম নয়। সেই কারণে, মুক্তির বিভিন্ন জগৎ আমাদের জন্য অপেক্ষা করে সেইখানেই, যেখানে আমরা সত্যকে পাই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করে নয়, আমাদের যুক্তির সাহায্যে জেনে নয়, পূর্ণতম প্রেমসম্ভূত মিলনের দ্বারা।'[১]

'পূর্ণতম প্রেমসম্ভূত মিলন'—একমাত্র হৃদয়ের পথেই সম্ভব। তাই রবীন্দ্রনাথের বিপুল ও বিচিত্র রচনায় যে বিশ্বানুভূতি, সত্যানুভূতি, মানবিকতাবোধ এমনকি আধ্যাত্মিক অনুভূতিরও যে প্রকাশ ঘটেছে তা তাঁর হৃদয়ানুভূতিরই ফুল, ফল ও ফসল। তাঁর সব রকম দার্শনিক চেতনারও মূল উৎস হৃদয়। হৃদয় অনুপস্থিত বলে তাই স্বর্গও তাঁর কাছে পরিত্যাজ্য বিবেচিত হয়েছে। গতিহীন অচলায়তন হৃদয়ধর্মিতার শত্রু বলেই তাঁরও শত্রু, তাই 'স্থির' জীবনের নিন্দায় তিনি হয়েছেন মুখর :

যতক্ষণ স্থির হয়ে থাকি
ততক্ষণ জমাইয়া রাখি
যতকিছু বস্তুভার।
ততক্ষণ নয়নে আমার
নিদ্রা নাই;
ততক্ষণ এ বিশ্বেরে কেটে কেটে খাই
কীটের মতন;
ততক্ষণ
চারিদিকে নেমে নেমে আসে আবরণ;
দুঃখের বোঝাই শুধু বেড়ে যায় নূতন নূতন,
এ জীবন
সতর্ক বুদ্ধির ভারে নিমেষে নিমেষে
বৃদ্ধ হয় সংশয়ের শীতে, পক্ব কেশে।

'বস্তুভার' আর 'সতর্কবুদ্ধি' শুধু যে হৃদয়ধর্মিতার পরিপন্থী তা নয়, জীবনের গতিশীলতারও তা এক প্রবল অন্তরায়। এ কারণেই রবীন্দ্র-মানসে সেসবের কোনো স্থান নেই। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে চীনদেশে গিয়েও রবীন্দ্রনাথ এ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন : 'When the current of the mind grows feeble, things that are dead accumulate and their ponderous immobility intimidates our life into stillness.'[২] ধর্ম আর সত্য রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রায় সমার্থক ছিল। মানুষ যেখানে সত্যের সাধক সেখানেই তিনি ধার্মিক—'Dharma for man is the best experession of what he is in truth.'[৩]

রবীন্দ্রনাথ মানুষের ব্যক্তিসত্তায় বিশ্বাসী ছিলেন, ব্যক্তিত্ব অর্জন আর ব্যক্তিত্বের বিকাশেই মানুষের মুক্তি, তাঁর এ প্রত্যয়কে তিনি নানাভাবে ব্যক্ত করেছেন, যেমন *Personality* গ্রন্থে : '...man will have his new birth in the freedom of his individuality, from the enveloping vagueness of abstraction.' ব্যক্তিত্বের বিকাশের ফলে যে স্বাধীনতা মানুষ লাভ করবে তাতেই মানুষের সঙ্গে মানুষের সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। এরই নাম দিয়েছেন তিনি সৃষ্টিশীল ঐক্য বা creative unity. রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চেতনার পরিমণ্ডলে এসব চিন্তা-ভাবনার স্থানও অনস্বীকার্য।

১ *Religion of Man* : অনুবাদ—হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ('রবীন্দ্র-দর্শন')।
২ *Talks in China*. p 152.
৩ *Talks in China*. p 123.

শওকত ওসমান

নন্দনতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ

"Art is man added to nature"

—Bacon

বিষয়-বিষয়ীর সম্পর্ক দার্শনিকদের চিরন্তন শিরঃপীড়া। "Give me extension and motion and I will construct the universe", এই সদম্ভ ঘোষণা সত্ত্বেও দেকার্তীয় দ্বৈতবাদ কয়েক শতাব্দীব্যাপী, এমনকি আজো পেণ্ডুলামের মতো অস্থিরতায় নাচার। মন ও পদার্থের যোগাযোগহীন অবস্থান-স্বীকৃতির পরিণতি এক দিকে জড়বাদ; দেকার্তের [illegible]াই, যার ফলে, আধিদৈবিক ও অলৌকিক জগতের নিকুচি সাধন করে। অন্যদিকে মনের সর্বস্বতায় বিশ্বাসীদের কাছে জড় পদার্থের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। কিন্তু জড়বাদীদের অস্বোয়াস্তি মেটে না। বিশ্বজগৎ যদিও মনহীন, মানুষ তবু চিন্তা করে। মানুষ আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ অনুভবের শিকার। সুতরাং মনের অস্তিত্ব ফুৎকারে ওড়ানো অসম্ভব। এই অস্বোয়াস্তি মেটানোর জন্যে দুই পথ খোলা থাকে। এক, আবার দেকার্তীয় দ্বৈতবাদে [illegible]স্মিক—যেখানে মন এবং জড় যোগাযোগহীন; একমাত্র অলৌকিকতার মাধ্যমেই সেখানে সম্পর্ক-স্থাপন সম্ভব। দুই, বর্তমান আশ্রয় দার্শনিক পরিভাষায় সাইকো-ফিজিক্যাল প্যারালেলিজম বা মন্‌কায়া-সমান্তরালবাদে—যেখানে মস্তিষ্কে অনুষ্ঠিত প্রত্যেক ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে মনেও প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা অবিশ্যি উক্ত মতবাদে অনুপস্থিত। সাদা কথা, ভাববাদী পর্যায়ে জড় পদার্থ সোজাসুজি নাকচ, তা মনের প্রক্ষেপ ছাড়া আর কিছু নয়। দুই বিপরীতের সাদৃশ্য আবিষ্কার দর্শনে এক জটিল প্রচেষ্টা। কান্টের অবদান এই ক্ষেত্রে অপরিসীম। জ্ঞান মনের ওপর নিষ্ক্রিয় সংবেদন-ছাপ নয়। মনেরও সক্রিয় গুণাবলি আছে, ক্যাটিগরি নামে খ্যাত। জ্ঞান নির্ভর করে মানুষের অন্বিষ্টের ওপর, দ্রষ্টার স্বার্থ ও সামাজিক ঐশ্বর্যের ওপর, যুগ-রঙ্গমঞ্চের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে জড়িত। জ্ঞান তাই আপেক্ষিক অসম্পূর্ণ। কিন্তু একদম গোচরবহির্ভূত নয়। প্রপঞ্চ জানা যায়। কিন্তু বস্তু-স্বরূপ thing in-itself সর্বদা জানার বাইরে মাথা খোঁড়ে। দেকার্তীয় দ্বৈতবাদের জায়গায় কান্ট আর এক দ্বৈতবাদ খাড়া করেন। হেগেলের চিন্তায় তার একটা উত্তরণ ঘটে। বিষয়-বিষয়ীর সম্পর্কে কোনো বিরোধ নেই। কারণ উভয়ই পরম সত্তার প্রতিচ্ছায়া হিসেবে এক অখণ্ডতায় বিলুপ্ত। জ্ঞানের মধ্যে প্রতীতি (percept) এবং প্রত্যয়ের (concept) বিরোধিতা আর থাকে না। হেগেলের মতে জ্ঞান, শিল্প এবং ধর্ম পরমের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন স্তর মাত্র। জ্ঞানের শেষ পরিণতি দর্শনেই মেলা সম্ভব।

ভূমিকার এই আঁচড়টুকু প্রয়োজন ছিল। কারণ, বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদেরই প্রয়োগ ঘটে সৌন্দর্যতত্ত্বের আলোচনায়। যথা, ক্রোচের নন্দনতত্ত্ব তাঁর নব্যভাববাদের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি মনে করতেন, মনের ক্রিয়াকলাপের দুই স্তর—বোধি (intuition) এবং প্রত্যয়, যারা একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি জড়িত। মনের ক্রিয়াকলাপের সুষ্ঠু পরিণতির জন্য প্রয়োজন বোধি থেকে প্রত্যয়ে পৌছানো। ইন্ট্যুইশান কেবল চিত্রকল্প বা ইমেজ সরবরাহ করে, যদিও তাদের পারস্পরিক সম্পর্কদান সম্পর্কে নীরব। পূর্ণ জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন প্রত্যয়। প্রত্যয়-বৈশিষ্ট্যে মূর্ত সামান্য বা concrete universal এবং নিজেই নিজের প্রকাশ-কলাপ। শিল্পীর কর্তব্য বোধির রূপদান। এই প্রকাশই তার কর্তব্য। শিল্প বোধিমূলক জ্ঞান, যা এক নির্বিকল্প ধ্যানের প্রকাশ। কল্যাণ ও সত্যের দায়িত্ব শিল্পীর নয়। শোপেনহাওয়ারের মতে, শিল্প বিষয় ও বিষয়ীর উভয়ের স্বাতন্ত্র্য ঘুচিয়ে দেয়। আস্বাদের ফল এক ধ্যানময় চৈতন্যময়তা—যেন সাংখ্যের অসঙ্গ পুরুষ। এই চিন্তা তাঁর দার্শনিক সূত্রজালেরই ঈষৎ অদল-বদল প্রয়োগ।

রবীন্দ্রনাথ পেশাদার দার্শনিক ছিলেন না। 'পথ আমারে পথ দেখাবে এই জেনেছি সার'। নিজের বাণীর মূর্ত প্রতিরূপ তিনি। তাঁর নবী-তুল্য দৃষ্টি অনেকান্ত বিস্ময়কর ধারায় প্রবাহিত। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে ফ্রয়েডের বয়স মাত্র সাঁইত্রিশ বৎসর। তিনি সাধারণ চিকিৎসক মাত্র। অস্ট্রিয়ার ভেতরে বা বাইরে কোথাও তাঁর চিন্তার আলোড়ন নেই। সাহিত্যের আলোচনায় অচেতন মনের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তখনই অবহিত। বিখ্যাত 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধের প্রথমাংশ যেন কোনো মনোসমীক্ষণবাদীর রচনা। অস্তিবাদী দর্শন গেঁজিয়ে উঠল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পরাজয়ের গ্লানি-হত ফরাসি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে। তার দু দশক আগে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'দুঃখের তীব্র উপলব্ধি আনন্দকর, কেননা সেটা নিবিড় অস্মিতাসূচক ... দুঃখ আমাদের স্পষ্ট করে তোলে, আপনার কাছে আপনাকে ঝাপসা থাকতে দেয় না।' অস্তিবাদীদের Angst বহু পূর্বে রবীন্দ্রনাথে ধ্বনিত। অস্মিতা শব্দটি পর্যন্ত লক্ষণীয়। এমনই দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আলোচনায়। পূর্বেই কথিত, তিনি পেশাদারী অর্থে দার্শনিক ছিলেন না। বিনয়সহকারে তিনি বলেছেন, সাহিত্যের স্বরূপ সম্পর্কে তাঁর বিচার 'অন্তরের উপলব্ধি থেকে, বাইরের অভিজ্ঞতা বা বিশ্লেষণ থেকে নয়।' কিন্তু প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে তাঁর ধারণা অকুতোভয়। সারগ্রাহিতার পথে তিনি কোথাও এগোন নি। শৈল্পিক অনুভূতিই কবিগুরুর চিন্তার সারথি। এই জন্য তাঁর বিপুল রচনাসম্ভার নানারূপ সাক্ষী হিসেবে বর্তমান, যদিও তত্ত্বের ময়দানে কত বার না তিনি হাজিরা দিয়েছেন।

আমার চেতনার রঙে পান্না হ'ল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হ'য়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে—
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, 'সুন্দর'—
সুন্দর হ'ল সে।

বার্কলের মতো চরম ভাববাদ যেন রবীন্দ্রনাথে। বিষয়ীপ্রাধান্য এখানে স্পষ্ট। কিন্তু কবিগুরুর মানস-পরিচয়ে এহ বাহ্য। 'জ্ঞানে জানি বিষয়কে। এই জানায় জ্ঞাতা থাকে পেছনে আর জ্ঞেয় থাকে তার লক্ষ্যরূপে সামনে। ভাবে জানি আপনাকেই, বিষয়টা থাকে উপলক্ষ্যে

...ই আপনার সঙ্গে মিলিত।' পূর্বোক্ত কবিতার চিন্তারাজ্য থেকে রবীন্দ্রনাথ সরে এসেছেন। 'আমাদের জানা দু রকমের, জ্ঞানে জানা আর অনুভবে জানা। অনুভব শব্দের ধাতুগত অর্থের মধ্যে আছে অন্য কিছুর অনুসারে হয়ে ওঠা; শুধু বাইরে থেকে সংবাদ পাওয়া নয় অন্তরে নিজের মধ্যেই একটা পরিণতি ঘটা। বাইরের পদার্থের যোগে কোনো বিশেষ রঙে বিশেষ রসে বিশেষ রূপে আপনাকেই বোধ করাকে বলে অনুভব। সেই জন্যে উপনিষদ্ বলেছেন, পুত্রকে কামনা করি বলেই যে পুত্র আমাদের প্রিয় তা নয়, আপনাকেই কামনা করি বলেই পুত্র আমাদের প্রিয়। পুত্রের মধ্যে পিতা নিজেকেই উপলব্ধি করে, সেই উপলব্ধিতেই আনন্দ।

'আমরা যাকে বলি সাহিত্য, বলি ললিতকলা, তার লক্ষ্য এই উপলব্ধির আনন্দ, বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ী এক হয়ে যাওয়াতে যে আনন্দ।'

অর্থাৎ কবিগুরুর মতে সাহিত্যশিল্প নিমিত্ত মাত্র। সত্তার সঙ্গে মানুষের একাত্মতা সাধারণ জীবনে ঘটে না। কবি নিজে রেলের বগি এবং প্যাসেঞ্জারের উপমা টেনে অন্যত্র বলেছেন যে, রেলারোহীর কাছে তখনকার মতো বগিটা সত্য, কিন্তু বাইরে ধরিত্রী তার জন্যে অপেক্ষার্থী। প্রাত্যহিকতার শত পাকে মানুষ সত্তার স্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকে। শিল্পের সাহায্যে এই ভেদ ঘোচে। কবির সাফাই : 'আমার ব্যক্তিপুরুষ যখন অব্যবহিত অনুভূতি দিয়ে জানে অসীম পুরুষকে...তখন তার মধ্যে জানে আপনাকেও...। জীবনে শূন্যতাবোধ আমাদের ব্যথা দেয়, সত্তাবোধের ম্লানতায় সংসারে এমন কিছু অভাব ঘটে যাতে আমাদের অনুভূতির সাড়া জাগে না, যেখানে আমাদের ব্যক্তিবোধকে জাগ্রত রাখবার মতো এমন কোন বাণী নেই যা অস্পষ্ট ভাষায় বলছে, আমি আছি।...আপন অন্তরে ব্যক্তিপুরুষকে নিবিড় করে অনুভব করি যখন আপন বাইরে গোচর হয়েছে রসাত্মক রূপ।' শিল্প ব্যক্তিচেতনা ও বিশ্বচেতনার সেতুবন্ধ নয় শুধু তাদের গভীরতর করার বাহন। কবির আর এক ভাষণ : 'সুন্দরের অন্তরে আছে একটি রসময় রহস্যময় আয়ত্তের অতীত সত্য, আমাদের অন্তরেরই সঙ্গে তার অনির্বচনীয় সম্বন্ধ। তার সম্পর্কে আমাদের আত্মচেতনা হয় মধুর, গভীর, উজ্জ্বল। আমাদের ভিতরের মানুষ বেড়ে ওঠে, রাঙিয়ে ওঠে, রসিয়ে ওঠে। আমাদের সত্তা যেন তার সঙ্গে রসে মিলে যায়—একেই বলে অনুরাগ।...কবির কাজ সেই অনুরাগে মানুষের চৈতন্যকে উদ্দীপ্ত করা, ঔদাসীন্য থেকে উদ্‌বোধিত করা।'

রস চিত্ত-বৃত্তির আস্বাদ, অলৌকিকের সঙ্গে তার যোগাযোগ। অভিনব গুপ্ত বা আনন্দবর্ধনের সঙ্গে কবির মত-সাদৃশ্য যথেষ্ট। প্রাচীন রসবাদীগণ শিল্পের বিচার করেছেন পাঠকের দিক থেকে, শিল্পীর দিক থেকে নয়। রবীন্দ্রনাথের আলোচনা সেই পথানুসারী। এই ক্ষেত্রে কবি, এমনকি হেগেলও, 'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর' প্রতিধ্বনির হেরফের। অতীতের জের রবীন্দ্রনাথ আরো একভাবে টেনেছেন। যেহেতু রস অলৌকিক বস্তু-জগতের নিয়ম সেখানে প্রযোজ্য নয়। শিল্পজাত দুঃখ তাই দুঃসহনীয় নয়। বরং আবেগ-মোক্ষণ, চিত্ত-প্রশান্তির উপায়—অভিনব গুপ্তের ভাষায় বিশ্রান্তি। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মও আনন্দস্বরূপ। ব্রহ্ম নিজের আনন্দস্বরূপ উপলব্ধির জন্য আপন লীলায় বিকাশমান, মানুষও আনন্দস্বরূপ আস্বাদনে নিজেকে নানাভাবে প্রকাশরত। আনন্দই শিল্প। কবিগুরু সাক্ষ্য দেন, 'সৌন্দর্য আমাদের প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া আনিয়াছে। জগতের সঙ্গে কেবল আমাদের প্রয়োজনের সম্বন্ধ না রাখিয়া আনন্দের সম্বন্ধ পাতাইয়াছে।'

আর এক দিকে শিল্প ও সৌন্দর্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত ছিল রেনোসান্সের আদর্শ-অনুরূপ। শিল্প অবসরের ফল। সৌন্দর্য প্রয়োজনের স্পর্শহীন। কবিগুরু প্রয়োজনের প্রতি বহু জায়গায় তূষ্ণী মনোভাব দেখিয়েছেন, 'অন্তরের অহেতুক আনন্দকে বাহিরে

প্রত্যক্ষগোচর করার দ্বারা তাকে পর্যাপ্তি দান করবার যে চেষ্টা, তাকে খেলা না বলে লীলা বলা যেতে পারে। সে হচ্ছে আমাদের রূপ সৃষ্টি করবার বৃত্তি, প্রয়োজন-সাধনের বৃত্তি নয়।' অন্যত্র—'ব্যবহারিক বুদ্ধিনৈপুণ্যে মানুষ কলে বলে কৌশলে বিশ্বকে আপন হাতে পায়, আর কলানৈপুণ্যে কল্পনাশক্তিতে বিশ্বকে সে আপন কাছে পায়। প্রয়োজন-সাধনে এর মূল্য নয়...।' অর্থাৎ শিল্পসৃষ্টির অধিকারী তারাই যাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটে গেছে এবং মূলত যারা অবসরপুষ্ট। সমাজের সর্বস্তরে শিল্পসংস্কৃতি মিছরির সুতোর মতো (উপমা কবিগুরুর) অদৃশ্য চালিয়ে দিতে না পারলে সুস্থ সমাজ-গঠন সম্ভব নয়। কবি বহু জায়গায় এই মতের সোচ্চার শাহী ঢ্যাঁড়াদার ছিলেন। কিন্তু প্রয়োজনকে এমন অমর্যাদা দিলে সর্বগামী সংস্কৃতির সম্ভাবনা কোথায়? অন্য দিকে কারু ও চারুশিল্পের মধ্যে এক বিরাট পরিখা হাঁ করে থাকছে। এই বিভেদ কবিগুরুর কাছে দুঃসহ ছিল। শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠাতাও তিনি, জীবনযাপনকে শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছানোর প্রচেষ্টায়। বিশ্বাস কঠিন, কেন প্রয়োজনের ওপর তিনি এমন বিরূপ মত পোষণ করতেন? সৌন্দর্যের বাহন সামগ্রী যা প্রয়োজনীয়তার সীমানাবাসী। আনন্দবর্ধনের প্রতিধ্বনি তোলা যায়, আলোকার্থী দীপের প্রতি কীভাবে অবহেলা দেখাতে পারে?

রেনেসান্সী আদর্শে রবীন্দ্রনাথের এই আচ্ছন্নতা কিন্তু তাঁর মানসস্বরূপ নয়। সাহিত্য শব্দের ধাতুগত অর্থের কথা কতবার না বলেছেন : 'সহিত শব্দ হইতে সাহিত্য শব্দের উৎপত্তি। অতএব ধাতুগত অর্থ ধরিলে সাহিত্য শব্দের মধ্যে একটি মিলনের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সে যে কেবল ভাবে ভাবে ভাষায় ভাষায় গ্রন্থে গ্রন্থে মিলন তাহা নহে; মানুষের সহিত মানুষের, অতীতের সহিত বর্তমানের, দূরের সহিত নিকটের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ যোগসাধন ব্যতীত আর কিছুর দ্বারাই সম্ভবপর নহে। যে দেশে সাহিত্যের অভাব সে দেশের লোক পরস্পর সজীব বন্ধনে সংযুক্ত নহে; তাহারা বিচ্ছিন্ন। পূর্বপুরুষদের সহিতও তাহাদের জীবন্ত যোগ নাই। কেবল পূর্বাপর প্রচলিত জড়প্রথাবন্ধনের দ্বারা যে যোগসাধন হয়, তাহা যোগ নহে, তাহা বন্ধন মাত্র। সাহিত্যের ধারাবাহিকতা ব্যতীত পূর্বপুরুষদিগের সহিত সচেতন মানসিক যোগ কখনো রক্ষিত হইতে পারে না।' শিল্পের এই কম্যুনিকেশান বা সঞ্চারবাদী তত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ টলস্টয়ের সমগোত্রীয়। অভিনব গুপ্তের ভাষায় এমন 'সন্তানবৃত্তি'র অধিকারী বলেই শিল্প যুগযুগান্তর-উত্তীর্ণ গতিতে মানুষের মনে ধাক্কা দেয়। মুছে যায় দেশকালপাত্রের জুলুম।

রবীন্দ্র-মানস কিন্তু কোনো বিশেষের দাস নয়। ক্রোচের মতো অভিব্যক্তিবাদীদের প্রাঙ্গণেও তার স্বচ্ছন্দ বিহার। কবির জবানে, '...সাধারণ অভিজ্ঞতার জিনিসকেই সাহিত্য যখন বিশেষ করে আমাদের সামনে উপস্থিত করে, তখন সে আসে অভূতপূর্ব হয়ে, সে হয় সেই একমাত্র, আপনাতে আপনি স্বতন্ত্র।' শিল্প আপন অনন্যতায় ভাস্বর। বোধির রূপায়ণ শিল্পীর একমাত্র দায়িত্ব। 'সমাজ সংসার মিছে সব'। ক্রোচে নিজের চোখের সামনে ফ্যাসিজমের বর্বর দোর্দণ্ডতা বাড়তে দেখে নিজের মত বদলেছিলেন কি না জানা যায় নি। চারুকলা সৃষ্টির ক্ষেত্রে নির্বাচন-ত্যাগ-পরিত্যাগ অপরিহার্য—তা বুদ্ধির ব্যাপার। শুধুমাত্র বোধি বা ইন্ট্যুইশানের দোহাই পেড়ে এই অপরিহার্যতা কী করে এড়ানো যায়? ক্রোচে তদ্বিষয়ে কী ভাবতেন জানা যায় নি। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু অভিব্যক্তিবাদীদের ছলনামুক্ত। হাঁক ফুকার বলেছেন, 'সাহিত্যের বিশেষত্বই হচ্ছে তার পক্ষপাত ধর্ম;—সাহিত্যের বাণী স্বয়ম্বরা।' কয়েক পঙ্‌ক্তি পূর্বে উদ্ধৃতির সঙ্গে এই ঘোষণার স্ববিরোধ স্পষ্ট। কিন্তু কবিগুরু কোথাও সীমাবদ্ধ হওয়ার দুর্বলতার সঙ্গে আপস করেন না।

ইন্ট্যুইশনিস্টদের জের রেখেই মন্তব্য করেন, 'লোক যদি সাহিত্য হতে শিক্ষা পেতে চায় করে তবে পেতেও পারে, কিন্তু সাহিত্য শিক্ষা দেবার জন্য কোন চিন্তাই করে না। কোন দেশে সাহিত্য ইস্কুল–মাষ্টারির ভার নেয় নি।' অথচ কবির নিকট, সত্য আনন্দ–রূপ প্রকাশ। মঙ্গলের সঙ্গে সৌন্দর্যের বাঁধা গাঁটছড়া খুলতে রবীন্দ্রনাথের অনীহা অত্যধিক। উপমার সম্রাট তিনি, উপমাত্মক (এ্যানালজিকাল) যুক্তিরও রাজচক্রবর্তী। কবির ঘোষণা, এই চঞ্চল সংসারে আমরা সত্যের আস্বাদ কোথায় পাই? যেখানে আমাদের মন বসে। হাজার লোক আসিতেছে যাইতেছে, তাহারা আমাদের কাছে ছায়া, তাহাদের উপলব্ধি আমাদের কাছে নিতান্ত ক্ষীণ বলিয়াই তাহাদের মধ্যে আমাদের আনন্দ নাই। বন্ধুর সত্য আমাদের কাছে গভীর, সেই সত্য আমাদের মনকে আশ্রয় দেয়; বন্ধুকে যতখানি সত্য বলিয়া জানি সে আমাদিগকে ততখানি আনন্দ দেয়।' কবির মতে এইভাবে সত্য ও আনন্দে সখ্য। বন্ধু আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী অর্থাৎ মঙ্গলেচ্ছু। এইভাবে সত্য শিব সুন্দরের ভাব–সম্মিলন ঘটে। উপমাত্মক যুক্তির যাথার্থ্য নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। কিন্তু আধুনিক দার্শনিক মহলে কেউ আর জোরেশোরে তা উচ্চারণ করেন না। বরং সমর্থন মেলে : 'If the metaphysical nature of the world should be that of the relation of finite existents to an absolute existent, the absolute existent would be sui generis and in principle could only be described analogically.' *(Nature of Metaphysical Thinking—D. Emmet)* প্রমাণস্বরূপ উদাহরণও পাওয়া যায়। বেদ, উপনিষদ। ডান্টের ডিভাইন কমেডি এবং স্কোলাস্টিক দর্শনের কাব্য–ভাষ্য। বর্তমান যুগে অস্তিবাদ সম্পর্কে ধারণার প্রশস্ত ক্ষেত্র কাম্যুদের উপন্যাস, নাটক।

সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামতের মোটামুটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী এখানে প্রদত্ত। গ্রীষ্ম ও বর্ষা রবীন্দ্রনাথের গদ্য–পদ্য রচনায় অজস্র ছড়ানো। অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষম প্রজ্ঞার অধিকারী তাঁর সদা–জাগর প্রবাহ–উচ্ছল আত্মা যেন এই দুই প্রতীকের প্রাণানুষঙ্গ। কবিগুরুর মানস–পরিচয়দান অনেক সাধনা এবং গবেষণাসাপেক্ষ। বর্তমান লেখক সম্পূর্ণ অবহিত, সূর্যের মধ্যে বাল্‌ব জ্বালানোর পিকাসোচিত দৃষ্টান্ত–দুঃসাহসই এই নিবন্ধ–প্রচেষ্টা।

আবদুল মান্নান সৈয়দ

রবীন্দ্রনাথ : তাঁর শিল্পসাহিত্যতত্ত্বের ত্রিবেণী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : এই উচ্চারণ উৎকীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনোলোকে ভেসে ওঠে এক দীর্ঘ, বিশাল, গভীর, ভাস্বর, বিশ্রব্ধ, আদর্শায়িত ও সদাসক্রিয় চৈতন্যলোকের ইতিহাস—যা ষাট বৎসরাধিক ব্যেপে বাংলা সাহিত্যের বিবিধ ক্ষেত্র থেকে বিচিত্রসচ্ছল ফসলরাশি তুলেছে;—কিন্তু এ-কথা নতুন করে বর্ণনা করার দরকার নেই আর, কেননা এ তো আজ ইশকুলে-পড়া বালকও জানে;—এখন, যা বিশেষ দ্রষ্টব্য, তা হচ্ছে : তাঁর শিল্পসাধনার এই দীর্ঘবিসারী জগৎ শুধুমাত্র 'সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার' কূল-ভাঙা বান-ডাকা আনন্দেই অবসিত হয় নি, তারই সঙ্গে তার উৎসে ও প্রসারে পাই 'নির্মাণের' শালপ্রাংশু মহাধ্বজ লীলা, সঙ্গীতের পিছনে নিয়মের কঠিন জ্যামিতির বদ্ধমুষ্টির মতো। সাহিত্যে তাঁর সেই প্রথম দংশন থেকে যদি অন্ত্য-পর্ব পর্যন্ত এক লহমায় অতিক্রম করে আসি তা হলে দেখব : তাঁর গভীর ও বিস্তারিত বিহার নাথ, নিসর্গ ও নরনারীর ত্রিলোকের এক স্বকীয় জয়স্তম্ভ রচনা করে দিয়ে গেছে। তাঁর ভারতীয়তা; তাঁর য়োরোপার্জন; এবং কোন ব্যাখ্যাতীত স্বর্গের চক্রান্তে জাগ্রত তাঁর ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের জ্বলদর্চিরেখা : এইসব—এই সবই তো একজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : তাঁর শিল্পসাহিত্যতত্ত্ব বিচারেও তাই আশরীর রবীন্দ্রনাথের সমগ্র বিচ্ছুরণে ও নিমজ্জনে যুক্ত ও লগ্ন হতে হয়, যদিচ রবীন্দ্রনাথের স্থাপনা সাতাশ খণ্ড 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'-র পরপারেও বটে। তবে, এখানেই বলে রাখি : তাঁর বিরাট ব্যক্তিতার অতিমর্ত্য আবাহন শিল্পবিচারের প্রতিকূল বলে, যথাসম্ভব নিজেকে সংদমিত রেখে শান্ত স্থির ও স্তব্ধ মনীষায় অগ্রসর হলে যেমন রবীন্দ্রনাথেরই অনুসৃত ও ব্যবহৃত আবেগঘনিল শিল্প-সমালোচনা এড়ানো যায়, তেমনি নিরপেক্ষ তরফ থেকে তাকে শনাক্তিকরণেও সুবিধা।

২

সাহিত্যের লক্ষ্য : সত্য ও সুন্দর; ফলশ্রুতি : আনন্দ ও কল্যাণ—এক কথায় এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের সারাৎসার। সত্য, সুন্দর ও কল্যাণ—এই সংযুক্ত ত্রিবেণী শুধু তাঁর সমগ্র সাহিত্যের অন্তরে মৌলিক অনলের মতো কাজ করে যায় নি, যে-মহাজীবন তিনি যাপন করেছেন, তার ভিতরেও এই তিন ধারণা ও চেতনা অনুস্যূত;—অর্থাৎ, জীবনে ও সাহিত্যে, উভয়ত্র, তিনি সত্য সুন্দর ও কল্যাণের দিকে তথা শিল্পের নিপট উৎসারের প্রতি

লিত ও ধাবিত হয়েছেন।[১] এ জন্যেই য়োরোপীয় এবং সংস্কৃত নিবিড় আলঙ্কারিকেরা ভাবে সাহিত্যতত্ত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যবচ্ছেদ ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন, রবীন্দ্রনাথ হিত্যের শরীর ও আত্মাকে কোনোদিন অনুরূপভাবে খোপে-খোপে বিভক্ত ব্যাখ্যা করেন না, তাঁর বিচারের ধরনটি স্বাধীন ও স্বকীয়, বঙ্কিম ও গতিবিশুদ্ধ, ব্যক্তিগত ও সাহিত্যিক; জগন্নাথ বা রিচার্ড্‌স্‌-এর আলোচনা স্বয়ং সাহিত্য হয়ে উঠেছে—এ-কথা কেউ বলবে না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনাও তাঁর আলোকপ্রাপ্ত হয়ে প্রায়শ সাহিত্যলোকে কীর্ণ : সব রচনাই কবিতার কুশলতা—অর্থাৎ উপমা, চিত্রকল্প, ধ্বনি, শব্দক্রীড়া, শব্দবিহার, অনুষঙ্গ ইত্যাদি—কুশলতা-দ্বারা তুমুলভাবে আক্রান্ত; তার শিল্প-সাহিত্যতত্ত্বের এই বিচাররশ্মি মুখ্যত তাঁর কএকটি প্রবন্ধগ্রন্থে ও কিছু শবলিত ছিন্নপত্রাবলিতে প্রত্যক্ষভাবে বিকীর্ণ এবং তাঁর সমগ্র রচনাবলিতে পরোক্ষপ্রতীক কীর্তিত। স্মরণীয় : তাঁর সাহিত্যতত্ত্ব তাঁর জীবনদর্শনেরই সহোদর এবং তাঁর মতো জীবন ও রচনাকে অভিন্ন প্রদীপাধারে নিষ্কম্পভাবে বিধায়িত করেছেন—এরকম কীর্তিমান পুরুষ যেমন এই গ্রহেই বিরল, তেমনি সেই আত্মপ্রাথমিক সাহিত্যযাত্রা থেকে শেষ জীবনাবধি পৃথিবীলোক-সম্পর্কিত এক সচল দর্শনের ধারক ছিলেন তিনি—যা তাঁর প্রাকৃতিক উত্থানের আগে ও পরে অন্তত কোনো বাংলা লেখকে মেলে না। 'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি-যে মহৎ', এই রবীন্দ্রোক্তি রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যেই নিবেদিত হতে পারে, এখানেই তার কারণ নিহিত।—আমার এই আলোচনায় তাঁর নন্দনতত্ত্ব-বিষয়ক পুস্তক-ও আলোচনা-গুচ্ছই অন্তর্ভুক্ত হয় নি, তাঁর জীবন ভরে উৎসিত সৃষ্টিলোকী সমুদয় রচনাই আমার বক্তব্যের সপক্ষে আমি স্বীকার করে নিয়েছি, কেননা তিনি তো বিশুদ্ধ কান্তিবিদ্যাবিৎ নন, বরং বিশুদ্ধ সাহিত্যরসস্রষ্টা।

রবীন্দ্রনাথের সত্যের ধারণা সুন্দরে কল্যাণে আনন্দে একাত্ম; বা, বলা চলে, তাঁর সত্য-সুন্দর-কল্যাণের চেতনা পরস্পরের ভিতরে প্রবিষ্ট। একদিকে বিচিত্রবিধ প্রসঙ্গে তিনি জন কীটস্‌-এর সত্যসুন্দরের অন্যোন্যসম্বন্ধজাগর প্রবাদপ্রখ্যাত কবিতার পঙ্‌ক্তিটি— 'Beauty is truth, Truth beauty'— উদ্ধৃত করেছেন, কখনো যথাযথ, কখনো সাচীকৃত; অপরদিকে প্রাথমিক 'প্রভাতসংগীত' কবিতাগ্রন্থে সেই-যে হৃদয়স্থ নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হল তা ক্রমশ এক মানবরচিত সৃষ্টি-সমুদ্রের আকারে ব্যাপ্ত হয়ে যায়, এমনকি 'শেষ লেখা'-র সর্বান্ত্য কবিতায়ও সেই বিপুলা পৃথ্বী ও নিরবধি কালের 'সত্যেরে সে পায় আপন আলোক-ধৌত অন্তরে অন্তরে'। একটি দীর্ঘ রেখায় যেন তিনি সত্যকে তাঁর আশি বছরের আত্মবাহী মানচিত্রে অঙ্কন করে গেলেন : রেখাটি মানবস্বভাবের মতোই একেবারে সরল নয়, অঙ্কের মতো একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতির মধ্য দিয়ে এসে একটি অতিনির্দিষ্ট ফল প্রসব করে না : তাই তো 'প্রভাতসংগীত'-এ তাঁর হৃদয় খুলে গেলেও তারপর আবার 'কড়ি ও কোমল'-এ আত্মবৃত হয়ে আসে; এবং

এ-প্রসঙ্গে অজস্র উদাহরণ সমাহৃত করে তোলা যায়, বর্তমানে সে-সব স্থগিত রেখে একটিমাত্র অসামান্য কাব্যবিন্যাসের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি : শরীরের আবরক একটি তুচ্ছ নতুন কাপড়—একটি সামান্য অন্তরীয়— তাঁর শিল্পৈষণার এবং সাধারণ বস্তুর শিল্পে রূপান্তরণ ও অনন্যকরণের এক উজ্জ্বলমেধাবী পরিচয়পত্র : স্থানাভাবে কেবলমাত্র প্রথম স্তবকটি উদ্ধার করলুম : "সর্বদেহের ব্যাকুলতা কী বলতে চায় বাণী,/ তাই আমার এই নূতন বসনখানি। / নূতন সে মোর হিয়ার মধ্যে দেখতে কি পায় কেউ?/ সেই নূতনের ঢেউ/ অঙ্গ বেয়ে পড়ল ছেয়ে নূতন বসনখানি। / দেহগানের তান যেন এই নিলেম বুকে টানি।"—৩৮-সংখ্যক কবিতা, 'বলাকা'।

এই আত্মরচিত ভুবনে বাস ও তার থেকে বৃহৎ জগতে বেরিয়ে আসা—এই দ্বন্দ্ব তাঁর সারা জীবনের নিত্যসহচর ছিল, কোনো-এক পত্রে যাকে তিনি একই সঙ্গে বিরহমিলনপরিপূর্ণ সংসারের প্রতি টান ও নিরুদ্দেশলোকের আহ্বান বলে শনাক্ত করেছেন; এই দ্বৈরথ ঈষৎ রূপান্তরিত হয়ে তার উত্তরজীবনকে যেন দু টুকরো করে ফেলেছিল—যথাসময়ে আমরা তা নির্দেশ করব। কিন্তু লক্ষণীয় : সারা জীবনের লুক্কায়িত ও উচ্চারিত এই দ্বন্দ্বময় কবিকাহিনীর ভিতরেও মোটামুটিভাবে তাঁর চেতনদেহলী-যে নির্দ্বন্দ্ব লাগে, এমনকি তার গোধূলিসন্ধির ঈষৎবিদীর্ণ-পর্বেও, তার কারণ : নিসর্গপ্রকৃতিতে তার নিরন্তর মুগ্ধতা, কখনো ধুলোমাটির মানবের জয়গাথায়, কোনো-কোনো অধ্যায়ে ঈশ্বরের নিদিধ্যাসনে। তবে এ-কথা যেন আমরা বিস্মৃত না-হই যে, সকল শিল্পীর মতোই রবীন্দ্রনাথের জগৎও আমাদের এই পৃথিবীর ও মানুষের নির্বিকার ও অবিকল প্রতিরূপ নয়, তা বহুলাংশে স্বরচিত, কবি-কর্তৃক গদ্যে-পদ্যে বহুবার কথিত 'হৃদয়ের পথ' দিয়েই তাঁর যাবতীয় ভ্রমণ সম্পন্ন হয়— গ্রন্থপীড়নে নয় কখনো। তাঁর অজস্র রচনার প্রায় যে-কোনো স্থান থেকে একটি উৎকলন তাঁর এই সত্যসুন্দরসন্ধিৎসার, সত্য ও সুন্দরের অন্যোন্য সম্বন্ধপাতের সাক্ষ্য দিতে পারে :

১. সুন্দর আনন্দ দেয়, তাই সাহিত্যে সুন্দরকে নিয়ে কারবার। বস্তুত বলা চাই, যা আনন্দ দেয় তাকেই মন সুন্দর বলে, আর সেটাই সাহিত্যের সামগ্রী।[২]

২. আধুনিক কবি বলিয়াছেন : Truth is beauty, beauty Truth। আমাদের শুভ্রবসনা কমলালয়া দেবী সরস্বতী একাধারে Truth এবং Beauty মূর্তিমতী। উপনিষদ্‌ও বলিতেছেন : আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি। যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহাই তাঁহার আনন্দরূপ, তাঁহার অমৃতরূপ। আমাদের পদতলের ধূলি হইতে আকাশের নক্ষত্র পর্যন্ত সমস্তই Truth এবং beauty সমস্তই আনন্দরূপমমৃতম।

সত্যের এই আনন্দরূপ অমৃতরূপ দেখিয়া সেই আনন্দকে ব্যক্ত করাই কাব্য সাহিত্যের লক্ষ্য।[৩]

'পরো শুধু সৌন্দর্যের নগ্ন আবরণ', প্রথম-যৌবনের কোনো কবিতায় তাঁর পক্ষে বিধর্মী সংরাগদীপিত এই ঘোষণা করলেও, তখনই, সমকালেই একটি চিঠিতে পাই স্বস্থ সমীকরণ : 'যারা সৌন্দর্যের মধ্যে সত্যি সত্যি নিমগ্ন হতে অক্ষম তারাই সৌন্দর্যকে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের ধন বলে অবজ্ঞা করে —কিন্তু এর মধ্যে যে অনির্বচনীয় গভীরতা আছে, তার আস্বাদ যারা পেয়েছে তারা জানে সৌন্দর্যকে ইন্দ্রিয়ের চূড়ান্ত শক্তিরও অতীত—।' অধোরেখ অংশে যে ইন্দ্রিয়াতীত সুন্দরসমীক্ষা প্রকাশিত, তা তখনই তলে-তলে কবির রক্তের ভিতরে প্রবাহিত, এবং কবির প্রথম কাব্যশিখর—'মানসী'র—'সুরদাসের প্রার্থনা' নামক গীতাগ্নিতে অপাবৃত ও প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছে। 'কড়ি ও কোমল'-এর ক্ষণিক শারীররতি শমিত হয়ে গেলে যে সুরদাস 'আত্মার জানালা' (লেওনার্দোর উচ্চারণে) চক্ষুর্দ্বয় উপড়ে ফেলতে চায়, সে যে ইতিহাস-প্রোক্ত সুরদাস নয়, বরঞ্চ তার ছদ্ম-প্রাবরণীতে স্বয়ং কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—এই তথ্য একটু নিবেশেই ধরা পড়ে। অনন্তর, অপরিসীম মমতায় তিনি-যে এই কল্পমূর্তিকে আঁকড়ে থাকলেন সারা জীবন—সর্বদা হয়তো সমান্তরালভাবে নয়, ঈষৎ বেঁকে-চুরে—তার বিস্তর উদাহরণ রবীন্দ্র-রচনাবলির লাইনে-লাইনে অমেয়ভাবে পরিকীর্ণ। একই কারণে, কলাকৈবল্যবাদের উদ্‌গাতা তেয়োফিল গোতিয়ে-র কোনো একটি নভেলবিন্যাসের

---

২ 'সাহিত্যের পথে'।

৩ "সৌন্দর্যবোধ", 'সাহিত্য', পৃ ৫১-৫২।

প্রতিপাদ্য যেহেতু সৌন্দর্যের টান ও আকর্ষণ সংসার থেকে মানুষের মনকে স্বতন্ত্র ছিনিয়ে নিতে চায়, অতএব রবীন্দ্রনাথ এই সিদ্ধান্তের একদেশদর্শিতাকে স্পষ্ট ধিক্কার জানিয়েছিলেন। কারণ, তাঁর অদ্বিধান্বিত মত, 'সৌন্দর্যবোধের যথার্থ পরিণতভাব কখনোই প্রবৃত্তির বিক্ষোভ কিংবা অসংযমের সঙ্গে এক ক্ষেত্রে টিকিতে পারে না। পরস্পর পরস্পরের বিরোধী।' রবীন্দ্র রচনাবলীর অধিকাংশে এইসব উক্তির সমর্থন মেলে, কিন্তু কোনো-কোনো গল্প-উপন্যাসে বা একেবারে অন্ত্যজীবনের কোনো-কোনো রচনায় তাঁর এই আদর্শিক সৌন্দর্যচেতনা চিড় খেয়ে গিয়েছিল, কোনো-কোনো রচনাংশ হয়ে উঠেছিল আরণ্যিক—আমরা যথাসময়ে তা চিহ্নিত করব।

তাঁর সত্য-চৈতন্যের একটি অংশ যেমন সুন্দর, অপরাংশ তেম্নি আনন্দ ও কল্যাণ। 'আনন্দই তাহার [সাহিত্যের] আদি অন্ত মধ্য। আনন্দই তাহার কারণ এবং আনন্দই তাহার উদ্দেশ্য।' রবীন্দ্রনাথ ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশের সন্তান, এবং বাংলাদেশে ঐ শতক দেশহিতৈষণা, সামাজিক উন্নয়ন ও জাগরণের অনবচ্ছিন্ন কর্মে উন্মুখর—রবীন্দ্র-রচনায়ও এই কল্যাণ-ও মঙ্গল-ভাবনার প্রচুর সাক্ষ্য বর্তমান, প্রায় যে-কোনো জায়গায় হাত দিলে উদাহরণ উঠে আসবে : তাঁর গদ্য রচনায় তো বটেই, কবিতায় কখনো প্রত্যক্ষভাবে, কখনো বা ইশারাপাতে। নব্য লেখকদের প্রতি উপদেশে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই শুভঙ্কর সাহিত্যচর্চারই সূত্র ধারণ করেছিলেন, 'যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্য জাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।' কিংবা প্রাগুক্ত শতাব্দীশোভন সেই প্রযত বাণী-বিভূতি : সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য, অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী ধরা মহাপাপ। রবীন্দ্রনাথের মনোভাব এই সব সর্বতোভদ্র ভাবনা-চেতনা-ধারণারই সহগ, কেবল উভয়ের পার্থক্য এইখানে : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর ক্ষেমঙ্কর ভাবনা-বেদনার অনুযায়ী করে সর্বাংশে নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন; আর অধিকাংশ সময়ে এই শ্রেয়োসংবিতে চালিত ও অধিকৃত হলেও কখনো কখনো একেবারে উলটো কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সাহিত্যকৃতির ঈষদংশ অন্তত এ শ্রেয়োভাবনাকে আমল দ্যায় নি। উনবিংশ শতাব্দীর সার্বত্রিক জাগরণের বাংলাদেশ তাঁর সাহিত্য নির্মাণেরও পটসন্ততি মেলে ধরেছিল : প্রায় সমস্ত লেখক কোনো না কোনোভাবে দেশ-সমাজ-মানবের মঙ্গল-ভাবনায় নিঃসরণ করে গেছেন; তৎকালীন ও তৎস্থানিক বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যচর্চার সংবাদ যাঁরা রাখেন, তাঁরা জানেন দেশ-সমাজের আতশী-ফলন কোন মুগ্ধবোধে ও আয়তনে আবৃত ছিল;—অবশ্য, এর মুখ্য দায় দেশজ পেশির বাংলাময় ইতিহাসসীবনেরই নিশ্চয়। বঙ্কিম এই শ্রেয়োভাবনায় আমুণ্ডনখাগ্র অধিকৃত ছিলেন; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যের কল্যাণ-মঙ্গল ও নীতি-প্রচারের বিপরীত উদাহরণ সরবরাহ করলেও তাঁর সাহিত্যচর্চাও মুখ্যত সত্যধর্মধ্বজ; পরবর্তী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বা নজরুল ইসলাম প্রভৃতি প্রধান সাহিত্যরথীর চেতনালোকে ঐ তরঙ্গ সঞ্চারিত হয়ে এসেছে। তিরিশের কালে এই দায়িত্বভার কবিকথকদের হাত থেকে স্খলিত হয়ে যায়; তবে স্মরণীয় : পরোক্ষভাবে দেশ-সমাজের কল্যাণ-ভাবনা থেকে নিশ্চয় একেবারে বিচ্যুত হওয়া কারো পক্ষে ও কোনো কালেই সম্ভব নয়। বঙ্কিম যেমন শুধুমাত্র তাঁর সময়ের সাহিত্যের কর্ণধারই ছিলেন না, তেম্নি রবীন্দ্রনাথও ছিলেন না কেবল গুরুদেব : দেশ-সমাজের সকল প্রসঙ্গে তাঁদের আতত দায়িত্বভার ছিল অভিভাবকের মতোই। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বক্তব্য যে মূলত সেই অনিমেষ শ্রেয়োভাবনায় নিঃসৃত হয়েছে, এ-বিষয়ে উভয়ের রচনা থেকে দুটি

পাশাপাশি উদ্ধারপর্ব সাহায্য করবে :

১. কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে। কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য, কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষ সাধন—চিত্তশুদ্ধি জনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা—কিন্তু নীতি ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য, প্রথমোক্তটি গৌণ উদ্দেশ্য, শেষোক্তটি মুখ্য উদ্দেশ্য।[৪]

২. বিশুদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে উদ্দেশ্য বলিয়া যাহা হাতে ঠেকে তাহা আনুষঙ্গিক। এবং তাহাই ক্ষণস্থায়ী। যাহার উদ্দেশ্য আছে তাহার অন্য নাম—কোনো একটি বিশেষ তত্ত্বনির্ণয় বা কোনো একটি বিশেষ ঘটনা-বর্ণনা যাহার উদ্দেশ্য তাহার লক্ষণ অনুসারে তাহাকে দর্শন বিজ্ঞান বা ইতিহাস বা আর কিছু বলিতে পারো। কিন্তু সাহিত্যের উদ্দেশ্য নাই।... সাহিত্য অর্থেই একত্র থাকিবার ভাব—মানবের 'সহিত' থাকিবার ভাব—মানবকে স্পর্শ করা, মানবকে অনুভব করা। সাহিত্যের প্রভাবে হৃদয়ে হৃদয়ে শীতাতপ সঞ্চারিত হয়, বায়ু প্রবাহিত হয়, ঋতুচক্র ফিরে, গন্ধ গান ও রূপের হাট বসিয়া যায়। উদ্দেশ্য না থাকিয়া সাহিত্যে এইরূপ সহস্র উদ্দেশ্য সাধিত হয়।[৫]

রবীন্দ্রনাথের এই সুন্দর-কল্যাণ-সত্যের পিছনে তাঁর অভিজাত পারিবারিক প্রভাব বা তাঁর ঋষিপ্রতিম জনকের প্রভাব নিশ্চয় উল্লেখনীয়। রবীন্দ্রজীবননাট্যে যে-নিরাসক্তিসাধনা অথবা রাবীন্দ্রিক শান্তবলয়ে যে-অধ্যাত্মঅন্বয় তার পিছনে কেবল তাঁর স্বাবলম্বনের প্রবর্তনাই নয়, পিতারও অনিঃশেষ অংশ আছে বলে মনে হয়; মনে হয়, একেবারে আক্ষরিক অর্থে না হলেও, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যুগ্মদৃষ্টি—বিলাস ও সন্ন্যাস-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভিতরে জ্যোতির্বিকাশী আয়তনে সংস্থিত। অধ্যাত্মজীবী দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনী'র কোনো কোনো অংশের সঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যের ছন্ন সম্বন্ধ কখনো রীতিমতো বিস্ময়কর।

> দিদিমার মৃত্যুর পূর্ব্বদিন রাত্রিতে আমি ঐ চালার নিকটবর্ত্তী নিমতলার ঘাটে একখানা চাঁচের উপর বসিয়া আছি। ঐ দিন পূর্ণিমার রাত্রি, চন্দ্রোদয় হইয়াছে, নিকট নামসঙ্কীর্ত্তন হইতেছিল—'এমন দিন কি হবে, হরিনাম বলিয়া প্রাণ যাবে'; বায়ুর সঙ্গে তাহা অল্প অল্প আমার কানে আসিতেছিল। এই অবসরে হঠাৎ আমার মনে এক আশ্চর্য্য উদাস-ভাব উপস্থিত হইল। আমি যেন আর পূর্ব্বের মানুষ নই। ঐশ্বর্য্যের উপর একেবারে বিরাগ জন্মিল। যে চাঁচের উপর বসিয়া আছি, তাহাই আমার পক্ষে ঠিক বোধ হইল; গালিচা দুলিচা সকল হেয় বোধ হইল, মনের এক অভূতপূর্ব আনন্দ উপস্থিত হইল। ...
>
> .... আমার চারিদিকে কেবল বিলাস ও আমোদের অনুকূল বায়ু অহর্নিশি প্রবাহিত হইতেছিল। এত প্রতিকূল অবস্থাতেও ঈশ্বর আপনি দয়া করিয়া আমার মনে বৈরাগ্য দিলেন, ও আমার সংসারাসক্তি কাড়িয়া লইলেন, এবং তাহার পরে সেই আনন্দময় স্বীয় আনন্দের ধারা আমার মনে বর্ষণ করিয়া আমাকে নূতন জীবন প্রদান করিলেন। তাঁহার এ কৃপার কোথাও তুলনা হয় না। তিনিই আমার গুরু, তিনিই আমার পিতা।[৬]

'আত্মজীবনীর কোনো কোনো অংশকে 'নৈবেদ্য', 'খেয়া', 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য' বা 'গীতালি'র গদ্যভাষ্যের মতো মনে হয়—এটা নিশ্চয় অলীক নয়। উপর্যুক্ত আত্মি-

৪ "উত্তর চরিত", 'বিবিধ প্রবন্ধ' : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৫ "সাহিত্যের উদ্দেশ্য", 'সাহিত্য' : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর', পৃ ১৭৬-৭৭।

৬ 'আত্মজীবনী' : দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ ৪ ও ৮।

অভিজ্ঞানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতার ও ধারণাচেতনার সতত সম্বন্ধ অন্তর্গভীরে জড়ানো রয়েছে।

অতএব মন, তোর কলসী ও দড়ি আন,
অতলে মারিস ডুব Mid-Victorian ।[৭]

নিজের উদ্দেশে এই কৌতুকের পিছনে কিন্তু কিছু সত্যও জড়িত : মধ্য-ভিক্টোরিয়ান আবহাওলোকের উপবর্তী ছিলেন তিনি। তাঁর শিল্প-সাহিত্যতত্ত্বের চিন্তায় এমনকি টেনিসনের উপস্থিতিও নজরে পড়ে যেন।

এইসঙ্গে তাঁর উপর বৈদান্তিক মহিমচ্ছায়ার সান্দ্রতাও অবিসংবাদিতভাবে সত্য। "আছে আছে আছে' এই বোধির ভিতরে চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষয় আশয়", এই উক্তি জীবনানন্দ দাশের হলেও রবীন্দ্রপরবর্তী কবির নয়, এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ। এই সর্বার্থসাধক অস্তিবাদ, এই নিরন্ত-অবার আনন্দোৎসার—এই হচ্ছে আদ্যোপ্রান্ত রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব, অতএব, যে-কয়েকটি উৎসমূল থেকে ঈষদঙ্কুরিত, অতএব, তার সংক্ষিপ্ত চিত্রলেখা এ-রকম : (ক) দৈশিক প্রভাব; (খ) বৈদেশিক ছায়া; (গ) পারিবারিক পরিবেশ; (ঘ) ধর্ম তথা উপনিষদের আলোক; (ঙ) রবীন্দ্রনাথ যেহেতু কেবল সাহিত্যগুরু নন, জাতির দিঙ্‌নির্দেশক ও অভিভাবকের অলিখিত অপিচ অনিবারণ পদ তাঁকে যেহেতু স্বীকার করে নিতে হয়েছিল, অতএব তাঁর পরিপার্শ্ব ও সত্য-সুন্দর-কল্যাণের নিশিত নান্দন নব্য প্রবক্তা হিশেবে তাঁকে খানিকটা সহায়তা করেছিল— এ-কথা হয়তো অস্বীকার করা চলে না; (চ) সর্বোপরি কবি-সার্বভৌমের ব্যক্তিগত প্রবণতা।

২

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের নিহিত প্রসঙ্গগুলি—সত্য, সুন্দর, কল্যাণ ও আনন্দ—এই ধারণাসমুচ্চয় বিশ্বসাহিত্যের বিশদ মজলিশে স্থাপন করে এর মৌল সীমা-শক্তি-বিভূতি ও স্খলন পতন ছেঁকে তোলা যায়। কিন্তু তার আগে বলা দরকার : সাহিত্যের এই অন্তর্গত সারাৎপথ প্রসঙ্গে লেখকে-লেখকে দেশে-কালে ভিন্নমত লক্ষ করা গেলেও শিল্পসাহিত্য থেকে এই অপরিনির্বাণ বিষয়গুলির নির্বাসন কারো কাম্য হতে পারে না; অর্থাৎ, সাহিত্যের লক্ষ, পরিবর্তমান অর্থে, সত্যও বটে সুন্দরও বটে, এবং শেষপর্যন্ত সাহিত্য নামধেয় যে-কোনো রচনা কল্যাণ বা আনন্দসঞ্চারী। দেশে-কালে লেখকে-লেখকে কেবল যে-পার্থক্য ঘটে, তা অস্মিতা ও ব্যক্তিস্বরূপের : যথা—সত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব যেমন আলোকের কান্তিধারায় অভিস্নাত, এমিল জোলার তেমন নয়; সুন্দর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে-রকম অবিচলিতমনা, রাইনে মারিয়া রিলকে তা থেকে ভিন্ন পরামর্শ দেন; অথবা সাহিত্যের কল্যাণশক্তি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা সমান্তরাল নয়। যেন মঞ্চে নাটক অভিনীত হচ্ছে, বিভিন্ন রঙের আলো ফেলা হচ্ছে অভিনেতাদের উপর;—ঐ অভিনেতাদের বলা যেতে পারে সত্য-সুন্দর-কল্যাণ, আর ঐ বিভিন্ন রঙের আলো বিভিন্ন লেখকের চিত্ত।

দেশে দেশে মানুষ আপনার সত্য প্রকৃতিকে আপনার অসত্য দীনতার হাত থেকে রক্ষা করে আসছে। মানুষ আপনার দৈন্যকে, আপনার বিকৃতিকে বাস্তব জানলেও সত্য বলে বিশ্বাস

৭ 'আধুনিকা', 'প্রহাসিনী' : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

করে না। তার সত্য তার নিজের সৃষ্টির মধ্যে সে স্থাপন করে। রাজ্যসাম্রাজ্যের চেয়েও তার মূল্য বেশি। ...

... সাহিত্যশিল্পকে যারা কৃত্রিম বলে অবজ্ঞা করে তারা সত্যকে জানে না। বস্তুত প্রাত্যহিক মানুষ তার নানা জোড়াতাড়া লাগা আবরণে, নানা বিকারে কৃত্রিম; সে চিরকালের পরিপূর্ণতার আসন পেয়েছে সাহিত্যের তপোবনে, ধ্যানের সম্পদে। যেখানে মানুষের আত্মপ্রকাশে অশ্রদ্ধা সেখানে মানুষ আপনাকে হারায়। তাকে বাস্তব নাম দিতে পারি, কিন্তু মানুষ নিছক বাস্তব নয়। তার অনেকখানি অবাস্তব, অর্থাৎ তা সত্য। তা সত্যের সাধনার দিকে নানা পন্থায় উৎসুক হয়ে থাকে তার সাহিত্য তার শিল্প একটি বড়ো পন্থা। তা কখনও কখনও বাস্তবের রাস্তা দিয়ে চললেও পরিণামে সত্যের দিকে লক্ষ্য নির্দেশ করে।[৮]

নিম্নরেখ অংশগুলিতে অভিনিবেশ দিলে মনে হয় : রবীন্দ্রনাথের ধারণা ছিল বাস্তব বা প্রাত্যহিক মানুষ নানাভাবে অসম্পূর্ণ ও কৃত্রিম, এবং সত্য ও বাস্তব যেন আমেরু আলাদা, যেন সত্যমাত্রই অপাপবিদ্ধ ও কেবল অনুভববেদ্য, বাস্তব যেন সত্য হতে পারে না। এখানেই য়োরোপীয় সত্য ধারণার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সত্য ধারণা দ্বিমেরুবিষম হয়ে ওঠে। যদিচ উপর্যুক্ত উদ্ধৃতির শেষ লাইনে 'আধুনিক' চেতনারই অনুলিখন, বা প্রাক্‌লিখনও বলা চলে, তবু মোটামুটি তা তত্ত্ব হিসেবে তাঁর কাছে যাচিত মর্যাদা পায় নি; পক্ষান্তরে, য়োরোপ বা রবীন্দ্রঠাকুরোত্তর বাংলাদেশে বিষিয়ে-ওঠা বাস্তবকে বা মানবজীবনের আবিলতাকেও সত্যেরই উৎসঙ্গে মেলায়।

The arts, literature, poesy, are a science, just as chemistry is a science. Their subject is man, mankind and the individual.[৯]

এজরা পাউন্ডের এই সিদ্ধান্তে রবীন্দ্রনাথ সায় দিতে পারতেন না, কিন্তু বাংলাভূমির কথাসাহিত্যে যখন মনোবাস্তবতা আরাধ্য ঈশ্বর হয়ে উঠেছিল, তখন একজন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ-রকম বিজ্ঞানমন্যতাই জ্ঞাপন করেছিলেন—মনে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ এরকম উক্তি স্বীকার করে নিতে পারতেন না,—কেননা তাঁর রোমান্টিক উজ্জীবনে হাঁপিয়ে উঠত বাঁধা-ধরা বিজ্ঞান : যিনি বাল্যবেলায় কলকাতার প্রস্তরপুরী থেকে উধাও হয়ে গেছেন কল্পলোকে ও নিসর্গে; যিনি কেবলমাত্র ঈশ্বরদত্ত মানবস্বভাব দ্বারা জগৎজীবনের রহস্যভেদ করতে চেয়েছিলেন, অধীত দর্শনে আস্থা রাখেন নি পাছে সহজগ্রাহ্য বিষয় হয়ে ওঠে জটিল; যিনি যে-তপোবনের অস্তিত্ব ছিল কেবল পুরাণে ও মানুষের কল্পনাজগতে, তাকে তাঁর অলোকদৃষ্টি সাধনার মধ্য দিয়ে নামিয়ে আনেন এই শতকের ফাঁপা পটভূমিকায়;—তাঁকে 'আধুনিক' বলে মেনে নেওয়া যেমন শক্ত, তেম্নি তাঁর দূরদেশকালকল্পনার মিলনোৎপন্ন অবিশ্বাস্য সৃষ্টিসাধনাকে আধুনিকোত্তম বলে স্বীকার না-করা আরো কঠিন।

Beauty is not the object of art, but its flesh and blood, its being.[১০]

রবীন্দ্রনাথকে মনে হয় বস্তুর স্বকীয় সৌন্দর্যই আকর্ষণ করত প্রধানত, যদিচ তা হৃদয়ের পথেই সৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে ওঠে, তবু মনে হয় ঐ হচ্ছে তাঁর মূলমন্ত্র, মৃত্তিকালগ্ন বটে তবে এক হিসেবে অক্ষিতও বটে, যতদিন-না তিনি উত্তরকালের বস্তুবিবিক্ত হৃদয়রঞ্জনী প্রলেপের সন্ধান পেয়েছিলেন। প্রসঙ্গত, সজনে-ডাঁটার বিষয়ে শরৎচন্দ্রের অসাহিত্যিক আপত্তিও একেবারে অবান্তর নয় এজন্যে যে তা ঠিক রবীন্দ্রচেতনায় তথা শিল্পাংশে ধৃত হতে পারে নি।

৮ "সত্য ও বাস্তব", 'সাহিত্যের স্বরূপ' : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ ৫৮-৫৯।

৯ "The serious artist", *Literary Essays of Ezra Pound,* পৃ ৪২।

১০ *Essays in Aesthetics* : Jean-Paul Sartre, পৃ ৭২।

যখন তিনি ঈষৎ শিল্পবিচ্যুত হয়েও গদ্যকবিতা সম্ভব করে তুললেন, তখনো 'এ গান সত্য অনন্ত গোধূলিলগ্নে'র ছন্দোচ্চারণে ফিরে গিয়েছিলেন যেখানে মরা বিড়ালের ...ছের কানকো ছাইপাঁশ ইত্যাদি অব্যর্থ মনে না হয়ে অলগ্নতায় পড়ে থাকে।[১১] তবে যে-খেয়ালি জাঁ-পল সার্ত্র্ আধুনিক বিশ্বকবিতার জনিতা শার্ল বোদলেয়রকে অগ্রাহ্য ...াসি কবিকুলশিরোমণি বলে আখ্যা দেন শব্দব্রহ্মবাদী স্তেফান মালার্মেকে, সৌন্দর্য তাঁর মতামত মোটামুটি সাধারণের ধারণাই অনুমোদন করে :

Beauty is not monadic. It requires two unities, one visible and the other ... If ever we managed even after relentless effort to penetrate into the ...ence of a work by a single glance, the object would be reduced to its inert ...ility, Beauty would be effaced, and only its ornamentation would ...ain. ১২

বাংলাদেশে উত্তররৈবিক কাব্যচেতনায়ও সৌন্দর্যধারণা মোটামুটি দীর্ঘপোষিত ...কানুনেরই সমর্থন পায় :

...তে পারে কবিতা জীবনের নানারকম সমস্যার উদ্‌ঘাটন; কিন্তু উদ্‌ঘাটন দার্শনিকের মতো ...না; যা উদ্‌ঘাটিত হল তা যে কোনো জঠরের থেকেই হোক আসবে সৌন্দর্যের রূপে, আমার ...নাকে তৃপ্তি দেবে।[১৩]

হৃদয়জীবী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিরুদ্ধে যে-মননশীল ইমানুএল কান্টকে স্থাপন করা ... তাঁর নিকটেও সৌন্দর্য চিত্তেরই অকপট প্রেরণা মাত্র। কিন্তু যদি রবীন্দ্রনাথের ...সুন্দরের সঙ্গে এ-কালের সেতুপ্রণয়ন অসম্ভব বোধ হয়, তা হলেও ক্রোচের সংজ্ঞা ও ...ভরকেন্দ্র অথবা লরেন্সের রক্তের শাশ্বত ধর্মনিযুক্তি একদেশদর্শিতায় তুল্যমূল্য। ..., আরিস্টটল, আনন্দবর্ধন বা ক্রোচের ভাষ্যে সাহিত্যের আনন্দফল অর্থাৎ মীমাংসা ..., কেবল প্রত্যেকের পদ্ধতি স্বতন্ত্র। আবার, ফ্লোবেয়রের মতো রবীন্দ্রনাথ স্বয়ম্ভর ...হাতির দাঁতের কুঠুরিতে নিজেকে রুদ্ধ রাখেন নি, বরঞ্চ আনুপূর্ব জীবনকেই রচনা ...তুলেছিলেন শিল্পময় করে তুলেছিলেন। আসলে সুখদ প্রাচ্যপ্রতিভূ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...সুন্দর কল্যাণের নিরন্তর নির্দ্বন্দ্ব স্নিগ্ধ অনবনমনে চলেছিলেন, যাবতীয় নেতি যেখানে ...এক অপার সদর্থকতায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। এমনকি যাঁরা এই ঘনঘোর রবীন্দ্রনাথের ...থেকে একদিন সবলে নিজেদের ছিনিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁদেরই ..., নাস্তিকেন্দ্রিক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সারা জীবন নিখিল নঞর্থক রাষ্ট্র করার পরেও, ...জীবনে, ১৯৫৬ সালে, লেখেন : 'দিনে দিনে নিজেকে যত চিনছি তত বুঝছি যে ...আমার বৈরী নয়, বহির্জগৎ সুন্দর ও অতিথিবৎসল।' এবং পূর্বপরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ...নন্দ দাশের কবিতার লাইন ক'টিও শূন্যসন্ধান নয় নিশ্চয়, বরং সুস্থির সুরসাম্যেরই ...। অতএব, রবীন্দ্রনাথ, সত্য-সুন্দর-কল্যাণের অপরিক্লান্ত সম্প্রচারক, আশরীর ...করেছিলেন এ-দেশেরই দীর্ঘব্যাপ্ত ইতিহাসচেতনাকে এবং সেই অতিভার বহনের ...মতা একমাত্র তাঁরই ছিল।

...দীপের মিলনে সুন্দরের জন্ম, অথবা কদর্যতার মধ্য থেকে সুন্দরের উন্মেষ—এইসব যখন ...রোপীয় অন্বীক্ষা, তখন, তারসঙ্গে রানি কমলিকার কুৎসিতদর্শন রাজাকে শেষ পর্যন্ত ভালবাসা— ...য় সমান্তর নয়, বরং জীবনের উপরতল থেকে উচ্চারিত বলে বোধ হয়।

Essays in Aesthetics : Jean-Paul Sartre, পৃ. ৭৬।

...কবিতার কথা", 'কবিতার কথা' : জীবনানন্দ দাশ, পৃ. ১২।

৪

রবীন্দ্রকাব্যের উত্তরণপরম্পরায় এই সত্য–সুন্দর–কল্যাণেরই আন্তর ও বহির্লীলা। বাঁশ, রাখাল, রাজা, নৌকো ইত্যাদি কয়েকটি প্রিয় প্রতীকে কবি তাঁর অনুভূতির বিচিত্রিত সা রেখে গেছেন—যা সত্য–সুন্দর–কল্যাণেরই সমর্থন করে। অবশ্যই এই ধ্রুবপদের ভিত কখনো কখনো যে বিপর্যাস রচিত হয় নি, তাও নয়। কৈশোরিক ‘কবি–কাহিনী’র ' দারুণ অশান্তি এ মনুষ্যজগতে,/ রক্তপাত, অত্যাচার, পাপ কোলাহল’ থেকে আশি বছে সেই ক্ষুরধার ‘সভ্যতার সংকট’ পর্যন্ত এই বিসংবাদ প্রত্যক্ষে সক্রিয়। কবিতালো ‘পরিশেষে’ আছে ‘প্রশ্নে’র মতো ক্ষমাহীন কবিতা; পরে সায়ন্তন কবিতাগুচ্ছে আ প্রকট : ‘প্রথম দিনের সূর্য’, ‘দুঃখের আঁধার রাত্রি’, ‘তোমার সৃষ্টির পথ’ প্রভৃতি কবিতা ‘শূন্যতার মূক ব্যথা ব্যাপ্ত করে প্রিয়াহীন ঘর’, আর মরণের অভিজ্ঞতায় উপজাত সে আঁটোসাঁটো আশ্চর্য প্রমিতির কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত না করলে মনে হয় স্নান অসম্পূর্ণ থেকে গেল, সেই অমোঘ অনিবারণ আত্মার ইস্পাতসঙ্কাশ উচ্চারণরেখা :

রূপনারানের কূলে
    জেগে উঠিলাম;
জানিলাম এ জগৎ
    স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
    আপনার রূপ—
চিনিলাম আপনারে
    আঘাতে আঘাতে
            বেদনায় বেদনায়;
    সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম—
    সে কখনো করে না বঞ্চনা।
আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন—
    সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।[১৪]

মনে হয়, যদি মৃত্যু তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে না যেত তা হলে হয়তো তিনি চেতনার নবতর লো আর একবার উত্তীর্ণ হতেন, অন্তত তাঁর শেষ কবিতাগুচ্ছ পড়ে বোধ হয় বহু আবর্তন পুনরাবর্তন–পুনরাবৃত্তির পরে তিনি অপর কোনো ভুবনের প্রবেশদুয়ারে, কোনো নব প্রস্থানে মুখে—এবং সেই হিসেবে মনে হয়,তাঁর একাশি বছর বয়সে মহাপ্রয়াণও অকালমৃত্যু অকালমৃত্যু, কেননা তখনো তাঁর চেতনা জাগ্রত ও অজর, তাঁর ক্ষান্তিহীন জীবন ও সত্যে অন্বীক্ষা তখনো আগন্তুককে স্থান করে দিচ্ছে। তত্রাচ, অতিসরলীকরণের মোহে আমরা যে না ভুলে যাই যে কবিজীবনের এই শেষ বছরেও, ১৯৪১–এও, তাঁর মূলমন্ত্র মৃত্যুর কয়েক মা আগে লেখা ‘মধুময় পৃথিবীর ধূলি’তে : ‘দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে। / সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মূরতি / এই জেনে এ ধূলায় রাখিনু প্রণতি।’

---

১৪ “রূপনারানের কূলে”, ‘শেষ লেখা’ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কবির গদ্যরচনায়ও প্রধানভাবে সত্য-সুন্দর-কল্যাণচেতনাই সর্বত্র সমীরিত; আবার ...একী উদাহরণও আছে। যেমন, 'সে', 'গল্পসল্প', 'খাপছাড়া' প্রভৃতি অস্বভাবী গ্রন্থ, যা ...হিত্যের মুখচ্ছদ এঁটে আমাদের সুমুখে হাজির হয়। রবীন্দ্রকবিতায় যে-মাঙ্গল্যপ্রবণ ...প্রকৃতির সাক্ষাৎ পাই, তাঁর ছোটগল্পে সেই স্নিগ্ধ ও মধুর নিসর্গ নির্বাপিত হয়ে গেছে ... কোথাও; যেমন, 'খোকাবাবুর প্রত্যার্বতনে' মনিবপুত্রের সলিলসমাধির পরে 'পদ্মা ... খলখল ছলছল করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল, যেন সে কিছুই জানে না এবং পৃথিবীর ... সকল সামান্য ঘটনায় মনোযোগ দিতে তাহার যেন এক মুহূর্ত সময় নাই।' এই পর্যায়ে ...য় 'নষ্টনীড়' নামক সেই পারিবারিক ধ্বংসধ্বজ গল্প; কিংবা 'নিশীথে' গল্পের নায়কের ...বিকার; অথবা 'দুরাশা' গল্পের 'কঠোর কঠিন নিষ্ঠুর নির্বিকার' প্রায় মোপাসাঁ-শোভন ...ত, কিংবা 'মধ্যবর্তিনী' গল্পে শৈলবালার মৃত্যুর পর 'নিবারণ নূতন করিয়া পুরাতন ...পত্নীকে ফিরিয়া পাইল বটে, কিন্তু ঠিক মাঝখানে একটি মৃতা বালিকা শুইয়া রহিল, ...কে কেহ লঙ্ঘন করিতে পারিল না।' আরো : নির্বিপ্লব বাংলা উপন্যাসের দেশে ...ক 'চোখের বালি', যেখানে মনের কারখানাঘর থেকে আগুনের জ্বলুনি হাতুড়ির পিটুনি ...তুর মূর্তি রচনা করতে থাকে। অথবা 'মালঞ্চ'র সেই শ্বাসরোধী উপসংহার, যেখানে ...বির মহাকরুণা মুখ ফিরিয়ে রেখেছে :

> ...া দ্রুত আপনি গেল সরে। ভাঙা গলায় বলে উঠল, 'পারলুম না, পারলুম না, দিতে পারব না, পারব না।' বলতে বলতে অস্বাভাবিক জোর এল দেহে—চোখের তারা প্রসারিত হয়ে জ্বলতে লাগল। চেপে ধরলে সরলার হাত, কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হল, বললে, 'জায়গা হবে না তোর রাক্ষসী, জায়গা হবে না। আমি থাকব, থাকব, থাকব।' হঠাৎ ঢিলে সেমিজপরা পাণ্ডুবর্ণ শীর্ণমূর্তি বিছানা ছেড়ে খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে উঠল। অদ্ভুত গলায় বললে, 'পালা পালা পালা এখনি, নইলে দিনে দিনে শেল বিঁধব তোর বুকে, শুকিয়ে ফেলব তোর রক্ত।' বলেই পড়ে গেল মেঝের উপর।[১৫]

তাই, মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের চিত্রাবলি আকস্মিক বা আপতিক কিছু নয়। ...ত দেশী-বিদেশী অনেক সমালোচক রবীন্দ্রছবিতে এমন সব বিষয় ও বস্তুর আবিষ্কার ...চন ও উদ্‌ঘাটন করেছেন, যা তাঁর ঈশ্বরঘনিল মানসসম্বর্গের সঙ্গে যথাযথ মেলে না। এই ...বিষয়বস্তু তাঁর সাহিত্যের অন্তরে-অন্তরে দীর্ঘকাল আবহমান; কেবল যা ছিল সুপ্ত ও ...ন সঞ্চারী, তাঁর অন্তিম রচনা ও চিত্রগুচ্ছে তা ভিতর দুয়ার অনর্গল করে ...য়ে এসেছিল। তাঁর চিত্র যদি ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় 'অবচেতনার বুদবুদ' ..., তা হলে বলা দরকার : এই অবচেতনা তাঁর গল্প-উপন্যাসেও কখনো কখনো ব্যবহৃত ...। এই প্রসঙ্গে এই শতাব্দীরই অপর একজন লেখকচিত্রী ডি. এইচ. লরেন্সের সঙ্গে ...চিত্রাবলির তুলনা চলে। উভয়ের চিত্রাবলিই ঐন্দ্রিয়িক ও চীৎকৃত, সংরক্ত ও আদিম, ... স্বকীয় প্রকাশ ভাস্বর; লরেন্সের নগ্ন নারীপুরুষের পাশে রবীন্দ্রনাথের লিবিডো-শোভন ...মালা স্থাপন করা যায়; কেবল মস্ত পার্থক্য এই : রবীন্দ্রনাথের ছবি তাঁর রচনার পরিপূরক, ... জীবনদৃষ্টিতে এতকাল যা ছিল খানিকটা অবহেলিত তারই দ্যুতিময় লীলায়িত ...খেলা; আর লরেন্সের চিত্রজগৎ তাঁর জীবনচৈতন্যেরই বিস্তার ও প্রসার, তাঁর ...দর্শনেরই চিত্ররূপ।

...এই সমপরিসরে মধুসূদন-উৎখাতে, বঙ্কিম-বিরোধে ও উত্তর-রৈবিক উর্ধ্বশ্বাস ...কতার' পরিহাসে—অন্তত এই তিনবার—অস্বস্থ ও আরক্তিম রবীন্দ্রমুহূর্তগুলি

---

[১৫] 'মালঞ্চ' : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রয়োজনীয় হতে পারে; কিন্তু স্মরণীয় উত্তরকালে যেমন তিনি মধুসূদনকে আবার তাঁর প্রাপ্য আসনে বসিয়ে দিয়েছিলেন, যেমন বঙ্কিমকে বরণ করে নিয়েছিলেন, তেমনি সদ্যবিকাশিত আধুনিকদেরও পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন এবং প্রায় প্রত্যেকটি তৎকালীন তরুণের রচনাকে সংবর্ধনা ও আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন। তিনিই বাংলা আধুনিক কবিতার জনকপুরুষ মধুসূদন দত্তকে বলেছিলেন 'নির্বীজ', আজ তিরিশের সর্বস্বীকৃত আধুনিকতাকে সেদিন বলেছিলেন 'গুলি–পাকানো ল্যাঙ্গট–পরা ধুলো–মাখা আধুনিকতা', এবং

> কোনোখানেই মিথ্যা সত্য হয় না; শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু বলিলেও হয় না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও হয় না।... কঠোর সত্যাচরণ করিয়া আমাদের এই বঙ্গসমাজের কি এতই অহিত হইতেছে যে, অসাধারণ প্রতিভা আসিয়া বাঙ্গালীর হৃদয় হইতেই সেই সত্যের মূল শিথিল করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন? কিন্তু হায়, অসাধারণ প্রতিভা ইচ্ছা করিলে স্বদেশের উন্নতির মূল শিথিল করিতে পারেন, কিন্তু সত্যের মূল শিথিল করিতে পারেন না।[১৬]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই ক্রুদ্ধ অবস্থানের পরেই তিরিশের সৃষ্টিশীল সমালোচকদের রবীন্দ্রবিরোধের একটি পঞ্জি তৈরি করা যাক :

১. দেশ থেকে যে–সব পত্র ও পত্রিকা পাই সে–সব পড়ে অস্পষ্টরকম বুঝতে পারি যে দুরকম কবিওয়ালা কথার কুস্তি লড়ছেন।...সবচেয়ে আমাকে লজ্জিত করেছে, রবীন্দ্রনাথও এর মধ্যে আছেন।....অতি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অতি আধুনিকদের জয় হতে বাধ্য।[১৭]

২. কল্লোলের লেখকেরা মনে করেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ অনেক সার্থক কবিতা লিখেছেন কিন্তু তিনি যাবতীয় উল্লেখ্য বিষয় নিয়ে কবিতা লেখবার প্রয়োজন মনে করেন না—যদিও তাঁর কোনো–কোনো কবিতায় ইতিহাসের বিরাট জটিলতা প্রতিফলিত হয়েছে বলে মনে হয়; তিনি ভারত ও ইউরোপের অনেক জ্ঞাত ও অনেকের মতে শাশ্বত বিষয় নিয়ে সিদ্ধি লাভ করেছেন, কিন্তু জ্ঞান ও অন্তর্জ্ঞানের নানারকম সঙ্কেত রয়েছে যা তিনি ধারণা করতে পারেন নি বা করতে চান নি।[১৮]

৩. কিন্তু সে–সমস্ত সত্ত্বেও হয়তো এমন বিশ্বাস যুক্তিযুক্ত যে রবীন্দ্রনাথ কালের আনুকূল্যে একেবারে বঞ্চিত নন; এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রে আমাদের আস্থা থাক বা না থাক, আমরা মানতে বাধ্য যে মহাকবির আবির্ভাব লগ্নসাপেক্ষ। অর্থাৎ সকল প্রকারের মহত্ত্বই সুযোগ খোঁজে; এবং সাহিত্যিক মহত্ত্ব–প্রকাশের সুসময় ভাষার শৈশবাবস্থা।[১৯]

৪. তবু মোটামুটি বলতে হবে যে তাঁর নক্ষত্রবিহারী প্রতিভা বাংলার রসালো মাটিতে মানুষ আমাদের প্রাত্যহিক বাস্তবতায় বিরাজমান থেকেও বহু ঊর্ধ্বে স্বয়ংসম্পূর্ণ। সেখানে মধুসূদন বা দীনবন্ধু বরং আমাদের চেনা অগ্রজ।[২০]

কিন্তু এই সবই প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ার প্রতিলিখন, ক্রমশ এই সব লেখকেরা রবীন্দ্রমাহাত্ম্য আমূল টের পেয়েছিলেন, অঙ্গীকার করে নিয়েছিলেন। আর রবীন্দ্রনাথ যেন নিজেকে দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলেছিলেন, যেন কবি স্বয়ং তাঁর আশি বছরের জীবন উন্মোচন থেকে বিংশ শতকে আচ্ছিন্ন করে নিয়েছেন : একদিকে লোকশিক্ষা, সমাজহিত, দেশোদ্ধার

---

১৬ 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (চতুর্থ খণ্ড) : সুকুমার সেন, ৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।
১৭ "মনে মনে", 'জীয়নকাটি' : অন্নদাশঙ্কর রায়।
১৮ "অসমাপ্ত আলোচনা", 'কবিতার কথা' : জীবনানন্দ দাশ, পৃ. ১১২।
১৯ "ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ", 'কুলায় ও কালপুরুষ' : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, পৃ. ৪৪।
২০ "বাংলা সাহিত্যে প্রগতি", 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' : বিষ্ণু দে, পৃ. ১৪।

মানবের কল্যাণ ভাবনায় বিরতিহীন ক্ষরণ করে চলেছে, অপরদিকে কেবলমাত্র প্রাতিস্বিক উপলব্ধি ও অস্মিতার নিগূঢ় নিঃসরণ : এই আয়তনযুগ সর্বদাই পরস্পরের দিকে পিঠ ফিরিয়ে থাকে নি, অনেক সময়ে অর্ধনারীশ্বর। 'হায়রে, সমাজ-দাঁড়ের পাখি!' এই খেদোক্তির পাশেই সমাজমর্মী রবীন্দ্রনাথের দেশ-, সমাজ-ও রাষ্ট্র-চেতন সত্যসংবৃত রচনারাশি প্রবাহিত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশেই নয়, সমগ্রভাবে পৃথিবীই ছিল স্বস্থ ও সুন্দর; লরেন্স তাঁর কোনো-এক উপন্যাসে লিখেছিলেন : '১৯১৫-য় পুরোনো পৃথিবী শেষ হয়ে গেল', আর, একজন বাচংযত লেখক, ই. এম. ফস্টর-এর কাছে নবোদ্ভূত পৃথিবী এ-রকম বহুলাঙ্গ মনে হয়েছিল যে তিনি এই নব্য বিশ্ব-পৃথিবীর পটভূমিকায় তাঁর পক্ষে আর উপন্যাস প্রণয়ন সম্ভব নয়—ঘোষণা করেছিলেন। সেই নবাগত নিঃসহ জটিলতাকে আত্মস্থেয় রবীন্দ্রনাথ ধারণ করেছিলেন, যেখানে 'পায়ের তলায় কেবল পড়িয়া আছে একটা ঘা' ', তা-ও, আঁকাবাঁকাভাবে উপরের কোনো কোনো ছত্রে তা রেখায়িত হয়েছে, যার জন্যে এমনকি কখনো বা তাঁর সেই আলোকবোধন—সত্য-সুন্দর-কল্যাণের ধ্রুবা—নির্জিত হয়েছে তাঁরই হাতে। এমনিভাবে, দর্শনের ভাষায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'অন্তর্বৃত' ও 'বহির্বৃত' একাধারে এই সোচ্চার দুই প্রদেশে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

৫

বহুব্যবহৃত-ব্যবহৃত-ব্যবহৃত হয়েও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে যে-কথাটি অস্খলিত দাঁড়িয়ে থাকে, তা হচ্ছে এই যে, রবীন্দ্রনাথ মূলত একজন কবি;—কিন্তু তিনি মহাকবিতা রচনা করেন নি, তাঁর বাণীর ললিতা উদ্গীত হয়েছে টুকরো টুকরো প্রাণবিক মনস্বিতায় ভরে উঠে; তাই তো গল্পে উপন্যাসে এমনকি ডস্টয়েভস্কির মতো অবচ্ছিন্ন আশ্রয়ভূমি থেকে তাঁর চরিত্রপাত্র উদ্ভূত হলেও ডস্টয়েভস্কি ও তাঁর চরিত্রপাত্র সম্পূর্ণ উলটো পদ্ধতিতে এক অমরতার গন্তব্য সন্ধান করে ফেরে; তাই তো তাঁর প্রবন্ধমালা কোনোরকম 'সাহিত্যিক' প্রচল মানে না; আর বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান নাট্য-রচয়িতা হয়েও রঙ্গমঞ্চে তাঁর নাটক কিছুতেই জমে না।

মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক অভিজাতমন্যতার দেদীপ্যমান ফাঁপরে পড়ে গিয়েছিলেন, যেখানে তাঁর মধ্য-ভিক্টোরিয়ান পর্বের সুরুচি ও আদর্শ, তাঁর উপনিষদ্-উদ্ভোজ মানস তাঁকে বাঁচাতে পারত না, যা পারত এবং পেরেছিল তা হচ্ছে আগন্তুক আধুনিকতার সঙ্গে তাঁর আলিঙ্গন, প্রাক্তন সুসীম সাহিত্যচেতনার বুর্জোয়াপনা উৎখাত করে দিব্যোজ্জ্বল ক্রন্দসীর নিচে ধুলো-মাখা মানুষের ও মানসের সঙ্গে তাঁর নিজেকে স্থাপন করার শক্তি।

এবং সত্য-সুন্দর-কল্যাণকেও তিনি দেখেছিলেন একজন কবিরই দূর ও আভিজাতিক কল্পভূমি থেকে, যেখানে জীবনযাপনের আবশ্যিক বাস্তবতার ছন্দ চাষাড়ে মনে হয়, যেখানে প্রেমের শর্ত বাদে আর সব অনাবশ্যকের অবলেশ হয়ে যায়, যেখানে জীবনের ভার ঝরে গিয়ে স্ফূর্তির ধারাবাহিক দীপাবলি জ্বলে ওঠে কেবল শিল্পাগ্নিতে। কিন্তু সুখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের কবিসংবিৎ ও কবিকৃতিতে খানিকটা বিসংগতি আছে —তাঁর রাশি রাশি রচনায় তাঁর ধারণার আলোক তিনি পরিবেশন করেছেন, আবার কিছু কিছু রচনায় এক অস্থিত অন্তঃরণ—আমরা তাঁর এই সত্য-সুন্দর-কল্যাণ ধারণার সঙ্গে তাঁর রচনার আলোকে সংগতি ও বিসংগতি উপরে নিবিষ্ট করে দিয়েছি। সত্য সম্পর্কে তাঁর ঈষৎ-অসম্পূর্ণ ধারণা, সুন্দর সম্বন্ধে তাঁর অভিজাত মনোভাব ও তাঁর দেশসমাজের প্রয়োজনানুগ কল্যাণচিন্তা

সর্বাংশে তাঁর শিল্পবিন্যাসে স্বাক্ষরিত ও অনুসৃত হয় নি। তাঁর অর্জিত তত্ত্বের সুমিত চৌ ডিঙিয়ে তাঁর শিল্প বৃহৎ জীবন ও নীলিমা-ক্রান্তির উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে,—যেমন অগ্রগা হয়ে গিয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের পরিধি পেরিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা, যেমন গিয়েছিল এগিয়ে কবিদের উদ্দেশে প্লেটোর কবিতাক্রান্ত বক্রোক্তি। অন্তর ও বহির্বাস্তবতাকে আকর্ষণ করে রবীন্দ্রনাথের সত্যসংবিৎ পূর্ণায়ত হয়ে অভিজাত মনোভাব ঝরিয়ে যা পরুষ ও উৎকট বিভিন্ন শিল্পমাধ্যমে তার স্থান করে দিয়ে তাঁর সৌন্দর্যচেতনা নব্যতন্ত্রী আধুনিকতাতে সৃষ্ট ও উচ্ছিন্ন করে দিয়ে গেছে; আর এক জন উইলিয়ম আর্চর যেখানে রিরংসার নগ্নকঠিন প্রকাশলীলা দেখেছেন, তা এবং 'নষ্টনীড়' বা 'মালঞ্চ'র মতো রচনা নিশ্চয় নিসর্গসুন্দরীর বন্দনাগাথায় বা মানবকল্যাণে প্রণীত হয় নি। এইভাবে তাঁর নভোচারী অপিচ শিল্পময় সত্য-সুন্দর কল্যাণের ত্রিবেণী নিটোল সুগোল ও স্বয়ম্পূর্ণ হয়েছে। "No one is cynic", এমনকি সার্ত্র র মুখে যখন এই কথা শুনি, তখন মনে হয়, নাস্তি উর্ধ্বশ্বাস আধুনিকতার ভিড়বিলোল অতিবিষম নবীন নির্মোচন মাত্র। অতঃপর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্প-সাহিত্যতত্ত্বের এই বাহুবিলম্বিত পটশোভাভূমিতে, মনে হয়, আলবেয়ার কাম্যুর এক আর্ষোক্তি নববিন্যাসে মর্যাদাবান করে নেওয়া যায় :

'No artist telerates reality', says Nietzsche. That is true, but no artist can ignore reality.'[২১]

কাজী মোতাহার হোসেন

রবীন্দ্রসঙ্গীত

রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রকৃত মর্যাদা বুঝতে হলে সমসাময়িক সঙ্গীতের গতিপ্রকৃতির পটভূমিতে ফেলেই দেখতে হয়। রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীত এবং তার বিশিষ্ট সুর উনবিংশ শতাব্দীতে খুব প্রচলিত ছিল, এখনো রয়েছে। তবু স্বীকার করতে হয়, বর্তমানে এর জনপ্রিয়তা আগের তুলনায় অনেক হ্রাস পেয়েছে। এর প্রধান কারণ, ধর্মসঙ্গীতের ধারা এখন পৌরাণিক দেবদেবী-মুখী নেই। সৃষ্টিকর্তার ধারণাতেই একটা আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। সৃষ্টিকর্তা এখন কল্পলোকবিহারী হৃদয়-দেবতা, যার সঙ্গে মানুষের সহজতর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। নিধুবাবুর টপ্পাজাতীয় প্রণয়সঙ্গীতও বর্তমানে কতকটা অবহেলিত। নিধুবাবুর একটি গান এই :

নয়নেরে দোষ কেন?
আঁখি কি মজাতে পারে নাহ'লে মনমিলন।
আঁখি যত জনে হেরে, সবাই কি আর মনে ধরে
সেই যাকে মনে করে, সেই তার মনোরঞ্জন।

প্রাচীনকালের অনেক গানের মতো এই সুন্দর গানটাতেও যেন একটা সাধারণ তত্ত্বকথা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তবে টপ্পার তানপ্রধান সুরের মনোহারিত্বের জন্য বিশেষ বিশেষ মহলে এর আদর আছে।

দাশরথি রায়ের পাঁচালী এক সময় শহর-পল্লী মাৎ করে রেখেছিল, এখন আর তার সে কদর নেই। এগুলোর বিষয়বস্তু ছিল রামলীলা, রাধাকৃষ্ণের লীলা ইত্যাদি। এসব গানে দ্ব্যর্থ প্রয়োগের বাহুল্য দেখা যায়; কিন্তু এযুগে ওসব অনেকটা স্থূল ও শ্রুতিকটু বলে গণ্য করা হয়। যেমন :

বৃন্দেগো, কেশবের বিচ্ছেদ কে সবে প্রাণে।
না শুনে গান বাঁশরীর, না হেরে শ্যাম-শরীর,
আমার সব রূপ যে, সব আঁধার সেই প্রাণ-কেশব বিনে!
মরে কি শরীর কিশোরীর, সে গোবিন্দ জানে॥

শ্রীধর কথকের গান এখনো মাঝে মাঝে শোনা যায়। সে বোধ হয় এর মানবীয় গুণের জন্য। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক :

ভালবাসি ব'লে কিরে আসিতে ভালবাস না।
আপন করম-দোষে না পুরিল বাসনা।।

সতত আমার মন, তব রূপ করে ধ্যান,
অধীনে রেখেছ কেবল ভাবিতে ভব ভাবনা।।

এখানে অতিশয় প্রত্যক্ষ বা স্থূলভাবে প্রিয়তমকে অনুযোগ করা হচ্ছে—ভালবাসার প্রতিদান পাওয়া যায় নি বলে। তবু রেকর্ড-করা সুরে কারুকার্যের জন্যও এ গান বেঁচে আছে।

গোবিন্দ অধিকারী, মধুকান ও রূপচাঁদ পক্ষী সম্বন্ধেও মোটামুটি উপরোক্ত মন্তব্য করা যায়। সাতু বাবু ও গিরিশ ঘোষের দু-একটা গান বর্তমান যুগে উৎরাবার মতো বলে মনে হয়। যেমন :

নয়নে আমার বিধি কেন পলক দিয়েছে
দরশন সুখে আমায় বিমুখ করেছে।
মন যারে সদা চায় নয়ন বিবাদী তায়
সুখ সাধে একি দায়, প্রমাদ ঘটেছে।। [সাতু বাবু]

আর :

হায়রে হায় প্রেমিক যে জন, সে কেন চায় ভালবাসা।
দিলে নিলে বদল পেলে, ফুরিয়ে গেল প্রেমপিয়াসা।।
প্রেমে যায় ভালবাসি, পরাব না পরব ফাঁসি,
চায় না প্রেম কেনাবেচা, ভালবেসে পুরায় আশা।। [গিরিশচন্দ্র ঘোষ]

কৃষ্ণমোহন মজুমদারের :

তুমি কার কে তোমার কারে বলরে আপন
মহামায়া নিদ্রাবশে দেখাচ্ছে স্বপন।

আর, অমৃতলাল গুপ্তের :

দিবা অবসান হল কি কর বসিয়া মন
উত্তরিতে ভবনদী করেছ কি আয়োজন।

আমরাও ছেলেবেলায় শুনেছি। এগুলো তত্ত্বপ্রধান হলেও এর ভিতর এমন একটা চিরন্তন সত্যের জাদুস্পর্শ রয়েছে যে, এখনো অনেক ভক্তের প্রাণ উদাস করে দেয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের দেশপ্রেমমূলক গান—'ধনধান্যে পুষ্পভরা', আর হাসির গান 'আমরা বিলাতফেরতা ক'ভাই', এবং আরো অনেক গান এখনো আপন উৎকর্ষবলেই চালু আছে। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'ভালবাসে তাই ভালবাসিতে আসে, আমি যে বেসেছি ভাল, সে বাসা সে ভালবাসে', আর অতুলকৃষ্ণ মিত্রের '(ও তায়) সেধে শুধু কেঁদে সারা হই, পায়ে ধরি যত তত পায়ে ঠেলা রই', কিংবা, ''আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল, সকলি ফুরায়ে যায় মা' ইত্যাদি গান এখনো একেবারে পুরোনো বলে বর্জিত হয় নি।

মুন্সী বেলায়েৎ হোসেনের :

একে আমার জীর্ণ তরী প্রেমনদীতে তুফান ভারী
কেমনে যাইব পারে এই ভয়েতে ভেবে মরি।

এ ধরনের গান এখনো পল্লীগ্রামে শুনতে পাওয়া যায়। রামলাল দাস দত্তের 'তনয়ে তার তারেনি', 'বারে বারে যে দুখ দিয়েছ, দিতেছ তারা' এখনো দিব্যি বেঁচে আছে, বোধহয় সহজ বাণীর গুণে আর গ্রামোফোন রেকর্ডের কল্যাণে। রজনীকান্ত সেনের 'পাতকী বলিয়া কি গো পায়ে ঠেলা ভালো হয়', 'তোমারি দেওয়া প্রাণে তোমার দেওয়া দুখ, তোমারি দেওয়া বুকে তোমারি অনুভব', 'সেথা আমি কি গাহিব গান, যেথা গভীর ওঙ্কারে সাম-ঝঙ্কারে

কাঁপিত দূর বিমান' ইত্যাদি গান বিশ-ত্রিশ বছর আগেও শুনেছি,—এখন আর শুনতে পাই নে। এসব দেখে মনে হয় গানের স্থায়িত্ব নির্ভর করে কতকটা অন্তর্নিহিত গুণের ওপর, আর কতকটা রেকর্ড বা অন্যবিধ প্রচারণার মারফতে।

রবীন্দ্রনাথের পরিবারে সঙ্গীতচর্চার বিশেষ চল ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দে লো সখি দে পরায়ে চুলে, সাধের বকুল হার', আর গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গাওহে তাঁহার নাম রচিত যার বিশ্বধাম' এখন পর্যন্ত পুরোনো হয় নি। বোধহয় মার্জিত ভাষা আর ভাব এবং ব্রহ্মসঙ্গীতের প্রচলন এগুলোকে আরো অনেক দিন বাঁচিয়ে রাখবে।

এ পর্যন্ত নমুনাসূত্রে যা দেখা গেল, তার থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে রবীন্দ্রপূর্বকালে গানের বিষয়বস্তু অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। পৌরাণিক দেবদেবীর বন্দনা ও লীলা-বর্ণনা, তত্ত্বকথা, সংসারের অনিত্যতা, ভবনদী পার হওয়ার পাথেয়, আর কবি তরজা প্রভৃতি উপলক্ষে বাক্‌যুদ্ধই ছিল প্রধান বিষয়। তবে মাঝে মাঝে টপ্পা, পাঁচালি ও রঙ্গমঞ্চের মাধ্যমে মানবীয় প্রেম আর দেশপ্রেমের গানও প্রচলিত ছিল। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রশস্তি, সামাজিক ঘটনা বা নব্য আচার-ব্যবহার সম্পর্কিত বিদ্রূপাত্মক গানও বেশ কতকগুলো রচিত হয়। এ পর্যায়ে রূপচাঁদ পক্ষী, প্যারিমোহন কবিরত্ন, মনোমোহন বসু, অমৃতলাল বসু প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে জন-সমাজের রুচির পরিবর্তন এবং মূল্যবোধের যথেষ্ট বিবর্তন ঘটেছে। এই বিবর্তনে বৈদেশিক সুরের মিশ্রণ ব্যাপারে এবং রুচির দিক দিয়ে ডি. এল. রায়ের দান সামান্য নয়। তবু একথা অসঙ্কোচে বলা যায় যে প্রধানত ঠাকুরবাড়ির সাঙ্গীতিক পরিবেশ এবং ব্রহ্ম-সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের অবদানই সামাজিক ও সাহিত্যিক রুচি উন্নয়নে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আগেকার দিনে সঙ্গীতের সঙ্গে বাইজি, বাগানবাড়ি, বারবণিতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এর বাইরে যে সঙ্গীত তা হয়তো, কবি, তরজা, ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আজ যাকে পারিবারিক সঙ্গীত বলি, অর্থাৎ মাতাপিতা, পুত্রকন্যা সবাই মিলে এক সঙ্গে পারিবারিক জলসায় যে সঙ্গীত, নৃত্য, যন্ত্রবাদন উপভোগ করে থাকি, তা বলতে গেলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রভাবেই সম্ভব হয়েছে। নানা উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন ঋতুপ্রকৃতির জন্য অজস্র সঙ্গীত রচনা করে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত উপভোগের ক্ষেত্র প্রসারিত করেছেন। অবশ্য ঋতুসঙ্গীতের প্রতিকল্প 'বারমাস্যা' আমাদের গ্রামে গ্রামে প্রচলিত ছিল; কিন্তু সে গান গৃহপ্রাঙ্গণে হত না, তা হত বাইরে, বিশেষ করে ধানের ক্ষেতে, নিড়ানির সময় বা ধান কাটার সময়। রবীন্দ্রনাথ গানকে বাইরে থেকে গৃহস্থের ঘরের কোণে ডেকে এনে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

এইবার বিভিন্ন পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের রচিত গীতের কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া গেল।

ওহে সুন্দর, মম গৃহে আজি পরমোৎসব রাতি
রেখেছি কনক-মন্দিরে কমলাসন পাতি।
তুমি এসো হৃদে এথা, হৃদি-বল্লভ হৃদয়েশ
মম অশ্রু-নেত্রে কর বরিষণ করুণ হাস্য ভাতি।
তব কণ্ঠে দিব মালা, দিব চরণে ফুলডালা
আমি সকল কুঞ্জ কানন ফিরি এনেছি যুথী জাতি
তব পদতল-লীনা আমি বাজাব স্বর্ণবীণা
বরণ করিয়া লব তোমারে মম মানস-সাথী॥

এটা প্রেমসঙ্গীত, মানস–সাথীর উদ্দেশে লেখা; মানস–সাথী সুন্দর ও হৃদিবল্লভ। এটা কি ভগবৎ–প্রেমের গীত? অসম্ভব নয়। উৎসব কনক–মন্দির, কমলাসন, স্বর্ণবীণা প্রভৃতি পদ বীণাবাদিনী বাগ্‌দেবীর প্রতি ইঙ্গিত করতে পারে, কিন্তু 'হৃদিবল্লভ' পদটা এর সাথে খাপ খেতে চায় না। তবু লীলাপরায়ণ বা লীলাপরায়ণা দেবদেবী কখনো পুরুষ কখনো নারীরূপে প্রকাশ পেতে পারেন—অন্তত কাব্যিক প্রশ্রয় (poetic licence) স্বীকার করে গানটিকে ভগবৎ–গীতি বলে চালিয়ে দিলে হয়তো বহু লোকের সমর্থন পাওয়া যেতে পারে। আবার মানবীয় প্রেম বলে চালিয়ে দেওয়াতেও বোধহয় কারো আপত্তি হবে না। তখন 'কনক-মন্দির কমলাসন'–এর একটু ভিন্ন অর্থ হবে; নায়িকাই তখন পুষ্প–আহরণকারিণী পূজারিণী, প্রেমময়ী, বীণাবাদিনী কনকবরণী কন্যারূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। আমি তো এই দ্বিতীয় অর্থই অধিক সঙ্গত মনে করি। সে যাই হোক, সন্দেহের মধ্যে থাকা ভালো। এক এক জন এক এক অর্থ নিতে পারেন। হয়তো ভাষার মধ্যে একটু প্রচ্ছন্নতার আমেজ দিয়ে উভয় দিকই খোলা রাখা হয়েছে! এর ফলে গানের আবেদন দ্বিগুণ বিস্তৃত হয়ে গেছে। প্রেমের ধর্মই এই যে সব বুঝে ফেললে তো ফুরিয়েই গেল, কিছু স্পষ্ট আর কিছু গোপন থাকলেই প্রেমের মাদকতা বজায় থাকে।

ভাষার দিক দিয়েও গানটিতে দ্ব্যর্থ অলঙ্কারের বহুল প্রয়োগ নাই; একবার মাত্র 'হৃদে এসো' আর 'হৃদয়েশ' সদৃশ ধ্বনির ব্যবহার পীড়াদায়ক তো নয়ই বরং অতীব মনোহর হয়েছে। পরিমিত অলঙ্কারের এই গুণ; তা ছাড়া এই কবিতা পড়ে বা গানটি শুনে মানসপটে যে চিত্র উদিত হয় তার মার্জিত রূপ বিশেষ লক্ষণীয়।

সংসার যবে মন কেড়ে লয় জাগেনা যখন প্রাণ
তখন হে নাথ প্রণমি তোমায় গাহি বসে তব গান।
অন্তরযামী ক্ষমো সে আমার শূন্য প্রাণের বৃথা উপহার
পুষ্পবিহীন পূজার আয়োজন ভক্তিবিহীন তান।
ডাকি তবনাম শুষ্ক কণ্ঠে আশা করি প্রাণপণে
নিবিড় প্রেমের সরস বরষা যদি নেমে আসে মনে
সহসা একদা আপনা হইতে ভার দিবে তুমি তোমার অমৃতে
এই ভরসায় করি পদতলে শুষ্ক হৃদয় দান।।

এই গানটি নিঃসংশয়ে ভগবৎ–প্রেমের। এতে হা হুতাশ নেই, 'অকৃতি', 'অধম', 'হীনমতি', 'পামর' ইত্যাকার বিশেষণ প্রয়োগে আত্মধিক্কার নেই, বৈতরণী পার হবার আকাঙ্ক্ষাও নেই—আছে হৃদয়দৈন্যের অকৃত্রিম স্বীকৃতি, প্রেমবন্যার জোয়ারে অবগাহন করার আকুতি, আর অন্তর্যামীর অপ্রত্যাশিত দানের আশায় তাঁর চরণে শরণাগতি। কেমন সরল, মর্মস্পর্শী গীত,—অন্তর্যামীর মন গলাবার উপযোগী বটে।

যদি বারণ কর তবে গাহিব না, (যদি) শরম লাগে মুখে চাহিব না।।
(যদি) বিরলে মালা গাঁথা সহসা পায় বাধা
তোমার ফুলবনে যাইব না।
(যদি) থমকি থেমে যাও পথমাঝে (আমি) চমকি চলে যাব অন্য কাজে
(যদি) তোমার নদীকূলে ভুলিয়া ঢেউ তুলে
আমার তরীখানি বাহিব না।

আশা করি, এই গানটিকে কেউ ঐশীপ্রেমের দিকে টানতে চাইবেন না। তবে, সম্ভাবনা যে একেবারে নেই তাও বলতে পারি নে। রাধাকৃষ্ণের লীলার দোহাই দিয়ে এমন একটা

পরিবেশের কল্পনা হয়তো করা যেতে পারে, তবে শ্রীকৃষ্ণকে এমন নির্লিপ্ত প্রেমিকরূপে কল্পনা করা একটু কষ্টকর বই কি। গানে মানবীয় প্রেমের অভিমানবাণী বা প্রিয়তমার সম্ভাব্য সুখের পথে কাঁটা হয়ে না থাকার সংকল্প প্রবলভাবে (অথচ মধুরভাবে) প্রকাশ পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে নায়কের গভীর প্রেমের আভাসও যে নায়িকার হৃদয়ঙ্গম হবে না তাও বিশ্বাস করা যায় না। মার্জিতরুচি নায়ক সচরাচর মার্জিতরুচি নায়িকার প্রতিই আকৃষ্ট হয়ে থাকে। কাজেই আশা করা যায়, নায়কের অভিমানের মর্যাদা রক্ষা হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। রবীন্দ্রপূর্ব প্রেমসঙ্গীত পর্যালোচনা করে বোধহয় হাজার-করা এই পর্যায়ের বাণীসমৃদ্ধ ও সুরুচিসম্পন্ন গান খুঁজে পাওয়া যাবে না। রবীন্দ্রনাথের প্রেমসঙ্গীত কাব্য ও সুরসম্পদে এত বৈচিত্র্যপূর্ণ যে তার প্রধান প্রধান ভাব ও উদ্ধৃতি দিয়ে দেখানো একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধের কলেবরে কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই সে অসম্ভব চেষ্টা থেকে নিরস্ত হলাম।

শুনলো শুনলো বালিকা রাখ কুসুম মালিকা
কুঞ্জে কুঞ্জে ফেরনু সখি শ্যামচন্দ্র নাহিরে।
দুলই কুসুম মঞ্জুরী ভ্রমরা ফিরই গুঞ্জরি
অলস যমুনা বহরি যায় ললিত গীত গাহিরে।

গানটি বৈষ্ণব গীতের ছাঁচে রচিত, ভানুসিংহের পদাবলীর অন্তর্গত। এমন প্রকৃতির সঙ্গে মিশ খাওয়া শান্ত প্রেমের নমুনা সুবোধ্য বহির্বঙ্গীয় ভাষায় খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন। দুর্গাদাস লাহিড়ীর 'বাঙ্গালীর গান' থেকে নিধুবাবুর একটি গান [রাধিকা গোঁসাই কর্তৃক রেকর্ডকৃত] ভাবের প্রশান্তিতে সমপর্যায়ের বলে মনে হয়। যতদূর মনে আছে, তার কয়েকটা চরণ উদ্ধৃত করছি :

সোহাগে মৃণাল-ভুজে বাঁধিল শ্রীরাধা শ্যামে।
চপলা অচলা হল, নীলাচলে মিশাইল
গোপনে গোপিনীকুল, সে মাধুরী নেহারিল,
শোভিল কদম্বফুল শ্রীরাধাশ্যাম সমাগমে ।।

নিধুবাবু নিজে হিন্দি গানে ওস্তাদ ছিলেন। হয়তো কোনো হিন্দি গানের সুর ও ভাব এই গানে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। তাই যদি হয়, তবে রবীন্দ্রনাথের বাংলা-ভাঙা মৈথিলীর পাশে নিধুবাবুর হিন্দি বা ব্রজবুলি ভাঙা বাংলা গানকে দাঁড় করানো যেতে পারে। গানের রাজ্যে এই ওস্তাদে ওস্তাদে মোকাবিলা ঘটানোতে হয়তো এদের কারোই অখুশি হবার কারণ নেই। রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব দোহাবলীর অন্তর্নিহিত ভাবরস আত্মস্থ করে কেমন অবলীলাক্রমে সঙ্গীত রচনা করতে পেরেছেন তারই নমুনার নিদর্শন স্বরূপ এ গানটা উদ্ধৃত করা হয়েছে।

'জন-গণ-মন-অধিনায়ক জয় হে' কিংবা 'হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে' এই তুলনাহীন গান দুটোর পূর্ণ উদ্ধৃতি বা এর ওপর টীকা-টিপ্পনীর কোনো প্রয়োজন নেই। 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' এটাও রামপ্রসাদী সুরের একটি সুপরিচিত 'স্বদেশী গান'। দেশবাসী সকলে পরস্পর মিলে-মিশে একই উদ্দেশে একত্র সম্মিলিত হলে যে আনন্দ উপচে ওঠে এ-গানটিতে তাই প্রকাশ করা হয়েছে। 'অয়ি ভুবনমোহিনী' বিখ্যাত দেশপ্রেমের গান। এখানে দেশের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য আর পিতা-পিতামহদের মানস-সম্পদের ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করে, তার থেকে প্রেরণালাভ করার কথা বলা হয়েছে।

ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা ॥

এ গানটাতে বলা হয়েছে দেশের প্রকৃতি আমাদের হৃদয়ে তার ছাপ মুদ্রিত করে দিয়েছে;

দেশের উপাদান, ক্ষেতের শস্য আমাদের দেহের গঠনে, পোষণে নিয়োজিত হয়েছে; এসব সত্ত্বেও এই দেশের দুর্দশা মোচনে আমাদের অচেষ্টা যে নিতান্ত বেদনাদায়ক তাই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

উল্লিখিত সঙ্গীতগুলো থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রসঙ্গীতে শুধু প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ নয়, দেশের মানুষ ও বিশ্বের মানুষের মধ্যে আদান-প্রদানমূলক উপযুক্ত সম্পর্কস্থাপনের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এ হিসেবে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'ধনধান্যে পুষ্পভরা' কিংবা 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ' অথবা বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' দেশাত্মবোধক গান হিসেবে উপাদেয় হলেও এগুলোকে সর্বৈবভাবে একদেশদর্শী বলা যেতে পরে। এগুলোর দৃষ্টি আত্মনিবদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ পরিধিতে সীমাবদ্ধ। এর মধ্যে বৃহত্তর জগতের সঙ্গে যোগাযাগ করার কথা নেই, অন্যকে টেনে আনার এবং আপন করার কোনো কল্পনা নেই, ঐতিহাসিক দূরদৃষ্টিরও কোনো পরিচয় মেলে না। অবশ্য মানসধর্ম ও কালধর্মের জন্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বঙ্কিমের ও দ্বিজেন্দ্রলালের এই পার্থক্য রয়েছে। সে যা হোক রবীন্দ্রনাথ যে এঁদের চেয়ে এত ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছেন এজন্য তাঁর ঋষিতুল্য দূরদৃষ্টি আর অনন্যসাধারণ মনীষার প্রশংসা না করে পারা যায় না।

বৈশাখ, হে মৌনী তাপস

রিমঝিম ঘন ঘনরে বরিষে
গগনে ঘনঘটা, শিহরে তরুলতা, ময়ূর ময়ূরী নাচিছে হরষে।
দিশিদিশি সচকিত, দামিনী চমকিত,
চমকি উঠিছে হরিণী তরাসে॥

আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ

হায় হেমন্ত লক্ষ্মী

শীতের হাওয়ায় লাগলো নাচন

বসন্ত জাগ্রত দ্বারে, তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে
করো না বিড়ম্বিত তারে।

এগুলোতে বছরে বিভিন্ন ঋতু ও প্রাকৃতিক শোভার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে নিবিড় যোগ অনুভব করেছেন তাই প্রকাশ পেয়েছে কাব্যসঙ্গীতে। তাঁর ঋতুসঙ্গীতের মধ্যে বর্ষা-সঙ্গীতই সংখ্যায় অধিক। তারপর বসন্ত, শরৎ, গ্রীষ্ম, শীত, হেমন্ত। অনেকগুলোই একাধারে গান ও কবিতা। এটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশেষত্ব। তিনি বাণীসম্পদকে গানের কর্তবের মধ্যে ডুবিয়ে দিতে চান নি বা তবলা মৃদঙ্গের চাঁটির আঘাতে পর্যুদস্ত করতে চান নি। বরং এ সবের মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করে পারস্পরিক শোভাবর্ধন করতে চেয়েছেন। এ বিশেষত্ব প্রথমে ওস্তাদরা স্বীকার করতে চান নি; পরে জনসমর্থনের চাপে পড়ে তার সার্থক পরীক্ষণকে শুধু স্বীকৃতি কেন ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরি, টপ্পা, ভজনের মতো একটা একটা বিশেষ মর্যাদা দিতে বাধ্য হয়েছেন। ঋতুসঙ্গীতে বর্ষা ও বসন্তের ক্ষেত্রে একমাত্র নজরুল ইসলামই রবীন্দ্রনাথের সুযোগ্য উত্তরাধিকারীরূপে খ্যাতিলাভ করেছেন।

'আয় হ্যাদে গো নন্দরাণী', 'খাঁচার পাখী ছিল সোনার খাঁচাটিতে বনের পাখী বনে', 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে বাদল গেছে টুটি' প্রভৃতি বহু শিশুসঙ্গীত রচনা করে রবীন্দ্রনাথ

সঙ্গীতভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছেন। 'প্রলয় নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে', 'সহসা ডাল পালা তোর উতলা যে', 'আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি', 'আজ খেলাভাঙার খেলা খেলবি আয়', 'কাছে আছে দেখিতে না পাও' ইত্যাদি ক্রিয়াসঙ্গীত ও সমবেত সঙ্গীত রচনা করে রবীন্দ্রনাথ গৃহের আনন্দ বর্ধন করেছেন। তাঁর অনেক গান আবৃত্তিতে, নৃত্যসহযোগে বা রঙ্গমঞ্চে গীত হয়ে থাকে। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষেও অনেক গান রচিত হয়েছে। এখন আর নলকূপ খনন, হলকর্ষণ, শস্যবপন, প্রিয়জন বা গুরুজনের বিদায় বা বিয়োগ, আমন্ত্রণ, বিশেষ বিশেষ পর্ব বা উৎসব, বিবাহ, জন্মদিন, শিক্ষারম্ভ, বর্ষবিদায়, নববর্ষ, গৃহপ্রবেশ প্রভৃতির জন্য গানের অভাব হয় না। শুভ গুহঠাকুরতা 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধারা'য় এর বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন আশ্রমে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে ঋতু উৎসব, বসন্তী, বৈতালিক সঙ্গীত, ধর্মসঙ্গীত ইত্যাদি গাওয়ার ব্যবস্থা করে গেছেন।

পায়ে পড়ি শোন ভাই গাইরে, হৈ হৈ পড়া ছেড়ে দূর দিয়ে যাই রে

কাঁটাবন বিহারিণী সুর-কানা দেবী

তার পদ সেবি, করি তাহারই ভজনা, বদকণ্ঠলোকবাসী আমরা কজনা

চা-স্পৃহ চঞ্চল চাতক দল চল হে

ভালো মানুষ নইরে মোরা ভালো মানুষ নই

গুণের মধ্যে ওই আমাদের গুণের মধ্যে ওই

ইত্যাদি হাসির গান নিশ্চয়ই দ্বিজেন্দ্রলাল ও নজরুল ইসলামের এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ অবদানের সাথে তুলনীয়; হয়তো বা সূক্ষ্মতার দিক দিয়ে অধিক পরিপাটিও হতে পারে। রবীন্দ্র-পূর্বকালের হাসির গানের অধিকাংশই এত স্থূল যে সেসবের সঙ্গে এগুলোর তুলনাই চলতে পারে না।

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে (রামপ্রসাদী)

যার অদৃষ্টে যেমন জুটেছে, সেই আমাদের ভালো (বাউল)

আমি সংসারে মন দিয়েছিনু, তুমি আপনি সে মন নিয়েছ (কীর্তন)

খরবায়ু বয় বেগে চারিদিক ছায় মেঘে ওগো নেয়ে নাওখানি বাইও (সারী)

তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে টুকরো করে কাছি
ডুবতে রাজী আছি আমি ডুবতে রাজী আছি (ভাটিয়ালি)

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে, দেখতে তোমায় পাই নি (দেহতত্ত্ব)

এগুলো ভাবের দিক দিয়েই হোক বা সুরের দিক দিয়েই হোক লোকসঙ্গীতের কোঠায় পড়ে। লোকসঙ্গীত দেশের তথা পল্লীর অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সুর যেন দেশের আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে থাকে, আর আপনা-আপনি লোকের হৃদয়ে প্রবেশ করে। তাই অনায়াসে সে সুর স্থানীয় বৈশিষ্ট্য সহকারে লোকের কণ্ঠে অধিষ্ঠিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গানে তিনি নিজেই সুর দিয়েছেন। তাঁর প্রথম দিকের গান প্রায় রাগরাগিণীতে বাঁধা ও নিয়মিত তালে সন্নিবিষ্ট। তিনি রাগ-রাগিণী এবং তালে কতদূর দক্ষ ছিলেন তার একটি প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে দুর্গাদাস লাহিড়ীর সংগ্রহ পুস্তক থেকে।

তাঁর বইয়ের প্রকাশকাল ১৯০৫ সাল। এই সময় পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যেসব গান রচনা করেছেন, তার থেকে উক্ত সংগ্রহ পুস্তকে ২৮১টি গান উদ্ধৃত হয়েছে। তার মধ্যে তালের হিসাবে দেখা যায় ৭৬টি একতালা, ৪৭টি কাওয়ালী, ৪০টি ঝাঁপতাল, ২০টি আড়াঠেকা, ১১টি খেমটা, ৮টি যৎ ও চৌতাল, ৬টি ঠুংরি ও রূপক, ৪টি আড় খেমটা ও তাল ফেরতা, আর ৩টি তেওরা, ২টি করে ছেপকা, ধামার ও সুরফাক্তা, আর একটি করে মধ্যমান, টিমেতেতালা ও তেওট দেখা যায়। আর বাকি ৪৯টিতে তাল লেখা নেই; এর কতকগুলি কীর্তন, বাউল ও ভজন। রাগিণীর গণনায় দেখা যায় ২৩টি ভৈরবী, ১৭টি বেহাগ, ১১টি বাহার, ১০টি করে ঝিঁঝিট ও কীর্তন, ৮টি করে কাফি, খাম্বাজ ও ভায়রোঁ, ৬টি করে সিন্ধু ও ইমনকল্যাণ; ৫টি করে জয়জয়ন্তী, ললিত, ভজন, বিভাস, টোরী ও দেশ; ৪টি করে সাহানা, গৌড় সারং, গৌরী, রামপ্রসাদী, আলাইয়া, হাম্বীর, মুলতান। আর স্বল্প ব্যবহৃতগুলির মধ্যে রয়েছে ৩টি করে পূরবী, সিন্ধু কাফি, বাউল, কানাড়া, খট; ২টি করে মল্লার, দেশ, সিন্ধু, প্রভাতী, ধুন, গৌড় মল্লার, সরফর্দা, রামকেলী, কেদারা, পিলু, আর ১টি করে ছায়ানট, ককুভ, কালাংড়া আশাবরী, টোরী, আনন্দভৈরবী, সুরট, বড়হরস, সারং, যোগিয়া, আশাভৈরবী, বাগেশ্রী, মোহিনী, খট ললিত, দক্ষিণা, টোরী-ভৈরবী, মাঢ়, সিন্ধু ঝিঁঝিট, আশাবরী, রামকেলী, ভুপালী, বেলাওল, মালকোশে, শঙ্করাভরণ, সিন্ধু-ভৈরবী, জিলাফ বারোয়াঁ, কল্যাণ, বসন্তবাহার, জিলফ্ ও বারোয়াঁ। এগুলো বিশুদ্ধ শাস্ত্রসম্মত রাগ-রাগিণী বা যৌগিক রাগ (মিশ্র নয়)। এ ছাড়া ৫৩টি গানে মিশ্র রাগিণী ব্যবহার করা হয়েছে। এতগুলো রাগ-রাগিণীর বিশুদ্ধতা রক্ষা করে সুর দেওয়া এবং তাল লয় সহকারে গাইতে পারা অবশ্যই যেমন তেমন কথা নয়।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম দিকে শাস্ত্রসম্মত বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণীই অধিক ব্যবহার করেছেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে গায়ন প্রণালীতে বাণীর মর্যাদার দিকেও বেশ নজর রেখেছেন। মধ্যবর্তী কালে শাস্ত্রানুযায়ী রাগ-রাগিণীর মধ্যেও বৈচিত্র্যের জন্য বা সুরকে ভাবানুসারী করবার তাগিদে অনেক সময় অপ্রত্যাশিত সুর সংযোজন করেছেন। শেষজীবনে শাস্ত্রের লৌহবন্ধন অস্বীকার করেই ভাব, সুর আর বাণীর মধ্যে আশ্চর্যজনক সামঞ্জস্য বিধান করেছেন আপন কবিপ্রকৃতি, মৌলিক সুরবোধ আর রসানুভূতির অলক্ষ্য ও অলঙ্ঘ্য তাগিদেই। এর সমর্থনস্বরূপ যোগ্যতর সমঝদারের দেওয়া উদাহরণ এই :

মোর প্রভাতে এই প্রথম ক্ষণের কুসুম খানি
তুমি জাগাও তারে ঐ নয়নের আলোক হানি।

যাবার বেলা শেষ কথাটি যাও ব'লে,
কোন্‌খানে সে মন লুকাল দাও ব'লে।।

রাগসঙ্গীত বা মার্গসঙ্গীত লোকসঙ্গীতের চেয়ে অনেক বেশি সাধনাসাপেক্ষ—ওস্তাদের কাছে শিখতে হয়, অনেক ব্যাকরণ ও অলঙ্কারের মারপ্যাঁচ আছে, তাই পান থেকে চুন খসলে চলবে না। তবু 'অধিকারী'র অধিকার স্বীকার করতেই হয়। অধিকারী তাকেই বলে যিনি সঙ্গীতের ঠাট, জাতি, প্রকৃতি, সুর, তান, লয়, অলঙ্কার প্রভৃতি বাহ্য রূপের সঙ্গে সঙ্গে ভাব-রূপটাও সম্পূর্ণ আয়ত্ত করেছেন। এই অধিকারীরাই সঙ্গীতের স্রষ্টা হতে পারেন—এঁরাই ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরি, টপ্পা ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন আর রাগ-রাগিণীতে অনেক নতুন বৈশিষ্ট্য প্রবর্তন করেছেন। রবীন্দ্রনাথও এঁদের মধ্যে একজন অধিকারী। তিনি বাল্যকালে কালোয়াতি সঙ্গীতের পরিবেশে মানুষ হয়েছেন। কৈশোর ও যৌবনে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করে সঙ্গীতের

বিবিধ স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ও রীতিপ্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন; আপন গৃহেও উদার পরিবেশে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা-উদ্ভাবনের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন; তার ওপর, অনুভূতিশীল কবিচিত্ত দিয়ে সঙ্গীতের বাণী, তাল ও সুরের মধ্যে ক্ষেত্রোপযোগী সুসঙ্গত অনুপাতের প্রবর্তন করেছেন। এর ফলে রবীন্দ্রসঙ্গীতে এক প্রকার ক্লাসিকাল বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে, নিঃসন্দেহে সুষ্ঠুভাবে পরিবেশন করতে হলে এতেও বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। শুভ গুহঠাকুরতা 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধারা'র সুদীর্ঘ ভূমিকায় এর অলঙ্করণ নীতি, উচ্চারণ প্রণালী, শ্বাসগ্রহণ পদ্ধতি, কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের বহু গান স্বরলিপিতে বিধৃত হয়েছে। তবু শুধু ওর সাহায্যে বাড়িতে একলা বসে অনুভব করাই যথেষ্ট নয়। এ গানের গতিপ্রকৃতির বিশেষ বিশেষ ঝোঁক রয়েছে, তা আয়ত্ত করতে হলে রীতিমতো ওস্তাদ ছাড়া গতি নেই। তবে আটঘাট বেঁধে যতই শিক্ষাদান বা শিক্ষাগ্রহণ করা হোক জনপ্রিয়তার ফলে মুখে মুখে এর পরিবর্তন বা বিকৃতি বেশিদিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে ন। কিছুদিন পরে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ওস্তাদদের মধ্যেই পার্থক্য দেখা দেবে। তবে এতে অতিমাত্রায় ঘাবড়াবার কারণ নাই। আমার মনে হয়, প্রতিভাবানেরা হাতে হাতে প্রবাহমান সঙ্গীতসূত্র উর্ধ্বে ধরে রেখেছেন। কিন্তু টেলিগ্রাফের তারের মতো, খুঁটির মাথায় খুঁটা সঠিক উচ্চতা রক্ষা করলেও একটু দূরে গিয়ে প্রাকৃতিক নিয়মেই তা নুয়ে পড়ে। পূর্ববর্তীদের খুঁটির খানিক সামনে রবীন্দ্রনাথ যেমন অপসৃয়মাণ সঙ্গীতসূত্রের এক প্রান্তে নতুন খুঁটি গেড়েছেন, ভবিষ্যতে আর একজন 'প্রতিভা' এসে নুয়ে পড়া সূত্রের প্রান্ত আবার তুলে ধরবেন, তারপর আর একজন, তারপর আর একজন—এইভাবে অগ্রগামী সূত্র ওঠা-নামা করতে করতেই চলতে থাকবে। উন্নতির প্রবাহ তো চিরকাল এমনি করে ঢেউ খেতে খেতেই ছুটে চলে।

আহমদ শরীফ

সৌন্দর্যবুদ্ধি ও রবীন্দ্র-মনীষা

রবীন্দ্রনাথ এক আশ্চর্য মানুষ। জীবনপ্রভাত থেকে মৃত্যু-মুহূর্ত অবধি তিনি নব নব রাগে বিচিত্র অনুভবে নিজেকে রচনা করে গেছেন। চিন্তার ও কর্মের বহুধা ও বর্ণালি অভিব্যক্তিতে তাঁর জীবন বিপুল, বিচিত্র ও জটিল হয়ে প্রকটিত হয়েছে। বয়স তাঁর যতই বেড়েছে, তাঁর মনের দিগন্তও ততই হয়েছে প্রসারিত। বেড়ে গেছে তাঁর ভাবাকাশের উচ্চতা ও পরিধি। সেহেতু হয়তো সরে গেছে সাধারণের নাগালের বাইরে। তাই 'বলাকা'-পূর্ব কাব্যে 'গোরা'-পূর্ব উপন্যাসের, 'অচলায়তন'-পূর্ব নাটকের এবং 'গল্পসপ্তক'-পূর্ব ছোটগ পাঠকসংখ্যা যত বেশি, তাঁর পরবর্তী রচনার সমঝদার তত কম।

অতএব, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক জীবনের শুরু আর শেষ একভাবে হয় নি। কোনো সত্যিকার প্রতিভাই ধ্রুবতায় অবসিত হয় না—হতে পারে না। কেননা, অভাবিতকে ভাবনা করা, অচিন্ত্যকে চিন্তাগোচর করা, নিরবয়বকে অবয়ব দান করা প্রতিভার কাজ। প্রতিভা যুগের দান নয়—যুগের স্রষ্টা; অর্থাৎ প্রতিভা যুগের দ্বারা প্রভাবিত হয় না, যুগকে প্রভাবিত করে। আমরা রবীন্দ্রনাথকে প্রতিভা বলে মানি। তাই তাঁর বক্র, বিপুল ও বিচিত্র সৃষ্টিপ্রবা যে কোনো ঋজু সিদ্ধান্তের প্রতিকূল। আবার ভক্তি ও বিদ্বেষ—দু-ই যথাযথ ধারণা লাভে অন্তরায়। কবির তিরোভাবের পঁচিশোর্ধ্ব বছর পরে রবীন্দ্র-বিচারে সতর্ক দৃষ্টি ও অবিচল মন-মননের প্রয়োজন।

২

রবীন্দ্রনাথ আশৈশব সৌন্দর্যপিপাসু। এ পিপাসায় অনন্যতা আছে। কেননা, এ সৌন্দর্যবোধ প্যাগান নয়, গ্রিক নয়, আধ্যাত্মিকও নয়। শৈশবে চাকর-নির্দিষ্ট খড়ির গণ্ডি তাঁর শরীর বিচরণ নিয়ন্ত্রণ করত বটে, কিন্তু তাঁর দৃষ্টিবাহী মানস-বিহার রোধ করা যায় নি। 'ফাঁক ফুকরে' প্রকৃতি-নিসর্গ তাঁর হৃদয়দুর্গ দখল করে নিয়েছিল। বাধা ছিল প্রবল, তাই আগ্রহ তীব্র, অনুভূতি হল তীক্ষ্ণ। ফাটা দেয়ালের গুল্মফুল, পুকুরপাড়ের নারিকেল গাছ, আকাশে মেঘের লীলা আর তারার অব্যক্ত বাণী শৈশবে-বাল্যে কবির মন ও হৃদয় হরণ করেছে তাই আকাশচারিতা দিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের শুরু। আকাশ থেকে তিনি মাটিতে নেমেছেন, ভূমি থেকে ব্যোমে যাত্রা করেন নি। গোড়া থেকেই অবশ্য মেশামেশি হয়ে ভূম আর ভূমায়, মাখামাখি ছিল জীবনে আর জগতে। কবি একেই জেনেছেন সীমার মধ্যে

...মের মিলনসাধন বলে। এ বোধের অনুগত ছিল বলেই বিহারীলালের কাব্য বালক কবির ... করেছিল। আর এ উপাদানের অভাবে মধুসূদনের কাব্য পেল তাঁর অবজ্ঞা।

৬

...তি ও নিসর্গের সৌন্দর্যে মানুষমাত্রেই অল্পাধিক মুগ্ধ। কবিরা অনুভূতিপ্রবণ বলে তাঁদের ... প্রাকৃতির সৌন্দর্যের প্রভাব প্রবল। কিন্তু সাধারণ কবিতে তা যতখানি বহির্রূপচেতনা, ...খানি অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যানুভূতি নয়। কিন্তু কোনো কোনো কবি-মনে সেরূপ চেতনা ...ীর, ব্যাপক ও তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে। যে প্রকৃতি-চেতনা ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থের মনে ...বোধ জাগিয়েছে, যে রূপ-অন্বেষা ও প্রেমানুভূতি শেলীকে আকাশচারী করেছে, যে ...র্যানুভূতি কীটস্‌কে আনন্দিত করেছে, যে রূপমুগ্ধতা বিহারীলালকে তাত্ত্বিক করেছে, ...ই সৌন্দর্যচেতনা রবীন্দ্রনাথে এনেছিল এক অনন্য অনুভূতি, এক প্রকারের মুগ্ধতা বা ...ত, সারা জীবনেও কবি যার সীমা-শেষ খুঁজে পান নি। সে রূপমাধুরীর অনুভব ...কে 'তিলে তিলে নতুন' করে তুলেছে।

কৈশোরে কবির একদিন সত্যি সত্যি সৌন্দর্যে সচেতন দীক্ষা হয়েছিল। এক উষা-লগ্নে ...আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ ...মায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে ...র যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল, তাহা এক নিমিষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ...টাতে বিশ্বের আলোক বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল।' (জীবনস্মৃতি)—এই সৌন্দর্যানুভূতি তাঁর ...দিন ছিল—এমনি অনুভূতি জেগেছিল আরো এক দিন পূর্ণিমা রাতে—সৈকতে, তখন ... আহমেদাবাদে।

শৈশবে-বাল্যে তাঁর মন-আত্মা সৌন্দর্য-সমুদ্রে অবগাহন করে করেই পুষ্ট হতে থাকে। ... নিজের জবানিতে :

আমার শিশুকালেই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমার খুব একটি সহজ এবং নিবিড় যোগ ছিল। বাড়ির ভিতরের নারিকেল গাছগুলি প্রত্যেকে আমার কাছে অত্যন্ত সত্য হইয়া দেখা দিত। ...সকালে জাগিবামাত্রই সমস্ত পৃথিবীর জীবনোল্লাসে আমার মনকে তাহার খেলার সঙ্গীর মতো ডাকিয়া বাহির করিত, মধ্যাহ্নে সমস্ত আকাশ এবং প্রহর যেন সুতীব্র হইয়া আপন গভীরতার মধ্যে আমাকে বিরাগী করিয়া দিত এবং রাত্রির অন্ধকার যে-মায়াপথের গোপন দরজাটা খুলিয়া দিত, সম্ভব অসম্ভবের সীমানা ছাড়াইয়া রূপকথার অপরূপ রাজ্যে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার করিয়া লইয়া যাইত। ...

... কল্পনার

পালতোলা নৌকায় যখন-তখন আমার মন বিনা ভাড়ায় সওয়ারি হইয়া বসিত এবং যে-সব দেশে যাত্রা করিয়া বাহির হইত, ভূগোলে আজ পর্যন্ত তাহার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় নাই।...

কি মাটি, কি জল, কি গাছপালা, কি আকাশ সমস্তই তখন কথা কহিত, মনকে কোনোমতেই উদাসীন থাকিতে দেয় নাই। (জীবনস্মৃতি)

আমি এই পৃথিবীকে ভালোবাসি। (ছিন্নপত্রাবলী, ১৩)।

পদ্মাকে আমি ভারি ভালোবাসি। (ছিন্নপত্রাবলী, ৯৩)।

সৌন্দর্য যখন একেবারে সাক্ষাৎভাবে আত্মাকে স্পর্শ করতে থাকে, তখনই তার ঠিক মানেটি বোঝা যায়। আমি যখন একেলা থাকি, তখন প্রতিদিনই তার সুস্পষ্ট স্পর্শ অনুভব করি,

সে যে অনন্ত দেশকালে কতখানি জাগ্রত তা বুঝতে পারি। (ছিন্নপত্রাবলী, ১৯৭)।

সৌন্দর্য আমার পক্ষে সত্যিকার নেশা। আমাকে সত্যি সত্যি ক্ষেপিয়ে তোলে।...সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়ের চূড়ায় শক্তিরও অতীত; কেবল চক্ষুকর্ণ দূরে থাক, সমস্ত হৃদয় নিয়ে প্রবেশ করলেও ব্যাকুলতার শেষ পাওয়া যায় না। (ছিন্নপত্রাবলী, ২৫)।

এমনি আরো উদ্ধৃতি দেওয়া সহজ, কিন্তু অশেষের পথে এগুব না। রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন ধরে এমনি রূপদর্শী ও রসগ্রাহী ছিলেন, 'ছিন্নপত্র' ও 'ছিন্নপত্রাবলী' তার সাক্ষ্য।

৪

প্রকৃতি বা নিসর্গ অখণ্ড কোনো বস্তু নয়। খণ্ড, ক্ষুদ্র ও বিচিত্র বস্তু ও বর্ণের সমষ্টি মাত্র। কিন্তু তার সৌন্দর্য অখণ্ড সত্তার স্বীকৃতিতেই লভ্য। অতএব, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যানুভূতিই সৌন্দর্যবোধের উৎস। শৈশব-বাল্যেই এ বোধে অবচেতন দীক্ষা পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

খণ্ড-ক্ষুদ্রকে সামষ্টিক সমগ্রতায় উপলব্ধি করার জন্যে দৃষ্টি ও মননের যে-প্রসার প্রয়োজন, অন্যের পক্ষে যা' পরিশীলনেও সম্ভব হয় না—রবীন্দ্রনাথে তা প্রায় অনায়াসলব্ধ। অন্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'The First stage of my realization was through my feeling of intimacy with Nature'. (*Religion of Man*) প্রকৃতি কিংবা নিসর্গে সবকিছুই সুন্দর নয়, হ্রস্ব-দীর্ঘ, ক্ষুদ্র-বৃহৎ, সুগন্ধী-দুর্গন্ধী, মরা-তাজা, ভাঙা-মচকানো ঋজু-বাঁকা, বর্ণালি-বিবর্ণ সব রকমই আছে। কিন্তু সৃষ্টির কিছুই তুচ্ছ নয়, নিরর্থক নয়। এ বোধের বশে যদি কেউ প্রকৃতি নিসর্গের দিকে তাকায়, তা হলে সর্বত্র একটা রহস্য। একটা কল্যাণচিহ্ন প্রত্যক্ষ করা সহজ হয় :

এ দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোন মিল,
নহিলে নিখিল
এত বড় নিদারুণ প্রবঞ্চনা
হাসিমুখে এতকাল কিছুতেই সহিতে পারিত না।

এই আস্তিক্যবুদ্ধিই মানুষকে জীবন-রস-রসিক করে তোলে, তখন বিষ আর অমৃতের আপাত বৈপরীত্য ঘুচে যায়—দু-ই জীবনের অনুকূল বলে অনুভূত হয়। রবীন্দ্রনাথের মুখে তাই শুনি,

আমি স্বভাবতই সর্বাস্তিবাদী—অর্থাৎ আমাকে ডাকে সকলে মিলে—আমি সমগ্রকে মানি, গাছ আকাশের আলো থেকে আরম্ভ করে মাটির তলা পর্যন্ত সমস্ত কিছু থেকে ঋতুপর্যায়ের নানা প্রেরণা দ্বারা রস ও তেজ গ্রহণ করে তবেই সফল হয়ে ওঠে—আমি মনে করি আমার পক্ষে তেমনি—সমস্তের মধ্যে সহজ সঞ্চরণ করে সমস্তের ভিতর থেকে আমার আত্মা সত্যের স্পর্শ লাভ করে সার্থক হতে পারবে (রবীন্দ্রজীবনী ৩ : পৃ ২০৪)।

'জগতের সঙ্গে সরল-সহজ সম্বন্ধের মধ্যে অনায়াসে দাঁড়িয়ে যেন বলতে পারি 'আমি ধন্য'।

যা কল্যাণকর তা-ই সুন্দর, তা-ই শ্রদ্ধেয় এবং তা-ই প্রিয়। এ অনুভবের গভীরতাই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুর সঙ্গে একত্ব ও একাত্মবোধ জন্মায়। তখন সহজেই বলা সম্ভব, 'আমি জানিবারে পাই ধূলিরেও মানি আপনা'। যাকে বিষ বলে জানি, সুপ্রয়োগে তা-ই প্রাণ বাঁচায়, অপপ্রয়োগে অমৃত হতে পারে জীবন-ঘাতী। দুর্ব্যবহারে ভাইও হয় প্রাণের বৈরী, আবার প্রীতি দিয়ে অরিকেও মিত্র করা সহজ। এ তত্ত্ব একবার উপলব্ধ হলে বিশ্বজগতের প্রাণী ও প্রকৃতির আপেক্ষিকতা তথা জীবনধারণ ব্যাপারে পারস্পরিক উপকরণাত্মকতা হৃদয়গোচর

...। তখনই বলা চলে, 'আমি আছি এবং আমার সঙ্গে আর সমস্তই আছে, আমাকে ছেড়ে ... অসীম জগতের একটি অণু-পরমাণুও থাকতে পারে না।' (ছিন্নপত্রাবলী, ২৩৮)— ... এমনি স্তরে প্রাণী প্রকৃতি ও মানুষকে অভিন্ন সত্তার অংশ বলে না ভেবে পারা যায় ...। এরই নাম বিশ্বানুভূতি, এ তত্ত্বের ধর্মীয় নাম অদ্বৈতবাদ। এমনি করে রবীন্দ্রনাথে বিশ্বানুভূতি বা বিশ্বাত্মবোধ জাগে। 'প্রভাত-উৎসব', 'বিশ্বনৃত্য', 'অহল্যার প্রতি', '...', 'সমুদ্রের প্রতি', 'মধ্যাহ্ন', 'প্রবাসী', 'মাটির ডাক' প্রভৃতি কবিতায় তা সুপ্রকট।

এ বিশ্বেরে দেখি তার সমগ্র স্বরূপে
ছন্দ নাহি ভাঙে তার সুর নাহি বাধে।

...এব, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যচেতনাই রবীন্দ্রচিত্তে বৈচিত্র্যে ঐক্যতত্ত্বেরও বীজ বুনেছিল। এরই ...কারণে তিনি বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একত্ব ও একাত্ম অনুভব করেছেন; আর এরই বিস্তারে তাঁর ...রিক জীবনে তথা সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রীয় বোধে মানবিকতা, মানবতা বা ...মানবিকবাদের বিকাশও প্রতিষ্ঠা পায়। তাঁর এই মানসধর্মের সমর্থন রয়েছে বলেই ...নিষদ্‌ তাঁর প্রিয়। আর ঐক্যতত্ত্বের বিরলতার দরুনই স্মৃতি, পুরাণ ও গীতায় তাঁর অনুরাগ ...।

এই সৌন্দর্যবুদ্ধি কীভাবে তাঁর স্বদেশ, সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্র চিন্তার বিকাশে ও নিয়ন্ত্রণে ...ক হয়েছে, তার পরিচয় নেওয়াই এই প্রবন্ধের লক্ষ্য।

...

...দেশের ও ইউরোপের এক যুগসন্ধিক্ষণে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। এ-দেশে তখন বুর্জোয়া ...শী নগরকেন্দ্রী জীবনচর্চা শুরু হয়েছে। 'আমি এসেছি যখন...নতুন কাল সবে এসে ...ল।' ওদিকে সামন্ততন্ত্রী সমাজ ও নৈতিক জীবনবোধ গাঁয়ে গাঁয়ে তখনো অটল। কেননা, ...লো গাঁয়ের নিয়তি নির্দিষ্ট জীবনে ইংরেজি শিক্ষার ছোঁয়া লাগে নি।

বৃটিশ তখন দেশের মালিক, গ্রেট বৃটেনই তখন আমাদের বিলেত। সে বিলেতে ...বিপ্লবের ফলে ফিউডাল সমাজ লুপ্ত; গড়ে উঠেছে বুর্জোয়া সমাজ। এবং এই ধনিক ... তখন সাম্রাজ্যবাদে পরিণত। সামন্ত-বুর্জোয়া সমাজে পার্থক্য সামান্য নয়—সামন্তরা ... সংখ্যায় নগণ্য, কিন্তু দেশের মানুষের ধন-প্রাণের মালিক, শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারক, মান ... ঐশ্বর্যের প্রতিভূ, তারাই সব; আর সব তাদের প্রজা ও মজুর—ক্ষেতমজুর ও আফিসি ...।

আর বুর্জোয়াদের বৃত্তি, বিত্ত ও বেসাত আছে, তাদের মুখে হাসি, বুকে বল আর সঙ্কল্পে ... মন। তারা আত্মরচনায় ও আত্মপ্রসারে ব্যাকুল, তারা ধনে কেবল ধনী নয়, ...সম্পদেও ঋদ্ধ। তারা জিজ্ঞাসু এবং বিজ্ঞান ও যন্ত্রপ্রিয়, কিন্তু কলারসিক, সংস্কৃতিপ্রাণ, ...কামী, সেবাধর্মী আর মহৎ ও বৃহৎ আদর্শে উদ্বুদ্ধ। সামন্ত ছিল কয়েকজন, বুর্জোয়া ... কয়েক লক্ষ। তাদের ঐশ্বর্যের সীমা নেই, তাদের সৌজন্য অতুলনীয়।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ হচ্ছে বুর্জোয়া জীবনের ও ঐশ্বর্যের সোনার যুগ। দ্বিতীয়ার্ধ এর ... যুগ—আত্মধ্বংসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও হানাহানির কাল। ইউরোপে বুর্জোয়া জীবনের ...কালে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। কিন্তু বাঙলা দেশে সে অবক্ষয়ের সংবাদ তখনো পৌঁছে ... বুর্জোয়া সমাজের আত্মিক ও আর্থিক ঐশ্বর্যের পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ লালিত। বুর্জোয়ার ...ময়তা, উদারতা, সংস্কৃতিবানতা ও বিলাসবাঞ্ছা শহুরে বাঙালির হৃদয়-মন হরণ ...ছিল।

রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন এঁদের মধ্যে প্রধান। এঁরা উভয়েই চাকরি ও ব্যবসা করে সম্পদ অর্জন করেন এবং সবটা সদুপায়েও নয়। এঁরা দুজনেই সাহেব-ঘেঁষা ছিলেন এবং ইংরেজপ্রীতি এঁদের মজ্জাগত হয়ে উঠেছিল। তবু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ছিল। রামমোহন ছিলেন বিদ্বান ও প্রজ্ঞাবান—এই বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রাণের বাণীটি তিনি বুঝেছিলেন। তাঁর উদারতা, গ্রহণশীলতা ও আন্তর্জাতিক চেতনা তাই ছিল সে যুগে অতুলনীয়। দ্বারকানাথ বিদ্বান না হলেও বুদ্ধিমান ছিলেন। নতুন যুগের বৈষয়িক প্রসাদে তিনি ছিলেন মুগ্ধ। তাঁর শৌখিনতায়, বিলাসিতায়, দানশীলতায় ও সাহেবপ্রীতিতেই তাঁর নতুন জীবনচেতনা অবসিত। মনের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন বর্জনশীল, গ্রহণশীল ছিলেন না। তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যেও আমরা এই রক্ষণশীলতাই কেবল লক্ষ করি, তাঁর অধ্যাত্মবুদ্ধি তাঁকে ন্যায়নিষ্ঠ ও সৎ করেছিল, কিন্তু উদার করে নি। এই অনুদারতার জন্যেই তিনি সাহেবদের এড়িয়ে চলতেন, ব্রাহ্ম হয়েও ব্রাহ্মণ্য আভিজাত্যের ধারক ছিলেন; রামমোহন চরম তাচ্ছিল্যে যে পৈতার শিকল ছিঁড়লেন, তিনি নতুন করে সেই পৈতার-বন্ধন স্বীকার করেই গর্ববোধ করলেন। অতএব, রবীন্দ্রনাথ পিতা থেকে উদারতার কিংবা প্রতীচ্য প্রাণময়তার দীক্ষা পান নি। দ্বিজেন্দ্রনাথ অনেকটা বাপের মতোই ছিলেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বাজাত্যবোধ তাঁকে অনুদার রেখেছিল। অতএব পারিবারিক প্রভাব রবীন্দ্রনাথের বিশ্বানুভূতির তথা বিশ্বজনীনতা বা সর্বমানবিক বোধের অনুকূল ছিল না। তাই ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম পঁয়তাল্লিশ বছর কেটেছে অন্যের প্রভাবে। এ সময়েও অবশ্য কাব্যের ক্ষেত্রে তাঁর বিশ্ববোধ প্রকাশ ও বিকাশ নির্দ্বন্দ্ব ও নির্বাধ ছিল। যদিও কালিদাসের প্রভাবে প্রাচীন ভারত, তপোবন আর ব্রাহ্মণ্য মহিমায়ও তিনি প্রায় সমভাবেই মুগ্ধ ছিলেন, তবু তাতে বিরোধ ঘটে নি। কেননা, সেখানেও তিনি ঐশ্বর্যের মধ্যে ত্যাগ, ভোগের মধ্যে সংযম এবং প্রেমের মধ্যে তপস্যার বীজ ও মহিমা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে স্বাদেশিক, স্বাজাতিক ও স্বধর্মীয় গোঁড়ামি তাঁরও প্রশ্রয় পেয়েছে। কৈশোরেই তিনি সঞ্জীবনী সভার সদস্য, হিন্দু মেলার উৎসাহী কর্মী, স্বজাতির ঐতিহ্যগামী, গানের মাধ্যমে স্বদেশপ্রীতি প্রচারে ব্রতী। পারিবারিক জীবনেও অশিক্ষিতা বালিকাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণে কিংবা নিজের বালিকা কন্যার বিবাহদানে কোনো সংকোচ নেই। তাঁর এই ব্যবহারিক ভুবনে তাঁর চিন্তা ও কর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়েছে,—তাঁর পিতা ও তাঁর অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-তিলক প্রমুখ উগ্র স্বাজাত্যগর্বীদের প্রভাবে।

এ প্রভাব থেকে মুক্ত হতে তাঁর সময় লেগেছে। জীবনের পঁয়তাল্লিশটি বছর কেটে গেছে দেশ-জাত-ধর্মের খোলসমুক্ত হতে। অবশ্য এর মধ্যেও যে তাঁর বিদ্রোহ দেখা দেয় নি তা নয়। এ সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বিতর্ক স্মরণীয়। এ যেন বাল্যের সেই খড়ির গণ্ডি থেকে বাইরের পানে তাকানো। তাঁর নিজের উক্তিতে প্রকাশ, 'নানা কাজে আমার দিন কেটেছে, নানা আকর্ষণে আমার মন চারিদিকে ধাবিত হয়েছে। সংসারের নিয়মকে জেনেছি, তাকে মানতেও হয়েছে, মূঢ়ের মতো তাকে উচ্ছৃঙ্খল কল্পনায় বিকৃত করে দেখি নি। কিন্তু এই সমস্ত ব্যবহারের মাঝখান দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে আমার মন যুক্ত হয়ে চলে গেছে সেইখানে, যেখানে সৃষ্টি গেছে সৃষ্টির অতীতে। এই যোগে সার্থক হয়েছে আমার জীবন।' (আত্মপরিচয়)

রবীন্দ্রনাথের জীবনে সত্যই প্রতিভাসুলভ কোনো উচ্ছৃঙ্খলতা কিংবা বৈচিত্র্য নেই। সেদিক দিয়ে তাঁর নিতান্ত সাধারণ জীবন। ব্যারিস্টার হবার চেষ্টা, জমিদারি কাজে নিষ্ঠা, ব্যবসায় প্রবণতা, সমিতির কর্মে আগ্রহ, শিক্ষকতায় ও স্কুল-পরিচালনায় উৎসাহ, গার্হস্থ্য কর্তব্যে প্রযত্ন—এসব তাঁর বৈষয়িক জীবননিষ্ঠার পরিচায়ক—প্রতিভার সাক্ষ্য নয়। এমনকি প্রেমের ব্যাপারে তাঁর চিত্ত-বিভ্রান্তির পরিচয়ও দুর্লভ, যদিও তিনি বলেছেন, 'কোনো মেয়েকে

ভালোবাসাকে আমি কখনো ভুলেও অবজ্ঞার চোখে দেখি নি।' (রবীন্দ্রজীবনকথা, পৃ ২৬) বস্তুত তিনি প্রতিভা-দুর্লভ অসামান্য স্থিতধী এবং আত্মিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন, এমন সহনশীলতায় আত্মনিয়ন্ত্রণের নজির প্রতিভাবানদের চরিত্রে দুর্লক্ষ্য। কাজেই রবীন্দ্রনাথের ভাবের জীবনে ও বাস্তব জীবনে সুস্পষ্ট সীমারেখা ছিল। একটি অপরটিকে কখনো লঙ্ঘন করে নি, করে নি আচ্ছন্ন।

৬

স্বাজাত্য ও স্বাদেশিকতার নির্মোকমুক্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৌন্দর্যবুদ্ধি-প্রসূত বিশ্বচেতনা দিয়ে তাঁর কাব্যজগৎ যেমন রচনা করেছিলেন, তেমনি করে তাঁর ব্যবহারিক ভুবন নির্মাণে মনোনিবেশ করলেন। বিশ্ব-প্রকৃতিতে তিনি বৈচিত্র্যের মধ্যে যে-ঐক্যের সন্ধান পেয়েছিলেন, মানব-জগতেও পেলেন সে-তত্ত্বের সন্ধান। যে-তত্ত্বচিন্তা প্রকৃতির মধ্যে কল্যাণচিহ্ন ও সুষম সৌন্দর্য আবিষ্কার করেছিল, সে-তত্ত্ববুদ্ধিই দ্বন্দ্ব-সংঘাত-স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও মানুষের একত্বে ও একাত্মতায় বিশ্বাস রাখতে অনুপ্রাণিত করেছিল; এ অভিন্ন সত্তাবোধে উৎসাহিত হয়েই তিনি বিশ্বমানব-ঐক্যে আস্থা রেখেছিলেন। অবশিষ্ট জীবনে তাঁর চিন্তা ও কর্ম এ-বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। একালে ঔপনিষদিক বিশ্বচিন্তা আর গৌতমবুদ্ধের করুণা ও মৈত্রীতত্ত্ব তাঁকে বিশেষ করে উদ্বুদ্ধ করেছে। এ বোধের অঞ্জন চোখে মেখেই তিনি প্রাচীন ভারতের দিকে তাকিয়েছিলেন; ফলে সেকালের সমাজে দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-দ্রোহ কিছুই তাঁর চোখে পড়ে নি, তিনি দেখেছেন বহুত্বেও একের অবয়ব—স্বাতন্ত্র্যেও সামঞ্জস্য, শ্রেণীসমন্বিত ও বর্ণে বিন্যস্ত সমাজে প্রীতিপ্রসূত কর্তব্য ও দায়িত্বসচেতন ব্যষ্টি। তাঁর এ দৃষ্টিতে ইতিহাস-চেতনা নেই, কিন্তু সৌন্দর্যবুদ্ধিজাত আদর্শিক প্রেরণা আছে। তাঁর মতে : 'আসল কথা, মানুষের ইতিহাসে মানুষের মনটা সবচেয়ে বড় জিনিস' (মনস্তত্ত্বমূলক ইতিহাস)। 'ইতিহাস কেবলমাত্র তথ্যের ইতিহাস নহে, তাহা মানব মনের ইতিহাস, বিশ্বাসের ইতিহাস' (ঐতিহাসিক চিত্র)। 'ইতিহাসকে কেবল জ্ঞান নহে, কল্পনার দ্বারা গ্রহণ করিলে তবেই তাহাকে যথার্থভাবে পাওয়া যায়' (ইতিহাস কথা)।

এ বোধই প্রবর্তিত ও প্রচারিত আচারিক ধর্মের প্রতি তাঁকে বীতরাগ করেছে; মানুষের ধর্ম বলতে তিনি বুঝেছেন, মানুষের চিত্তোত্থিত কল্যাণবুদ্ধি ও আত্মজ প্রীতি। যে-প্রীতি অপরের সবকিছুকে আপন বলে গ্রহণ করতে প্রেরণা দেয়, যে-প্রীতি কর্তব্য ও দায়িত্ববুদ্ধি জাগিয়ে রাখে।

অদ্বৈতবাদী তথা বিশ্ব-ঐক্যে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথের এসব মৌলিক চিন্তা। এ চিন্তা থেকেই তাঁর স্বাদেশিকতা বিশ্বচিন্তায়, এবং তাঁর জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতায় পরিণত, আর ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিশ্বভারতীতে উন্নীত। এজন্যেই দেশের স্বাধীনতার চেয়ে সমাজগঠনকে তিনি প্রধান ভেবেছেন, সরকারি সাহায্যের চেয়ে আত্মশক্তির প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় মনে করেছেন আর ঐশ্বর্যের চেয়ে মর্যাদাবোধের এবং সচ্ছলতার চেয়ে সততার দাম তাঁর কাছ বেশি ছিল। এ কারণেই খেলাফত আন্দোলনকালে গোঁজামিলে হিন্দু-মুসলিম মিলন-প্রতিষ্ঠার নিন্দা করেছেন তিনি, গান্ধীর যন্ত্র ও যন্ত্রশিল্প-বিমুখতা পছন্দ করেন নি, পারেন নি ইউরোপীয় শিক্ষাবর্জনে সায় দিতে। কেননা ইউরোপের রেনেসাঁসের দানকে তিনি মানব নির্বিশেষের জন্যে আশীর্বাদ বলে মনে করতেন, একে গ্রহণ করেছিলেন মানুষ অবিশেষের ঐতিহ্য বলে। একে তিনি মানুষের আত্মার শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে জানতেন ও মানতেন। তাই আধুনিক ইউরোপ ও ঔপনিষদিক ভারত তাঁর মন হরণ করেছিল।

ফাঁকির দ্বারা কোনো ফাঁক পূরণ ছিল তাঁর আদর্শবিরোধী, কেননা তিনি গৌতমবুদ্ধের মতো 'কারণ নিরূপণ ও উপায় নির্ধারণ' তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, অর্থাৎ যে কোনো কিছু গোড়া থেকেই শুরু করতে হবে। এটি তাঁর সেই সৌন্দর্যবুদ্ধিজাত ঐক্যতত্ত্বেরই প্রভাবের ফল, তাঁর শেষজীবনে ইতিহাসচেতনা, বিজ্ঞানবুদ্ধি, সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তা প্রবল হয়। এখানেও তিনি সমাধান খুঁজেছেন সৌন্দর্যবুদ্ধিপ্রসূত একত্ব ও একাত্মতত্ত্বে তথা বিশ্বজনীনবোধের স্বীকৃতিতে। অতএব, এখানেও তিনি অধ্যাত্মবাদী ও অদ্বৈতবাদী। তাই কামনা করেছেন মহামানবের আবির্ভাব, যিশু-বুদ্ধের মতো প্রেম ও মৈত্রীবাদীর নেতৃত্ব। তাঁর অধ্যাত্মবুদ্ধি বিজ্ঞানবর্জিত নয়। তাই ঔপনিষদিক জ্যোতিষ্মান পুরুষস্বরূপ সবিতা আর বিজ্ঞানীর জগৎ-কারণ সূর্য তাঁর চিন্তায় অভিন্ন হয়ে উঠেছে। তাঁর জীবনের শেষ দশকের রচনা তাই 'সবিতা'-কেন্দ্রী। তাঁর জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, বিজ্ঞানবুদ্ধি ও ইতিহাস-চেতনা এখানে প্রজ্ঞার স্তরে উন্নীত। এই প্রজ্ঞার আলোকে তিনি সমাধান খুঁজেছেন বর্তমানের বিশ্বমানব সমস্যার।

রবীন্দ্রজীবনের অন্তিম মুহূর্তে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের মরণ কামড় আবার শুরু হয়ে গেছে। সমাজতন্ত্রবাদ প্রসার লাভ করছে। ধনিক সভ্যতার অবসান-প্রায় সোনার যুগে তাঁর আবির্ভাব আর সমাজতন্ত্রের বিকাশ-মুহূর্তে তাঁর তিরোভাব—তাই ইতিহাস ও বিজ্ঞানসচেতন না হয়ে পারেন নি তিনি।

তাঁর ধারণায় যেখানে symmetry, harmony ও symphony নেই, সেখানে সত্য নেই। সত্য ও কল্যাণের পথ দুরূহ কিন্তু গন্তব্য নিশ্চিত শান্তির। 'সত্য যে কঠিন- সে কখনো করে না বঞ্চনা'।

কিন্তু সাধারণ লোক যতটা আপাত-প্রয়োজন-সচেতন, ততটা দূরদর্শী নয় আশুফলপ্রাপ্তিই তাদের লক্ষ্য। এ কারণেই কৃষি ও কৃষকের উন্নতির জন্যে তিনি যা কিছু করেছেন ও করতে চেয়েছেন, তা কৃষকদের মধ্যেও সমাদৃত হয় নি। তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ উপহাস পেয়েছে, তাঁর সমাজচিন্তা পেয়েছে অবহেলা।

৭

আজকের দিনে কে না স্বীকার করে যে, খণ্ড-ক্ষুদ্র হয়ে এ যুগে কেউ বাঁচতে পারে না। বাঁচবার পক্ষে সংহতি ও পারস্পরিক সহযোগিতা অপরিহার্য—ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্র সম্বন্ধে এ সত্য সমভাবে প্রযোজ্য। জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান থেকে যৌথ রাষ্ট্রব্যবস্থা অবধি সংহতি ও সহযোগিতা-লক্ষ্যে গঠিত অসংখ্য সংস্থায় দুনিয়া ভরে গেছে। এ তো সেই বিশ্বানুভূতির ফল। সেই বৈচিত্র্যে ঐক্যসন্ধানের, স্বাতন্ত্র্যে সমন্বয়সাধন প্রয়াসেরও সর্বমানবিকবাদের স্বীকৃতি। অথচ অর্ধশতাব্দী আগে এ তত্ত্ব উচ্চারণ করে রবীন্দ্রনাথ উপহাসই পেয়েছেন :

> একটি মহাযুদ্ধের তূর্যধ্বনিতে আজ যুগারম্ভের দ্বার খুলেছে।...মানুষের সঙ্গে মানুষের সে সম্বন্ধ এক মহাদেশ থেকে আর এক মহাদেশ ব্যাপ্ত, তার মধ্যে সত্যের সামঞ্জস্য যতক্ষণ না ঘটবে ততক্ষণ এই কারণের নিবৃত্তি হবে না। এখন থেকে যে-কোনো জাত নিজের দেশকে একান্ত স্বতন্ত্র করে দেখবে, বর্তমান যুগের সঙ্গে তার বিরোধ ঘটবে, সে কিছুতেই শান্তি পাবে না। এখন থেকে প্রত্যেক দেশকে নিজের জন্য যে-চিন্তা করতে হবে, সে-চিন্তার ক্ষেত্র হবে জগৎজোড়া। চিত্তের এই বিশ্বমুখী বৃত্তির চর্চা করাই বর্তমান যুগের শিক্ষার সাধনা।

অতীতে আমরা রবীন্দ্রনাথের কবিত্বকে মনীষা আর মনীষাকে কবিত্ব বলে জেনেছি। তাঁর বিশ্বচেতনা ও অদ্বৈতবোধ mysticism বলে অবহেলা পেয়েছে আমাদের। তাঁর

যুগচেতনা ও যুগসমস্যার সমাধান-প্রয়াস কবির স্বাপ্নিক-কাঙ্ক্ষা বলে হয়েছে উপহসিত। ফলে রবীন্দ্রচিন্তা তাঁর স্বদেশেও গুরুত্ব পায় নি।

আজ আমরা প্রত্যক্ষ করছি, নানা বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যেও তাঁর ঔপনিষদিক 'বসুধৈব কুটুম্বকম'-বাদ আজকের দুনিয়ায় কবি-কল্পিত তত্ত্বমাত্র নয়, অতি গুরুতর তথ্য এবং মানবজীবনের নিরেট সত্য। অবশেষে রবীন্দ্রনাথের সেই মানবতা, সর্বমানবিকতা বা বিশ্বজনীনতা ও সেই 'মৈত্রীধর্ম' আজ জয়ের পথে,—দেখতে পাই।

৮

পৃথিবীর কোনো একক ব্যক্তির রচনার এমন বিপুল ও বিচিত্র বিস্তার আর দেখা যায় নি। এমন সর্বতোমুখী ও সর্বত্রগামী ভাব-চিন্তা-কর্মও অদৃষ্টপূর্ব। অবশ্য গল্পে-উপন্যাসে-নাটকে-প্রবন্ধে তাঁর সমকক্ষ কিংবা তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ লেখক ইউরোপ খণ্ডে বিরল নয়, কিন্তু কাব্যজগতে, বিশেষ করে গীতিকবিতার ও গানের ভুবনে তাঁর তুলনা বিরল। অনুভূতির সূক্ষ্মতায়, বৈচিত্র্যে, চিত্রায়ণে, মাধুর্যে, তাৎপর্যে, উৎকর্ষে আর অনেকতায় তাঁর গান ও গীতিকবিতা প্রায়-অনুপম। তাঁর স্বভাষী তাঁর কাছে পেয়েছে সৌন্দর্য দেখার চোখ, সুরুচির পাঠ, মানবতার বোধ ও বিশ্বজনীনতায় দীক্ষা। তাঁর কাছে পেয়েছে তারা মুখের ভাষা, কণ্ঠের সুর, প্রাণের প্রীতি, চরিত্রের দার্ঢ্য, আত্মসম্মানবোধ, আনন্দের কাঙ্ক্ষা ও জীবনে প্রত্যয়। আজকের সংস্কৃতিবান-মানবতাবাদী বাঙালিমাত্রই রবীন্দ্রনাথের মানস-সন্তান।

গোলাম মুরশিদ

রবীন্দ্রনাথের গণসচেতনতার স্বরূপ

বাংলা সাহিত্যের বয়স হাজার বছর ধরলে তার ন' শ' বছরই কেটেছে দেবদেবীদের নিয়ে। তখন এর গতিও ছিল নিতান্ত মন্থর। মাত্র এক শ' বছর আগে মানুষ এসেছে তার রাজত্বে বসত করতে। প্রথমে রাজা-বাদশারা তারপর আমলা-জমিদাররা আর সব পেছনে সাধারণ মানুষেরা। 'দুর্গেশনন্দিনী'কে পথিকৃৎ ধরলে, শতাব্দীর একপাদের মধ্যেই রতন, রাইচরণ, চন্দরা, ফটিক এই শ্রেণীর সামান্য লোকদের আগমন নবরাজত্বের দ্রুত সম্প্রসারণ প্রমাণ করে। এখান থেকেই শুরু হল বাংলা ভাষায় গণসাহিত্যের প্রথম অধ্যায়। অন্য কথায় বলা যেতে পারে, 'হিতবাদী'তে রবীন্দ্রনাথের অর্ধ ডজন গল্প প্রকাশের মাধ্যমেই এই যুগের সূচনা। গণসাহিত্যের সীমানা এবং এর আকৃতি-প্রকৃতি সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দ্বারা এখনো চিহ্নিত হয় নি। সাহিত্যের সংজ্ঞা আপেক্ষিক ও পরিবর্তনশীল বলেই নয়, 'গণ' শব্দটিও বহু-অর্থবোধক বলেও এ সংশয়। সাহিত্যের উপাদান ও প্রকৃতি নিত্য বিবর্তিত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথসৃষ্ট গণসাহিত্যের প্রাতিস্বিকতা তাই বর্তমান, এমনকি, ওঁর সমসাময়িক সাহিত্যাদর্শ থেকেও স্বতন্ত্র। এর কারণ দ্বিমাত্রিক। এক, প্রতিবেশের পরিবর্তন; দুই, কবির মানসপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য।

'হিতবাদী'তে 'গল্পগুচ্ছে'র প্রকাশকাল থেকে আরো তিরিশ বছর এগিয়ে যাওয়া যাক। ১৮৯১ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত এ-দেশীয়দের জীবনে কী কী পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি? প্রথমত, রাজনীতির মঞ্চে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা অভিনীত হয়েছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, ক্ষুদিরাম প্রমুখ বিপ্লবীর আত্মবিসর্জন, প্রথম মহাযুদ্ধ, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাযজ্ঞ, খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন এবং সুকঠোর সরকারি দমননীতি—সব মিলে একটা রাজনৈতিক সচেতনতা ও জাগরণের সুর চতুর্দিকে ধ্বনিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম এবং অধ্যাত্মচিন্তা ইতোমধ্যে অপসৃত হয়েছিল 'পার্থিব' সব বিষয়ের তোড়ে। তৃতীয়ত, প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইউরোপীয় নব্য সাহিত্য ও রাশিয়ার নবজাগরণের সঙ্গে অনুবাদ ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষিতদের পরিচয় নিবিড়তর হয়েছিল। চতুর্থত, শহর ও গ্রামে মহাযুদ্ধজাত আর্থিক মন্দা ও নবযান্ত্রিক সভ্যতার ধনবণ্টনের অসাম্য তার বিরাট কালো রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল। ফলে, বিশেষ করে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের—যাদের 'মিল হয় নি বাধায় আর বুদ্ধিতে, মিল হয় নি শক্তিতে আর ইচ্ছায়', তাদের মধ্যে 'প্রোলেটারিয়েট' স্লোগানটা অত্যন্ত স্পষ্ট করে শোনা গেল। এই সমস্তের পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যে একটা নবত্বের ছাপ পড়া অনিবার্য হয়ে পড়েছিল।

সাহিত্য তো আসমানি ফসল নয়, সাহিত্য জীবনেরই প্রতিফলন। কাজেই 'হিতবাদী'তে রবীন্দ্রনাথের কলম বেয়ে যে জনগণের প্রবেশ সাহিত্যের দরবারে, পরিবর্তিত পটভূমিতে তাদের ভিন্নতর পোশাকে দেখা যাবে, এইটেই স্বাভাবিক। এমনকি, এসময়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গণচেতনার স্বরূপ না-হোক রূপ অনেকটা বদলে গিয়েছিল। আর এই একই কারণে রবীন্দ্রনাথের গণসচেতনতার আদর্শ এবং কল্লোল, সংহতি, প্রগতি, কালিকলম প্রভৃতি সাহিত্যগোষ্ঠীর আদর্শের অনৈক্য।

রবীন্দ্রনাথের মানসতায় কী এমন স্বাতন্ত্র্য যা তাঁর সাহিত্যসম্পর্কিত ধারণাকে প্রচলিত ধারা থেকে পৃথক করেছে? তাঁর জীবনী ও সাহিত্য বিশ্লেষণ করলে এই বৈশিষ্ট্যসমূহ সহজেই ধরা পড়তে পারবে।

এমন এক পরিবারে কবির জন্ম হয়েছিল সমাজের আর নিরেনব্বই ঘরের সঙ্গেই যার সর্ববিধ বৈসাদৃশ্য। সে-পরিবারের ধর্ম আলাদা। একে তারা পিরালি ব্রাহ্মণ তদুপরি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে এই দূরত্বকে দুস্তর করে তোলেন। সে-পরিবারের, সুতরাং, বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ। যাঁরা সম্পর্ক রাখতেন, গোপনে আনাগোনা করতে হত তাঁদের। অন্যতর ধর্ম কেবল বাইরের দিক থেকে ব্যবধান রচনা করে নি। স্বতন্ত্র ধর্মীয় ভাবনা ও অনুষ্ঠানাদি ঠাকুর পরিবারের ছেলেদের মনে একটি বিশিষ্ট ধর্মাদর্শও নিশ্চয় সৃষ্টি করেছিল। উপনিষদের পরিমণ্ডলে লালিত রবীন্দ্রমনোলোকে সৌন্দর্য ও শ্রেয়োভাবনাই ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। সেই আলোকেই তিনি অতঃপর জগৎ ও জীবনের মূল্যায়ন করেছেন। তা ছাড়া শৈশব ও কৈশোরে তাঁর ট'পর কড়া নিষেধ ছিল বাইরে বেরোবার।[২] বহিঃসংসারের সংস্পর্শে আসাতে এই যে দুর্ভেদ্য বাধা, যৌবনে তা বাহ্যত অপসারিত হলেও, খুবই স্বাভাবিক, অবচেতন মনের গভীরে যে দূরত্বের শিকড় প্রবিষ্ট হয়েছিল তা উন্মূলিত করে জনগণের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা কোনোদিন সম্ভব হয় নি কবির পক্ষে।

তা ছাড়া শ্যাম চাকরের গণ্ডি[৩] যত হাস্যকর হোক, মনস্তাত্ত্বিক বলবেন, অপরের সঙ্গে নিবিড় সংসর্গে আসায় সে-ও কবির অন্তরের অন্তস্তলে হয়তো প্রবল প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছিল। পরবর্তী জীবনে শ্যাম চাকরের গণ্ডি, অভিভাবকের সদাসতর্ক প্রহরা ঘুচেছিল কিন্তু মনের ভিতরে অদৃশ্য একটি কাঁটা সতত জনসঙ্গমে বাধা দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সোচ্চার অস্বীকৃতি[৪] সত্ত্বেও সাধারণ-বিশ্বাস ধনীর সন্তান তিনি। একথা অনেকাংশে সত্য। বলা বাহুল্য, জনগণের সঙ্গে মেলামেশায় সে-ও কম অসুবিধে সৃষ্টি করে নি। ছেলেবেলায় স্কুলে যেতেন গাড়িতে করে, ফিরে এসে বন্দী হতেন পুনর্বার চতুর্দেয়ালের ভিতরে। এর মধ্যে বাইরের সংস্পর্শে আসার ফুরসত কোথায়? 'অশিক্ষিত অকর্মণ্য' বলে যৌবনে ওঁর ওপর ভার পড়ল জমিদারি তদারকির। এতদিন প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে অবাধ মিলনের পথে যে দুর্মোচনীয় ব্যবধান ছিল, মনে করা সঙ্গত, এবারে তা অপসৃত হল। অথচ, কী আশ্চর্য, অন্তরের দিক থেকে যে বাধা ছিল মিলনকে সে ঠেকিয়ে রাখল। তাই দেখতে পাচ্ছি, শত আন্তরিক সম-অনুভূতি সত্ত্বেও তিনি যে জমিদার তা না নিজে বিস্মৃত হতে পেরেছেন, না প্রজাসাধারণ। এ স্থলে 'রাজসম্মান' এবং 'প্রেসটিজ' দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান তৈরি করেছে।[৫] সম্মানের এই নির্বাসন কেবল যৌবনেই নয়, আজীবন তাঁকে আপামর জনসাধারণ থেকে দূরে রেখেছে। সম্মান, দৃশ্যত, পরিচয় একের সঙ্গে বহুর, কিন্তু ধরণীর এক কোণে একটুকু ভালবাসা যাঁর কাম্য, সম্মান তাঁর স্নেহবুভুক্ষু অন্তরে শান্তি দেয় না, বরং বহুর কোলাহলে নিবিড় পরিচয়কে আহত করে। খ্যাতির খররৌদ্রে আশ্রয়হীন কবি শ্রান্তিতে ভেঙে পড়েছেন।[৬] সম্মানের আপাতসুখ রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাই প্রকৃতপক্ষে অনেক সময়ই দুর্বহ

অন্তরবেদনার কারণ হয়েছিল। বলেছেন, সম্মানের চিরনির্বাসনে সমাজের উচ্চমঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে। তাই যেখানে চাষা চাষ করছে, জেলে জাল ফেলছে, তাঁতি তাঁত বুনছে সেখানে কোনোকালেই প্রবেশ করতে পারি নি।[৭]

অথচ সকলের সঙ্গে মিলনের ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা তাঁর সমগ্র হৃদয়ে ব্যাপ্ত ছিল, যদিও মিলনের পথ রুদ্ধ, এই মর্মান্তিক ট্র্যাজেডির কথা তিনি নানা স্থানে বলেছেন।

> জন্মকাল থেকে আমাকে একখানা নির্জন নিঃসঙ্গতার মধ্যে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তীরে দেখতে পাচ্ছি লোকালয়ের আলো, জনতার কোলাহল; ক্ষণে ক্ষণে ঘাটেও নামতে হয়েছে, কিন্তু কোনোখানে জমিয়ে বসতে পারি নি। বন্ধুরা ভাবে তাদের এড়িয়ে গেলুম; শত্রুরা ভাবে, অহংকারেই দূরে দূরে থাকি। যে-ভাগ্যদেবতা বরাবর আমাকে সরিয়ে সরিয়ে নিয়ে গেল, পাল গোটাতে সময় দিলে না, রশি যতবার ডাঙার খোঁটায় বেঁধেছি টান মেরে ছিঁড়ে দিয়েছে, সে কোনো কৈফিয়ত দিলে না।[৮]

অন্তরের ভেতরে এই যে বিপ্রতীপভাবের সন্নিবেশ, বলা নিষ্প্রয়োজন, রবীন্দ্রগণচেতনাকে বিশিষ্ট রঙে রঞ্জিত করেছে। তাই রবীন্দ্রনাথ সমাজের নিচের তলার মানুষের কথা যখন বলেছেন, অন্তরদরদ তখন অবশ্যই প্রকাশ পেয়েছে; কিন্তু তিনি তাদের সঙ্গে কোথায়ও কি একাত্ম হতে পেরেছেন! তিনি লিখেছেন, ওরা কাজ করে, নিষ্করুণ অপচয় থেকে বাঁচাতে হবে এদের। ওরা, এদের, এ সমস্ত সর্বনামের ব্যাখ্যা করে মার্ক্সবাদী সমালোচক বলবেন, এটা উদার বুর্জোয়ার সস্তা সহানুভূতি। এ নিন্দার কথা মেনে নিয়ে বলতে হয়, রবীন্দ্রনাথ প্রলেটারিয়েটদের একজন ছিলেন না, তাদের সঙ্গে অভিন্ন বোধ করতে পারেন নি—পূর্বেই কথিত হয়েছে তাঁর স্বভাবের গভীরে একাকিত্বের একটি বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছিল প্রতিবেশের কারসাজিতে। জনতা ও তাঁর মধ্যেকার গরাদ তাই কখনো সরে যায় নি সম্পূর্ণরূপে।

কিন্তু জন্মমানবপ্রেমিক, তিনি চতুর্দিকের অজানা মানুষদের দেখেছেন প্রীতির রসে অভিষিক্ত করে। 'মানুষের মন চায় মানুষেরই মন'—এ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন কৈশোরোত্তর কালেই। কিন্তু উপর্যুক্ত পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সম্মানের নানা উপসর্গের দরুন ভালোয়-মন্দয় মেশানো সগুণ মানুষকে তিনি ক্বচিৎ লাভ করেছেন। অথচ তিনি মনে করতেন :

যাহা কিছু হেরি চোখে কিছু তুচ্ছ নয়;
সকলি দুর্লভ বলে আজি মনে হয়।
দুর্লভ এ ধরণীর লেশতম স্থান,
দুর্লভ এ জগতের ব্যর্থতম প্রাণ।[৯]

তিনি জানতেন যারা আছে মাটির কাছাকাছি অশেষ প্রেম তাদেরও মধ্যে বর্তমান।

আজি যার জীবনের কথা তুচ্ছতম
সেদিন শুনাবে তাহা কবিত্বের সম।[১০]

যদিচ তাঁর আফসোসের সীমা নেই

পরম আত্মীয় বলে যারে মনে মানি
তারে আমি কতদিন কতটুকু জানি।[১১]

এই অর্ধ-পরিচয়ের আলোকে কবি তাই তাঁর পরিপার্শ্বকে দেখেছেন সঠিক স্বরূপে নয়, আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে। এই বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে সাধারণ মানুষকে দেখার জন্যেই রবীন্দ্রগণচেতনা ভিন্ন প্রকৃতির। 'ছিন্নপত্রাবলী', 'পঞ্চভূত' প্রভৃতিতে এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় অনায়াসলভ্য। উচ্ছ্বসিতভাবে তিনি প্রজাদের যে কথা বলেছেন তা তাদের ভালবাসা, তাদের

নানা মানুষী আনন্দ বেদনা–দুর্বলতার প্রসঙ্গে। কবির চোখ ছলছল করে উঠেছে ক্ষণে ক্ষণে, তা তাদের দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম দেখে ততটা নয়, যতটা তাদের মধ্যে চিরন্তন মানবত্বের পরিচয় পেয়ে।[১২] কবি নিজেই বলেছেন, পল্লীবাংলাকে কী এক আশ্চর্য বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তিনি দেখেছিলেন।[১৩] প্রতিদিনের দুঃখ–দারিদ্র্য অভাব–অনটনের ছবিও তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং তাতে বিচলিত হয়ে আপন প্রকৃতিতে বৈপরীত্য থাকা সত্ত্বেও পল্লীর কাজে কোমর বেঁধে নেমেছিলেন।[১৪] কিন্তু যা তাঁকে সবচেয়ে বেশি অভিভূত করেছিল সে হচ্ছে সাধারণ সব লোকের মধ্যে অসাধারণ শাশ্বত মনুষ্যত্বের প্রকাশ। এই জিনিসটিই অপরিসীম সহানুভূতির সঙ্গে তিনি এঁকেছেন তাঁর রচনায়। রতনের[১৫] জীবনে দৈনন্দিন অর্থাভাব বা অন্নকষ্ট ততটা নেই, যতটা আছে তার মধ্যে নারীত্বের পরিচয়। রাইচরণ[১৬], ফটিক[১৭], কবির ভৃত্য[১৮], শঙ্কর[১৯] এরা সবাই ভৃত্য কিন্তু কোথাও তাদের দৈন্যের বিবরণ নেই, এরা মানুষ এইটেই মুখ্য উপপাদ্য বিষয়। রহমত কাবুলিওয়ালা[২০], দুহাজার মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে যে এসেছে জীবিকার সন্ধানে, কবির কাছে তার জীবিকা–অন্বেষণবৃত্তান্ত অবান্তর। কিন্তু কী অপূর্ব সম–অনুভূতিতে রুক্ষ–রহমত আর বাঙালি–লেখকের কোমল মনের ঐক্য নির্দেশ করেছেন তিনি, তাই লক্ষযোগ্য। এমনকি সপ্তপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে উপেন[২১] কোথাও জীবন ধারণের মধ্যে সামান্যতম সংগ্রামে বিব্রত হয়েছে এমন নজির কবিতায় অনুপস্থিত। 'নির্বোধ সর্বকর্মপণ্ডকারী' রামকানাইয়ের[২২] প্রাত্যহিক জীবন দৃশ্যগোচর নয়, অন্তত সে–বর্ণনা দিতে লেখক উৎসাহী নন, কিন্তু যেখানে সে যুধিষ্ঠিরের চেয়ে সততায় সত্যবাদিতায় কোনো অংশে ন্যূন নয়, সেখানে রবীন্দ্রনাথের কলম অকুণ্ঠিত। লেখকের কৌতুক–আলোকে বিপন্ন রামকানাইয়ের অসহায়তা ও দুঃখ এবং তার মনুষ্যত্ব যুগপৎ উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত। চন্দরার[২৩] দুঃখদৈন্য অনুক্ত, লেখক প্রতিবিম্বিত করেছেন অভিমানিনী একটি নারীর ছবি।

অন্য দিকে বর্তমান শতকের তৃতীয় দশকে বাংলা সাহিত্যে যে নবত্বের ঝড় এল (সঙ্গত কারণেই), তার আলোড়নে বাস্তবতার নবমূল্যবোধ ও নবসাহিত্যাদর্শ একটি বৃহৎ লেখক ও পাঠকগোষ্ঠীর প্রতিকূল পরিবেশবিক্ষুব্ধ চিত্তে বাসা বাঁধল। মানুষের দারিদ্র্য এবং ধন ও রাজতন্ত্রের স্বৈরাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হল সাহিত্যের ধুয়ো। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সমস্যাগুলো সাহিত্যের মুখ্যবস্তু হিসেবে গণ্য হতে লাগল। এবং সমকালীন মানুষের জীবনের অন্ধকার দিক—'গুহাগহ্বরের যত ভাঙাচোরা রেখাগুলি'[২৪] সাহিত্যাঙ্গনে বিশেষ গৌরব লাভ করল। সাময়িক এই আবেগের জোয়ারে অতিরেক নিশ্চয় ছিল। রবীন্দ্রনাথ এই 'আদিখ্যেতা'টাই মেনে নিতে পারেন নি। যদিও বস্তুজগৎ সম্বন্ধে তাঁর কোনো শুচিবাই ছিল না, কিন্তু সাহিত্যে বাস্তবতার স্বরূপ নিয়ে তাঁর একটি নীতি ছিল। তাঁর মতে ছিল সাহিত্য বস্তু নয়; বস্তুর অনুকৃতিও নয়। তাই বস্তুজগতে যা তিনি দেখবেন তাকেই হুবহু প্রতিবেদন করবেন না বরং আপন মনের রঙে তাকে নবরূপ দান করবেন। সাহিত্যিক বস্তুর লালক নয়, বস্তুর স্রষ্টা। বাস্তব জীবনে এমন অনেক অসংলগ্ন অস্বাভাবিক অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে, যেগুলো অস্বীকার করা অসম্ভব, কিন্তু সমগ্র জীবনের প্রেক্ষিতে তা খণ্ডিত। 'যাহা রুগ্‌ণ, যাহা ভগ্ন পঙ্কস্তর তলে' সেই রূঢ় বাস্তবতাকে রবীন্দ্রনাথ 'আত্মপ্রবঞ্চনা ছলে'[২৫] অস্বীকার না করলেও অবজ্ঞা নিশ্চয়ই করেছেন। সেই কারণেই দরিদ্রজনের যে–জীবনযাত্রা তাঁর গল্প কবিতায় রূপায়িত, তাতে মানুষের প্রাণধারণের জন্যে প্রাণপণ প্রযত্নের সকরুণ দিকটি আংশিক বর্জিত। 'চিরন্তন মানবের মহিমা'র জয়ধ্বনি তিনি দিয়েছেন। কারণ তিনি একান্তভাবেই বিশ্বাস করতেন অশান্তির ঘূর্ণি জীবনকে কেবল ক্ষণিক বিদ্রূপ করতেই

পারে। তাঁর ধারণা ছিল জীবনসংগ্রামের কালো দিকটিই শুধু সাহিত্যে চিত্রিত হবে না তার মধ্যে একটি আশা ও আনন্দের বাণী যেন সদাজাগরূক থাকে। অবদমিত মনোবাঞ্ছা যেমন স্বপ্নে চরিতার্থতা লাভ করে, শতচিহ্নবিক্ষত জীবনের আনন্দ এবং বিলাসও যেন তেমনি প্রতিবিম্বিত হয় সাহিত্যদর্পণে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে রাত্রির অন্ধকারে
দেবতার কাছে যে অসম্ভব বর মাগি
সে বর আমি পাব না,
কিন্তু পায় যেন তোমার নায়িকা।[২৬]

সকল পাঠক কি এই ইচ্ছাই পোষণ করেন না মনের গোপনে?—'পড়তে পড়তে বুক যেন ওঠে ফুলে'।

দারিদ্র্যদুঃখ–অঙ্কনে রাবীন্দ্রিক ও আধুনিক নীতিতে এই–যে ভেদ সেটা মোটেই বর্ণগত নয়, পার্থক্যটা প্রকৃতিগত। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন সাহিত্যের শর্ত অটুট রেখে অঙ্কিত হবে বিত্তহীনতার বেদনা। পূর্ণাঙ্গ একটি চিত্র রচনা করতে দারিদ্র্য দুঃখ আসবে, যতটা স্বাভাবিক। জোর করে আমদানি করলে যত মর্মস্পর্শী হোক তাতে করে লেখকের দারিদ্র্যই প্রকাশ পাবে। মুকুন্দরাম থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন, 'সাহিত্যে ধনী বা দরিদ্রকে বিষয়বস্তু করা দ্বারায় তার উৎকর্ষ ঘটে না, ভাব–ভাষা সমস্তটা জড়িয়ে একটি মূর্তি সৃষ্টি হলো কি না এইটেই লক্ষ্য করবার যোগ্য। তুমি খাও ভাঁড়ে, আমি খাই ঘাটে—দারিদ্র্যদুঃখের বিষয় হিসেবে এর শোচনীয়তা অতিনিবিড়, কিন্তু তবু কাব্য–হিসেবে এতে অনেকখানি বাকি রইল।'[২৭] এক কথাতে কবি বলেছেন, দারিদ্র্য নিয়ে 'আস্ফালন' যেন কোথাও না–থাকে। 'জঙ্গলে–আবিষ্ট ভাঙ্গা মেটে পাঁচিলের গা বেয়ে বাগ্‌দি বুড়ি বিকেলের পড়ন্ত রৌদ্রে ঘুঁটে সংগ্রহ করে আপন ঝুড়িতে তুলছে, আর পিছনে–পিছনে তার পোষা নেড়ি কুকুরটা লাফালাফি করছে, এই ব্যাপারটি যদি তথ্য মাত্রের সামান্যতা থেকে পৃথক করে এর নিজের অস্তিত্ব গৌরবে দেখি তা হলে এও জায়গা নেবে ভাবের নিত্যজগতে।'[২৮] রবীন্দ্রগণচেতনার আদর্শ এখানে স্ফটিকসদৃশ অচ্ছ। সকলে মিলে দারিদ্র্যকে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করার যে 'হুজুগ' কবি তাকে মানতে পারেন নি; বলেছেন সাহিত্যে পানওয়ালী বা খনিক আপনি এসে পড়ল তো ভালোই, কিন্তু সেই এসে পড়াটা যেন যুগধর্মের একটা কায়দার অন্তর্গত না হয়।[২৯] যুগের এই আন্দোলনের অভিঘাতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যাদর্শ পরিবর্তন করেন নি, জনপ্রিয়তার প্রলোভনও তাঁকে বিচলিত করতে পারে নি।

অথচ গণজীবনের নিত্যসংঘাতের প্রতি ওঁর সহানুভূতির ঘাটতি ছিল না। এ সম্বন্ধে তাঁর উক্তি :

যেথা ঐ বাস্তব জগৎ
সেখানে আনাগোনার পথ
আছে মোর চেনা
সেথাকার দেনা
শোধ করি সে নহে কথায় তাহা জানি—
তাহার আহ্বান আমি মানি।
দৈন্য সেথা, ব্যাধি সেথা, সেথায় কুশ্রীতা,
সেথায় রমণী দস্যুভীতা—
সেথায় উত্তরী ফেলি পরি বর্ম,

সেথায় নির্মম কর্ম,
সেথা ত্যাগ, সেথা দুঃখ, সেথা ভেরি বাজুক 'মাভৈঃ'
শৌখিন বাস্তব যেন সেথা নাহি হই।[৩০]

[illegible] চরণটি তৎকালীন গণসাহিত্যিকদের বিদ্রূপ করে লেখা। সমাজের নিম্নভূমির দৈন্য, [illegible], কুশ্রীতা সম্পর্কে কবি ষোল আনা সজাগ ছিলেন। তার চাপে মানুষের সকরুণ [illegible]দৃষ্টে ওঁর স্পর্শকাতর অতিসংবেদনশীল সমগ্র কবি-আত্মা বিমূঢ় বিচলিত হয়েছিল। [illegible] প্রতিকারনিমিত্ত আপন সাধ্যানুযায়ী প্রয়াসের ত্রুটিও করেন নি। তিনি বুঝেছিলেন বাইরে [illegible] আর্থিক সহায়তা অথবা সহানুভূতির দ্বারা দারিদ্র্যের এই অতল হ্রদ ভরাট করা যাবে [illegible]। তাই প্রধানত অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন ও শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্যে তিনি [illegible]ক্ষামূলকভাবে আজ থেকে সত্তর বছর আগে শিলাইদহ, কালীগ্রাম, পতিসর প্রভৃতি [illegible] সমবায় ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। আংশিক সফলতাদৃষ্টে এই ব্যবস্থার সর্বাঙ্গীণ [illegible]কল্পে এমনকি নোবেল প্রাইজের বাবদ প্রাপ্ত গোটা টাকাটা পতিসর কৃষি ব্যাংকে জমা [illegible]। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সালিসি ব্যবস্থা, কুটির শিল্প, শিক্ষা, চিকিৎসা, জলকষ্ট [illegible]করণ, আদর্শ কৃষি-খামার প্রতিষ্ঠা, ধর্মগোলা স্থাপন, সামাজিক উৎসব, পল্লীপরিসংখ্যান [illegible] প্রভৃতি নানা বিষয় ছিল কবিপ্রবর্তিত সমবায় সমিতির কাজ। এই সমস্ত উদ্দেশ্য [illegible]ভাবে সফল হয়েছিল পরবর্তীকালে স্থাপিত শ্রীনিকেতনে।[৩১] রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে [illegible]নেই সমসাময়িক তরুণ সাহিত্যিক ও প্রৌঢ় রাজনীতিকদের প্রভেদ। ওঁরা সাহিত্যে, [illegible]দপত্রে, সভামঞ্চে দরিদ্রনারায়ণকে নিয়ে যতটা হইচই করতেন, সে-তুলনায় রবীন্দ্রনাথ [illegible] নির্বাক ছিলেন। কিন্তু বাস্তব জীবনে তিনি পল্লী পুনর্গঠনের যে-মহান কার্য অত পূর্বে [illegible] করেছিলেন তার অন্য কোনো দৃষ্টান্ত সেকাল বা একালে অনুপস্থিত। বর্তমানে [illegible]স্তানে (PARD) ও ভারতে যে পল্লী পুনর্গঠনের কাজ আরম্ভ হয়েছে তা নিতান্তই সরকারি [illegible]গে। প্রতিভাবান তিনি, সেই সুদূর অতীতেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, দরিদ্র [illegible]বাসীকে আত্মশক্তিতে যদি প্রবুদ্ধ করা না যায় তা হলে সরকারি সাহায্যের দ্বারা তাদের [illegible] দৈন্য মোচন করা যাবে না। কিন্তু বাস্তব জীবনে যিনি দীনবন্ধু, তাঁর সাহিত্যাদর্শ ছিল [illegible]ত সৌন্দর্যবোধভিত্তিক; তাই সাহিত্যে এই রিক্ত নিরন্নদের জীবন কতটা আসতে [illegible]বে সে সম্পর্কে ওঁর স্বতন্ত্র ধারণা ছিল।

এ কথা অবশ্য অনস্বীকার্য, কল্লোল কালিকলমের আন্দোলনের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ কিঞ্চিৎ [illegible]বিত হয়েছিলেন। 'তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা—/ আমার সুরের অপূর্ণতা', [illegible]ত্যের আনন্দের ভোজে/ নিজে যা পারি না দিতে, নিত্য আমি থাকি তারি খোঁজে'[৩২] [illegible] বাক্যের মধ্যে যে প্রত্যক্ষ স্বীকৃতি তার সূচনা 'পরিশেষ', 'পুনশ্চ' থেকে। তাই [illegible]পদ কেরানির[৩৩] জীবনসংগ্রামের চিত্র খানিকটা দেখা গেছে। টিকটিকির সঙ্গে তার [illegible], দত্তদের বাড়ির ছেলেকে পড়িয়ে তার খেতে পাওয়া, আলো জ্বালাবার দায় থেকে [illegible] জন্যে শেয়ালদা ভ্রমণ, বর্ষায় দুর্গতি, কিনু গোয়ালার গলির আমের খোসা ও আঁটি, [illegible]লের ভুতি, মরা বেড়ালের ছানা, ছাইপাঁশ সবকিছুই কবির নবলব্ধ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। [illegible]'র আমলের সঙ্গে তার তুলনা করলেই সে পরিবর্তন সুস্পষ্ট হয়। প্রতিবেশের দীনতা [illegible]র্বে তাঁর রচনায় এমন প্রলম্বিত ও সূক্ষ্মভাবে আর কখনো অঙ্কিত হয় নি। কিন্তু কবির [illegible] সহানুভূতি ও স্বতঃস্ফূর্তি কোথায়? না, যেখানে আকবর বাদশার সঙ্গে হরিপদ কেরানির [illegible] ভেদ নেই, যেখানে মহাকাল ও মহাবিশ্বের পটভূমিকায় ছেঁড়াছাতা ও রাজছত্র [illegible]কার হয়ে গিয়েছে। "ছেলেটা"[৩৪], "সাধারণ মেয়ে"[৩৫], "বাঁশিওয়ালা"[৩৬], "ওরা কাজ

করে’”[৩৭] সর্বত্রই জীবনসংগ্রামের ঘনিষ্ঠতর ছবি রয়েছে। অন্তত বুঝতে পারা যায়, কবির দৃঢ়ভিত্তি আদর্শ বিচলিত কখনো কখনো। তাই কোথাও কোথাও দারিদ্র্যের দ্বারা খাবলে দেওয়া জীবন চিত্রণের প্রতি মন অনুকূল হয়েছে কিন্তু সৌন্দর্যমহিমার যে-নীতি তাঁর রচনায় সতত সর্বথা ক্রিয়াশীল, তা-এই কঠোর বাস্তব প্রতিবেদনে তাঁর মনকে নিরুৎসাহ করেছে। শেষ পর্যন্ত যে ছবি তাঁর তুলি দিয়ে বেরিয়ে এসেছে তা বেদনাকরুণ কিন্তু তার চেয়েও বেশি সুন্দর।

মহাযুদ্ধ বা তেমন-কোনো ঘূর্ণিঝড়ে ক্বচিৎ সংশয়িত হলেও, শাশ্বত মানবমহিমার প্রতি রবীন্দ্রনাথের মন চিরকাল আস্থাবান ছিল। পৃথিবীর ধূলিকণা পর্যন্ত মধুময়—এ বিশ্বাসের প্রতি নেতিবাচক হয় নি তাঁর অন্তর। তাই নৈরাশ্যবাদকে কখনো স্বীকৃতি দেন নি,

রুগ্ন যদি রোগেরে চরম সত্য বলে,
তাহা নিয়ে স্পর্ধা করা লজ্জা বলে জানি।[৩৮]

মানুষ সম্বন্ধে একটা আশাবাদ তিনি সর্বদা পোষণ করেছেন।

দুঃখেরে দেখেছি নিত্য, পাপেরে দেখেছি নানা ছলে;
অশান্তির ঘূর্ণি দেখি জীবনের স্রোতে পলে পলে
মৃত্যু করে লুকোচুরি
সমস্ত পৃথিবী জুড়ি।[৩৯]

বা

অপূর্ণ শক্তির এই বিকৃতির সহস্র লক্ষণ
দেখিয়াছি চারিদিকে সারাক্ষণ

তাই বলে এইটেকেই চরম জ্ঞান করে তিনি হতাশ হন নি :

চিরন্তন মানবের মহিমারে তবু
উপহাস করি নাই কভু।[৪০]

কবি মনে করতেন সাহিত্যে জীবনের এই কালো দিকটাই শুধু প্রাধান্য পেলে সাহিত্যসৃষ্টির সাবলীলতা ব্যাহত হবে। ‘মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত না-পাই যদি’ বীরের রক্তস্রোত, মাতার অশ্রুধারা সব যদি ধরার ধুলায় হারিয়ে যায়, রাত্রির তপস্যা ঊষার উদয়কে যদি ডেকে না-আনে, তবে নিদারুণ দুঃখরাতে মানুষ কোন্ আশা নিয়ে বাঁচবে? মানুষের বাইরের শত অপমানই যদি সাহিত্যের একমাত্র বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়; তার প্রাণের ঐশ্বর্য, শতদুঃখতাপের মধ্যেও যা অম্লান জ্যোতিতে দীপ্যমান হয়ে থাকে, তার ষোল-আনা অবজ্ঞা, মানসিকতার প্রকৃতিস্থতা প্রমাণ করে না। রবীন্দ্রাদর্শ অনুযায়ী তা অসাহিত্য। তাই মানুষের প্রাত্যহিক দৈন্যের দিকটি মেনে নিয়েও তার যা শ্রেষ্ঠধন, যা শুধু চমকে ঝলকে, দেখা দেয় মিলায় পলকে, তাকেই উচ্চতর আসন দিয়েছেন। এ সম্বন্ধে সমকালীন একটি উক্তি তাঁর আছে,

> প্রকৃতির মধ্যে একটা নির্মল প্রসন্নতা আছে। ব্যক্তিগত জীবনে অবস্থার বিপ্লব ঘটে, কিন্তু তাতে এই বিশ্বজনীন দানের মধ্যে বিপ্লব ঘটে না—সেই আমাদের সৌভাগ্য। তাতে যদি আপত্তি করার একটা দল পাকাই তা হলে বলতে হয়, যাঁরা নিঃস্ব তাঁদের জন্যে মরুভূমিতে উপনিবেশ স্থাপন করা উচিত, নইলে তাঁদের মনের তুষ্টি অসম্ভব। নিঃস্ব শ্রেণীর পাঠকদের জন্য সাহিত্যেও কি মরু-উপনিবেশ স্থাপন করতে হবে।[৪১]

গণসাহিত্য সম্বন্ধে কবির বিশ্বাস এখানে সুস্পষ্টরূপে প্রকটিত। আমাদের রুগ্‌ণ-প্রতিবেশে প্রকৃতির নির্মল সুস্থতাই আরামের প্রলেপ দিতে পারে; ব্যথার উদ্‌গার রোগকে কেবল আরো মারমুখী করে তোলে। দুঃসহ দুঃখের বেড়াজালে নিরুপায় মানুষকে দেখে সান্ত্বনাদানের

তাঁর চিত্ত যখন আকুলিত তখন একটি মাত্র উপায় তাঁর কাছে প্রতিভাসিত হয়েছে, অন্তরে নিগূঢ় সত্যের রূপায়ণ।[৪২] তাই অধমের বহির্জীবন অপেক্ষা অন্তর্লোক সাহিত্যে অধিকতর আগ্রহে সৃজিত। সৃষ্টির আনন্দেই সাহিত্য—নিরন্ন কামার-কুমোর- এলেও সই, বৃহত্তম বুর্জোয়া এলেও সই।

রাজার, ধর্মের, সমাজের শাসনে প্রপীড়িত, শোষণে নিঃশেষিত একান্ত রিক্ত বঞ্চিতদের কাতর হয়ে আপনার সৌন্দর্যসাধনাকে কবি একদিন ধিক্কার দিয়েছিলেন। এদের জন্যে আপনার সর্বস্ব নিয়োজিত করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করে বিশ্ববাসীকে আহ্বান লেন,

এই সব মূঢ়ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা
এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।[৪৩]

পরমুহূর্তেই তাঁর কবিমন ধরার ধূলিস্পর্শহীন সুদূর নক্ষত্রলোকে বিচরিত। লোকান্তরে সৌন্দর্যপিয়াসী আদর্শবাদী সে-অন্তরের অভিযাত্রা। এই স্ববিরোধ কি কী? কিনু গোয়ালার গলির আবর্জনা-কুণ্ডে প্রবেশ করেই তাকে দুর্বিষহ মাতালের পের মতো মনে করার কারণ কী? এইটেই হচ্ছে রবীন্দ্রমনীষা ও কবিত্বের দ্বন্দ্ব। কুলের অধিকাংশই যে তাঁর গণচেতনা সম্বন্ধে অজ্ঞ বা সন্দিহান তার নিগূঢ় রহস্য মত এখানে। পূর্বেই বলা হয়েছে বাস্তবজীবনে প্রজাসাধারণের ক্ষুধা ও অজ্ঞানতামুক্তির পল্লীপুনর্গঠন ইত্যাদি কার্যক্রমের মধ্যে রবীন্দ্রমনীষার প্রোজ্জ্বল স্বাক্ষর বর্তমান। এবং উত্তুঙ্গ সৌন্দর্যচেতনা তাঁর সাহিত্যে সতত উপস্থিত। এই বাস্তববুদ্ধি তাঁর সাহিত্যকে দারিদ্র্যপ্রসঙ্গমুখর করে তুলেছে, আবার গণসাহিত্যও তাঁর সৌন্দর্যবোধের দ্বারা। এই কারণে নিরঙ্কুশ দৈন্য তাঁর রচনায় অবর্তমান। সেটা আন্তরিকতার অভাবজনিত সৌন্দর্যবুদ্ধিজাত। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের আন্তরিকতা সন্দেহের অতীত। বরং তাৎকালিক সাহিত্যিকদের আন্তরিকতাবিহীন ভঙ্গিসর্বস্ব সাহিত্য তাঁকে সুতীব্ররূপে উদ্‌বেজিত করেছে। 'সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি/ ভালো নয়, ভালো নয়, নকল শৌখিন মজদুরি'[৪৪] ইত্যাদি সতর্কতা ও ঘৃণার বাণী তিনি একবারই উচ্চারণ করেন নি। যতার প্রলোভনে দারিদ্র্যের কারি-পাউডার দিয়ে সাহিত্যিক অপথ্য তৈরির বিরুদ্ধে[৪৫] বহুবার হুঁশিয়ার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গণসাহিত্যের মূল্যায়ন হতে পারে কতার গভীরতা দিয়ে।

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন সভ্যতার পিলসুজ কর্মী মানুষ—তেলকালি যার গা বেয়ে ক্ষরিত—তার মুক্তি আছে আত্মশক্তির উদ্বোধনে। গণআন্দোলনের তাই তিনি প্রবল ছিলেন। নগরের সুসজ্জিত প্যান্ডালে বক্তৃতা করে সমকালীন রাজনীতিকদের দেশকে করার হাস্যকর প্রয়াসকে তাই তিনি কোনোদিন অনুমোদন করেন নি। বরঞ্চ অজ্ঞ কে স্বাধীনতার যথার্থ মর্ম বুঝিয়ে দিতে বলেছেন প্রয়োজনীয় মৌল শিক্ষার দ্বারা। এবং ছেন, অর্থনৈতিক সচ্ছলতার জন্যে তাদের স্বাবলম্বী করে তুলতে। আত্মশক্তি ও ওকে প্রবুদ্ধ করে তোলার তাঁর এই প্রচেষ্টা পল্লীপুনর্গঠনে যেমন প্রকাশিত, সাহিত্যেও আন্দোলনে তাঁর সে-আদর্শ উদ্ভাসিত। 'প্রায়শ্চিত্ত', 'পরিত্রাণ' ও 'মুক্তধারা' নাটকের বৈরাগী যে-আদর্শ প্রচার করেছে, সেটাই এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বাস্তববুদ্ধির মণ্ডিত রূপ। ধনঞ্জয় বৈরাগী নেতা হতে চায় না, সে কেবল মূর্খ জনসাধারণের কের অন্তরে যে-চালক আছে অধিষ্ঠিত তাকে অচৈতন্য থেকে জাগিয়ে তুলতে গামী। যখন সে সুপ্তি ভেঙে জেগে উঠবে, সেদিন পায়ের বেড়ি, হাতের কড়া, দ্বারের

অর্গল ভেঙে খান খান হয়ে পড়বে। ধনঞ্জয়ের জন্ম ১৯০৯ সালে। আরো এক যুগ প[illegible] চিত্তশক্তির উদ্বোধনের দ্বারা, মার দিয়ে নয়, মার খেয়ে দেশকে পরাধীনতামুক্ত করতে [illegible] হয়েছিলেন গান্ধীজী। গান্ধীজীর আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হয় নি; কিন্তু স্বল্পকালেই তা স্বব[illegible] ব্রিটিশরাজের টনক নাড়িয়েছিল। গণআন্দোলনের রাবীন্দ্রিকভাবনা আদর্শায়িত, অবাস্ত[illegible] দীর্ঘদিন তার সফলতার জন্যে আবশ্যক, কিন্তু তা চিরস্থায়ী ফলদায়ক।

আন্দোলনের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ কোন্ সমাজব্যবস্থা প্রচলনে আগ্রহী? কোনো বু[illegible] অথবা সোশ্যালিস্ট সমাজ নয়। তিনি কেবল নিচের তলার মানুষগুলোকে আবর্জনাস্তূপ [illegible] টেনে তুলতে চান। যাতে তাদের আবদ্ধ ঘরেও প্রাণের হাওয়া বয় সেই তাঁর একমাত্র কা[illegible] 'সব রাজত্বটাই কি রাজার? অর্ধেক রাজত্ব প্রজার নয় তো কি?'[৪৬] শাসক এবং শাসি[illegible] পর্বতপ্রমাণ বৈষম্য দূর হোক এটাই তাঁর লক্ষ্য।

আজকের মতো বলো সবাই মিলে—
যারা এতদিন ছিল মরে তারা উঠুক বেঁচে,
যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে, তারা
দাঁড়াক একবার মাথা তুলে।[৪৭]

বিশ্বের বিশালবিস্তৃত পথে অনাগত কাল থেকে চলছে অগণিত মানুষের ধারা; সেই প[illegible] বন্ধুরতা ঘুচিয়ে দিতে কবি আহ্বান করেছেন। 'কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু, কোথাও গ[illegible] গর্ত, করতে হবে সমান। তবে ঘুচবে বিপদ।'[৪৮] কিন্তু কোনো স্থানে কবি প্রলেটারি[illegible] সমাজ গড়ার প্রস্তাব করেন নি। কারণ তাতেও একটা ইজমের জয় ঘোষিত হবে; [illegible] আবার ছোটরা অন্যান্য থেকে সুউচ্চে জায়গা নেবে; সেও একটা বৈষম্য। 'যদি ছোটো[illegible] মাতলামি করতে থাকে তখন নবযুগের উঁচুতে-নিচুতে নতুন বোঝাপড়া হবে।' আ[illegible] ভাবনাটিও বিশেষ সৌন্দর্যচিন্তার দ্বারা পরিশীলিত। এখানেও মনীষার সঙ্গে কবিত্বের [illegible] মিশেছে।

উপসংহারে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের গণসচেতনতার স্বরূপ একান্তই রাবী[illegible] সম্পূর্ণরূপেই তাঁর নিজস্ব। তাঁকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে হলে কোন্‌টা তাঁর কা[illegible] কোন্‌টা মনীষা তার প্রভেদ যথার্থরূপে নিরূপণ করা চাই। সাধারণ মানুষের জন্যে ওঁর [illegible] সাহিত্য ও পল্লীপুনর্গঠনের কাজে কতটা ব্যক্ত হয়েছে, সমান্তরালভাবে তার মূল্য[illegible] আবশ্যিক। দরিদ্রদের নিয়ে তাঁর লেখা গল্প, নাটক ও কবিতার সুবিচার হতে পারবে [illegible] বাস্তব ও অন্তর্জীবনে সহানুভূতি ও সৌন্দর্যাদর্শের নিয়তদৃশ্যমান বিরোধের কথা [illegible] রাখলে।

তথ্যনির্দেশ

১ 'অখ্যাত বংশের ছেলে আমরা। তোমরা শুনে হাসবে, সত্যই অখ্যাত বংশের ছেলে ছিলেম [illegible] আমার পিতার খুব নাম শুনেছ, কিন্তু এক সময় আমাদের গৃহে নিমন্ত্রণের পথ ছিল গোপনে। [illegible] অল্প লোককে জানতুম সমাজে তাঁদের নামডাক ছিল না।' পল্লীপ্রকৃতি, *রচনাবলী* ২৭, পৃ ৫[illegible]।

২ '[illegible]বাড়ির বাইরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল। এমনকি বাড়ির ভিতরেও আমরা যেমন খুশি যাওয়া [illegible] করিতে পারিতাম না। সেই জন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল আবডাল হইতে দেখিতাম।' জী[illegible] *রচনাবলী* ১৭, পৃ ২৭০।

এই নিষেধের প্রহরা ভেদ করে একদিন দুজন অভিভাবকের পেছনে পেছনে বালক রবীন্দ্রনাথ [illegible]

ভেতর দিয়ে অনেক দূর অবধি গিয়েছিলেন। সেই প্রথম পল্লীদর্শন তাঁর স্মরণে চিরকাল জাগরূক ছিল। কিন্তু প্রথম মিলনের আনন্দ অধিকক্ষণ স্থায়ী হতে পারে নি।' "...আমার অগ্রবর্তীরা হঠাৎ টের পাইলেন, আমি পিছনে আছি। তখনই ভর্ৎসনা করিয়া উঠিলেন, 'যাও, যাও, এখনি ফিরে যাও।' ... কেবল সেইদিনই যে হতাশ হইয়া আমাকে ফিরিতে হইল তাহা নহে, ক্রটি সংশোধন করিয়া ভবিষ্যতে আর-একদিন বাহির হইবার উপায়ও রহিল না।" জীবনস্মৃতি, *রচনাবলী ১৭*, পৃ ২৯০-১।

'আমাদের এক চাকর ছিল, তাহার নাম শ্যাম। ...সে আমাকে ঘরের একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া আমার চারিদিকে খড়ি দিয়া গণ্ডি কাটিয়া দিত। গম্ভীর মুখ করিয়া তর্জনী তুলিয়া বলিয়া যাইত, গণ্ডির বাহিরে গেলেই বিষম বিপদ। বিপদটা আধিভৌতিক কি আধিদৈবিক তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতাম না, কিন্তু মনে বড়ো একটা আশঙ্কা হইত। গণ্ডি পার হইয়া সীতার কী সর্বনাশ হইয়াছিল তাহা রামায়ণে পড়িয়াছিলাম, এইজন্য গণ্ডিটাকে নিতান্ত অবিশ্বাসীর মতো উড়াইয়া দিতে পারিতাম না।' ঐ, পৃ ২৬৯। 'আজ সেই খড়ির গণ্ডি মুছিয়া গেছে, কিন্তু গণ্ডি তবু ঘোচে নাই। দূর এখনো দূরে, বাহির এখনো বাহিরেই।' ঐ, পৃ ২৭০।

'আমি যখন এসেছি আমাদের পরিবারে তখন আমাদের অর্থসম্বল হয়ে এসেছে রিক্তজলা সৈকতিনী। থাকতুম গরিবের মতো, কিন্তু নিজেকে জানি নি গরিব বলে।' পল্লীপ্রকৃতি, *রচনাবলী ২৭*, পৃ ৫৯৭।

'পায়ে আমার মোজা নাই, গায়ে একখানি জামার উপর অন্যকোনো ভদ্র আচ্ছাদন নাই। মোজা ও পোশাক-পরিচ্ছদের কোনো উপসর্গ আমার ছিলই না।' জীবনস্মৃতি, *রচনাবলী ১৭*, পৃ ২৯০-১।

'ছেলেবেলায় আমরা যে কী অবস্থায় মানুষ হয়েছি—কল্পনা করতে পারিস নে। গরিবভাবে দিন কাটিয়েছি। বাবুয়ানার নামগন্ধও ছিল না। প্রথম যখন জুতো পায়ে দিই তখন বোধহয় বারো বছর বয়স আমার। জুতো পায়ে দিয়ে মনে হল যেন কেউকেটা হয়ে গেছি একজন। নিতান্ত সাদাসিধে জীবন ছিল তখন।' *আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ*, পৃ ৩০-১।

'বিকেল বেলায় আমি এখানকার গ্রামের ঘাটের উপরে বোট লাগাই। অনেকগুলো ছেলেয় মিলে খেলা করে, বসে বসে দেখি। কিন্তু আমার সঙ্গে নিশিদিন যে পদাতিক সৈন্য লেগে থাকে তাদের জ্বালায় আর আমার মনে সুখ নেই। ছেলেদের খেলা তারা বেয়াদবি মনে করে; মাঝিরা যদি আপনাদের মন খুলে হাসিগল্প করে সেটা তারা রাজার প্রতি অসম্মান জ্ঞান করে; চাষারা যদি ঘাটে গোরুকে জল খাওয়াতে নিয়ে আসে তারা তৎক্ষণাৎ লাঠি হাতে করে রাজমর্যাদা রক্ষা করতে ধাবিত হয়। অর্থাৎ, রাজার চতুর্দিকটা হাসিহীন খেলাহীন শব্দহীন জনহীন ভীষণ মরুভূমি করতে পারলে তাদের মনের মতো রাজসম্ভ্রম রক্ষে হয়—ইদিকে হতভাগ্য রাজার প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করতে থাকে। কালও তারা ছেলেদের তাড়া করতে উদ্যত হয়েছিল, আমি আমার রাজমর্যাদা জলাঞ্জলি দিয়ে তাদের নিবারণ করলুম।' *ছিন্নপত্রাবলী ২৪*, পৃ ৪৯।

'প্রজারা যখন সসম্ভ্রম কাতরভাবে দরবার করে, এবং আমলারা বিনীত করযোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন আমার মনে হয় এদের চেয়ে এমন আমি কী মস্ত লোক যে আমি একটু ইঙ্গিত করলেই এদের জীবনরক্ষা এবং আমি একটু বিমুখ হলেই এদের সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। আমি যে এই চৌকিটার উপরে বসে বসে ভান করছি যেন এই-সমস্ত মানুষের থেকে আমি একটা স্বতন্ত্র সৃষ্টি, আমি এদের হর্তাকর্তাবিধাতা, এর চেয়ে অদ্ভুত আর কী হতে পারে! ...এই-সমস্ত ছেলে-পিলে গোরুলাঙ্গল-ঘরকন্না-ওয়ালা সরলহৃদয় চাষাভুষোরা আমাকে কী ভুলই জানে! আমাকে এদের সমজাতি মানুষ বলেই জানে না। সেই ভুলটি রক্ষা করবার জন্যে কত সরঞ্জাম রাখতে এবং কত আড়ম্বর করতে হয়। বোট থেকে কাছারি পর্যন্ত আমি হেঁটে আসবার প্রস্তাব করেছিলুম, নায়েব বিজ্ঞভাবে বললেন—কাজ নেই! কী জানি যদি ঐ ভুলে আঘাত লাগে। prestige মানে হচ্ছে মানুষ সম্বন্ধে মানুষের ভুল বিশ্বাস। আমাকে এখানকার

প্রজারা যদি ঠিক জানত, তা হলে আপনাদের একজন বলে চিনতে পারত, সেই ভয়ে সর্বদা মুখোশ পরে থাকতে হয়। সাধারণ ইতর মানুষের মতো পদযুগল চালনা করে এই ইতর পৃথিবীর উপর দিয়ে চলি নে, বন্দুক ঘাড়ে বরকন্দাজ হুহুঙ্কারে সম্মুখ থেকে সকলকে হাঁকিয়ে দিয়ে চলেছে—যেন আমার চেয়ে অগ্রবর্তী হওয়া লোকের পক্ষে একটা বেআদবি।' *ছিন্নপত্রাবলী ১৫,* পৃ ৩৬-৭।

৬ 'সেদিনকার খ্যাতিহীনতার স্নিগ্ধ প্রথম প্রহর কেটে গেল। অবশেষে খ্যাতি এসে অনাবৃত মধ্যাহ্ন রৌদ্রে টেনে বের করলে। তাপ ক্রমেই বেড়ে উঠল, আমার কোণের আশ্রয় একেবার ভেঙ্গে গেল।' প্রতিভাষণ, সপ্ততিবর্ষপূর্তি উপলক্ষে।

'I wish I were young enough to be able to join you and perform the meanest work that can be done in your place, thus getting rid of that filmy web of respectability that shuts me off from intimate touch with Mother Dust'. *Pioneer of Education,* L. K. Elmhirst. p. 23

৭ পাই নে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার,
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।
চাষি খেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল—
বহুদূরপ্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার,
তারি 'পরে ভর দিয়া চলিতেছে সমস্ত সংসার।
অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।
মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে,
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।
'ঐকতান', জন্মদিনে, *রচনাবলী* ২৬, পৃ ৭৮।

৮ পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি, *রচনাবলী ১৯,* পৃ ৪১৬।

৯ দুর্লভ জন্ম, চৈতালি, *রচনাবলী ৫,* পৃ ১৫।

১০ সামান্য লোক, ঐ, পৃ ১৩।

১১ ক্ষণমিলন, ঐ, পৃ ২৩।

১২ 'আহা, এমন প্রজা আমি দেখি নি—এদের অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং এদের অসহ্য কষ্ট দেখলে আমার চোখে জল আসে। আমার কাছে এই সমস্ত দুঃখপীড়িত অটলবিশ্বাস-পরায়ণ অনুরক্ত ভক্ত প্রজাদের মুখে এমন একটি কোমল মাধুর্য আছে, এদের দিকে চেয়ে এবং এদের কথা শুনে সত্যি সত্যি বাৎসল্যে আমার হৃদয় বিগলিত হয়ে যায়। বাস্তবিক, এরা যেন আমার একটি দেশজোড়া বৃহৎ পরিবারের লোক। এই-সমস্ত নিঃসহায় নিরুপায় নিতান্তনির্ভরপর সরল চাষাভুষোদের আপনার লোক মনে করতে বড়ো একটা সুখ আছে।... এরা যখন কোনো-একটা অবিচারের কথা বলে আমার চোখ ঝাপসা হয়ে আসে—অন্য নানা ছলে আমাকে সামলে নিতে হয়। এরা অনেক দুঃখ অনেক ধৈর্যসহকারে সহ্য করেছে, তবু এদের ভালোবাসা কিছুতেই ম্লান হয় না।... এখানকার মানুষের মধ্যে যে জিনিসটি আছে সে বড়ো অনাদরের নয়। যতক্ষণ না সভ্যতার মাঝখানে এই সব সরলতার প্রতিষ্ঠা হয় ততক্ষণ সভ্যতা কখনোই সম্পূর্ণ এবং সুন্দর হবে না।' *ছিন্নপত্রাবলী* ১১১, পৃ ১৭০-১৭১।

পল্লীবাসীর মুখে এই অকৃত্রিম সরলতার সন্দর্শন কবি একবারই করেন নি। আর একখানে লিখেছেন,

"এখানে আমার আর-একটি সুখ আছে। এক-এক সময় এক-একটি সরল ভক্ত বৃদ্ধ প্রজা আসে, তাদের ভক্তি এমনি অকৃত্রিম, তারা সত্যি সত্যি আমাদের এত ভালোবাসে যে আমার চোখ ছলছল করে আসে। এই মাত্র কালীগ্রাম থেকে একটি বুড়ো প্রজা তার ছেলেকে সঙ্গে করে আমার কাছে এসেছিল—সে যেন তার সমস্ত সরল আর্দ্র হৃদয়খানি দিয়ে আমার পা-দুটো মুছিয়ে দিয়ে গেল। ভাগবতে কৃষ্ণ বলেছেন 'আমার চেয়ে আমার ভক্ত বড়ো', সে কথার মানে খানিকটা বোঝা যায়। বাস্তবিক এর সুন্দর সরলতা এবং আন্তরিক ভক্তিতে এ লোকটি আমার চেয়ে কত বড়ো! আমিই যেন এ ভক্তির অযোগ্য, কিন্তু এ ভক্তিটি তো বড়ো সামান্য জিনিস নয়।... আমি কি এই বৃদ্ধটির রাজা হবার যোগ্য! মানুষে মানুষে যদি সত্যি একটা আধ্যাত্মিক যোগ থাকে তা হলে আমার এই অন্তরের মঙ্গল-ইচ্ছা ওর হয়তো কিছু কাজে লাগতে পারে—তা ছাড়া জমিদার হয়ে যা করতে পারি তা তো করবই।" *ছিন্নপত্রাবলী* ৯৬, পৃ ১৪৯।

বেদেদের করুণ জীবনযাত্রা দেখে ব্যথিত হয়েছেন। কিন্তু উচ্ছ্বসিত হয়েছেন অন্য কারণে। কবির জবানিতে শোনা যাক,

"... এই এরা , যারা নিতান্তই মাটির সন্তান, যারা নিতান্তই পৃথিবীর গায়ের সঙ্গে লেগে আছে, এদের মধ্যেও সৌন্দর্যের আকর্ষণ ও পরস্পরের মনোরঞ্জনের চেষ্টা আছে। যেখানে-সেখানে জন্মাচ্ছে, পথে পথেই বেড়ে উঠছে, এবং যেখানে-সেখানে মরছে—এদের ঠিক অবস্থাটা, ঠিক মনের ভাবটা ভারী জানতে ইচ্ছে করে।" *ছিন্নপত্রাবলী* ১৬, পৃ ৩৮।

পঞ্চভূতের ডায়ারিতে একটি ঠিকা মুহুরির কথা আছে। তার দুঃখ-দৈন্যের সামান্যতম একটি কল্পিত রেখাচিত্র আছে বটে, কিন্তু তার মানবিক গুণের প্রসঙ্গে কবি পঞ্চমুখ। লোকটির ওলাউঠা হয়েছিল। 'সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তাহার সেবাশুশ্রূষা করিলাম, কিন্তু পিসিমার ধনকে পিসিমার নিকট ফিরাইয়া দিতে পারিলাম না—আমার সেই ঠিকা মুহুরিটির মৃত্যু হইল। ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জুন খুব মহৎ, তথাপি এই লোকটিরও মূল্য অল্প নহে। তাহার মূল্য কোনো কবি অনুমান করে নাই, কোনো পাঠক স্বীকার করে নাই, তাই বলিয়া সে মূল্য অনাবিষ্কৃত ছিল না, একটি জীবন আপনাকে তাহার জন্য একান্ত উৎসর্গ করিয়াছিল—কিন্তু খোরাক-পোশাক-সমেত লোকটার বেতন ছিল আট টাকা, তাহাও বারো মাস নহে। মহত্ত্ব আপনার জ্যোতিতে আপনি প্রকাশিত হইয়া উঠে, আর আমাদের মতো দীপ্তিহীন ছোটো ছোটো লোকদিগকে বাহিরের প্রেমের আলোকে প্রকাশ করিতে হয়; পিসিমার ভালোবাসা দিয়া দেখিলে আমরা সহসা দীপ্যমান হইয়া উঠি। যেখানে অন্ধকারে কাহাকেও দেখা যাইতেছিল না সেখানে প্রেমের আলোক ফেলিলে সহসা দেখা যায়, মানুষে পরিপূর্ণ।' *রচনাবলী* ২, পৃ ৫৮২।

১৩ পদ্মা-ইছামতীর তীরে তীরে যে-জীবনের সঙ্গে কবির নবযোগাযোগ তার সঙ্গে ইতিপূর্বে কোনো পরিচয় ছিল না। এই নতুন জগতের প্রকৃতি ও মানব সন্দর্শনে তিনি আনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলেন।

'...there was an element of mystery for me. My whole heart went out to the simple village people as I came in close contact with them. They seemed to belong to quite another world so very different from that of Calcutta.' কবির সঙ্গে সাক্ষাৎকার, *Forward, 23 Feb 1936.*

তাই কবির যে দৃষ্টি সেটা রোম্যানটিকতায় আচ্ছন্ন, আলো-আঁধারের রহস্যপূর্ণ। 'আমার যে নিরন্তর ভালোবাসার দৃষ্টি দিয়ে আমি পল্লীগ্রামকে দেখেছি তাতেই তার হৃদয়ের দ্বার খুলে গিয়েছে। আজ বললে অহঙ্কারের মতো শোনাবে, তবু বলব আমাদের দেশের খুব অল্প লেখকই এই রসবোধের চোখে বাংলা দেশকে দেখেছেন। আমার রচনাতে পল্লীপরিচয়ের যে অন্তরঙ্গতা আছে, কোনো বাঁধাবুলি দিয়ে তার সত্যতাকে উপেক্ষা করলে চলবে না।' অভিভাষণ, *রচনাবলী* ২৭, পৃ ৫৯৮।

ভালোবাসার আলোকে দেখেছিলেন বলেই পল্লীর হৃদয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল। অন্যত্র লিখেছেন, 'আমার নিজের বিশ্বাস এই আনন্দবিস্মিত দৃষ্টির ভিতর দিয়ে বাংলা দেশকে দেখা আমাদের সাহিত্যে আর কোথাও নেই।' *চিঠিপত্র ৯,* পৃ ৩৩৩।

"ছিন্নপত্র" যখন লিখেছিলুম—রসে ভরা ছিল এমনতরো দিনগুলো, জীবনে আর আসবে না। বাংলা দেশের হৃদয়ে আমি প্রবেশ করেছি। হৃদয়ের অত বড়ো দান আর আমার হবে না।' *আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ,* পৃ ১২২।

১৪ 'ও তো সত্যি আমার কাজ নয়, কিন্তু বেদনা বেজেছিল বুকে, চুপ করে থাকতে পারিনি। ... আমাকে করতে হয়েছে এই কাজ। নিজের জমিদারিতে একদিন আমি তাদের মাঝখনে গিয়ে কাজ করেছি। আমি দূরে থাকিনি—থাকতে পারিনি। কারণ আমি একটা পরিপূর্ণতাকে ভালোবেসেছিলুম। এই দারিদ্র্য, বিচ্ছিন্নতা, মলিনতা দেখা যায় না; তা আমার কবিত্বকে আঘাত করেছিল। আমাকে বুর্জোয়া বলে আমি তো করেছি এই সব কাজ; কিন্তু যারা তা নয়, তারা কী করেছে।' *আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ,* পৃ ১২৯–৩০।

১৫ পোস্টমাস্টার, *রচনাবলী ১৫,* পৃ ৪১১।

১৬ খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, *রচনাবলী ১৬,* পৃ ২৯৫।

১৭ পুরাতন ভৃত্য *রচনাবলী ৭,* পৃ ৯৬।

১৮ কর্ম, *রচনাবলী ৫,* পৃ ১৬।

১৯ রাজা ও রানী, *রচনাবলী ১,* পৃ ২৬১।

২০ কাবুলিওয়ালা, *রচনাবলী ১৭,* পৃ ২২০।

২১ দুই বিঘা জমি, *রচনাবলী ৭,* পৃ ৯৮।

২২ রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, *রচনাবলী ১৫,* পৃ ৪২২।

২৩ শাস্তি, *রচনাবলী ১৮,* পৃ ২৭৮।

২৪ সমকালীন মানুষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক লাঞ্ছনার প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল নন; জন্মরোম্যান্টিক, তিনি অভিজাত ও বুর্জোয়া কবি,—এ অপবাদ রবীন্দ্রনাথ মেনে নেন নি। কৈফিয়তস্বরূপ বলেছেন, অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের আনন্দের ছন্দটি দেখেছেন, প্রাত্যহিক দৈন্য তাকে ম্লান করতে পারে নি।

প্রত্যক্ষ দেখেছি যথা
দৃষ্টির সম্মুখে মোর হিমাদ্রিরাজের সমগ্রতা,
গুহাগহ্বরের যত ভাঙাচোরা রেখাগুলো তারে
পারে নি বিদ্রূপ করিবারে—
যত কিছু খণ্ড নিয়ে অখণ্ডেরে দেখেছি তেমনি,
জীবনের শেষবাক্যে আজি তারে দিব জয়ধ্বনি।

জয়ধ্বনি, *রচনাবলী ২৪,* পৃ ৫৫।

২৫ ঐ।

২৬ সাধারণ মেয়ে, পুনশ্চ, *রচনাবলী ১৬,* পৃ ৭১।

২৭ সাহিত্যরূপ, *রচনাবলী ২৬,* পৃ ৫০২।

২৮ সাহিত্যের তাৎপর্য, ঐ, পৃ ৪৬১–২।

২৯ 'কয়লার খনিক বা পানওয়ালীদের কথা অনেক মিলে লিখলেই কি নবযুগ আসে। ঐ রকম কোনো একটা ভঙ্গিমার দ্বারা যুগান্তরকে সৃষ্টি করা যায়, এ কথা মানতে পারব না।... আজকের দিনের বারো-আনা লোক যদি চরকা নিয়েই কাব্য ও গল্প লিখতে বসে তা হলেও যুগ-সাহিত্যের সৃষ্টি হবে না। কেননা তার পনেরো-আনাই হবে অসাহিত্য। খাঁটি সাহিত্যিক যখন একটা সাহিত্য রচনা করতে বসেন

তখন তাঁর নিজের মধ্যে একটা একান্ত তাগিদ আছে বলেই করেন; সেটা সৃষ্টি করবার তাগিদ, সেটা ভিন্ন লোকের ভিন্নরকম। তার মধ্যে পানওয়ালী বা খনিক আপনিই এসে পড়ল তো ভালোই। কিন্তু, সেই এসে পড়াটা যেন যুগধর্মের একটা কায়দার অন্তর্গত না হয়।' সাহিত্যরূপ, *রচনাবলী ২৩,* পৃ ৪৯৭।

৮০ রোম্যান্টিক, রচনাবলী ১৪, পৃ ৪৭–৮।

৮১ ক) Sen, Sudhir : *Tagore on rural Reconstruction,* Vishva-Bharati.

খ) Elmhirst, K. L : *Pioneer of Education,* John Murray.

গ) Lal, Prem Chand : *Education and Reconstruction in Rural India;* Allen and Unwin.

ঘ) রবীন্দ্রনাথ : *পল্লীপ্রকৃতি*

এই গ্রন্থসমূহে রবীন্দ্রনাথের পল্লীপুনর্গঠনমূলক বিচিত্র কর্মোদ্যমের বিশদ পরিচয় আছে।

৮২ ঐকতান, *রচনাবলী ২৫,* পৃ ৭৮।

৮৩ বাঁশি, *রচনাবলী ১৬,* পৃ ৮৪।

৮৪ *রচনাবলী ১৬,* পৃ ৩৯।

৮৫ *ঐ,* পৃ ৭১।

৮৬ *রচনাবলী ১০,* পৃ ৯৫।

৮৭ *রচনাবলী ২৫,* পৃ ৪৯।

৮৮ সাহিত্য মনের বিলাস। সে যদি আনন্দের প্রলেপে মানসিক বৈবর্ণ্যকে বিদূরিত না করে, তা হলে, কবির মতে, সাহিত্য অনাবশ্যক।

সে যদি অমান্য করে বিদ্রূপের বাহক সাজিয়া
বিকৃতির সভাসদরূপে
চিরনৈরাশ্যের দূত,
ভাঙা যন্ত্রে বেসুর ঝংকারে
ব্যঙ্গ করে এ বিশ্বের শাশ্বত সত্যেরে,
তবে তার কোন্ আবশ্যক।...
রুগ্ন যদি রোগেরে চরম সত্য বলে,
তাহা নিয়ে স্পর্ধা করা লজ্জা বলে জানি।

রোগশয্যায় ২৪, *রচনাবলী ২৫,* পৃ ২৬।

৮৯ ঝড়ের খেয়া, *রচনাবলী ১২,* পৃ ৬১।

৯০ জয়ধ্বনি, *রচনাবলী ২৪,* পৃ ৫৫।

৯১ বর্তমান উদ্ধৃতির পূর্ব বাক্যটি :

"কিছুকাল থেকে আমি দুঃসহ রোগদুঃখ ভোগ করে আসছি, সেইজন্য যদি বলে বসি 'যাঁরা আমার শুশ্রূষায় নিযুক্ত তাঁরাও মুখে কালো রঙ মেখে অস্বাস্থ্যের বিকৃত চেহারা ধারণ করে এলে তবেই সেটা আমার পক্ষে আরামের হতে পারে', তা হলে মনোবিকারের আশঙ্কা কল্পনা করতে হবে।" সাহিত্যবিচার, *রচনাবলী ২৭,* পৃ ২৭৬।

৯২
দুঃসহ দুঃখের বেড়াজালে
মানবেরে দেখি যবে নিরুপায়,
ভাবিয়া না পাই মনে,
সান্ত্বনা কোথায় আছে তার।...

সেই অসহায়তায় আপনার অন্তরের মধ্যে নিহিত চিরভাস্বর সত্যের অমৃত হয়ত দুঃখ হরণ করতে পারে।

মানবচিত্তের সাধনায়
গূঢ় আছে যে সত্যের রূপ
সেই সত্য সুখ দুঃখ সবের অতীত।

রোগশয্যায় ২৯, *রচনাবলী ২৫,* পৃ ২৯।

৪৩ এবার ফিরাও মোরে, *রচনাবলী ৪,* পৃ ৩৩।

৪৪ ঐকতান, *রচনাবলী ২৫,* পৃ ৭৮।

৪৬ 'অন্যান্য সকল বেদনার মতোই সাহিত্যে দারিদ্র্যবেদনারও যথেষ্ট স্থান আছে। কিন্তু ওটার বাহানা একটা ভঙ্গিমার অঙ্গ হয়ে উঠেছে—যখন-তখন এই প্রয়াসের মধ্যে লেখকেরই শক্তির দারিদ্র্য প্রকাশ পায়। ... এই ভাবুকতার কারি-পাউডারের যোগে একটা কৃত্রিম শস্তা সাহিত্যের সৃষ্টি হয়ে উঠছে। এই উপায়ে বিনা প্রতিভায় এবং অল্প শক্তিতেই বাহবা পাওয়া যায়, এইজন্যেই অপটু লেখকের পক্ষে একটা মস্ত প্রলোভন এবং অবিচারক পাঠকের পক্ষে একটা সাহিত্যিক অপথ্য।' সাহিত্যে নবত্ব, *রচনাবলী ২৩,* পৃ ৪১১-২

অন্যত্র বলেছেন, এর দ্বারা দীর্ঘস্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায় না। নগদ বিদায়ই সার হয় : 'সাহিত্য অনেক সময় বর্তমানের কাছ থেকে ঘুষ নিয়ে ভাবীকালকে বঞ্চনা করে। এক একটা সময় আসে যখন ঘুষের বাজার খুব লোভনীয় হয়ে ওঠে, দেশাত্মবোধ, সম্প্রদায়ী বুদ্ধি তাদের তহবিল খুলে বসে তখন নগদ বিদায়ের লোভ সামলানো শক্ত হয়ে ওঠে।' অভিভাষণ, *রচনাবলী ২৭,* পৃ ৫৯৭।

৪৭ কালের যাত্রা, *রচনাবলী ২২,* পৃ ১৪৫।

৪৮ ঐ, পৃ ১২৪।

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম

নিজের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ একদা লিখেছিলেন,

> সকল মানুষেরই 'আমার ধর্ম' বলে একটা বিশেষ জিনিস আছে। কিন্তু সেইটিকেই সে স্পষ্ট করে জানে না। সে জানে আমি খৃষ্টান, আমি মুসলমান, আমি বৈষ্ণব, আমি শাক্ত ইত্যাদি। কিন্তু নিজেকে যে ধর্মাবলম্বী বলে জন্মকাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত নিশ্চিন্ত আছে, সে হয়তো সত্য তা নয়। নাম গ্রহণেই এমন একটা আড়াল তৈরী করে দেয় যাতে নিজের ভিতরকার ধর্মটা তার নিজের চোখেও পড়ে না।
>
> কোন্ ধর্মটি তার? যে-ধর্ম মনের ভেতরে গোপনে থেকে তাকে সৃষ্টি করে তুলছে।[১]

অর্থাৎ কোনো মানুষের যা চরিত্র এবং জীবনদর্শন যা তার ব্যক্তিত্বের ভেতর থেকে উদ্ভিন্ন হয়ে ওঠে তাই তার যথার্থ ধর্ম। কোষ্ঠীতে বা নামপত্রে তার যে ধর্মের উল্লেখ আছে, সেটা তার প্রকৃত ধর্ম নাও হতে পারে।

এ বিষয়ে কবি আরো বলেছেন,

> আমার ধর্ম কী, তা যে আজও আমি সম্পূর্ণ এবং সুস্পষ্ট করে জানি, এমন কথা বলতে পারি নে—অনুশাসন আকারে তত্ত্ব আকারে কোনো পুঁথিতে লেখা ধর্ম সে তো নয়।

তবে রবীন্দ্রনাথের ধর্ম কী? আর যদি তাঁর কোনো বিশেষ জীবনদর্শন বা ধর্মীয় আদর্শ থাকে, তবে তাই বা কী অথবা কোন জাতীয়? এ প্রশ্ন হয়তো অনেকের মতোই আমার মনকেও দীর্ঘকাল যাবৎ আলোড়িত করেছে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা এই প্রশ্নেরই কিঞ্চিৎ মীমাংসা করতে চেষ্টা করব।

২

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম কী ছিল অথবা তাঁর ধর্মবোধ কোন জাতীয়, এই প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া সহজসাধ্য নয়, হয়তো বা দিতে চেষ্টা করাও সমীচীন নয়। কারণ, তাঁর ধর্মবোধ আসলে ছিল বিবর্তনশীল; তাঁর ব্যক্তিত্বের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ধর্মবোধও বিকাশ লাভ করেছে, তার ক্রমশ পরিবর্তন ও প্রসার ঘটেছে, কোনো এক জায়গায় সেটি স্থায়ীভাবে আবদ্ধ হয়ে থাকে নি। শেষ পর্যন্ত তাঁর মনের মধ্যে যে ধর্মবোধ পরিণতি লাভ করেছিল, বলা যেতে

---

১ 'আত্মপরিচয়', ৩।

পারে, সেটিই তাঁর প্রকৃত ধর্মীয় আদর্শ, অথবা প্রথম থেকে শেষ অবধি যত ধর্মচিন্তা তাঁর মনে বাসা বেঁধেছিল, হয়তো বা সেসবের সমষ্টিই তাঁর ধর্ম। নিশ্চয় করে কে বলবে?

দার্শনিক–সমালোচক বলেন,

Rabindranath's religious ideas cannot be fully understood unless seen through the vista of an evoluation. He begins his life as a Brahma, passes through a synthetic religion ultimately stoops at the "Religion of Man"[২]

প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ ধর্মের বিষয়ে ছিলেন অনেকটা সনাতনপন্থী, অর্থাৎ ইতিহাসবাহিত প্রাচীন ভারতবর্ষের রীতি–নীতি, ধ্যান–ধারণা, আদর্শ ও সংস্কৃতির ভেতর দিয়ে তার সামাজিক ধর্মের যে একটা রূপ দাঁড়িয়ে গেছে, তাকেই যেন কবি প্রথম জীবনে পরম নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে চেয়েছেন। কবির ৪০/৪৫ বৎসর বয়ঃক্রম কাল পর্যন্ত তাঁর অন্তরে এইরূপ চিন্তাই বলবৎ ছিল। ১৩০৯ সালে 'বঙ্গদর্শন'–এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে কবি বলেছেন,

সকল জাতির স্বভাবগত আদর্শ এক নয়, তাহা লইয়া ক্ষোভ করিবার কারণ দেখি না। ভারতবর্ষ মানুষকে লঙ্ঘন করিয়া কর্মকে বড়ো করিয়া তোলে নাই। ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্মকে মাহাত্ম্য দিয়া সে বস্তুত কর্মকে সংযত করিয়া লইয়াছে। ফলের আকাঙ্ক্ষা উপড়াইয়া ফেলিলে কর্মের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। এই উপায়ে মানুষ কর্মের উপরেও নিজেকে জাগ্রত করিবার অবকাশ পায়। হওয়াই আমাদের দেশের চরম লক্ষ্য, করা উপলক্ষ মাত্র।

বিদেশের সংঘাতে ভারতবর্ষের এই স্তব্ধতা ক্ষুব্ধ হইয়াছে। তাহাতে যে আমাদের বলবৃদ্ধি হইয়াছে, এই কথা আমি মনে করি না।... পূর্বে ভারতবর্ষের কার্যপ্রণালী অতি সহজ–সরল, অতি প্রশান্ত, অথচ অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। তাহাতে আড়ম্বর মাত্রেরই অভাব ছিল, তাহাতে শক্তির অনাবশ্যক অপব্যয় ছিল না।... দারিদ্র্যের যে কঠিন বল, মৌনের যে স্তম্ভিত আবেগ, নিষ্ঠার যে কঠোর শান্তি এবং বৈরাগ্যের যে উদার গাম্ভীর্য, তাহা আমরা জনকয়েক শিক্ষাচঞ্চল যুবক বিলাসে, অবিশ্বাসে, অনাচারে, অনুকরণে এখনও ভারতবর্ষ হইতে দূর করিয়া দিতে পারি নাই। সংযমের দ্বারা, বিশ্বাসের দ্বারা, ধ্যানের দ্বারা এই মৃত্যুভয়হীন আত্মসমাহিত শক্তি ভারতবর্ষের মুখশ্রীতে মৃদুতা এবং মজ্জার মধ্যে কাঠিন্য, লোকব্যবহারে কোমলতা এবং স্বধর্ম রক্ষায় দৃঢ়তা দান করিয়াছে। শান্তির মর্মগত এই বিপুল শক্তিকে অনুভব করিতে হইবে, স্তব্ধতার আধারভূত এই প্রকাণ্ড, কাঠিন্যকে জানিতে হইবে।[৩]

অতীতের এই ভারতবর্ষের যে ধ্যানরূপ কবির মানসচক্ষে প্রকটিত হয়েছিল তার আরেকটি পরিচয় :

মনশ্চক্ষে হেরি যবে ভারত প্রাচীন—
পুরব পশ্চিম হতে উত্তর দক্ষিণ
মহারণ্য দেখা দেয় মহাচ্ছায়া লয়ে।
রাজা রাজ্য–অভিমান রাখি লোকালয়ে
অশ্বরথ দূরে বাঁধি যায় নতশিরে
গুরুর মন্ত্রণা লাগি'—স্রোতস্বিনীতীরে
মহর্ষি বসিয়া যোগাসনে, শিষ্যগণ
বিরলে তরুর তলে করে অধ্যয়ন

২ বিনয়গোপাল রায় : *Philosophy of Rabindranath*, p. 88.
৩ 'ভারতবর্ষ', "নববর্ষ"; 'স্বদেশ', "নববর্ষ"।

প্রশান্ত প্রভাতবায়ে, ঋষিকন্যাদলে
পেলব যৌবন বাঁধি পরুষ বল্কলে
আলবালে করিতেছে সলিল সেচন।
প্রবেশিছে বনদ্বারে ত্যজি সিংহাসন
মুকুটবিহীন রাজা, পক্ব কেশজালে
ত্যাগের মহিমাজ্যোতি লয়ে শান্ত ভালে।[৪]

...চীন ভারতবর্ষের এই যে আবহমানকাল–প্রচলিত সভ্যতা, তা যে সমসাময়িক কালেও ...ক্রিয় এবং সমাজ ইচ্ছে করলেই তার বাইরে যেতে পারে না, এ–কথা বোঝাতে গিয়ে ...খন রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

আমাদের সংস্কার ও শিক্ষা এত দীর্ঘকালের, তাহা আমাদিগকে এমন জটিল, বিচিত্র ও সুদৃঢ়ভাবে জড়িত করিয়া রাখিয়াছে যে, বৃহৎ জাতিকে চিরকালের মতো তাহার বাহিরে লইয়া যাওয়া কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। সেই চিরোচ্ছিন্ন ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির মধ্য হইতেই আমাদের অভ্যুত্থানের উপাদান সংগ্রহ করিতে হইবে।[৫]

কবি তখন নিজেকে নিঃসন্দিগ্ধরূপে এবং প্রায় সম্পূর্ণরূপেই সেই সমাজের অন্তর্গত ...রেই ভেবেছিলেন, কেননা এই সমাজেই যে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন,

আমাদের পরিচয়ের একটা ভাগ আছে, যাহা একেবারে পাকা—আমার ইচ্ছা অনুসারে যাহার কোনো নড়চড় হইবার জো নাই।...

যে আমি হিন্দুসমাজে জন্মিয়াছি সেই আমার এ–কথা নিশ্চয়রূপে জানা কর্তব্য, জ্ঞানে ভাবে কর্মে যাহা কিছু আমার শ্রেষ্ঠ তাহা একলা আমার নহে, তাহা একলা আমার সম্প্রদায়েরও নহে, তাহা সমস্ত সমাজের।[৬]

...তএব, যে সমাজে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন, সে সমাজের যে ধর্ম, তাঁরও সেই ধর্ম। সে ...র্মের আদর্শ কী, কী তার অর্থ সেটি পূর্বোদ্ধৃত অংশগুলিতেই কবি ব্যাখ্যা করেছেন।

কিন্তু সেই সঙ্গে কবি এটাও বুঝতে আরম্ভ করেছিলেন 'জন্মগ্রহণ' করাটাই শেষ কথা ...য় এবং জন্মের সঙ্গে অর্জিত যে ধর্ম, সেটাই তাঁর এক মাত্র চরম ধর্ম নয়, তারও অতিরিক্ত ...ছু আছে :

তাহার আর একটা ভাগ আছে যা আমার স্বোপার্জিত—আমার বিদ্যা ব্যবহার ব্যবসায় বিশ্বাস অনুসারে যাহা আমি বিশেষ করিয়া লাভ করি এবং যাহার পরিবর্তন ঘটা অসম্ভব নহে।[৭]

এমনি করে কবির ব্যক্তিত্বের জন্মগত, বংশগত যে অংশ, তারই সঙ্গে এসে যুক্ত হচ্ছে ...পর একটি অংশ—যেটি গড়ে উঠেছে তাঁর শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কৃতি ও মননের ভেতর দিয়ে। ...টি বয়োবৃদ্ধি এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কবি নিজে অর্জন করেছেন। এবং এটিই ...এক হিসেবে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রধান দিক, তাও তিনি অনুভব করতে আরম্ভ করেছেন :

মানুষের প্রকৃতির মধ্যে সবই যদি চিরন্তন হয়, কিছুই যদি তাহার নিজে গড়িয়া লইবার না থাকে, আপনার মধ্যে কোথাও যদি সে আপনার ইচ্ছা খাটাইবার জায়গা না পায় তবে তো সে মাটির ঢেলা।[৭]

...পরে উদ্ধৃত অংশটির মধ্যে একটি কথা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সেটি হচ্ছে 'পরিবর্তন ঘটা

...তালি', "তপোবন", (১৩০২)।
...মাজ', "হিন্দুর ঐক্য", (১৩০৫)।
...রিচয়', "আত্মপরিচয়", (১৩১৯)।
...।

অসম্ভব নহে'। অর্থাৎ তাঁর ধর্মীয় আদর্শের এমন একটা দিক আছে, যা ক্রমশ পরি[illegible] হতে পারে এবং হচ্ছিলও। তাই কয়েক বৎসর পরেই আমরা কবির মুখে শুনি,

> সাম্প্রদায়িক সাধারণ নাম গ্রহণ করে আমি যতই মনে করি না কেন যে, আমি সম্প্রদা[illegible] সকলের সঙ্গেই সমান ধর্মের, তবু আমার অন্তর্যামী জানেন মনুষ্যত্বের মূলে আমার ধর্মের [illegible] বিশিষ্টতা বিরাজ করছে। সেই বিশিষ্টতাতেই আমার অন্তর্যামীর বিশেষ আনন্দ।[৮]

এখানে যেন হিন্দু সম্প্রদায়ের গণ্ডি কাটিয়ে বেরিয়ে চলেছেন কবি। তাই যে হিন্দু [illegible] এবং হিন্দু আদর্শ সম্পর্কে ইতিপূর্বে কবি এমন আবেগপূর্ণ ভাষায় প্রশস্তি রচনা কর[illegible] ২০ বৎসর পরেই তার সম্পর্কে কবি লিখছেন,

> এক সময়ে ভারতবর্ষে গ্রীক পারসিক শক নানা জাতির অবাধ সমাগম ও সম্মিলন ছিল। [illegible] মনে রেখো, সে 'হিন্দু' যুগের পূর্ববর্তী কালে। হিন্দু যুগ হচ্ছে একটা প্রতিক্রিয়ার যুগ [illegible] যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে সচেষ্টভাবে পাকা করে গাঁথা হয়েছিল। দুর্লঙ্ঘ্য আচারের প্রাকার তুলে [illegible] দুষ্প্রবেশ্য করে তোলা হয়েছিল। একটা কথা মনে ছিল না, কোনো প্রাণবান জি[illegible] একেবারে আটঘাট বন্ধ করে সামলাতে গেলে তাকে মেরে ফেলা হয়।[৯]

এ যেন কবির এক নবচেতনা লাভ। অনেকটা তাঁর 'গোরা' উপন্যাসের নায়ক গো[illegible] চরিত্রের মতো। গোরা প্রথমে ছিল নিষ্ঠাবান হিন্দু, হিন্দুত্বের অলি-গলিতে এমন কো[illegible] আচার, এমন কোনো বিশ্বাস ছিল না, যা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে গোরা প্রতিপালন না ক[illegible] কিন্তু একদিন অকস্মাৎ সে জানতে পারল, সে হিন্দু-সন্তান তো নয়ই, ভারতবর্ষীয়ও [illegible] তখন যেন একমুহূর্তেই তার চোখের সামনে থেকে সমস্ত ধর্মীয় ভেদ ও সঙ্কীর্ণতার আ[illegible] খসে পড়ল। তখন তাকে বলতে শুনি,

> 'আমি হিন্দু নই। আজ খবর পেয়েছি, আমি মিউটিনির সময়কার কুড়ানো ছেলে, আমার [illegible] আইরিশম্যান। ভারতবর্ষের উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত সমস্ত দেবমন্দিরের দ্বার আজ আমা[illegible] কাছে রুদ্ধ হয়ে গেছে—আজ সমস্ত দেশের মধ্যে কোনো পংক্তিতে কোনো জায়গায় আমা[illegible] আহারের আসন নেই।...
>
> আজ আমি মুক্ত, পরেশ বাবু। আমি যে পতিত হব, ব্রাত্য হব, সে-ভয় আর আমা[illegible] নেই—আমাকে আর পদে পদে মাটির দিকে চেয়ে শুচিতা বাঁচিয়ে চলতে হবে না।'[১০]

গোরা তাই সেদিন হিন্দু সমাজের আচার-বিচারের সংকীর্ণ গণ্ডি পরিত্যাগ করে দীক্ষা [illegible] চেয়েছে এক নব জাতীয়তার—যার প্রতিষ্ঠাভূমি হচ্ছে শুধু উদার মনুষ্যত্ব :

> 'আপনি আজ আমাকে সেই দেবতারই মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দুমুসলমান খ্রীষ্টান ব্রাহ্ম সকলে[illegible] যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে, কোনো ব্যক্তির কাছে কোনো দিন অবরুদ্ধ হয় [illegible] যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নয় ভারতবর্ষের দেবতা।'[১০]

কবির নিজের মনের ভেতরেও ক্রমশ ধীরে ধীরে এমনি একটা সংস্কারমুক্তি ঘটছিল, [illegible] সম্পর্কে তিনি প্রথমে নিজেই পুরোপুরি সচেতন ছিলেন না। কিন্তু তার অঙ্কুর রয়েছে [illegible] কাব্য-জীবনের সূচনাতেই যা তাঁর কবি-ধর্মের গোড়ার কথা, সেই উদার বিশ্বমানবি[illegible] মধ্যেই। বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানবের প্রতি যে এক অহেতুক প্রেম সেদিন কবির মনে [illegible] করেছিল, তাই পরিণামে তাঁর মনের সমস্ত সংস্কার, সমস্ত ভেদরেখাকে ভাসিয়ে [illegible] গিয়েছিল। সেদিন এক গুহানিঃসৃত নির্মোক্ত নির্ঝরের মতো উচ্ছ্বসিত বিশ্বপ্রেমে আপ্লুত [illegible]

---

৮ 'আত্মপরিচয়', ৩ (১৩২৪)।

৯ ড. কালিদাস নাগকে লিখিতপত্র, 'কালান্তর' (১৩৩৯)।

১০ 'গোরা', পৃ ৭৪ (প্রকাশ ১৩১৬)।

কবি গেয়ে উঠেছিলেন,

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি!
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি!
ধরায় আছে যত মানুষ শতশত
আসিছে প্রাণে মোর, হাসিছে গলাগলি।[১১]

কিন্তু পরে সমাজ ও ধর্মের প্রভাবে প্রথম জীবনে কবির মনেও কতিপয় সংস্কার ও বিশ্বাসের বেড়াজাল সৃষ্টি হয়, যার মধ্যে সত্যতা কিছুটা হয়তো আছে, কিন্তু অনেকখানিই অতিরঞ্জন ও উচ্ছ্বাসে ভরা। প্রথম যৌবনের আবেগপ্রবণতাও তার জন্য হয়তো অনেকখানি দায়ী। কিন্তু পরিণত বয়সে এই আবেগ ও উচ্ছ্বাস যখন থিতিয়ে এল, তখন ক্রমশ কবি মানবজীবন ও সমাজের প্রতি অনেকটা নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তাকাতে অভ্যস্ত হলেন। তাই সামাজিক সংস্কারগুলি যেন কতকগুলি নির্মোকের মতো দৃষ্টি থেকে ক্রমে ক্রমে খসে পড়তে লাগল। তাই একদা যে ব্রাহ্মণত্বের উপর একটা নৈষ্ঠিক মহিমা আরোপ করে কবি তাকে অভিনন্দিত করেছিলেন, তাকেই আবার, 'বিসর্জন' নাটকে শুধু অব্রাহ্মণোচিত নয়, অমানুষিক কাজের অপরাধে অভিযুক্ত করেছেন, এবং তাকেই মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য নরকবাসের ব্যবস্থা করে তীব্র ভর্ৎসনা করে বলেছেন,

রে ঋত্বিক,
শুধু একা তোর তরে একটি নরক
কেন সৃজে নাই বিধি। খুঁজে যমলোক
তব সহবাসযোগ্য নাহি মিলে পাপী।[১২]

এখন থেকে কবি ক্রমশ মানবিক সত্যের মর্যাদা উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছেন এবং পরম উদাত্তকণ্ঠে সর্বোপরি এই মানবিক মহিমার জয় ঘোষণায় ব্রতী হয়েছেন। মানবিক ধর্ম অথবা মানুষের প্রাণের দাবি যে কোনো সামাজিক ধর্মের ঊর্ধ্বে, এ কথাটাই সবচেয়ে বড় সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে কবির সমগ্র সাহিত্যে, প্রধানত কাব্যে। তাই হিন্দু সমাজের দৃষ্টিতে 'ম্লেচ্ছ মুসলমান'কেও তিনি ব্রাহ্মণকন্যা অমাবাই–এর পতিত্বে বরণ করিয়েছেন এবং তার মুখ দিয়ে নিজের অনুভূত পরম সত্য কথাটাই উচ্চারণ করিয়েছেন,

যবন ব্রাহ্মণ
সে ভেদ কাহার ভেদ? ধর্মের সে নয়।
অন্তরের অন্তর্যামী যেথা জেগে রয়
সেথায় সমান দোঁহে।

আর তার পিতা পরিশেষে তারই সমর্থনে বলতে বাধ্য হয়েছেন—

বৃথা আচার বিচার।
...সমাজের চেয়ে
হৃদয়ের নিত্যধর্ম সত্য চিরদিন।[১৩]

হিন্দু সমাজের চোখে এই নারী পতিতা; কিন্তু হৃদয়ধর্মের মূল্যে কবি তাকে পরম সতী বলে স্বীকার করেছেন। মানবধর্মকে এমন সামাজিক ধর্মের ঊর্ধ্বে স্থান দিতে পেরেছিলেন বলেই কবি পতিতার মধ্যেও নারীত্বের মহিমময়ী রূপ দেখে তাকে নমস্কার করেছেন; সে তাই বলে,

১১ 'প্রভাতসঙ্গীত', "প্রভাত উৎসব" (১২৯০)।
১২ 'কাহিনী', "নরকবাস" (১৩০৪)।
১৩ 'কাহিনী', "সতী" (১৩০৪)।

ধন্য রে আমি ধন্য বিধাতা
সৃজেছ আমায় রমণী করি;

এবং

আনন্দে মোর দেবতা জাগিল
জাগে আনন্দ ভকত-প্রাণে।[১৪]

এমনি করে ক্রমে ক্রমে সর্বসংস্কারমুক্ত হয়ে তিনি আদিম মানবশিশুর মতো সরল [illegible] নিরঞ্জন দৃষ্টিতে পৃথিবীর দিকে তাকিয়েছেন এবং যেন বিধাতার মতো এক নিরাসক্ত [illegible] দৃষ্টি লাভ করেছেন। কেননা সত্য মাত্রই উলঙ্গ, শুভ্র এবং নিরঞ্জন। এ যেন সংস্কার-আচা[illegible] বিচারের আগাছার মধ্য থেকে এক বলিষ্ঠ মহীরুহের উদ্ভিন্ন হয়ে ওঠা। সামাজিক [illegible] সাম্প্রদায়িক ধর্ম মানুষের নিত্য ধর্মকে কিরূপে অবমাননা করে তার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে [illegible] জায়গায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

হিন্দুর কুয়ো থেকে মুসলমানে জল তুললে তাতে জল অপবিত্র করে। এটা বিষম মুর্শ[illegible] কথা। কেননা, পবিত্রতা হল আধ্যাত্মিক রাজ্যের আর কুয়োর জলটা হল বস্তুরাজ্যের। যদি [illegible] যেত, মুসলমানকে ঘৃণা করলে মন অপবিত্র হয় তা হলে সে কথা বোঝা যেত; কেননা, [illegible] আধ্যাত্মিক মহলের কথা। কিন্তু মুসলমানের ঘড়ার মধ্যে অপবিত্রতা আছে বললে [illegible] সীমানাগত জিনিসকে তর্কের সীমানার বাইরে নিয়ে গিয়ে বুদ্ধিকে ফাঁকি দেওয়া হয়।[১৫]

শুধু তাই নয়, এই সাম্প্রদায়িক ধর্ম যে অনেক সময়ে প্রকৃত ধর্মকে হত্যা করে, [illegible] কবি দেখেছেন। যিশুখ্রিস্টের ধর্মাবলম্বীরাই কীভাবে তাঁরই ধর্মকে হনন করছে, তাই দেখা[illegible] গিয়ে কবি বলেছেন—

সেদিন তাঁকে মেরেছিল যারা
ধর্মমন্দিরের ছায়ায় দাঁড়িয়ে,
তারাই আজ নূতন জন্ম নিল দলে দলে,
তারাই আজ ধর্মমন্দিরের বেদীর সামনে থেকে
পূজামন্ত্রের সুরে ডাকছে ঘাতক সৈন্যকে,
বলছে, "মারো মারো।"
মানবপুত্র যন্ত্রণায় বলে উঠলেন ঊর্ধ্বে চেয়ে
"হে ঈশ্বর, হে মানুষের ঈশ্বর,
কেন আমাকে ত্যাগ করলে।"[১৬]

এমনি করে সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক, আচার-বিচার-মূলক সঙ্কীর্ণ ধর্মের গণ্ডি কা[illegible] এগিয়ে চললেন কবি; কবির চিত্ত ধীরে ধীরে যেন এক নব মানবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করল, [illegible] মৌলিক মানবধর্ম সমস্ত দেশকাল জাতি ধর্ম ও সম্প্রদায়ের বাইরে অথচ তারই অ[illegible] বস্তু। এই সাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ বলিষ্ঠ মানবধর্মে অনুপ্রাণিত হয়েই কবি পরবর্তী[illegible] লিখলেন,

ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত।
দেবালয়ের মন্দিরদ্বারে,
পূজা-ব্যবসায়ী ওদের ঠেকিয়ে রাখে।

---

১৪ 'কাহিনী', "পতিতা" (১৩০৪)।
১৫ 'শিক্ষা', "শিক্ষার মিলন"।
১৬ 'পুনশ্চ', "মানবপুত্র"।

ওরা দেবতাকে খুঁজে বেড়ায় তাঁর আপন স্থানে
সকল বেড়ার বাইরে
সহজ ভক্তির আলোকে,
নক্ষত্রখচিত আকাশে,
পুষ্পখচিত বনস্থলীতে,
দোসর-জনার মিলন-বিরহের
গহন বেদনায়।...
কবি আমি ওদের দলে—
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
দেবতার বন্দীশালায়
আমার নৈবেদ্য পৌঁছল না।
পূজারি হাসিমুখে মন্দির থেকে বাহির হয়ে আসে,
আমাকে শুধায়, "দেখে এলে তোমার দেবতাকে?"
আমি বলি, "না।"
অবাক হয় শুনে; বলে, "জানা নেই পথ?"
আমি বলি "না।"
প্রশ্ন করে, "কোনো জাত নেই বুঝি তোমার?"
আমি বলি, "না।"[১৭]

সমস্ত 'জাত' চলে গেলে যে 'জাত' থাকে সেটা শুধু 'মানুষ'। কবি এখন সেই আদিম মানবের জাতিতে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন, আর কোনো জাত তাঁর নেই, আর কোনো জাতিতে কবি বিশ্বাসও করেন না। এমনি ব্রাত্য, জাতিচ্যুত এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা কোনো ধর্মে দীক্ষিত নয়, কোনো গুরু বা পুরোহিতের কাছে যারা কোনোদিন মন্ত্র নেয় নি—যেমন আউল-বাউল, বৈষ্ণব নেড়া-নেড়ীর দল, ডোম-চণ্ডাল প্রভৃতি। কবি নিজেকে এদেরই দলভুক্ত মনে করেন। এমনি করে সমস্ত গণ্ডির বাঁধন যদি কেটে যায়! এই শ্রেণীর লোকেরা কোনো মন্ত্র, তন্ত্র, পূজা-অর্চনার মধ্য দিয়ে তাদের উপাস্য দেবতা বা ঈশ্বরের সাধনা করে না। তারা তাদের দেবতাকে পায় 'সহজ ভক্তির আলোকে' সুস্থ জীবনচর্চার মধ্য দিয়েই। কবিও তাদেরই মতো দেবতাকে আর মন্দিরে খোঁজেন না। কোনো আচার বা মন্ত্রের সাহায্যে তাঁকে পেতে চান না, তাঁর যিনি আরাধ্য দেবতা কবি তাঁকে লাভ করেছেন আপন অন্তরে, আনন্দময় জীবনরসে, এই পৃথিবীর যা কিছু সুখ-সম্পদ, রূপরস, সৌন্দর্য—তার অনন্ত অমৃত আস্বাদনের মধ্য দিয়েই। কবির অসংখ্য কবিতা ও গানে এই মতবাদ ধ্বনিত হয়েছে এবং এই সমস্ত কবিতা প্রায় সর্বজনপরিচিত। এখানে শুধু দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি অংশ মাত্র উদ্ধৃত করা হল :

(১) সাধু যবে স্বর্গে গেল, চিত্রগুপ্তে ডাকি
কহিলেন, "আনো মোর পুণ্যের হিসাব।"
চিত্রগুপ্ত খাতাখানি সম্মুখেতে রাখি
দেখিতে লাগিল তার মুখের কী ভাব।
সাধু কহে চমকিয়া—"মহাভুল এ কী!

প্রথমের পাতাগুলো ভরিয়াছ আঁকে,
শেষের পাতায় এ যে সব শূন্য দেখি—
যতদিন ডুবে ছিনু সংসারের পাঁকে
ততদিন এত পুণ্য কোথা হতে আসে!"
শুনি কথা চিত্রগুপ্ত মনে মনে হাসে।
সাধু মহা রেগে বলে, "যৌবনের পাতে
এত পুণ্য কেন লেখ দেবপূজা-খাতে?"
চিত্রগুপ্ত হেসে বলে—"বড় শক্ত বুঝা।"
যারে বলে ভালোবাসা, তারে বলে পূজা।"[১৮]

(২) ভজন পূজন সাধন আরাধনা
সমস্ত থাক্ পড়ে।
রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে
কেন আছিস ওরে।
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে
কাহারে তুই পূজিস সঙ্গোপনে,
নয়ন মেলে দেখ্ দেখি তুই চেয়ে
দেবতা নাই ঘরে।
তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙ্গে
করছে চাষা চাষ—
পাথর ভেঙ্গে কাটছে যেথায় পথ,
খাটছে বারো মাস।
রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে,
ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে;
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি
আয় রে ধুলার 'পরে।[১৯]

মানুষের মধ্যেই আছেন কবির দেবতা, তাঁর নারায়ণ। সেই অর্থে তাঁর কাছে নরই নারায়ণ। শুধু তাই নয়, মানুষের মধ্যে যারা অবজ্ঞাত, হীন, পতিত, অন্ত্যজ, তাদের মধ্যেই কবি এই নরনারায়ণের, তাঁর দেবতার অস্তিত্ব অনুভব করেন সবচেয়ে গভীর, সবচেয়ে সত্যভাবে :

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে, সবার নিচে
সব-হারাদের মাঝে।[২০]

এমনি করে সকল গণ্ডি, সমস্ত সম্প্রদায়, সর্বপ্রকার বিভেদ ও বৈষম্যের ঊর্ধ্বে, অথচ মানুষেরই অন্তর্নিবিষ্ট এই যে সর্বমানুষের ঈশ্বর, কবি তাঁরই সাধনা, তাঁরই আরাধনা

১৮. 'চৈতালি', "পুণ্যের হিসাব"।
১৯. 'গীতাঞ্জলি', ১১৯।
২০. ঐ, ১০৭।

করেছেন এবং তাঁকে খুঁজে পেয়েছেন মানুষেরই মধ্যে। একদিকে ভিতরে আপন অন্তর্জগতের আলোকে এবং অপর দিকে বাইরে সর্বমানবের মিলন রসে। তাঁর ভাষায়, "আমার মন যে সাধনাকে স্বীকার করে তার কথাটা হচ্ছে এই যে, আপনাকে ত্যাগ না করে আপনার মধ্যেই সেই মহান পুরুষকে উপলব্ধি করবার ক্ষেত্র আছে—তিনি নিখিলমানবের আত্মা।"[২১]

এই 'নিখিল মানবের আত্মা'কে উপলব্ধি করবার সাধনাই তাঁর সাধনার শেষ কথা, তাঁর সাধনার পরিণাম। কিন্তু এই নিখিল মানবের আত্মার স্বরূপ কী আর কীভাবেই বা তাঁকে পাওয়া যায়? তার উত্তরে দার্শনিক কবি বলেন,

"আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ', তিনি সর্বজনীন, সর্বকালীন মানব।তাঁরই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায় ভাবে কর্মে সর্বজনীনতার আবির্ভাব। মহাত্মারা সহজে তাঁকে অনুভব করেন সকল মানুষের মধ্যে তাঁর প্রেমে সহজে জীবন উৎসর্গ করেন। সেই মানুষের উপলব্ধিতেই মানুষ আপন জীবসীমা অতিক্রম করে মানবসীমায় উত্তীর্ণ হয়।"[২২]

কবির এই সর্বজনীন 'মানব' যেন এক পরম পুরুষ বা 'অতি মানব' যিনি সর্বমানবের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট থেকে তাকে মহত্ত্বের শ্রেয়োত্বের প্রেরণা যুগিয়ে আসছেন। তাঁরই পরিচয় দিতে গিয়ে কবি পূর্বে একটি বিখ্যাত কবিতায় বলেছিলেন,

কে সে? জানি না কে! চিনি নাই তারে—
শুধু এইটুকু জানি—তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর-পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা-বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তরপ্রদীপখানি। শুধু জানি যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বানগীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরানে
সংকট আবর্তমাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন,
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সংগীতের মতো। দহিয়াছে অগ্নি তারে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে,
সর্ব প্রিয়বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি জ্বেলেছে সে হোম-হুতাশন—
হৃৎপিণ্ড করিয়া ছিন্ন রক্তপদ্ম-অর্ঘ্য-উপহারে
ভক্তিভরে জন্মশোধ শেষ পূজা পূজিয়াছে তারে
মরণে কৃতার্থ করি প্রাণ।[২৩]

তিনি অনুভব করেছিলেন সমস্ত মানুষেরই অন্তরে রয়েছে এক মহামানবত্বের প্রেরণা, যা তাকে অনুপ্রাণিত করে শ্রেয়োত্বের পথে; মহত্ত্বের পথে অগ্রসর করে নিয়ে যায়। মহাত্মাদের কর্ণে তার আহ্বান পৌঁছায় সকলের আগে এবং সবচেয়ে গভীরভাবে; সেই আহ্বান শুনে তাঁরা আর ঘরে তিষ্ঠাতে পারেন না, নিত্যনৈমিত্তিক জৈব প্রয়োজনের আয়োজন তাঁদের আর বাঁধতে পারে না; তাঁরা তাই ব্যক্তিগত সংসারের সীমা ছাড়িয়ে ছুটে বেরিয়ে হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট সেই মহামানবের সৌন্দর্য প্রেরণায়, তাঁর প্রদর্শিত মহত্ত্বের আদর্শকে সফল

---

২১ 'মানুষের ধর্ম', "মানবসত্য" (১৩৩৯)।
২২ ঐ, ভূমিকা।
২৩ 'চিত্রা', "এবার ফিরাও মোরে"।

করে তুলবার জন্য নব নব ত্যাগ আর দুঃখবরণের পথে। মানুষের অন্তর্নিবিষ্ট এই 'মহামানব' (Superman)-কেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।'

এক দিক থেকে এই 'মহামানব'কে লাভ করবার, তাঁর পথে অগ্রসর হবার সাধনাই রবীন্দ্রনাথের ধর্মসাধনা। আর একেই তিনি নাম দিয়েছেন মানুষের ধর্ম।

৩

রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধের যে দিকটির কথা উপরে আলোচনা করা হল, সেটি তাঁর ধর্মচিন্তার অর্থাৎ মননের ও উপলব্ধির দিক। তাঁর ধর্মোপলব্ধি শেষ পর্যন্ত কোন পরিণতির অভিমুখে অগ্রসর হয়েছিল, তা আমরা সেখানে দেখাতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু এ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধের আরেকটি রূপ আছে। সেটি তাঁর কবিচিত্তের অনুভূতির দিক থেকে। পূর্বোক্ত উপলব্ধির মতো এটি তাঁর মননজাত বা মস্তিষ্কের সজ্ঞান চিন্তাপ্রসূত নয়, বরং এ যেন তাঁর হৃদয়ানুভূতি এবং এক অর্ধচেতন, অর্ধসুষুপ্ত মনের বোধজাত; ইংরেজিতে যাকে বলে intuition, তারই ফল। ধর্ম সম্পর্কে একটি তাঁর ভাবের (idea) কথা, অপরটি রসের কথা। একটির স্থান মস্তিষ্কে, বুদ্ধিবৃত্তিতে; অপরটির স্থান হৃদয়ে, অন্তরানুভূতিতে। রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধের ক্ষেত্রে এই দ্বিতীয় দিকটির স্থানও কিছুমাত্র কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং এই দ্বিতীয় দিকটি প্রথমোক্ত দিকটিকে, অর্থাৎ কবির অনুভূতিই তাঁর উপলব্ধিকে, তাঁর ধ্যান ও মননের ধর্মকে পূর্ণতা দান করেছে। তাঁর ধর্মবোধের এই দুটি দিক যেন পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কিত। এর একটি অপরটি থেকে স্বতন্ত্র নয় এবং এদের ঠিক আলাদা করে দেখানো যায় না। তবু আমরা আলোচনার সুবিধের জন্য, রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধের এই দ্বিতীয় দিকটি অর্থাৎ অনুভূতির দিক থেকে তাঁর ধর্মের কী রূপ, নিম্নে তাই স্বতন্ত্রভাবে অনুসন্ধান করবার চেষ্টা করব। অবশ্য উপরি-উক্ত আলোচনায়ও তার কিছু কিছু ইঙ্গিত আছে।

মনে রাখতে হবে কবি যে 'মহামানব'কে লাভ করবার সাধনার কথা বলেছেন, তা তো সহজ কাজ নয়, তাঁর পথে অগ্রসর হতে হয় 'ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে রাখি সাবধানে অন্তরপ্রদীপখানি'। রস সম্ভোগের কুঞ্জকাননে নয়, অশেষ ত্যাগ ও নব নব দুঃখবরণের দুর্গম পথেই তাঁর সঙ্গে মানবাত্মার অভিসার :

নয় এ মধুর খেলা,
তোমায় আমায় সারাজীবন
সকাল-সন্ধ্যাবেলা।...
কতবার যে নিবল বাতি
গর্জে এল ঝড়ের রাতি,
সংসারের এই দোলায় দিলে
সংশয়েরি ঠেলা।...
ওগো রুদ্র দুঃখে সুখে
এই কথাটি বাজল বুকে—
তোমার প্রেমে আঘাত আছে
নাইকো অবহেলা।[২৪]

কবি এ সম্পর্কে নিজে আরো বলেন, "আমার ধর্ম কী, তা যে আজও আমি সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট করে জানি, এমন কথা বলতে পারি নে... কিন্তু অলস শান্তি ও সৌন্দর্যরসভোগের

২৪ 'গীতিমাল্য', ৪১।

নয় ধর্মের প্রধান লক্ষ্য বা উপাদান নয়, এ কথা নিশ্চয় জানি। আমি স্বীকার করি, 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে'।... কিন্তু সেই আনন্দ দুঃখকে-বর্জন-করা আনন্দ নয়, দুঃখকে-আত্মসাৎ-করা আনন্দ।"[২৫]

কবি মনে করেন, দুঃখের মধ্যে দিয়েই ঘটে সুন্দরের পরম আবির্ভাব, আর 'দুঃখের দহন বেগে উঠিবে যে অমৃত' তারই স্পর্শে মানবাত্মা নিখাদ সুবর্ণের মতো পরিশুদ্ধি লাভ করে :

দুঃখ যদি না পাবে তো দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে,
বিষকে বিষের দাহ দিয়ে দহন করে মারতে হবে।...
মরতে মরতে মরণটারে শেষ করে দে একেবারে
তার পরে সেই জীবন এসে আপন আসন আপনি লবে।।[২৬]

তাই আঘাত যে তাঁরই পুরস্কার, কবির দেবতা শুধু 'শান্তম, শিবম' নন, তিনি যে রুদ্রও। যখন কখনো কখনো তিনি ধরা দেন রুদ্র বেশে কঠোর বেদনার মধ্য দিয়ে, তখন সেই দারুণ দুর্দিনে তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় ঘটে বজ্রের আলোতে :

ওরে, দুয়ার খুলে দে রে, বাজা, শঙ্খ বাজা!
গভীর রাতে এসেছে আজ আঁধার ঘরের রাজা।
বজ্র ডাকে শূন্য তলে বিদ্যুতেরই ঝিলিক ঝলে,
ছিন্ন শয়ন টেনে এনে আঙিনা তোর সাজা।
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এল দুঃখ রাতের রাজা।[২৭]

তাই দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়ে কবি এক রুদ্র দেবতার প্রসাদ লাভ করেন, বজ্রের নির্ঘোষে তাঁর বাঁশির সংকেত শুনতে পান এবং অন্ধকার ভয়াল রজনীতে তাঁরই ভীষণ মনোহর রূপ প্রত্যক্ষ করেন। তাই 'এই করেছ ভালো নিঠুর' কিংবা 'আরো কি বাণ তোমার তূণে আছে' এই বলে দুঃখকে আহ্বান জানাতেও তাঁর বাধে না।

কবির দেবতার কখনো কখনো এমনি কঠোর রুদ্র মূর্তি। কারণ যে পূর্ণ মানবত্বের, যে পূর্ণমানবের জন্য রবীন্দ্রনাথের সাধনা, দুঃখ ও কঠোর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নইলে তাকে লাভ করা অসম্ভব। সে রকম প্রাপ্তি ফাঁকা, অসম্পূর্ণ; কেবল সুখের মধ্যে, আরাম-আয়েশের মধ্যে তো তাঁর অধিষ্ঠান নয়। কবির 'রাজা' ও 'অরূপরতন' নাটকদ্বয়ে এই তত্ত্ব সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। 'অরূপরতন' নাটকের নায়িকা সুদর্শনা অনেক দুঃখের মধ্য দিয়ে জেনেছে,

> 'অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে যখনি রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম তখনি মনে হলো সেও বেরিয়ে এসেছে, রাস্তা থেকেই তাকে পাওয়া শুরু করেছি। এখন আমার মনে আর কোনো ভাবনা নেই। তার জন্য এত যে দুঃখ, এই দুঃখই আমাকে তার সঙ্গ দিচ্ছে—এত কষ্টের রাস্তা আমার পায়ের তলায় যেন সুরে সুরে বেজে উঠছে—এ যেন আমার বীণা, আমার দুঃখের বীণা, এরই বেদনার গানে তিনি এই কঠিন পাথরে এই শুকনো ধুলোয় আপনি বেরিয়ে এসেছেন—আমার হাত ধরেছেন।'[২৮]

তখন সে বুঝতে পারল—

'তুমি সুন্দর নও প্রভু, সুন্দর নও, তুমি অনুপম।'

---

২৫ 'আত্মপরিচয়', ৩।
২৬ 'গীতবিতান', পূজা ৯১।
২৭ 'খেয়া', "আগমন"।
২৮ 'অরূপরতন', ৪।

এমনি দুঃখ-বেদনার কঠোর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কবি যাঁকে লাভ করেছেন, যে কবিকে চিরকালই দুঃখ দিয়েছেন, তা নয়। কখনো কখনো, তিনি তাঁর আনন্দময় দিয়েও কবির জীবনকে রসে, মাধুর্যে ও আনন্দে ভরে তুলেছেন—

মনে আছে কবে কোন্ ফুল্লযূথীবনে,
বহুবাল্যকালে, দেখা হত দুই জনে
আধো-চেনাশোনা? তুমি এই পৃথিবীর
প্রতিবেশিনীর মেয়ে, ধরার অস্থির
এক বালকের সাথে কী খেলা খেলাতে
সখী, আসিতে হাসিয়া, তরুণ প্রভাতে
নবীন বালিকা-মূর্তি, শুভ্রবস্ত্র পরি
ঊষার কিরণধারে সদ্য স্নান করি
বিকচ কুসুমসম ফুল্ল মুখখানি
নিদ্রাভঙ্গে দেখা দিতে, নিয়ে যেতে টানি
উপবনে কুড়াতে শেফালি।[২৯]

কবি তখন তাঁকে বলেছেন খেলার সঙ্গিনী, নর্মসহচরী আর আপন অন্তরে তাঁর রস- লাভ করেছেন বলে তাঁর নাম দিয়েছেন—মানস-সুন্দরী। পরবর্তীকালে 'পূরবী' কা মানস-সুন্দরীকে লীলাসঙ্গিনী বলে অভিহিত করে কবি তাঁর উদ্দেশে বলছেন,

দুয়ার-বাহিরে যেমনি চাহি রে মনে হল যেন চিনি—
কবে, নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা, ছিলে লীলাসঙ্গিনী?...
মনে আছে সে কি সব কাজ, সখী, ভুলায়েছ বারে বারে।
বন্ধ দুয়ার খুলেছ আমার কঙ্কণ-ঝংকারে।[৩০]

আবার এখন :

ডাকিলে আবার কবেকার চেনা সুরে—বাজাইলে কিঙ্কিণী।
বিস্মরণের গোধূলিক্ষণের আলোতে তোমারে চিনি।

কবির এই লীলাসহচরী মানস-সুন্দরীই পরিণামে তাঁর জীবনের নিয়ন্ত্রণকর্ত্রী জীবন পরিণত হয়েছেন—তার আভাস পূর্ববর্তী "মানস-সুন্দরী" কবিতাতেই আছে :

ছিলে খেলার সঙ্গিনী
এখন হয়েছে মোর মর্মের গেহিনী,
জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।[৩১]

কবি যখন যাই নাম দিন না কেন, তাঁর মানসী বা মানস-সুন্দরী, 'চিত্রা' জীবনদেবতা এবং 'রাজা' 'অরূপরতন' নাটকের রাজা এবং 'খেয়া' কাব্যের দুঃ রাজা ও রাজার দুলাল যে একই সত্তার বিভিন্ন রূপ—রবীন্দ্রসাহিত্য ধারাবাহিকভাবে করলে—এ বিষয়ে সংশয়মাত্র থাকে না। একই দেবতা বিচিত্র রূপে, কখনো রু কখনো মধুর বেশে কবির কাছে দেখা দিয়েছেন। কবি কখনো যেমন তাঁর ভ্রূকুটি-ভয়াল ভীষণ সুন্দর রূপ, তেমনি কখনো আবার দেখেছেন তাঁর শা করুণাময় রূপ :

২৯ 'সোনার তরী', "মানস-সুন্দরী"।
৩০ 'পূরবী', "লীলাসঙ্গিনী"।
৩১ 'সোনার তরী', "মানস-সুন্দরী"।

সুন্দর, তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে
অরুণ–বরণ পারিজাত লয়ে হাতে।...
স্বপন আমার ভরেছিল কোন্ গন্ধে
ঘরের আঁধার কেঁপেছিল কী আনন্দে,
ধুলায় লুটানো নীরব আমার বীণা
বেজে উঠেছিল অনাহত কী আঘাতে।।[৩২]

প্রকৃতির নিবিড় সাহচর্যের মধ্য দিয়ে কবি এমনি এক শুভাশীর্বাদ, এমনি অমৃতস্পর্শ করেছেন। অবশ্য আঘাত বেদনাও কবির কাছে তাঁর দেবতার এক রকম আশীর্বাদই। তবে আসল কথাটা হচ্ছে, কবি তাঁর দেবতার অস্তিত্ব, তাঁর উপস্থিতি অনুভব করেন, জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে আর তাঁর পরিচিত সাধারণ সংসারেরই পার্শ্বে।

নামহারা এই নদীর পারে
ছিলে তুমি বনের ধারে,
বলে নি কেউ আমাকে।
শুধু কেবল ফুলের বাসে
মনে হত খবর আসে
উঠ্‌তো হিয়া চমকে।...
ঐ কী গভীর, এ কী মধুর,
এ কী হাসি পরাণ–বঁধুর
এ কী নীরব চাহনি,
এ কী ঘন গহন মায়া
এ কী স্নিগ্ধ শ্যামল ছায়া
নয়ন–অবগাহনি।[৩৩]

তাঁর হৃদয়–দেবতার এমনি মনোহর নয়ন ভুলানো রূপ দেখে আনন্দে পরিপ্লুত হয়েছেন; তনুমন যেন এই সৌন্দর্যের রসে অবগাহন করে স্নিগ্ধ ও ধন্য হয়েছে।

কবি লক্ষ করেছিলেন, পৃথিবীর বিচিত্র সৌন্দর্য–মাধুর্য, এর সমস্ত রূপ, রস, সুষমা, গন্ধের মধ্যে এমনি একটা অপরিমেয়তা, অনির্বচনীয়তা আছে যে তারা যেন কেবল নাতে আপনি সম্পূর্ণ পর্যবসিত নয় ; নিজেদের ক্ষুদ্র সীমাকে অতিক্রম করে, তারা যেন কোন এক অসীম অনন্তের আভাস দিয়ে যায়। তাই এই বিশ্বভুবনের প্রতি তাকিয়ে বিস্ময় আর আনন্দের অবধি নেই :

> আমি, কি আত্মার মধ্যে কি বিশ্বের মধ্যে, বিস্ময়ের অন্ত দেখি না। আমি জড় নাম দিয়া, সসীম নাম দিয়া, কোনো জিনিসকে এক পাশে ঠেলিয়া রাখিতে পারি নাই। এই সীমার মধ্যেই, এই প্রত্যক্ষের মধ্যেই, অনন্তের যে প্রকাশ তাহাই আমার কাছে অসীম বিস্ময়াবহ। আমি এই জলস্থল–তরুলতা–পশুপক্ষী–চন্দ্রসূর্য–দিনরাত্রির মাঝখান দিয়া চোখ মেলিয়া চলিয়াছি, ইহা আশ্চর্য। এই জগৎ তাহার অণুতে পরমাণুতে, তাহার প্রত্যেক ধূলিকণায় আশ্চর্য।[৩৪]

'গীতাঞ্জলি', ৬৭।
'গীতিমাল্য', ৯।
'আত্মপরিচয়', ১।

আপন সত্তার মধ্যেও, অন্তরের এক গভীর প্রদেশে কবি এই অনন্তের উপস্থিতি অনুভব করেন এক মধুর, আনন্দরসে :

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি
বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।[৩৫]

জগতের সামান্য বস্তুর মধ্যেও রয়েছে এমনি এক অপরিমেয়তা, এক অশেষের ব্যঞ্জনা। বস্তুর সীমাবদ্ধ রূপকে ঘিরে বাজে তার সুরময় মূর্ছনা। 'অরূপ বীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে'—যার 'কান' আছে, সেই শুনতে পায়। তার জন্য প্রয়োজন প্রেমের দৃষ্টির, কেননা শুধু অনুরাগই এই আশ্চর্য রহস্যকে আবিষ্কার এবং ধারণা করতে পারে :

যাহাকে আমরা ভালোবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমন কি জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালোবাসা। প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্যসম্ভোগ।...সমস্ত বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত রহিয়াছে।...

...বৈষ্ণবধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেম-সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে প্রভুর জন্য দাস আপনার প্রাণ দেয়, বন্ধুর জন্য বন্ধু আপনার স্বার্থ বিসর্জন করে, প্রিয়তম এবং প্রিয়তমা পরস্পরের নিকটে আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন এই সমস্ত পরমপ্রেমের মধ্যে একটা সীমাতীত লোকাতীত ঐশ্বর্য অনুভব করিয়াছে।[৩৬]

রবীন্দ্রনাথও বিশ্বপ্রকৃতিতে, নিসর্গ-সৌন্দর্য এবং মানব-সম্বন্ধের মধ্যে যখন একটা সীমাহীনতা একটা অনির্বচনীয়তা লক্ষ করেছেন, তখন তার ভিতর দিয়ে এক অনন্ত অসীম পরম রহস্যময়ের প্রকাশ এবং অভিব্যক্তিই তিনি অনুভব করেছেন। আর সেই প্রকাশ যেমন বিচিত্র এবং আশ্চর্য—'যা দেখেছি যা পেয়েছি, তুলনা তার নাই'।

কবির কাছে তাঁর দেবতার প্রকাশও তাই বিচিত্র। কখনো তা বেদনাময়, আবার কখনো বিশুদ্ধ আনন্দময়, আবার রূপাতীত হয়েও তিনি পরম সুন্দর। কেননা নিখিল বিশ্বের সকল রূপ যে তারই অনন্ত রূপের অভিব্যঞ্জনা। বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত বৈচিত্র্য, অজস্রতা, এর নানা রূপ, রস, পরিমাণ পার্থক্য, কবির কাছে শুধু তারই অস্তিত্ব, তারই ঐশ্বর্য ঘোষণা করে। তাই সৃষ্টির সকল আনন্দময় প্রকাশে কবি সর্বদা তারই সান্নিধ্য লাভ করেন। এই আত্মিক অনুভূতির গভীর ঐকান্তিকতার উৎস থেকেই কত সহজভাবেই না উৎসারিত হয়েছে এই কথাগুলি,

এই তো তোমার প্রেম, ওগো
হৃদয়হরণ।
এই-যে পাতায় আলো নাচে
সোনার বরন।।
এই-যে মধুর আলসভরে

---

৩৫ 'গীতাঞ্জলি', ১২০।
৩৬ 'পঞ্চভূত', "মনুষ্য"।

মেঘ ভেসে যায় আকাশ-'পরে
এই যে বাতাস দেহে করে
অমৃত ক্ষরণ।[৩৭]

অথবা

সারা জীবন দিল আলো সূর্য গ্রহ চাঁদ।
তোমার আশীর্বাদ, হে প্রভু, তোমার আশীর্বাদ।।
মেঘের কলস ভ'রে ভ'রে প্রসাদ বারি পড়ে ঝ'রে
সকল দেহে প্রভাতবায়ু ঘুচায় অবসাদ।।
তৃণ যে এই ধূলার 'পরে পাতে আঁচলখানি,
এই-যে আকাশ চিরনীরব অমৃতময় বাণী,
ফুল যে আসে দিনে দিনে বিনা রেখার পথটি চিনে,
এই-যে ভুবন দিকে দিকে পুরায় কত সাধ।
তোমার আশীর্বাদ, হে প্রভু, তোমার আশীর্বাদ।।[৩৮]

এমনি করে প্রকৃতি আর মানবসংসারের মধ্য দিয়েই কবি তাঁর পরমেশ্বরের আনন্দরূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। 'আনন্দ রূপম অমৃতম যদ্বিভাতি'— যা কিছু দেখা যাচ্ছে, সব তারই আনন্দরূপ অমৃত। কবি তাই এই পৃথিবীর সমস্ত পরিচয় ও অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে এর সকল রূপে রসে স্বাদে গন্ধে বর্ণে বৈচিত্র্যে—কেবল সেই অমৃতময় ভূমাকে, পরমানন্দময় জীবনদেবতাকেই লাভ করেছেন,

এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানাবর্ণগন্ধময়।...
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।[৩৯]

কবির দেবতা তাই গভীরভাবে মর্ত্য-জীবনাশ্রয়ী; আর সেই কারণে কবি এই ইহলোকে, এই মাটির পৃথিবীর মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন চরম আনন্দ আর পরম গৌরব। এই ইহজীবনই তার চরমতম লক্ষ্য; এর বাড়া কিছু তাঁর কাছে নেই,

স্বর্গ কোথায় জানিস কি তা, ভাই—
তার ঠিক-ঠিকানা নাই।...
ফিরেছি সেই স্বর্গে শূন্যে শূন্যে
ফাঁকির ফাঁকা ফানুস।
কত যে যুগ-যুগান্তরের পুণ্যে
জন্মেছি আজ মাটির 'পরে ধুলামাটির মানুষ।...
স্বর্গ আমার জন্ম নিল মাটি-মায়ের কোলে
বাতাসে সেই খবর ছোটে আনন্দ-কল্লোলে।[৪০]

৩৭। 'গীতাঞ্জলি', ৩০।
৩৮। 'গীতবিতান', পূজা ৩৫৫।
৩৯। 'নৈবেদ্য' ৩০, "মুক্তি"।
৪০। 'বলাকা', ২৪।

এখানে কবিকে আমরা দেখি অত্যন্ত গভীর অর্থে জীবনবাদীরূপে; আগের কবিতাটিতে তিনি বলেছেন, 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়', এবং 'ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করা যোগাসন সে নহে আমার'। সুখ-দুঃখ-বিরহমিলন-পূর্ণ মানবসংসারের এই দুর্লভ মানব জীবন, একে বর্জন করে কবি কোথাও মুক্তি খুঁজতে যেতে চান না, এ-কথা তিনি অন্যত্র উচ্চকণ্ঠে বারে বারে নানাভাবে বলেছেন। 'সোনার তরী'র "মুক্তি" কবিতায়

চক্ষু কর্ণ বুদ্ধি মন সব রুদ্ধ করি
বিমুখ হইয়া সর্ব জগতের পানে,
শুদ্ধ আপনার ক্ষুদ্র আত্মাটিরে ধরি
মুক্তি-আশে সন্তরিব কোথায় কে জানে![৪১]

সংসার-বিমুখ মায়াবাদী মুক্তিকামীদের বিরুদ্ধে কবির এটি একটি বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। কিন্তু সেইসঙ্গে এইখানে ঘোষিত হয়েছে জীবনের জয়গান। শুধু এমনি পরোক্ষ বা নেতিবাচক নয়, স্পষ্ট ইতিবাচক মর্ত্যপ্রীতির কবিতা-গানই রবীন্দ্রকাব্যে অজস্র অসংখ্য। 'সোনার তরী'তেই আছে,

চেয়ে তোর স্নিগ্ধশ্যাম মাতৃমুখ-পানে
ভালোবাসিয়াছি আমি ধূলিমাটি তোর
জন্মেছি যে মর্ত্য-কোলে ঘৃণা করি তারে
ছুটিব না স্বর্গ আর মুক্তি খুঁজিবারে।[৪২]

একটি গানে আছে—

এই-যে কালো মাটির বাসা শ্যামল সুখের ধরা।
এইখানেতে আঁধার-আলোয় স্বপন-মাঝে চরা।।
এরই গোপন হৃদয়-'পরে ব্যথার স্বর্গ বিরাজ করে
দুঃখে-আলো-করা।[৪৩]

ভালবাসার গভীর আবেগে এই গানের কথাগুলি কেমন ভাববেদনা-মন্থর হয়ে উঠেছে।

কবি এখানে এমন একনিষ্ঠ মর্ত্যপ্রেমিক যে, তিনি এই মর্ত্যজীবনের মধ্যেই অনুভব করেছেন চরম সার্থকতা, এই সাধারণ ধূলিমাটির পৃথিবীর জীবনই তাঁর কাছে দুর্লভতম স্বর্গ এবং এই মর্ত্যরূপী স্বর্গের সব কিছুই মধুময়,

এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি—
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি
এই মহামন্ত্রখানি,
চরিতার্থ জীবনের বাণী।
দিনে দিনে পেয়েছিনু সত্যের যা-কিছু উপহার
মধুরসে ক্ষয় নাই তার।
তাই এই মন্ত্রবাণী মৃত্যুর শেষের প্রান্তে বাজে—
সব ক্ষতি মিথ্যা করি অনন্তের আনন্দ বিরাজে।
শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরণীর
বলে যাব—'তোমার ধূলির

---

৪১ 'সোনার তরী', "মুক্তি"।
৪২ 'সোনার তরী', "আত্মসমর্পণ"।
৪৩ 'গীতবিতান', পূজা ২১০।

তিলক পরেছি ভালে,
দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে।
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মূরতি,
এই জেনে এ ধুলায় রাখিনু প্রণতি।'[৪৪]

এমনি করে মর্ত্যপ্রীতিই কবির জীবনের ধ্যানমন্ত্রে পরিণত হয়েছিল; 'মধুময় পৃথিবীর ধূলি' এই মহাবাণীই তাঁর জীবনে চরম চরিতার্থতা আনয়ন করেছে এবং এর মধ্য দিয়েই জীবন রূপে দিয়ে তিনি পৃথিবীর কাছে জীবনের চরম মূল্য প্রদান করেছেন। এখানে মনে হয় জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা, মর্ত্য-জীবনকে আরতি করাই তাঁর ধর্ম, এর বড়ো আর কোনো ধর্ম কবির নেই।

কিন্তু তাই বলে কবি কেবল নিছক জীবনবাদী, প্রকৃতিপূজারী প্যাগান মাত্র নন, যদিও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিটা এখানে অনেকটা প্যাগানদেরই মতো। কিন্তু তাঁর এই প্রকৃতি-প্রীতি ও মর্ত্যপূজা প্রকৃতপক্ষে মহত্তর কোনো সত্তার, এদের অন্তর্নিহিত কোনো সত্যের প্রতি পূজার সোপান মাত্র, এর আভাস পূর্বোদ্ধৃত এই উক্তিটির মধ্যেই আছে : 'সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মুরতি/এই জেনে এ ধূলায় রাখিনু প্রণতি'। অর্থাৎ তাঁর কাছে উপনিষদের সেই বাণীটির তাৎপর্য জাজ্বল্যমান সত্য : 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে' এবং 'আনন্দরূপম অমৃতম যদ্বিভাতি।' অর্থাৎ সবকিছু তাঁরই আনন্দ থেকেই জাত এবং যা কিছু বিভাসিত, প্রকাশিত হচ্ছে, সেসব তাঁরই অমৃতময় আনন্দরূপ।

আর তাই জীবন ও প্রকৃতির প্রতি প্রীতি তাঁকে সেই অনন্তের, সেই আনন্দময় বিশ্ববিধাতার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেয় না বা কোনো মায়া-বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে না, কেননা এই সমস্ত সীমার মধ্য দিয়ে যে সেই অসীম, অনন্তেরই প্রকাশ। তাই এই জীবনানন্দ, এই নিসর্গপ্রীতি তাঁকে সেই অনন্তেরই অভিমুখে নিয়ে যায়,

> প্রকৃতি তাহার রূপরস বর্ণগন্ধ লইয়া, মানুষ তাহার বুদ্ধিমন তাহার স্নেহপ্রেম লইয়া, আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে—সেই মোহকে আমি...নিন্দা করি না। তাহা আমাকে বদ্ধ করিতেছে না, তাহা আমাকে মুক্তই করিতেছে; তাহা আমাকে আমার বাহিরেই ব্যাপ্ত করিতেছে। নৌকার গুণ নৌকাকে বাঁধিয়া রাখে নাই, নৌকাকে টানিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। জগতের সমস্ত আকর্ষণপাশ আমাদিগকে তেমনি অগ্রসর করিতেছে... সকলই এই জগৎসংসারের নিরন্তর টানে প্রতিদিনই ন্যূনাধিক পরিমাণে আপনার দিক হইতে ব্রহ্মের দিকে ব্যাপ্ত হইতেছে।[৪৫]

কবির মতে এমনি করে জগৎ সংসারের প্রতি সমস্ত আকর্ষণ, আত্মীয়পরিজন ও স্বজনের প্রতি সমস্ত মমতা ও প্রীতি, এক অনন্তের তথা প্রেমময় বিশ্ববিধাতার অভিমুখেই আমাদের যেন টেনে টেনে অগ্রসর করে নিয়ে যাচ্ছে। জগতের প্রতি, প্রিয়জনের প্রতি আমাদের যে আকর্ষণ সে তো তাঁরই আকর্ষণ :

> জগতের সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া, প্রিয়জনের মাধুর্যের মধ্য দিয়া ভগবানই আমাদিগকে টানিতেছেন—আর-কাহারো টানিবার ক্ষমতাই নাই। পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিয়াই সেই ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া, জগতের এই রূপের মধ্যেই সেই অপরূপকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা, ইহাকেই তো আমি মুক্তির সাধনা বলি। জগতের মধ্যে আমি মুগ্ধ, সেই মোহেই আমার মুক্তিরসের আস্বাদন।[৪৬]

---

৪৪ 'আরোগ্য', ১।
৪৫ 'আত্মপরিচয়', ১।
৪৬ ঐ।

তাই জীবনানন্দ এবং প্রকৃতি-সৌন্দর্য সম্ভোগের মধ্য দিয়ে কবি, ভগবান বা বিশ্ববিধাতা বা তাঁকে যে নামই দেওয়া হোক না কেন, তাঁরই অমৃত-রসের আস্বাদন লাভ করেছেন। এই আনন্দরসের আস্বাদনই তাঁর পূজা, সেই বিশ্বময়ের পূজা,

জীবনে আমার যত আনন্দ
পেয়েছি দিবসরাত
সবার মাঝারে তোমারে আজিকে
স্মরিব জীবননাথ।...
বার বার তুমি আপনার হাতে
স্বাদে গন্ধে ও গানে
বাহির হইতে পরশ করেছ
অন্তর-মাঝখানে।
পিতা মাতা ভ্রাতা প্রিয় পরিবার,
মিত্র আমার, পুত্র আমার,
সকলের সাথে হৃদয়ে প্রবেশি
তুমি আছ মোর সাথ।
সব আনন্দ-মাঝারে তোমারে
স্মরিব জীবননাথ।[৪৭]

জগৎ ও জীবনের সৌন্দর্য মাধুর্যের মধ্যে এমনি করে কবি লাভ করেছেন পরম অমৃতময়ের আনন্দ। তাই তো সে আনন্দ উপভোগ করবার জন্য কবির এমন ব্যাকুলতা :

নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে ফুলবনে
তারি মধু কেন মন-মধুপে খাওয়াও না।
নিত্য সভা বসে তোমার প্রাঙ্গণে
তোমার ভৃত্যেরে সেই সভায় কেন গাওয়াও না।
বিশ্বকমল ফুটে চরণচুম্বনে
সে যে তোমার মুখে মুখ তুলে চায় উন্মনে,
আমার চিত্ত-কমলটিরে সেই রসে
কেন তোমার পানে নিত্য-চাওয়া চাওয়াও না।[৪৮]

বিশ্বভুবনের এই রূপ-রস-সৌন্দর্য-উপভোগের যে অনাবিল আনন্দরস তারই মধ্য দিয়ে যখন কবি সেই পরম রসময় আনন্দময়ের সান্নিধ্য লাভ করেন, তখন এক অনির্বচনীয় পুলকে তাঁর সর্বদেহমন স্পন্দিত হতে থাকে, তিনি যেন এক দিব্যোন্মাদ ভাবের অবস্থা লাভ করেন। তখন তাঁর সমগ্র সত্তাকে মথিত করে যেন এক অলৌকিক রাগিণী বাজতে থাকে এবং রসাবেশে আত্মহারা কবির হৃদয়মন আপনিই গাইতে থাকে,

এই লভিনু সঙ্গ তব,
সুন্দর, হে সুন্দর,
পুণ্য হল অঙ্গ মম,
ধন্য হল অন্তর।।
আলোকে মোর চক্ষু দুটি

৪৭ 'নৈবেদ্য', ৭।
৪৮ 'গীতিমাল্য', ৪৩।

মুগ্ধ হয়ে উঠল ফুটি
হৃদ্‌গগনে পবন হল
সৌরভেতে মন্থর,
সুন্দর, হে সুন্দর ।।[৪১]

এটি যেন অসীম সুন্দর প্রিয়তমের সঙ্গে নিজ সসীম সত্তার আনন্দ-সম্মিলনের ক্ষণিক মুহূর্তের এক নিবিড় রসোল্লাস। অনেকটা বৈষ্ণবদের ভাব-সম্মিলনের মতো। আমার তো মনে হয়, এটি কবির সাধনার চূড়ান্ত পর্যায়, তাঁর ধ্যান-সমাধি বা দিব্যোন্মাদ অবস্থা। সুফি সাধকরা যাকে বলেন জজবা। কবি এখানে সুফি সাধকদের বা বৈষ্ণবদের মতোই মরমী বা মিস্টিক। সাধক তাঁর অলৌকিক উপলব্ধির যে মুহূর্তে আত্মহারা হয়ে বলে ওঠেন, 'আনাল হক' বা 'সোহং' অর্থাৎ আমিই তিনি, কবির এখন তেমনি অলৌকিক মুহূর্ত। এই মুহূর্তে যে তিনি পরম প্রিয়তম, পরম সুন্দর, আনন্দময়ের সান্নিধ্য, প্রায় তাঁর সঙ্গে একাত্মতা লাভ করেছেন।

তা হলে দেখা যাচ্ছে কবি কখনো দুঃখ বেদনার কঠোর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে, কখনো জীবনের আনন্দরসের মধ্য দিয়ে তাঁর আরাধ্য দেবতার সান্নিধ্য লাভ করেছেন। অবশ্য দুঃখ আর আনন্দ কবির কাছে পরস্পরবিরোধী সংজ্ঞা তো নয়; দুঃখের মধ্যেও কবি পেয়েছেন আনন্দ, আর সেই আনন্দই তাঁর দৃষ্টিতে অধিকতর রমণীয়। কারণ দুঃখের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মানুষের সত্তা যেমন গভীরভাবে আলোড়িত হয়ে ওঠে, সুখানুভূতিতে তা হয় না। বেদনা হৃদয়ের যে গহন তলকে স্পর্শ করে, সুখ তার কাছেও যেতে পারে না। অতএব বেদনার আনন্দই গভীর আনন্দ। জীবনের এই দুঃখ-সুখের মিলিত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যে নিগূঢ় আনন্দরস কবি পান করেছেন, তাই তাঁকে তাঁর জীবনেশ্বরের, তাঁর জীবনদেবতার স্পর্শ ও সান্নিধ্য দান করেছে—এ-কথাই রবীন্দ্রনাথের ধর্মসাধনার সার কথা।

৪

রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধের এই দুই দিক আমরা দেখতে পাই : একটি হচ্ছে মননের দিক, অপরটি সাধনার দিক। মনন বা উপলব্ধির দিক থেকে ধর্মকে তিনি দেখেছেন একটি আদর্শরূপে যার ভিত্তিভূমি হচ্ছে এক উদার মানবিকতা—যাকে তিনি অভিহিত করছেন 'মানুষের ধর্ম' বলে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ধর্ম কেবল শুষ্ক তত্ত্বমাত্র নয় আর শুধু দার্শনিক আলোচনার মধ্যেও তা পর্যবসিত নয়। রবীন্দ্রনাথ মর্ত্যপ্রেমিক কবি, তিনি জীবনরসের কবি। তাঁর ধর্মসাধনাও তাই জীবনের এই রসানুভূতি থেকে বিশ্লিষ্ট নয়, বরং তারই সঙ্গে গভীরভাবে অনুস্যূত। পূর্বেই বলেছি, তাঁর ধর্মের এই অনুভূতির দিকটা তার উপলব্ধির দিকটাকে পূর্ণতা দান করেছে। আর এখানেই রবীন্দ্রনাথ মিস্টিক হয়ে উঠেছেন; না-হলে তিনি হতেন শুধু দার্শনিক কবি। কিন্তু মননের বিষয়কে তিনি অনুভূতিগম্য করে তুলেছেন, তত্ত্বকে পেয়েছেন রসের মধ্যে। এইটেই মিস্টিক মনের বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাঁর ধর্মের এই মিস্টিক তথা অনুভূতির দিকটা আমরা তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি।

কবির যিনি আরাধ্য দেবতা, তত্ত্বোপলব্ধির দিক থেকে তিনি হচ্ছেন 'সর্বজনীন সর্বকালীন মহামানব', আর অনুভূতির দিকে থেকে তার প্রকাশ বিচিত্র, কবি তাই বিচিত্র নামে তাকে অভিহিত করেছেন। কখনো তিনি 'মানসী', 'মানস-সুন্দরী', 'লীলাসঙ্গিনী', আবার কখনো বা 'প্রভু', 'প্রিয়', 'অন্তর্যামী', 'জীবননাথ' ইত্যাদি। এক কথায় বলা যেতে

৪১ 'গীতিমাল্য', ১০২।

পারে তিনি কবির 'জীবনদেবতা'। এই জীবনদেবতার সঙ্গেই তাঁর সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা মিলন-বিরহের বিচিত্র সম্পর্ক, বা রসের সম্পর্ক। তিনি কবির প্রেমিকও বটেন, আবার তাঁর জীবনের অধীশ্বরও বটেন।

রবীন্দ্রনাথের নিজের কোনো কোনো কথা থেকেও মনে হয় তাঁর 'সর্বজনীন মানব' বা 'নিখিল মানবের আত্মা' আর তার 'জীবনদেবতা' একই সত্তা কিংবা একই সত্তার বিভিন্ন রূপ। যেমন,

> বিশ্বদেবতা আছেন, তাঁর আসন লোকে লোকে, গ্রহচন্দ্রতারায়। জীবনদেবতা বিশেষভাবে জীবনের আসনে, হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁর পীঠস্থান, সকল অনুভূতি সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে। বাউল তাঁকেই বলেছে মনের মানুষ। এই মনের মানুষ, এই সর্বমানুষের জীবনদেবতার কথা বলবার চেষ্টা করেছি Religion of Man বক্তৃতাগুলিতে। তাকে দর্শনের কোঠায় ফেললে ভুল হবে। তাকে মতবাদের একটা আকার দিতে হয়েছে, কিন্তু বস্তুত সে কবিচিত্তের একটা অভিজ্ঞতা।[৫০]

তা হলে দেখা যাচ্ছে আসলে তাঁর 'সর্বজনীন মানব'ও তাঁর কবিচিত্তেরই 'একটা অভিজ্ঞতা'—যাকে তিনি একটা দার্শনিক রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তবু তাঁর এই অভিজ্ঞতা আর তাঁর জীবনদেবতার অভিজ্ঞতা যে ঠিক হাত-ধরাধরি করে চলেছে, এ-কথা বলা চলে না। একজন হচ্ছেন তাঁর মনন, চিন্তা, তর্ক ও উপলব্ধির বিষয়; অপরজন সকল তর্ক মীমাংসা ও বুদ্ধির অতীত। প্রথমোক্তের অধিষ্ঠান যদি হয় মস্তিষ্কে, তবে দ্বিতীয়ের অধিষ্ঠান হৃদয়ে, 'কেবল রসে, কেবল সুরে, কেবল অনুভাবে'। এই দুই, একই সত্তার বিভিন্ন রূপ হতে পারে, কিন্তু সেই দুই রূপ একটু স্বতন্ত্র বই কি! কবি যদিও 'মানুষের ধর্ম'কে দর্শনের কোঠায় ফেলতে চান নি, তবু প্রকৃতপক্ষে তিনি সেখানে তাঁর কথিত 'নিখিল মানবের আত্মা'কে দর্শনেরই বিষয়ীভূত করেছেন এবং যুক্তি মীমাংসা দ্বারা তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু জীবনদেবতার সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্ক, সেটা নিতান্তই ব্যক্তিগত, অনুভূতির জগতের, সেটা তর্ক-মীমাংসার বিষয়ই নয়।

আঁধারে আবৃত ঘন সংশয়
বিশ্ব করিছে গ্রাস,
তারি মাঝখানে সংশয়াতীত
প্রত্যয় করে বাস।
বাক্যের ঝড় তর্কের ধূলি
অন্ধ বুদ্ধি ফিরিছে আকুলি,
প্রত্যয় আছে আপনার মাঝে—
নাহি তার কোনো ত্রাস।[৫১]

এই প্রত্যয়ের যিনি বিষয়, তাঁকে কবি এমনিতেই অনুভব করেন আপন হৃদয়ে, বিনা তর্কে বিনা আলোচনায়, শুদ্ধমাত্র আপন অনুভূতির (intuition) সত্যতায় :

না বুঝেও আমি বুঝেছি তোমারে
কেমনে কিছু না জানি।
অর্থের শেষ পাই না, তবুও
বুঝেছি তোমার বাণী।।
নিশ্বাসে মোর নিমেষের পাতে

---

৫০ 'মানুষের ধর্ম', "মানবসত্য"।
৫১ 'নৈবেদ্য', ১১।

চেতনা বেদনা ভাবনা-আঘাতে
কে দেয় সর্বশরীরে ও মনে
তব সংবাদ আনি।।...
আপনার চিতে নিবিড় নিভৃতে
যেথায় তোমারে পেয়েছি জানিতে
সেথায় সকলি স্থির নির্বাক্
ভাষা পরাস্ত মানি।।
না বুঝেও আমি বুঝেছি তোমারে
কেমনে কিছু না জানি।।[৫২]

অতএব 'জীবনদেবতা' সম্পর্কে কবির যে অভিজ্ঞতা আর 'মানুষের ধর্ম' সম্পর্কে তাঁর যে উপলব্ধি, এ দুটোকে আলাদা করে দেখাই সঙ্গত। তাঁর ধর্মবোধের এই যে দুটি দিক— এ দুটিকে আলাদা করে বুঝে নিয়ে, পরে এ দুটিকে মিলিয়ে নিলেই রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা করতে আমাদের সুবিধে হবে। নইলে গোলমাল বেধে যাওয়ার সম্ভাবনা, এমনকি কোনো কোনো কথা পরস্পরবিরোধীও মনে হতে পারে। মোট কথা, তাঁর দুটি অভিজ্ঞতা একই সত্তা সম্পর্কে হলেও স্বতন্ত্র এবং বিভিন্ন ধরনের। একটি জ্ঞানের সাহায্যে উপলব্ধি, অপরটি ধ্যানাবস্থার রসানুভূতি।

প্রশ্ন হতে পারে এই দুই মিলিত অভিজ্ঞতাই যদি কবির ধর্ম হয়, তবে তার এই ধর্মবোধকে কী নাম দেওয়া যেতে পারে? একে শুদ্ধমাত্র 'মানুষের ধর্ম' বলা যায় না, কেননা তাঁর ধর্মের অপর একটি দিক আছে, আবার শুদ্ধ 'আনন্দবাদ' বা 'মরমীবাদ' বললেও কবির চিন্তাধারার একটা প্রধান দিক অনুল্লিখিত থেকে যায়।

নিজের ধর্মবোধকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একটি ইংরেজি বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন,

> My religion is essentially a poet's religion. Its touch come to me through the same unseen and trackless channels as does the inspiration of my music. My religious life has followed the same mysterious line of growth as has my poetical life. Somehow they are wedded to each other.
>
> I believe that the vision of paradise is to be seen in the green of the earth, in the beauty of the human face and the breath of human life, even in objects that are seemingly insignificant and unpossessing. Everywhere in this earth the spirit of Paradise is awake and sending forth its voice. It reaches our inner ear without our knowing, it tunes our harp of life which sends our aspiration in music beyond the finite, not only in prayers and hopes, but also in temples which are flames of fire, in stone, in pictures which are dreams made everlasting, in the dance which is ecstatic meditation in still centre of movement.[৫৩]

লক্ষ করবার বিষয়, এই উক্তিটিতে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর ধর্মের বিবর্তনশীলতার কথা প্রকারান্তরে বলেছেন। এ বিষয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি।

---

৫২ ঐ, ৯।

৫৩ "The Religion of an Artist", *Contemporary Indian Philosophy* (George Allen & Unwin).

সে যাই হোক উদ্ধৃত উক্তিটির তাৎপর্যকে যথার্থভাবে এবং সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করলে, রবীন্দ্রনাথের ধর্মের নাম দিতে হয় 'মানবিকতাভিত্তিক আস্তিক্যবাদ'। মানবিক সত্য এবং মানবজীবনের রসবোধই তাঁর ধর্মের প্রধান কাণ্ড বা দেহ, কিন্তু এর মূল অনুপ্রেরণা বা আত্মা হচ্ছে এক গভীর আস্তিক্যবাদ।

আধুনিক হিউম্যানিস্টদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অনেকটাই মিল লক্ষ করা যাবে, কিন্তু সবটা নয়। হিউম্যানিস্টদের মতেই রবীন্দ্রনাথ গভীর জীবনবাদী এবং লৌকিক জগতের পূজারী। এই অংশ পর্যন্ত হিউম্যানিস্টদের সঙ্গে তাঁর মিল। কিন্তু এইটেই তো রবীন্দ্রনাথের ধর্মের শেষ কথা নয়। এই জগৎ ও জীবন যে তাঁর কাছে রূপাতীত, লোকাতীত, অনন্ত দেশকালব্যাপী এক মহান আনন্দশক্তির প্রকাশ; এ জগতের যা কিছু সুন্দর ও মহনীয়, অপরূপ ও অনির্বচনীয়, সে যে তারই বার্তা কবির কাছে বহন করে নিয়ে আসে :

> ফুলও আমাদের কাছে সেই প্রিয়তমের দূত হয়ে আসে।... সে চুপি চুপি আমাদের কানে এসে বলে, 'আমি এসেছি, আমাকে তিনি পাঠিয়েছেন। আমি সেই সুন্দরের দূত, আমি সেই আনন্দময়ের খবর নিয়ে এসেছি।'[৫৪]

এটা রবীন্দ্রনাথের কাব্যের এবং তাঁর ধর্মসাধনারও একটা মূল কথা—রূপের মধ্যে এই রূপাতীতের 'অরূপরতনে'র অনুভব। জগতের মধ্যেই জগতের অতিরিক্ত একটা কিছুর অস্তিত্ব তাঁর কাছে সত্য। হিউম্যানিস্টদের সঙ্গে এইখানে তাঁর অমিল। হিউম্যানিস্টরা হয় নিরীশ্বর, আর নয়তো ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরব। রবীন্দ্রনাথ নিরীশ্বরও নন, অজ্ঞেয়বাদীও নন। রবীন্দ্রনাথের জগৎপ্রেমের মূলে রয়েছে এক গভীর আস্তিক্যবোধ (theism), রবীন্দ্রনাথকে হয়তো বলা যেতে পারে pantheist বা সর্বেশ্বরবাদী, অর্থাৎ সবকিছুর মধ্যেই যিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করেন। অনেকটা পারস্যের সুফি কবিদের মতো। যেমন, আমরা হাফিজের কবিতায় দেখি,

> রবি, শশী, জ্যোতিষ্ক সব
> বান্দা তোমার, জ্যোতির্মতি!
> যেদিন হতে বান্দা হল—
> পেল আঁধার-হরা জ্যোতি,
> রাগে অনুরাগে মেশা
> তোমার রূপের রৌশনীতে
> চন্দ্র হল স্নিগ্ধ কিরণ,
> সূর্য হল দীপ্ত অতি।[৫৫]

কেউ কেউ আবার রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরবোধের সঙ্গে বার্গসঁ কথিত creative energy-র তুলনা করেছেন,[৫৬] কিন্তু এই তুলনায় কাজ কী! একজনের মত ও বিশ্বাস আরেকজনের মতোই হতে হবে, এমনই বা কী কথা আছে? রবীন্দ্রনাথই তো বলেছেন, কোনো বাঁধা ধর্মমত তাঁর নয়। তাঁর ধর্মমত তাঁরই জীবনের অভিজ্ঞতার ভেতর থেকে উদ্ভিন্ন হয়ে বেড়ে উঠেছে। কবির আপন জীবনে সৃষ্ট, অনেকটা তাঁর ব্যক্তি-অনুভূতিনির্ভর এই ধর্মমতেরই পরিচয় আমরা এই প্রবন্ধে দিতে চেষ্টা করেছি।

---

৫৪ 'শান্তিনিকেতন', "শ্রাবণসন্ধ্যা"।

৫৫ 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ', অনুবাদ : নজরুল ইসলাম, সংখ্যা ১২।

৫৬ Bergson, *Creative Evolution*.

মযহারুল ইসলাম

রবীন্দ্রনাথ ও লোকসাহিত্য

বিবিক্ত, বিষণ্ন ও ভয়াবহভাবে নির্জন এই কালে লোকসাহিত্যের চর্চা, পঠন-পাঠন ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা আমাদের চেতনার শরীরে স্নিগ্ধ মধুর প্রলেপের মতো। লোকসাহিত্যের সরল সহজ অনাড়ম্বর পৃথিবী একমাত্র ঠাঁই যেখানে মুখ লুকোবার মতো জায়গা আছে, অন্তত পিতৃমাতৃহীন এ-যুগে। লোকসাহিত্যের মধ্যে যুক্তিশাস্ত্রের নিয়মকানুন মানবার তেমন আয়োজন নেই অথচ শুধু তারই ভিতরে পর্যাপ্ত হৃদয় একেবারে ছড়িয়ে আছে, আর সেখানেই আমরা পূর্বপুরুষদের সঙ্গে সংলাপে স্নিগ্ধ হতে পারি। একালের ধূসর সৃষ্টিহীন মুহূর্তে লোকসাহিত্য দেশের বিপুল জনসাধারণের সঙ্গে একাত্ম হতে শেখায়, আমাদের একাকিত্ববোধ, স্বল্পকালের জন্য হলেও, মুখর জনকণ্ঠের মধ্যে হারিয়ে যায়, ব্যক্তির আলাদা নির্জন অস্তিত্ব জন-অস্তিত্বের স্বাদ পায়, তদুপরি দেশ-কাল-পাত্রের দিগ্বলয় বিশ্ববলয়ের মধ্যে স্থিতি পায়, আমাদের বিষাক্ত প্রতিহত অবমানিত অবহেলিত, প্রহারে প্রহারে জর্জরিত চেতনা অকস্মাৎ আত্মীয়তার সন্ধান পায়, মানবিকতার বিশ্বজনীন অবস্থিতি আমাদের মন কাড়ে।

রবীন্দ্রনাথ যে-মুহূর্তে লোকসাহিত্যের গভীরতর চর্চায় ব্যস্ত ছিলেন তিনি এসব কথা ভেবেছিলেন কি না জানি না। কিন্তু যেহেতু সব চেতনাই আসলে সমকালীন চেতনা সেহেতু আমরা এমন করে ভাবি। নিদারুণ বৃষ্টিপাত, ভয়ংকর খরা, ধ্বংসমুখী কালবোশেখী এবং অর্থনৈতিক মন্দা যে-দিনে দৈনন্দিন ঘটনা তখন আমরা এ-রকম ভাবি। আমাদের উপলব্ধ যন্ত্রণাই সেজন্য সবকিছু বিচারের মানদণ্ড অর্থাৎ তীব্র স্নায়বিক জ্বালা, অন্তর্দ্বন্দ্বে নিহত হৃদয় এবং সহৃদয় ঈশ্বরের অনুপস্থিতি আমাদেরকে রবীন্দ্রনাথের কাল থেকে পৃথক করে দিয়েছে, ফলে রবীন্দ্রনাথের বিচারও আমরা করি আমাদেরই চেতনার আলোকে। ঐতিহাসিক ও সমকালীন চেতনার সমন্বয়ে যথার্থ সাহিত্য-বিচার সম্ভব।

একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, কোনো সাহিত্যই স্বয়ম্ভূ নয়। প্রত্যেক সাহিত্যের মূল রসস্রোত একদিকে যেমন ব্যক্তির, অন্যদিকে তেমনি ব্যক্তির মাধ্যমে সমাজের মানসলোক থেকে উৎসারিত। একটি সমাজ আবার সমগ্র মানবসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সেদিক থেকে ব্যক্তির সাহিত্যে যেমন একটি সমাজের ও একটি দেশের হৃদয়বাণী ধরা পড়ে, তেমনি তার সৃষ্টির মাধ্যমে, যদি সে-সৃষ্টি তার হৃদয়ের অকৃত্রিম আনন্দ-বেদনার অনুভূতিতে অভিষিক্ত হয়, সমগ্র মানবসমাজের অব্যক্ত কথা যেন বাণীরূপ লাভ করে। সেজন্যই সাহিত্য-স্রষ্টার

হৃদয়-মুকুরটি তাঁর নিজের এবং সমাজের তথা বিশ্বের ছায়া প্রতিবিম্বিত হবার মতো সমুজ্জ্বল ও প্রশস্ত—তাঁর অনুভূতির ও মননের ক্ষেত্র তাঁর নিজের, সমাজের ও বিশ্বের জীবনালেখ্যের বীজকে পূর্ণাঙ্গ জীবন-ফসলে গড়ে তুলবার উপযুক্ত উর্বরতায় সমৃদ্ধ। এই কথাগুলো চিন্তা করেই সাহিত্যকে জীবনের দর্পণ বা সমাজের প্রতিবিম্ব বলে উল্লেখ করতে কোনো বাধা দেখি না। আবার এই কথাগুলো স্মরণ রেখেই বলতে হয়, আজকের ব্যক্তি বা সমাজ শুধু আজকের সৃষ্টি নয়। সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তির স্বাস্থ্যে, গঠনপ্রকৃতিতে, রক্তে, ভাষায়, মননে এবং সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা-চালচলনে অতীত রয়েছে—রয়েছে অনেককালের অনেক ওঠানামার পথ পেরিয়ে তার আজকের যুগে বা কালে উত্তরণের একটি চলিষ্ণু ধারা—একটি বিবর্তনের অবিরাম প্রবাহ। এই প্রবাহের গুঞ্জনধ্বনি কবি তাঁর রক্তে তাঁর মর্মে অব্যক্ত ভাষায় অনুরণিত হতে শোনেন :

তব সঞ্চার শুনেছি আমার মর্মের মাঝখানে,
কত দিবসের কত সঞ্চয় রেখে যাও মোর প্রাণে,...
তুমি জীবনের পাতায় পাতায় অদৃশ্য লিপি দিয়া
পিতামহদের কাহিনী লিখিছ মজ্জায় মিলাইয়া!

ফ্রস্টের ভাষায় :

It is from that water we were from
Long, long before we were from any creature
Here we, in our impatience of the steps,
Get back to the beginning of the beginnings, ...
It flows with us. It flows between us
To separate us for panic moment
It flows between us, over us and with us.

এই যে অতীত, যার অব্যক্ত গুঞ্জনে বিমুগ্ধ কবিচিত্তের বাণী দেশে দেশে কালে কালে সাহিত্যে প্রমূর্ত হয়েছে, লোকসাহিত্য তাকেই ধারণ ও লালন করে—লোকসাহিত্যের পথ সেই অতীত পর্বতগুহা বনজঙ্গল থেকে একালের গ্রাম মাঠ প্রান্তর শহর বন্দরে প্রসারিত। ফোকলোর (Folklore)-এর অঙ্গে অঙ্গে ছড়িয়ে আছে অতীতের চেতনা, অতীতের এবং অতীত-মানুষের মানসিকতা সংবলিত বিচিত্র অভিজ্ঞতার নিরাভরণ প্রকাশ। সুতরাং সংবেদনশীল কবি-সাহিত্যিক মাত্রেই হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতির অভিজ্ঞায় সংযোগ স্থাপন করেন দেশের traditional বা ঐতিহ্যনির্ভর সমাজ ও সাহিত্যের সঙ্গে। মননশীল চেতনার সেতু ধরে তাঁরা ফোকলোর-এর সাথে ওতপ্রোত হন।

রবীন্দ্রনাথের বেলায়ও ঠিক তাই হয়েছে। অতীতের অস্পষ্ট গুঞ্জন অনুসরণ করেই রবীন্দ্রনাথ মানসলোকে অতীত-ঐতিহ্যমুখী ভাবলোকে অবগাহন করেছেন। আর অতীত ঐতিহ্যের মূর্তিমান প্রতিনিধি লোকসাহিত্যের সংলাপ ধরে তিনি সেকালের সুবিস্তৃত লোকসমাজের সঙ্গে বারবার একাত্ম হয়েছেন। বাংলার আকাশ-বাতাস বাঙালির গানে, বাঙালির কথায় মুখর। সেই গান আর সেই কথা মধ্যযুগের সাহিত্যে স্থূল চেতনায় প্রতিফলিত হয়েছে। আর রবীন্দ্রসাহিত্যে এসে তা পরিশীলিত হয়েছে এবং রুচিবান অভিব্যক্তি ও সূক্ষ্ম কারুকার্যের মাধ্যমে একটি সুকুমার সাহিত্য-প্রাণ সৃষ্টি করেছে। রবীন্দ্রনাথ সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে যে বাঙালি ছিলেন, তার মূল কারণ সন্ধান করতে গেলে এ দেশের আকাশে বাতাসে গুঞ্জরিত লোকসমাজের সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় এবং দেশের অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁর

মানস-সংযোগ প্রভৃতির বিচার একান্ত প্রয়োজন। বিপিনচন্দ্র পাল যথার্থই বলেছেন :

> Rabindranath is not only the poet of modern Bengal but he is equally the poet, in a special sense, of ancient and medieval Bengal, a poet of Folk-Bengal...Rabindranath is, above all, a Bengali. In his philosophy he has worked to bring the ancient theosophy of the Upanishads to the modern man. In his poetic creations he has brought the realisations of the medieval Vaishnava and Sakta worshippers of Bengal to the most advanced modern plane. In his sense of literary revivalism he has based his feelings on the Folk-tradition of Bengal. In his protest against the spirit of current nationalism, which has been a call to universal war, he has tried to fulfil the mission of that Universal Religion for which Raja Rammohan strove. In all these he represents, in a very special sense, the genius and culture of his own people and province. *(Golden Book of Tagore,* ed. Ramananda Chatterjee, Calcutta, 1931.)

এজন্যেই রবীন্দ্রকাব্যে বাঙালি মনের বহু যুগের মর্মবাণী ধরা পড়েছে। বৌদ্ধযুগের নাথযোগী থেকে শুরু করে বৈষ্ণব সাধক, সুফী সাধনায় বিশ্বাসী পুঁথি রচয়িতা, আউল বাউল ও আধুনিক যুগের গীতিকবি, সবার মধ্যেই বাঙালি জীবনের একটি আত্মগত অধ্যাত্মসাধনার সন্ধান, জড়জীবনের প্রতি নিস্পৃহতার একটি স্বাভাবিক প্রবণতা কমবেশি বিদ্যমান। রবীন্দ্রনাথ তাঁদেরই প্রতিভূ।

এজন্যেই লোকসাহিত্যের দিগন্তবিস্তৃত মাঠে–ঘাটে রবীন্দ্রনাথকে কখনো জ্ঞাতে কখনো অজ্ঞাতে বিচরণ করতে দেখা গেছে। তিনি যে কালের আয়তনে ও রচনার পরিমাণে বিশাল বিরাট এই লোকসাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে তাঁর অনেক চিন্তার, মননের ও বিষয়ের উপাদান অসংকোচে গ্রহণ করে তাঁর রচনাকে বৈচিত্র্যে ও ঐশ্বর্যে শক্তিসম্পন্ন করে তুলেছেন, তাঁর কাব্যজগৎ থেকে এরকম প্রচুর উপাদান সংগ্রহ করা যেতে পারে। বলাই বাহুল্য, বিষয়টি একটি মূল্যবান গবেষণার বিষয়বস্তু হতে পারে। বর্তমান প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ সীমিত বলেই আমি শুধু কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে আমার বক্তব্যের সত্যতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করব। রবীন্দ্রনাথের খুব আগের দিকের কাব্যে না প্রবেশ করে 'ছবি ও গান' কাব্যটিকেই প্রথমে ধরা যাক। এই কাব্যের "রাহুর প্রেম" কবিতাটি যদিও আধুনিক ভাষণে ও অনুভূতিতে প্রগাঢ়, তবু কবিতাটির মূল কাঠামো সাজানো হয়েছে একটি চিরপরিচিত পৌরাণিক লোককাহিনী ও সেই কাহিনী–উদ্ভূত লোকবিশ্বাসের ভিত্তিভূমির ওপর। 'মানসী' কাব্যের "অহল্যার প্রতি" অনুরূপ আর একটি লোককাহিনী ও লোকবিশ্বাসভিত্তিক কবিতা। তাঁর পরিপক্ক চিন্তার ফসলে সমৃদ্ধ কাব্যগুলোতেও অনুরূপ নিদর্শন দুর্লক্ষ্য নয়। লোককাহিনী ও লোকবিশ্বাসকে আধুনিক কবিতায় যে কত সুন্দরভাবে প্রকাশ করা যায় এবং সেই কাব্যসম্মত প্রকাশ যে কত হৃদয়স্পর্শী হতে পারে তার নিদর্শন দুটো কবিতায় বিশেষভাবে লক্ষণীয়।—'কথা' কাব্যের "দেবতার গ্রাস" এবং "বিসর্জন"। কবিতাদ্বয়ে প্রচলিত লোকবিশ্বাসকেই করুণ কাহিনীর আধারে কবি রূপ দিয়েছেন এবং দুটো কবিতাই যে কিরূপ মর্মস্পর্শী হয়েছে তা বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন করে না। 'সোনার তরী' কাব্যের "[illegible]দতা" কবিতাটির ভাষা এবং পরিকল্পনা আধুনিক কবির, কিন্তু এ–কবিতার কাহিনী ও পরিবেশ সম্পূর্ণভাবেই লোকসাহিত্যের পরিমণ্ডলে লালিত এবং পরিপুষ্ট। কবিতাটির বিষয়বস্তু একটি বিখ্যাত টাইপ ও কয়েকটি বিশ্ব–প্রচলিত মটিফ–এর কথাই আমাদের মনে

করিয়ে দেয়। 'খেয়া' কাব্যের "আগমন" কবিতার রাজা যদিও কবির 'রাজা' নাটকের সমগোত্রীয় এক জন সাংকেতিক পুরুষ—এক জন 'আঁধার ঘরের' বা 'দুঃখ রাতের' রাজা, তবু তার আগমনের আয়োজনটি রূপকথাকেন্দ্রিক। 'ছড়ার ছবি' কাব্যের প্রায় সমস্ত কবিতাতেই লোকসাহিত্যে প্রতিবিম্বিত ছড়ার মেজাজ, চারিত্র্য এবং ছন্দকে তিনি যথাযথভাবে আয়ত্ত করেছেন। "রঙ্গ" কবিতাটি এদেশের হেঁয়ালি বা ধাঁধা থেকেই উৎসারিত।

পরিবেশ সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ যে লোকসমাজের অঙ্গনে মাঝে মাঝেই যাতায়াত করেছেন তার প্রমাণ তাঁর বহু কবিতায় ও গানে ছড়িয়ে রয়েছে। আমাদের একালের অতি আধুনিক আবহাওয়াপুষ্ট মন নিয়ে আমরা লোকসাহিত্যের সুবিস্তীর্ণ অথচ অসহায় দিগন্তের প্রতি একটি অবজ্ঞা বা উপেক্ষার ভাব প্রায়শ প্রকাশ করে থাকি। ইদানীং লোকসাহিত্যের প্রতি কটাক্ষপাত বা রক্তচক্ষু নিক্ষেপ করা একটি প্রশংসার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, এ কথাও মাঝে মাঝে শোনা যায়। অর্থাৎ মনে করা হয় লোকসাহিত্যের যা-কিছু সবই জীর্ণ এবং মধ্যযুগীয়, আর সে-সব অতিক্রম করেই মাত্র আধুনিকতার চত্বরে প্রবেশের ছাড়পত্র লাভ সম্ভব। অথচ রবীন্দ্রনাথের বেলায় এমনটি হয় নি। এমনটি হয় নি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, বার্নস্, মার্ক টোয়েন, লংফেলো এবং ফ্রস্টের বেলায়। এঁরা সবাই লোকসাহিত্যের বহু উপকরণ, উপমা, পরিবেশ এবং বিষয়বস্তু সাদরে গ্রহণ করেও তাঁদের সমসময়ে আশ্চর্য রকমের আধুনিক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর যে ক'জন কবির নাম করা গেল তাঁরা, বিশেষ করে আমেরিকার শেষ ক'জন, শিল্পায়নসমৃদ্ধ সমাজের মানুষ এবং সে সমাজের সাথে লোকসমাজের দূরত্ব সত্ত্বেও তাঁরা লোকসাহিত্যকে অবজ্ঞা করেন নি। বর্তমানে যান্ত্রিক সভ্যতায় বিশ্বের সবচেয়ে অগ্রণী এবং শিল্পায়নে অদ্বিতীয় দেশ নিঃসন্দেহে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। মধ্যবয়সী কবি রবার্ট লোয়েল বর্তমানে সে দেশের সবচেয়ে শক্তিধর এবং খ্যাতিমান কবিদের একজন। তিনি যান্ত্রিক সভ্যতার শীর্ষদেশে এবং লোকসাহিত্যের সমাজ থেকে বহুদূরে নিউইয়র্ক শহরে অবস্থান করেও লোকসাহিত্যকে উপেক্ষা করতে পারেন নি। তিনি বিস্ময়করভাবে আধুনিক, প্রথম জীবনে এলিয়টের প্রভাবপুষ্ট ছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে একটি অত্যুজ্জ্বল নিজস্ব কাব্য পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছেন, যেখানে ভক্তের সংখ্যা অসংখ্য। আমি নিজেও তাঁর একজন ভক্ত পাঠক এবং তাঁর কবিতা থেকে লোকসাহিত্যের অজস্র নিদর্শন আমি তুলে ধরতে পারি। এই যদি হয় যান্ত্রিকতায় এবং শিল্পায়নে বর্তমান সভ্যতায় সবচেয়ে উন্নত দেশের কবিদের কথা, তবে তুলনামূলকভাবে আমাদের শহরই হোক আর গ্রামই হোক, সবই যেখানে মধ্যযুগীয় গ্রাম সেখানে এবং সেই নির্জলা গ্রাম-দেশে গ্রাম্য সমাজে বাস করেও আমরা যদি লোকসাহিত্যকে কটাক্ষ করি আর সাহিত্য-চিন্তা থেকে লোকসাহিত্যকে সযত্নে দূরে রাখতে প্রয়াসী হয়ে উঠি, তবে তা একদিকে যেমন দুঃখের অন্যদিকে তেমনি আমরা যে করুণার পাত্র এই ভেবে অনুশোচনার অন্ত থাকে না। এ-যেন অনেকটা পানিতে বাস করে পানিকেই ব্যঙ্গ করা। মনে রাখতে হবে, আধুনিকতা, সে যে-যুগেরই হোক, নির্ভর করে কোনো বিষয়ের ওপর নয়, বিষয়ীর ওপর। যে-কোনো বিষয়কে আধুনিক অবয়বে দাঁড় করিয়ে প্রাণপ্রাচুর্যে উচ্ছল করে তোলা যায়, যদি, যিনি স্রষ্টা, তাঁর মনটি আধুনিকতার চেতনায় পরিপুষ্ট হয়ে থাকে। এ জন্যই রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্যের বহু বিষয় বা উপকরণ গ্রহণ করেও আধুনিকতায় সার্থক হয়েছেন আর ঈশ্বর গুপ্ত অনেক আধুনিক বিষয় গ্রহণ করেও মধ্যযুগীয় রসালতা এবং বাচালতা অতিক্রমে অক্ষম। এই জন্যই সুপ্রাচীনকালের মহাকাব্য রামায়ণ থেকে কাহিনী গ্রহণ করেও মধুসূদন তাঁর কালে বিপ্লবী আধুনিক ছিলেন, আর কায়কোবাদ

মধুসূদনের অনেক পরে একটি প্রায় সদ্য ঐতিহাসিক ঘটনা বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেও রচনায় মধ্যযুগের বদ্ধ জলাশয়ে অবগাহন করেছেন।

এই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ থেকে একটি উদাহরণ দেওয়া সমীচীন মনে করছি। রবীন্দ্রনাথের "সিন্ধুপারে" কবিতাটির সামগ্রিক পরিবেশ শুধু রহস্যময় নয়, লোকসাহিত্যের সংসারে লালিত। Lady Isabel and the Elf-knight নামক একটি ইংরেজি লোকগীতিকার (Ballad) পরিবেশের সঙ্গে এ-কবিতার পরিবেশ মিলিয়ে পড়লে সাদৃশ্য যে কত নিবিড় তা অনুধাবনীয় হবে :

পউষ প্রখর শীতে জর্জর, ঝিল্লিমুখর রাতি;
নিদ্রিত পুরী, নির্জন ঘর, নির্বাণ দীপ-বাতি।
অকাতর দেহে আছিনু মগন সুখ-নিদ্রার ঘোরে,
তপ্ত শয্যা প্রিয়ার মতন সোহাগে দিয়েছে মোরে।
হেনকালে হায় বাহির হইতে কে ডাকিল মোর নাম—
নিদ্রা টুটিয়া সহসা চকিতে চমকিয়া বসিলাম।...
দেখিনু দুয়ারে রমণী-মুরতি অবগুণ্ঠনে ঢাকা—
কৃষ্ণ অশ্বে বসিয়া রয়েছে, চিত্রে যেন সে আঁকা।
আরেক অশ্ব দাঁড়ায়ে রয়েছে পুচ্ছ ভূতল চুমে,
ধূম্রবরন, যেন দেহ তার গঠিত শ্মশান-ধূমে।...
নীরবে রমণী অঙ্গুলি তুলি দিল ইঙ্গিত করি—
মন্ত্রমুগ্ধ অচেতন-সম চড়িনু অশ্ব'পরি।

তারপর বহু পথ ঘাট, লোকালয় ও নির্জন অঞ্চল পার হয়ে

জনহীন এক সিন্ধুপুলিনে অশ্ব থামিল আসি।

সেখানে অনেক আয়োজন-শেষে রমণীর সঙ্গে কবির বিবাহপর্ব সম্পন্ন হল এবং কবি শেষ পর্যন্ত রমণীর মুখ দেখে অবাক বিস্ময়ে বলে উঠলেন,

সেই মধুমুখ, সেই মৃদুহাসি, সেই সুধাভরা আঁখি—
চিরদিন মোরে হাসাল কাঁদাল, চিরদিন দিল ফাঁকি।

যে ইংরেজি লোকগীতিকার কথা বলা হয়েছে তার নাম Lady Isabel and the Elf-knight। কবিতাটির কয়েকটি চরণ স্মরণ করছি :

Fair lady Isabel sits in her bower sewing,
    Aye as the gowans grow gay
There she heard an elf-knight blawing his horn
    The first morning in May.
If I had you horn that I hear blawing,
And you elf-knight to sleep my bosom.
This maiden had scarcely these words spoken
Till in at her window the elf-knight has luppen.
It's a very strange matter, fair maiden, said he
I canna blaw my horn but ye call on me.
But will ye go to you greenwood ride?
If ye canna gang, I will cause you to side.

She mounted on a milk-white steed.
And he upon a bay
They rode, they rode through the merry green woods
Till they came to the side of the sea.
O sit down a while, lay your head on my knee,
That we may hae some rest before that I die.
She stroakd him sac fast, the nearer he did creep,
Wia sma charm she lull'd him fast asleep.

রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য ইংরেজি গীতিকবিতাটির প্রভাবে "সিন্ধুপারে" কবিতার আদল দিয়েছেন এ–কথা বলবার ধৃষ্টতা আমার নেই, তবে দুই কবিতার পরিবেশ সৃষ্টিতে বিস্ময়কর সাদৃশ্য মনে করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথ লোক–ঐতিহ্য থেকে প্রেরণা গ্রহণে কুণ্ঠিত ছিলেন না।

শুধু বিষয়বস্তু গ্রহণে বা পরিবেশসৃষ্টিতেই নয়, শব্দচয়নেও তিনি লোকসাহিত্যে নিত্য ব্যবহৃত বহু শব্দ তাঁর কবিতায় নিঃসংকোচে স্থান দিয়েছেন। সমথ নাতনী, ঠিক দুক্ষুর, গুড়ো পাটালী, অনাছিষ্টি, তিতো কড়া ওষুধ, গা ছমছম, নাইতে এসে, রান্নাঘরে শব্দ বাসন মাজান, পালের কাছি এবং এই জাতীয় অসংখ্য শব্দ এমন সার্থকভাবে তিনি প্রয়োগ করেছেন যা তাঁর কবিতার আঙ্গিকে আধুনিক চেতনাকে বিড়ম্বিত না করে বরঞ্চ ফলপ্রসূ ও হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছে। শব্দের সার্থক ব্যবহারে তাঁর মুনশিয়ানা ও বাহাদুরি আমাদের সাহিত্যে একান্তই দুর্লভ।

এদেশের লোকসঙ্গীতের মরমিয়া ভাবসাধনা রবীন্দ্রনাথকে যে কত বেশি উন্মন করেছে তা তাঁর বহু কবিতায়, গানে ও উক্তিতে ধরা পড়েছে। লোকসাহিত্যের যে ধারাটি রবীন্দ্র কবি–মানসে সবচেয়ে গভীর ঝংকার তুলেছিল এবং তাঁর ব্যক্তিত্বকে সজোরে নাড়া দিয়েছিল সে হল এ দেশের আউল মরমিয়া ভাবসাধনা। কেউ কেউ এ জন্যই তাঁকে 'রবীন্দ্র বাউল' বলে ঠাট্টা করেছেন। লালন শাহের

কোন সুখে সাঁই করেন খেলা এই ভবে
দেখ সে আপনি বাজায় আপনি মজে সেই রবে

এই গানের কলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের

অরূপ বীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে
সে বীণা আজি উঠিল বাজি হৃদয় মাঝে

গানটি মিলিয়ে পড়লে সহজেই উপলব্ধি করা যায় আসলে দুই কবিই একই জগতের মানুষ। রবীন্দ্রনাথের

আমি রূপসাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপরতন আশা করি,

অথবা

অরূপ, তোমার বাণী
অঙ্গে আমার চিত্তে আমার
মুক্তি দিক্ সে আনি

কিংবা

ওই মরণের সাগরপারে চুপে চুপে
এলে তুমি ভুবনমোহন স্বপনরূপে

গানের সাথে লালনের নিম্নলিখিত গানগুলো মিলিয়ে পড়লে দুজনের চিন্তায় সাদৃশ্য সাধর্ম্য যে কত বেশি তা অনুধাবন করা সম্ভব হবে।

১. কথা কয়রে
দেখা দেয় না
নড়েচড়ে হাতের কাছে
খুঁজলে জনম-ভর মেলে না।

২. আমি একদিনও না দেখিলাম তারে
আমার বাড়ির কাছে আরশি নগর
সেথা এক পড়শী বসত করে।

৩. খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়।

গো পথের সাথী, নমি বারম্বার' গানটিতে এদেশের মুরশিদি গানের সুরই যেন ঝংকৃত য়েছে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু সম্বন্ধীয় চিন্তাধারার সঙ্গে লালনের ও পাগলা কানাইয়ের গানে ফলিত চিন্তাধারার একটি বিস্ময়কর সাদৃশ্য আছে। লালনের

দিনের দিন দিন ফুরালো
শুকনাতে তরণী
দিনের দিন দিন ফুরালো
বৈসা রে দিন গুণি

গানের সাথে রবীন্দ্রনাথের 'আমার দিন ফুরালো' গানটি যেন একই বাঁধনে আবদ্ধ।

উদাহরণের ফিরিস্তি না বাড়িয়ে যে-কথাটি স্পষ্ট করে বলা যায় এবং অনেকেই লেছেন সে হল এই যে, আউল বাউলের ভাবসাধনার জন্য যে মনোভূমির প্রয়োজন, যে লিমাটি, রস ও আর্দ্রতার আবশ্যক, রবীন্দ্রনাথ সেই মনোভূমির অধিকারী ছিলেন আর সেখানে পলিমাটি, রস ও আর্দ্রতার অভাব কোনোদিনই ঘটে নি।

এ কারণেই "বাউল গানের যে সাহিত্যিক মূল্য থাকিতে পারে, এ বিষয়ে শিক্ষিত বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথ। ইহার অনন্যসাধারণ রসপিপাসু কবিচিত্ত বাঙ্গালা দেশের বহু অজ্ঞাত ও তুচ্ছ বলিয়া পরিগণিত বস্তু ও বিষয়ের মধ্যে নব নব সৌন্দর্যের আবিষ্কার করিয়া বাঙ্গালীর রসভাণ্ডারের সম্পদ বহুগুণিত করিয়াছে। বাউল গান সংগ্রহের কার্যে রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টা প্রথমতম এবং শ্রেষ্ঠতম।" (সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড)

এ কারণেই রসগ্রাহী রবীন্দ্রনাথকে বলতে শুনি, "আমাদের দেশের ইতিহাস প্রয়োজনের মধ্যে নয়, মানুষের অন্তরের গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনাকে বহন করে এসেচে। বাউল-সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি—এ জিনিস হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই, একত্র হয়েচে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করে নি। এই মিলনে সভা-সমিতির প্রতিষ্ঠা হয় নি, এই মিলনে গান জেগেচে, সেই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু-মুসলমানের কণ্ঠ মিলেচে, কোরান পুরাণে ঝগড়া বাধে নি। এই মিলনেই ভারতের সভ্যতার সত্য পরিচয়, বিবাদে বিরোধে বর্বরতা। বাংলা দেশের গ্রামের গভীর চিত্তে উচ্চ সভ্যতার প্রেরণা স্কুল কলেজের অগোচরে আপনা-আপনি কি রকম কাজ করে এসেচে, হিন্দু-মুসলমানের জন্য এক আসন রচনার চেষ্টা করেচে, এই বাউল গানে তারই পরিচয় পাওয়া যায়।"

রবীন্দ্রনাথের সুসমঞ্জস ব্যক্তিত্ব, তাঁর বিশাল এবং জনতার ভিড়ে আকীর্ণ হৃদয়, স্থির বিশ্বাস, চারদিকে উজ্জ্বল নক্ষত্রের সমাবেশ ইত্যাদি এবং আরো অনেক কিছু তাঁকে দিয়েছিল

এমন এক শক্তি যা কালকেও শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত করে গেছে। বলা বাহুল্য, একালে আম আর কেউ বীর্যধর নই, আমরা পুতুলের মতো দুর্বল অথচ আত্মকথনে অভ্যস্ত, আমা আমাদের সকল শক্তি দিয়েও সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারি না। রবীন্দ্রনাথের কাছে এ ছিল অনায়াসসাধ্য, তাঁর ভুবনে ধ্রুবতারার অকম্পিত আলোকরশ্মি বারংবার তাঁকে সমুদ্র থেকে শুরু করে শেষ সমুদ্রের তীর পর্যন্ত নিয়ে গেছে। তাঁর সুগ্রথিত উত্তরাধিকারী আমরা নই—আর তাই নিঃসংশয়ে আমরা আমাদের হৃদয়কে অন্য সমর্পণ করতে পারি না।

আজ সে-সব কারণে এবং অন্যান্য নানা কারণে রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্য সম্বন্ধে বলেছিলেন তার একটা পরিমাপ করতে এসে মনে হচ্ছে না কি যে, আমাদের আয়ু শূন্য লম্বমান এক দড়ির প্রান্তে দোদুল্যমান। রবীন্দ্রনাথ প্রজ্ঞাবান বিবেকী বিশ্বের অসংশয় বিশ্রীভাবে অত্যাচারী নিয়ম-শৃঙ্খলায় আবদ্ধ সত্যের হাত থেকে একটা মুক্তির পথ খুঁজেছিলেন তাঁর 'লোকসাহিত্য' সেই আবেগের স্নিগ্ধ কোমল শিশু। সে কারণে মনে হয় না কি আমাদের মতো ফুটো হয়ে যাওয়া ফুসফুস তাঁর ছিল না বটে কিন্তু আমাদের মতো নাগরিকের হয়তো কোনো যন্ত্রণার অংশীদার ছিলেন তিনি। 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের পাঁচটি জুড়ে রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর হৃদয় সেই কথা বলে এবং বলে বড় অদ্ভুতভাবে, লোকসাহিত্যের ইতিহাস নয়, তার বৈজ্ঞানিক গবেষণা নয়, কোনো বিদেশী মতামতের প্রেক্ষিতে নয় বরং শুধুমাত্র হৃদয়, এবং হৃদয় দিয়েই তিনি সোচ্চার হয়েছেন আমাদের কাছে

তাঁর দুটি প্রবন্ধ "ছেলেভুলানো ছড়া"র মধ্যে তিনি সন্ধান পেয়েছিলেন ব্যাকরণহীন এক খাপছাড়া জগতের, বোধকরি, দীর্ঘদিনের যুক্তিশীল মনন ও মানসিকতার চর্চার পর প্রথম তিনি এলোমেলো অগোছালো হতে চাইলেন। পরবর্তীকালে এর মধ্যে তিনি নিজে এক অসম্ভবের ব্যাকরণ রচনা করলেন। রবীন্দ্র-চরিত্রের চারদিকে পরিদৃশ্যমান যে আলো গোলক বিদ্যমান ছিল যার ফলে তাঁকে ঋষি ইত্যাদি সুচতুর শব্দে বিভূষিত করা হয়েছে অথচ লোকসাহিত্যের ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নিজেই ঋষির আলোক- সুদূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন অর্থাৎ সেটা যেন একটা কলঙ্কের মতো, লেবেলের মতো এঁটে আছে। মহৎ বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথের অনাস্থার কথাটা বোঝা যাবে শুধু ছেলেভুলানো ছড়ার ঐকান্তিক পাঠে। বারংবার যে কথা মনে হয় সেটা হল এই যে, রবীন্দ্রনাথ এমন করে নিজেকে ছড়ার আবোল-তাবোলে হারিয়ে ফেলেছিলেন যে, সেটা যেন সংবিৎ হারিয়ে ফেলার মতোই। সেজন্যই আমার মতে "ছেলেভুলানো ছড়া" নামে দু-দুটো প্রবন্ধ আসলে রবীন্দ্রনাথের হৃদয়গত আত্মকথন। কেননা পরাজিত ব্যাকরণ এবং পরাভূত যুক্তি পণ্ডিতের ধূসর বিবর্ণ গবেষণার মধ্যে ঠাঁই পায়। রবীন্দ্রনাথ এই একটি ক্ষেত্রে কোনো প্রথাস্বীকৃত পথে এগোন নি।

ছেলেভুলানো ছড়া প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য স্মরণ করা যাক। তিনি বলেন, "বাংলা ভাষায় ছেলে ভুলাইবার জন্য যে-সকল মেয়েলি ছড়া প্রচলিত আছে, কিছুকাল হইতে আমি তাহা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম। আমাদের ভাষা এবং সমাজের ইতিহাস-নির্ণয়ের পক্ষে সেই ছড়াগুলির বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে একটি সহজ কাব্যরস আছে সেইটিই আমার নিকট অধিকতর আদরণীয় বোধ হইয়াছিল।"

উপরোক্ত উদ্ধৃতি প্রমাণ করে যুক্তিতর্কসহকারে পণ্ডিতজনের জন্য গ্রহণযোগ্য করে কিছু রচনা করতে চান নি। পণ্ডিতদের প্রতি তিনি কটাক্ষপাত করতে ভোলেন নি। মতে : "যাঁহারা উপযুক্ত সমালোচক তাঁহাদের নিকট একটা দাঁড়িপাল্লা আছে;

সাহিত্যের একটা বাঁধা ওজন এবং সেইসঙ্গে অনেকগুলি বাঁধি বোল বাহির করিয়াছেন; যে-কোনো রচনা তাঁহাদের নিকট উপস্থিত করা যায় নিঃসংকোচে তাহার পৃষ্ঠে উপযুক্ত নম্বর -সমেত ছাপ মারিয়া দিতে পারেন।"

এই উদ্ধৃতিও মূলত একই মানসসঞ্জাত, কারণ প্রকৃতপক্ষে তিনি ছড়ার আবোল-তাবোলের মধ্যে স্নাত হতে চেয়েছিলেন, সে কারণেই তিনি বাঁধা পথে না গিয়ে প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতির শাসন না মেনে এমনকি সমালোচকের মানদণ্ডের তোয়াক্কা না রেখে একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত আত্মকথনের রীতি গ্রহণ করেন। কিন্তু পণ্ডিতদের তিনি পরোয়া করুন আর নাই করুন, সমালোচকের ধার ধারুন আর নাই ধারুন, বিষয়ভিত্তিক আলোচনার সুযোগ সবারই আছে। রবীন্দ্রনাথ সেটাকে অস্বীকার করতে পারেন নি। যদিও ব্যক্তিগত রুচি ও মর্জিই তাঁর আলোচনার ভিত্তি তবু তাঁর প্রবন্ধদ্বয়ের শরীরে এমন অনেক প্রমাণ আছে যার ফলে মনে হয় তিনি প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতির সবটাকে উড়িয়ে দিতে পারেন নি। ছড়া প্রসঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত মোহ ছিল সুগ্রথিত। তিনি বলেন, " 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর নদেয় এল বান' এই ছড়াটি বাল্যকালে আমার নিকট মোহমন্ত্রের মতো ছিল এবং সেই মোহ আমি এখনো ভুলিতে পারি নাই। আমি আমার সেই মনের মুগ্ধ অবস্থা স্মরণ করিয়া না দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিব না ছড়ার মাধুর্য ও উপযোগিতা কী। বুঝিতে পারিব না, কেন এত মহাকাব্য এবং খণ্ডকাব্য, এত তত্ত্বকথা এবং নীতি প্রচার, মানবের এত প্রাণপণ প্রযত্ন, এত গলদ্‌ঘর্ম ব্যায়াম প্রতিদিন ব্যর্থ এবং বিস্মৃত হইতেছে, অথচ এই-সকল অসংগত অর্থহীন যদৃচ্ছাকৃত শ্লোকগুলি লোকস্মৃতিতে চিরকাল প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে।"

সুতরাং এ কথা পরিষ্কার যে রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্যের বিচারে একটি মুগ্ধ এবং ব্যক্তিগত রুচিকেই কাজে লাগিয়েছিলেন, অন্যদিকে মানুষের মহাকাব্য-খণ্ডকাব্য, তত্ত্বকথা ও নীতি প্রচারের মধ্যে যেহেতু যুক্তিটাই বড় সেহেতু তিনি মুখ ঘুরিয়ে ছড়ার অসম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ প্রলাপে একাত্ম হলেন। অবশ্য ছড়ার অবিকৃত রূপ, ছড়ার পরিবর্তন, একই ছড়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ইত্যাদি প্রসঙ্গে তাঁর মতামত সর্বজনশ্রদ্ধেয় ও সর্বজনগ্রাহ্যও বটে। ছড়ার মধ্যে অন্তঃশীল খণ্ড খণ্ড ছবি, চকিত সঙ্গীতের বিদ্যুৎবিলাস, শব্দের অত্যাশ্চর্য ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের কবিমনকে চতুর বিশ্বের শৃঙ্খলাবোধ থেকে মুহূর্তের মধ্যে সরল বালকের স্বপ্নময় পৃথিবীতে নিয়ে যায়। ছড়ায় আমাদের সমাজ, মানুষ, প্রকৃতি ও নারীর যে চিত্র দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ সে-সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছেন। সন্দেহ নেই এসব ব্যাপারে সমালোচকদের মতামত অভিন্ন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সর্বাপেক্ষা জোর দিয়েছেন ছড়ার স্বপ্নময়তার উপর। "যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে" ছড়াটির পূর্ণ উদ্ধৃতি ও আলোচনার পর তিনি বলেন, "পূর্বোদ্ধৃত ছড়াটিতে সংলগ্নতা নাই, কিন্তু ছবি আছে। কাজিতলা, ত্রিপূর্ণির ঘাট এবং ওড়বনের ঘটনাগুলি স্বপ্নের মতো অদ্ভুত, কিন্তু স্বপ্নের মতো সত্যবৎ।" এরপর তিনি প্রত্যক্ষ সত্য ও স্বপ্নের সত্যতা সম্বন্ধে একটি মতামত প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ ছড়ার মধ্যে পার্থক্য স্বপ্নের জগৎটা মূলত শিশুদের জগৎ। তাঁর মতে, বয়স্ক মানুষ ও শিশুর মধ্যে পার্থক্য এইখানে যে, "বয়স্ক মানুষ বহুল পরিমাণে নিজকৃত রচনা" আর শিশু "প্রকৃতির সৃজন"। কবির এই সিদ্ধান্ত একান্ত সরল কারণ ছড়ার রচয়িতা প্রকৃতই বয়স্ক মানুষ, শিশু নয়। সংসারের সংগ্রাম, ক্ষুব্ধ মানসিকতা, নিয়ম-শৃঙ্খলার কঠোর অত্যাচার বয়স্ককে প্রলাপ বকতে শেখায়, সে ফিরে যেতে চায় শিশুর সারল্যে। কবির মতে "ছড়া আপনি জন্মিয়াছে"। এ মতও গ্রাহ্য নয়। এটা ঠিক, ছড়ার রচয়িতা কে সেটা সহজে নির্ণয়যোগ্য নয়, তার কাল ও তারিখ নির্ণয়ও সহজ নয়। তথাপি ছড়া আপনা আপনি জন্মগ্রহণ

করে না। মানুষের মন সর্বদা ক্রিয়াশীল, যথার্থ পরিবেশে সে নিজের ভাষায় কথা বলে। রবীন্দ্রনাথ শিশুমনঃসমীক্ষণের দোহাই দিয়ে বলেন যে, শিশুমনঃসমীক্ষণের ক্ষমতা তত্ত্বকে সঠিক বিচার করে অথচ সমকালীন বিশ্বে ফ্রয়েড ও ঈয়ুঙ্গের গবেষণায় ধরা পড়ে যে, বয়স্কদের স্বপ্ন ও ছড়ার অসঙ্গতি একই বস্তু। স্বপ্নের মধ্যে দেখা আবোল-তাবোল ঘটনা যেমন যুক্তির ধোপে টেকে না তেমনি ছড়ার পরস্পরসম্বন্ধবিহীন অযৌক্তিক বক্তব্যের অসঙ্গতিও কোনো শাণিত যুক্তির পরোয়া করে না। এ কথা ঠিক যে, স্বপ্নের বিষয় ও ছড়ার বিষয় এক নাও হতে পারে কিন্তু উভয়ের রচনার মধ্যে সার্বিক মিল লক্ষ করবার মতো।

দ্বিতীয়ত ছেলেভুলানো ছড়া শুধু ছেলে ভুলানোর জন্যই রচিত, রবীন্দ্রনাথের এ সিদ্ধান্তও ঠিক নয়। ছড়ার যে-সব সংগ্রহ ইতিমধ্যে আমরা হাতে পেয়েছি তার থেকে প্রমাণ হয় যে, ছড়াতে বয়স্কদের যৌনতাবোধ থেকে শিশুর ক্রুদ্ধ বিদ্রূপের পরিচয় আছে। হাস্যোজ্জ্বল, নির্মল এবং শিশুসুলভ বিষয় যেমন তাতে আছে তেমনি আছে প্রাণ ধারণের বিচিত্র যন্ত্রণা। সুতরাং ছড়ামাত্রই শিশুভোগ্য এ কথা ঠিক নয়।

রবীন্দ্রনাথ ছড়ার মধ্যে কাব্যিক মোহমুগ্ধকর সহজ কোমল রসের যে সন্ধান পেয়েছিলেন তাই তাঁকে এসব সরল সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য করে। অথচ ছড়ার এমন গভীর আলোচনা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্যত্র নেই, এমনকি বিশ্বলোকসাহিত্যেও নেই। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপীয় লোকসাহিত্যবিদরা সর্বদা বিজ্ঞানীর দৃষ্টি দিয়ে ছড়াকে বিচার করেন। ফলে ছড়ার মধ্যে যে সহজ ভাবটি কোমল পরিমণ্ডলে ঐকান্তিকভাবে রসায়িত হয়ে আছে তার বিচার করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের আলোচনা ঈষৎ পরিহাসে প্রসন্ন, তাঁর বক্তব্য সর্বদা ঊষার সহাস সূর্যালোকে মধুর-পেলব, তাঁর দৃষ্টি ঐশী আলোকে প্রভাবান্বিত, মূলত সেজন্যই লোকসাহিত্যের আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি আজও একটি একক আসনের অধিকারী। এ কথা মানি যে, লোকসাহিত্যের আলোচনার সূত্রপাত করে তিনি আমাদের পথিকৃৎ হয়ে আছেন; কিন্তু এ কারণে নয়, ছড়ার মধ্যেকার গোপন গভীর বিশ্বটির সন্ধান দিয়ে তিনি আমাদের জন্য শুধু নয়, আগামী কালের জন্যও একটি জ্যোতির্ময় দলিল রেখে গিয়েছেন।

খোকা এল বেড়িয়ে।
দুধ দাও গো জুড়িয়ে।।
দুধের বাটি তপ্ত।
খোকা হলে খ্যাপ্ত।।
খোকা যাবেন নায়ে।
লাল জুতুয়া পায়ে।।

এই ছড়াটির আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "অবশ্য, খোকাবাবু ভ্রমণ সমাধা করিয়া আসিয়া দুধের বাটি দেখিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন, সে ঘটনাটি গৃহরাজ্যের মধ্যে একটি বিষম ঘটনা এবং তাঁহার যে নৌকারোহণে ভ্রমণের সংকল্প আছে ইহাও ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার যোগ্য—কিন্তু পাঠকগণ শেষ ছত্রের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন। আমরা যদি সর্বাঙ্গে ইংরাজের দোকান হইতে আজানুসমুত্থিত বুট কিনিয়া অত্যন্ত মচ্ মচ্ শব্দ করিয়া বেড়াই তথাপি লোকে তাহাকে জুতা অথবা জুতি বলিবে মাত্র। কিন্তু খোকাবাবুর অতি ক্ষুদ্র কোমল চরণযুগলে ছোট-ঘুণ্টি-দেওয়া অতিক্ষুদ্র সামান্য মূল্যের রাঙা জুতাজোড়া সেটা হইল 'জুতুয়া'।"

ছড়াটি সম্বন্ধে এ আলোচনা ঈষৎ পরিহাসে উজ্জ্বল অথচ গভীর রসদৃষ্টির ফলে ছড়ার মূল্যবোধকে নতুন করে উপস্থিত করে। এমনিভাবে প্রতিটি ছড়াই তাঁর হাতে নতুন মূল্যে মূল্যায়িত হয় আর ছড়া সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকে দেয় পালটে।

"কবি-সংগীত" ও "গ্রাম্যসাহিত্য" প্রবন্ধ দুটিতে লোকসাহিত্যের আর দুটি দিক নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। কবিসাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সঙ্গে আমরা একমত যে, ইংরেজ আক্রমণের ফলে হঠাৎসৃষ্ট বড়লোকদের আমোদ-ফুর্তির জন্য যে সাহিত্যের সৃষ্টি হয় তার মধ্যে গভীরতর কিছু নেই, কারণ অনুপ্রাস-বাহুল্যে, অর্থহীন শব্দের প্রাচুর্যে ও ঝংকারে সে সাহিত্যের আবেদন বাস্তবিকই কানের কাছে, হৃদয়ের কাছে নয়।

কিন্তু গ্রাম্যসাহিত্যের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ আর একবার এমন এক অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন যার তুলনা বিরল। গ্রাম্য গানে যে অবিকৃত মানুষী হৃদয় ব্যাপ্ত হয়ে আছে রবীন্দ্রনাথ সেটাকে দরদ দিয়ে অনুভব করেছেন। তাঁর আলোচনাটির প্রথম অংশটি উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করা গেল না।

> একদিন শ্রাবণের শেষে নৌকা করিয়া পাবনা-রাজশাহির মধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলাম। মাঠ-ঘাট সমস্ত জলে ডুবিয়াছে। ছোটো ছোটো গ্রামগুলি জলচর জীবের ভাসমান কুলায়পুঞ্জের মতো মাঝে মাঝে জাগিয়া আছে। কূলের রেখা দেখা যায় না, শুধু জল ছলছল করিতেছে; ইহার মধ্যে যখন সূর্য অস্ত যাইবে এমন সময়ে দেখা গেল প্রায় দশ-বারো জন লোক একখানি ডিঙি বাহিয়া আসিতেছে। তাহারা সকলে মিলিয়া উচ্চকণ্ঠে এক গান ধরিয়াছে এবং দাঁড়ের পরিবর্তে এক-একখানি বাখারি দুই হাতে ধরিয়া গানের তালে তালে ঝোঁকে ঝোঁকে ঝপ্ ঝপ্ শব্দে জল ঠেলিয়া দ্রুতবেগে চলিয়াছে। গানের কথাগুলি শুনিবার জন্য কান পাতিলাম, অবশেষে বারম্বার আবৃত্তি শুনিয়া যে ধুয়াটি উদ্ধার করিলাম তাহা এই—
>
> যুবতী, ক্যান্ বা কর মন ভারী।
> পাবনা থ্যাহে আন্যে দেব ট্যাহা-দামের মোটরি।

কবির মতে,

> এই দুটি চরণে সেই শৈবালবিকীর্ণ জলমরুর মাঝখান হইতে সমস্ত গ্রামগুলি যেন কথা কহিয়া উঠিল। দেখিলাম, এই গোয়ালঘরের পাশে, এই কুল গাছের ছায়ায়, এখানেও যুবতী মন ভারী করিয়া থাকেন এবং তাঁহার রোষারুণ কুটিলকটাক্ষপাতে গ্রাম্য কবির কবিতা ছন্দে-বন্ধে সুরে-তালে মাঠে-ঘাঠে জলে-স্থলে জাগিয়া উঠিতে থাকে।

গ্রাম্যগান-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই আলোচনা আমাদের কাছেও সহজসাধ্য নয়। দেখার মতো চোখ ও শোনার মতো কান রবীন্দ্রনাথের ছিল কিন্তু সর্বাপেক্ষা তীব্র উন্মুখ দরদী মনও তাঁর ছিল। আমাদের মন ও মনন, উপলব্ধি ও অনুভব যখন বড়বেশি যন্ত্রণাক্লিষ্ট তখন রবীন্দ্রনাথই আমাদের হাত ধরে গ্রাম্য কবির দরবারে নিয়ে যেতে পারেন, তদুপরি কুল গাছের ছায়ায় মনভারী-করা যুবতীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় তিনিই দিতে সক্ষম। আমাদের দৃষ্টি গভীরে যায় না; আমাদের চোখ বস্তুর স্থূলদিকে নিবদ্ধ অথচ রবীন্দ্রনাথ আত্মার বিশুদ্ধ স্বাদে আমাদের বিশুষ্ক নীরস জীবনে শান্তি আনতে পারেন। লোকসাহিত্যের আলোচনায় এই পরিণত দার্শনিক অথচ রসায়িত দৃষ্টির জন্যই লোকসাহিত্য তাঁর কাছে ঋণী থাকবে।

রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্যের আলোচনার সূত্রপাত করে, লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উদাহরণ সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এবং তাদের অবিকৃত রূপের উপর জোর দিয়ে, একই ছড়ার বিভিন্ন রূপান্তরকে পাশাপাশি রেখে আলোচনা করবার পরামর্শ দিয়ে, সর্বোপরি লোকসাহিত্যের অন্তর্নিহিত রসতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করে বাংলা লোকসাহিত্যের ইতিহাসে একটি অমর অধ্যায় যুক্ত করেছেন। তাঁর আলোচনা যদি বিদেশী পণ্ডিতদের উদ্ধৃতিতে কণ্টকাকীর্ণ না হয়ে থাকে, তাঁর হাতে লোকসাহিত্যের বৈজ্ঞানিক আলোচনা যদি নাই পেয়ে থাকি— তাতে খেদ করবার কোনো কারণ নেই।

আবদুল কাদির

রবীন্দ্রনাথ

বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবিপ্রতিভা রবীন্দ্রনাথ—এ কথা বলিলে অত্যুক্তি করা না। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র ও প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র। সুতরাং তি উত্তরাধিকার সূত্রেই এক দিকে আধ্যাত্মিকতা ও অন্যদিকে আভিজাত্য এই দুই অমূল্য সম্প লাভ করিয়াছিলেন। প্রথম জীবনের 'সন্ধ্যাসঙ্গীত', 'প্রভাতসঙ্গীত' প্রভৃতি হইতে শুরু কর শেষ জীবনের 'রোগশয্যায়,' 'প্রান্তিক' প্রভৃতি কাব্য পর্যন্ত তাঁহার সকল রচনায় আধ্যাত্মিকতা ও আভিজাত্য এক অপরূপ বাণীরূপ লাভ করিয়া রহিয়াছে। অবশ্য তাঁহা আধ্যাত্মিকতা প্রকাশ পাইয়াছে সত্যানুসন্ধান ও আত্মানুভূতির মধ্যে—বাস্তবের সংস্প আসিয়া যাহা বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও লোকহিতরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। আর তাঁহার আভিজা প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার বলিষ্ঠ সৌন্দর্যকল্পনা ও উন্নত রুচির মধ্যে; মহাপ্রাণতার পক্ষপাত হয়তো তাহারই পরোক্ষ ফল। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সুদীর্ঘ আশি বৎসরের অ জীবনে তিনি নানা ভাব ও কর্মায়োজনের মধ্য দিয়া তাঁহার অপূর্ব সৃষ্টিসৌধ গড়িয়া গিয়াছেন। বিশ্বভারতী, শ্রীনিকেতন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সেই সৌধেরই বিভিন্ন স্তম্ভ।

রবীন্দ্রনাথ দেশকর্মী ছিলেন, পল্লী-সংগঠক ছিলেন, শিক্ষাবিদ্ ছিলেন, রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতা ছিলেন, এ সকল সত্য কথা। কিন্তু তাঁহার বড় পরিচয় এই যে, তি ছিলেন শিল্পী, জীবনশিল্পী। তাঁহার কাব্য রূপ ও রসে অনবদ্য, তাঁহার জীবন সৃষ্টির আন সমুজ্জ্বল। তাঁহার কাব্য তাঁহার মানস-জগতের অপূর্ব সৃষ্টি, তাই তাঁহার শিল্পসৃষ্টিকে তাঁহা অসামান্য জীবন হইতে পৃথক করিয়া বিচার করা চলে না। তাঁহার প্রতিভার প্রকাশ রূপে অপেক্ষা মানস-গতিতেই বেশি, তাই তাঁহার সমগ্র সাহিত্য পাঠ করিয়া তাঁহার জীবন-দর্শ ও সৃষ্টি-মাহাত্ম্য উপলব্ধি করাই বিধেয়।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে আছে সত্য-প্রীতি, কর্ম-প্রীতি, কাণ্ডজ্ঞান-প্রীতি, জীবন-প্রীতি, মনুষ্যত্ব-প্রীতি, অন্যায়ের প্রতিরোধ, বৈরাগ্য-বিরোধিতা। সুতরাং সে সাহিত্য পাকিস্তানবাসীর প্রিয় হইবে, তাহাতে সন্দেহের অবসর থাকিতে পারে না।

জানি, একালের বৈষম্য-পীড়িত জনশ্রেণীর অংশবিশেষে এ ধরনের একটা অভিযোগ উঠিয়াছে যে, রবীন্দ্রনাথ উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিস্থানীয় কবি, তাঁহার কাব্যে জনগণে মনের খোরাক বেশি নাই। কিন্তু এ অভিযোগ কতখানি সত্য, তাহা বিচার করিয়া দেখা দরকার।

বাল্যাবধি রবীন্দ্রনাথ ঐশ্বর্যের কোলে এবং সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে লালিত। অলোকসামান্য প্রতিভা, দুর্লভ দেহসৌন্দর্য, অটুট স্বাস্থ্য, দীর্ঘ আয়ু, পর্যাপ্ত বিত্ত—এই সমস্তই তিনি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতো ভাগ্যলাভ এবং সেই ভাগ্যের সদ্ব্যবহার পৃথিবীর অত্যন্ত অল্প লোকই করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু প্রচুর ঐশ্বর্যের মধ্যেও তিনি ছিলেন নির্লিপ্ত, অগণিত বন্ধু এবং ভক্ত সত্ত্বেও তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ। এই নির্লিপ্ততায় তাঁহার কবি-মন পাইয়াছে ধ্যানের পূর্ণ অবকাশ, নিঃসঙ্গতার রসে তাঁহার চিত্ত হইয়াছে প্রদীপ্ত। ভাবসাধকের ঔদাসীন্য আর আত্মবিরহীর অন্তর্জ্বালা তাঁহার কাব্য ও সঙ্গীতকে করিয়াছে সমৃদ্ধ ও সুঠাম। তাঁহার শিক্ষা ও রুচি, মানসগঠন ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ছিল যে আভিজাত্য, তাহা আমরা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া যাই তাঁহার সৃষ্টির এই অপরূপত্বের জন্য। তবে এ কথা অনেকটা সত্য যে, রূপকল্পনা ও ভাবসাধনার ক্ষেত্রে তাঁহার আভিজাত্য অনেকখানি অপ্রকট থাকিলেও তাঁহার চিন্তা-ভাবনার মধ্যে তাহা সব সময়ে অপ্রকাশ থাকে নাই।

কিন্তু বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার সমর্থক হইলেও রবীন্দ্রনাথের নিকট নির্যাতিত মানবতার আবেদন কোনোদিন উপেক্ষিত হয় নাই। তিনি "মূঢ় ম্লান মূক মুখে" ভাষা দিতে চাহিয়াছিলেন, "শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে" মহা জীবনলাভের আশা জাগাইয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। এমনকি মাঝে মাঝে কবির সৌন্দর্য-তন্ময় চিত্ত জগতে ন্যায়পরায়ণতার অবাধ লাঞ্ছনা দেখিয়া বিদ্বেষ-বিষে অধীর হইয়া উঠিয়াছে। তিনি মনুষ্যত্বের অপমানে বিধাতার নিকট তীক্ষ্ণকণ্ঠে ফরিয়াদ করিয়াছেন,

আমি-যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রিছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে,
আমি-যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃত কাঁদে।...
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?

প্রেমিক রবীন্দ্রনাথের নিকট মানুষই হইতেছেন 'ইষ্টদেব', সংসারধর্ম পালনই হইতেছে ঈশ্বরের সেবা। তিনি দিব্যচক্ষে দেখিয়াছেন, সংসারবিরাগী যখন শিশুসন্তান ও প্রেয়সীকে রাখিয়া গৃহত্যাগ করিতেছে তখন তাঁহার 'দেবতা' বিরূপ হইয়াছেন।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ আপন অন্তরের ব্যথার বেদিতেই চাহিয়াছেন সেই চিররহস্যময় দেবতার পদপাত, অপরোক্ষ-অনুভূতির মধ্যে পাইয়াছেন তাঁহার অমৃতস্পর্শ। ইহা অনস্বীকার্য যে, তিনি "হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে" বারবার দেবতার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়াছেন, কিন্তু দেবতা "বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহার" করেন, সেখানেও তাঁহার সাথে যোগ রক্ষা করিতে বিস্মৃত হন নাই। তাই তিনি মাঝে মাঝে 'পূজার আসন' ছাড়িয়া কর্মের ক্ষেত্রে 'দেবতা'র উপলব্ধি কামনা করিয়াছেন।

তিনি ধ্যান ভাঙ্গিয়া "রিক্তভূষণ দীনদরিদ্র" পরিশ্রমীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ভগবানকে, তাই কখনো কর্মযোগে "তাঁর সাথে এক" হইতে চাহিয়াছেন। যে দুর্ভাগা দেশ এই দরিদ্রদিগকে "মানুষের অধিকারে বঞ্চিত" করিয়াছে, সে দেশের উদ্দেশে তিনি পরম বেদনায় উচ্চারণ করিয়াছেন এই সতর্কবাণী,

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

অন্তরের আনন্দ-ঐশ্বর্যের মধ্যে যে মহিমান্বিত 'দেবতা'র আসন, তাঁহাকে তিনি দেখিয়াছেন

নিঃস্ব-নির্যাতিতের মাঝখানে :

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে, সবার নীচে,
সব-হারাদের মাঝে।

পৃথিবীর সর্বহারাদের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণভাবে রবীন্দ্র-রচনায় মূর্ত হইয়া ওঠে নাই সত্য, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'সর্বহারাদের মাঝে' তাঁহার ইষ্টদেবতাকে 'প্রণাম' করিবার জন্য আর্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেই পৃথিবীর নিরন্ন আর নিপীড়িতের বন্ধু বলিয়া তিনি যুগ-যুগান্তে স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প, শিক্ষা, সমাজগঠন প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁহার দৈবী প্রতিভার অসামান্য দান বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে অক্ষয় সম্পদ। বিপুল ও বিচিত্র সৃষ্টি-গৌরবের দিক দিয়া এই মহিমান্বিত পুরুষের সঙ্গে তুলিত হইতে পারেন ইতালির লিওনার্দো দা ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯) আর জার্মানির গ্যেটে (১৭৪৯-১৮৩২)। বিশাল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম শিল্পানুভূতির জন্য কালের বুকে ইঁহাদের প্রভাব হইয়াছে অর্থপূর্ণ ও দূরপ্রসারী। বাস্তবতাকে পরিপূর্ণরূপে স্বীকার করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল ইঁহাদের অলৌকিক স্বপ্ন-কল্পনা। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন,

মোর কিছু ধন আছে সংসারে,
বাকী সব ধন স্বপনে,
নিভৃত স্বপনে।

কিন্তু সেই স্বপ্নলোক নিরালম্ব নয়, এই সুখ-দুঃখপূর্ণ পৃথিবীর বাতাসে ভর দিয়াই তাঁহার মনোবিহঙ্গ স্বপ্নস্বর্গের পানে উধাও হইয়াছিল। অবশ্য একদা তিনি বলিয়াছিলেন,

আছে শুধু পাখা, আছে মহানভ-অঙ্গন

কিন্তু চির-পথিক কবি তাঁহার "বিরল ভুবনখানি"র মাধুর্য আস্বাদের জন্যও বারবার ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন। 'সোনার তরী'র "পুরস্কার" কবিতাটির বহুস্থানেও তিনি নিজের এ ধরনের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা চমৎকার ভঙ্গিতে ব্যক্ত করিয়াছেন। পৃথিবীর এক কোণে নিভৃত ভবনে থাকিয়া কবি অনন্যমনে একমাত্র বাণীর সেবাতেই নিজেকে চিরনিয়োজিত রাখিতে চাহিয়াছেন।

সংকীর্ণ সংসারে জীবনের লাভ-ক্ষতি হিসাব-নিকাশ সম্বন্ধে, চিরনির্লিপ্ত কবির জীবনে কখনো আত্মমগ্ন ভাব-সমাধি দেখা দিয়াছে, কখনো "বিজয়িনী" "উর্বশী"র যৌবন-সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার রসতন্ময়-চিত্ত উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে। কোনোদিন তিনি পরানের সাথে নিশীথ-বেলা মরণ-খেলা খেলিয়াছেন, আবার কোনোদিন রূপবিহ্বলা পৃথিবীর পানে তাকাইয়া আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিয়াছেন।

তবে বসন্ত-রঙিন বিশ্বের সভায় কবি শুধু কোকিলের মতো গান গাহিয়া তৃপ্ত হন নাই, অন্তহীন সুখ-দুঃখে মণ্ডিত এই মর্ত্যভূমিকে আপনার প্রত্যেক অণু-পরমাণু দিয়া সর্বপ্রকারে অনুভব করিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার কবি-চিত্তকে ব্যাকুল করিয়াছে। ধুলা-মাটির এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি অনুভব করিয়াছেন চরম গৌরব, সুখে-দুঃখে মিশ্রিত মর্ত্যজীবনের চমৎকারিত্ব উপলব্ধি করিয়া অনন্ত সুখের কল্পস্বর্গকে তুড়ি মারিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন,

স্বর্গ কোথায়, জানিস কি তা ভাই?
তার ঠিক-ঠিকানা নাই!

তার আরম্ভ নাই, নাই রে তাহার শেষ
ওরে নাই রে তাহার দেশ,
ওরে নাই রে তাহার দিশা,
ওরে নাই রে দিবস, নাই রে তাহার নিশা।

ফিরেছি সেই স্বর্গে শূন্যে শূন্যে
ফাঁকির ফাঁকা ফানুস।
কত যে যুগ যুগান্তের পুণ্যে
জন্মেছি আজ মাটির 'পরে ধুলা-মাটির মানুষ।
স্বর্গ আজি কৃতার্থ তাই আমার দেহে
আমার প্রেমে, আমার স্নেহে,
আমার ব্যাকুল বুকে,
আমার লজ্জা, আমার সজ্জা, আমার দুঃখে-সুখে।
আমার জন্ম মৃত্যুরি তরঙ্গে
নিত্য নবীন রঙের ছটায় খেলায় সে-যে রঙ্গে।

মানুষের জন্য কবির মমতা অপরিসীম; সেজন্যই কল্পিত সুখস্বর্গ অপেক্ষা এই অশ্রুমান মর্ত্যভূমি তাঁহার চিত্তকে করিয়াছে অধিকতর আকর্ষণ।

স্বর্গাধিক গরীয়সী এই মর্ত্যভূমি ছাড়িয়া একদিন কোন্ অজ্ঞেয়লোকে যাত্রা করিতে হইবে, এই দুর্লভ মানবজীবন একদা শেষ হইয়া যাইবে। তাই কবির মনে হইয়াছে যে, মনুষ্যজন্ম দুর্লভ, এই জগতের তুচ্ছতম বস্তুও দুর্লভ,

দুর্লভ এ ধরণীর লেশতম স্থান,
দুর্লভ এ জগতের ব্যর্থতম প্রাণ।

তবু জগৎ ও জীবনের জন্য নাড়ি-ছেঁড়া আকর্ষণ একদা কাটাইতে হয়, অত্যন্ত প্রিয়জনকে চিরবিদায় দিতে হয়,

তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।

কিন্তু মৃত্যু তাঁহার নিকট কুৎসিত নয়, তিনি মৃত্যুকে মনে করিয়াছেন জীবনের রূপান্তর মাত্র।

তিনি আজ মৃত্যুর পরপারে। কিন্তু মৃত্যুতে তাঁহার কিছুই নিঃশেষিত হয় নাই। ক্লান্তিহীন তপস্যায় তিনি হৃদয়ের পাত্র ভরিয়া বেদনার দান অনুদিন গ্রহণ করিয়াছিলেন; চির-অতন্দ্র চিত্তে লাভ করিয়াছিলেন অনির্বচনীয়ের আস্বাদ; তাই মৃত্যুতে তাঁহার সমাপ্তি নয়।

তিনি আজ "অমর্ত্যলোকের দ্বারে অভ্যর্থনা" লাভ করিয়াছেন। মর্ত্যলোকেও তাঁহার কীর্তি হইবে কালজয়ী।

যত বড় হও,
তুমি তো মৃত্যুর মতো বড় নও।
আমি মৃত্যু-চেয়ে বড়, এই শেষ কথা ব'লে
যাব আমি চলে'।

নিঃসন্দেহে তিনি "মৃত্যুর চেয়ে বড়"; মৃত্যু সত্ত্বেও তিনি রহিয়াছেন চির-অম্লান, চির-ভাস্বর। এই মৃত্যুজিৎ কবির মন্ত্রে অনুদিন আমাদের অন্তরে জাগুক্ কর্ম ও আনন্দের প্রেরণা।

জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা

রবীন্দ্রসাহিত্য মূল্যায়নের সমস্যা

রবীন্দ্রনাথের রুচি যে আমাদের রুচি নয় এ কথা সকলে মানবেন কি না জানি না। কোনো এক পাশ্চাত্য লেখক অভিযোগ করেছেন যে, আমাদের ইতিহাসবোধ নাকি অত্যন্ত ক্ষীণ, তাই মানব-সভ্যতার এই মারাত্মক যুগসন্ধিকালে ভিক্টোরীয় সমন্বয়বাদে আমরা আশ্বাস খুঁজি। কথাটায় একটু অতিরঞ্জন থাকলেও অনেকটা সত্যি বলে মনে হয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কথাই ধরুন। সারা জীবন জাতীয়তাবাদী নব্য হিন্দুদের দ্বারা "বিজাতীয়" বলে উপহসিত হয়ে যখন তিনি প্রতিষ্ঠার সর্বোচ্চ চূড়ায় তখন আবার কল্লোল যুগের তরুণ সাহিত্যিকদের বেলায়ও একই বিশেষণ প্রয়োগ করে বসলেন। তাই নব্য সাহিত্যিকদের নেতৃস্থানীয় নরেশ সেনগুপ্ত ক্ষুব্ধ হয়ে লিখলেন, "রবীন্দ্রনাথের কাছে এ কথা লইয়া কটাক্ষ প্রত্যাশা করি নাই।" যিনি চিরনূতনকে বরাবর শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছেন, দেখা যায় তাঁরও ইতিহাসকে বুঝতে ভুল হয়। অবশ্য কাব্যবিচারে রুচিই শেষ কথা নয়। মহৎ কাব্য সর্বকালের রুচিকেই কিছুটা তৃপ্তি দিতে পারে। তবে রুচিবদলের সঙ্গে সঙ্গে অতীতের মহৎ কাব্যের মধ্যেও আমরা বর্তমানের প্রতিফলন দেখতে চাই। এবং ঠিক এই জন্যেই যুগে যুগে মহৎ কাব্যপাঠের রূপ ও প্রকৃতি বদলায়। আধুনিক সমালোচকরা দেখিয়েছেন যে, শেক্সপীয়রের নাটকে এমন অনেক নিকৃষ্ট ধরনের রসিকতা রয়েছে যা এলিজাবেথীয় যুগের শ্রোতার মনোরঞ্জন করতে সমর্থ হলেও আধুনিক যুগে অচল। অন্যধারে সতের শতকের সাধারণ দর্শক কি জানত যে, 'হ্যামলেট' নাটকের মধ্যে এক সূক্ষ্ম দার্শনিক প্রত্যয় নিহিত রয়েছে? রবীন্দ্রকাব্য আলোচনায়ও সমালোচনার এই চিরাচরিত পন্থার ব্যতিক্রম হওয়ার যো নেই।

রবীন্দ্রনাথকে বিভিন্ন সময়ে যে ধরনের রুচির মোকাবিলা করতে হয়েছিল এবার তার কিছু নমুনা দিচ্ছি। প্রথমেই রবীন্দ্রনাথকে জাতীয়তাবাদী নব্য হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। এঁদের মুখ্য নায়ক দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। রবীন্দ্রকাব্যের বিরুদ্ধে তাঁর প্রধান প্রধান অভিযোগ অস্পষ্টতা, অবাস্তবতা, দুর্নীতিপরায়ণতা ও বিদেশী ভাবাপন্নতা। 'সোনার তরী'তে তিনি দেখেছেন অনাবশ্যক অস্পষ্টতা, 'চিত্রাঙ্গদা'য় দুর্নীতির কারণ চিত্রাঙ্গদা উপযাচিকা হয়ে প্রেম নিবেদন করেছে এবং বিবাহের পূর্বেই অর্জুনকে দেহদান করেছে। পরের অভিযোগটি রসবিচারের অন্তর্গত নয়, প্রথমটিই মুখ্য অভিযোগ— প্যারডির ভাষায়,

আমি লিখছি যে সব কাব্য মানবজাতির জন্যে
নিজেই বুঝি না তার অর্থ, বুঝবে কি আর অন্যে?...

বিপিন পালের অভিযোগ গুরুতর, কারণ তাতে কিছুটা প্রশংসার খাদ মেশানো আছে :

রসানুভূতির তীক্ষ্নতা ও অধ্যাত্মদৃষ্টির প্রসার ও গভীরতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পরে, বাংলায় জন্মিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। তবে রবীন্দ্রনাথ অনুভূতির বিস্তৃতিতে ও অনুভাব্য বিষয়ের বিচিত্রতাতে যতটা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন অন্যদিকে সেই পরিমাণে তাঁর রসানুভূতির গভীরতা ও বাস্তবতা বৈষ্ণব কবিদের অপেক্ষা হীন বলিয়াই মনে হয়... যে ঐকান্তিক অন্তর্মুখীনতা ও রসানুভূতি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত করে তাহাই আবার তাঁর দুর্বলতারও মূল কারণ হইয়াছে...মহর্ষি আপনার ধর্মমতের জন্য সমাজচ্যুত হওয়াতে তাঁর পরিবারবর্গের জীবন কলিকাতার সাধারণ ধনী সম্প্রদায়ের জীবন অপেক্ষাও সঙ্কীর্ণতর হইয়া পড়ে। রবীন্দ্রের উদারপ্রাণ এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আপনার স্বাভাবিক মুক্তভাব আস্বাদন করিবার জন্য আশৈশবই এক সুবিশাল কল্পিত জগৎ রচনা করিয়া তাহারই মধ্যে বিহার ও বিচরণ করিয়াছে...মানুষ বলিয়াই মানুষকে শ্রদ্ধা ও প্রীতিভরে প্রাণে টানিয়া লইবার জন্য একটা লালসা ধর্মপ্রাণ রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে যে সময় সময় আকুল করিয়া তুলিয়াছে ইহাও সত্য। কিন্তু এ সকল সাধু চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের প্রাণের উদারতা মাত্রই প্রকাশিত হয়। সে সকল চেষ্টার সফলতা আর সপ্রমাণ হয় না... রবীন্দ্রনাথের কাব্য অনেক সময়ই চিত্তকে মুগ্ধ করে, কিন্তু স্নিগ্ধ করিতে পারে না।

'ক্ল্যাসিক' আদর্শনিষ্ঠ এই বুদ্ধিদীপ্ত সমালোচনার উত্তরস্বরূপ অজিতকুমার চক্রবর্তী পূর্ণাঙ্গ রবীন্দ্র-সমালোচনার সূত্রপাত করেন; উপজীব্য, রবীন্দ্র-মানসের ক্রমবিবর্তন; উদ্দেশ্য, পাঠকসমাজকে রোমাণ্টিক রস-সমীক্ষার সঙ্গে পরিচিত করান। অজিতকুমারের এই আলোচনা বাংলাদেশের পাঠকসমাজের রুচি-পরিবর্তনে যথেষ্ট সহায়তা করে। কবি নিজেও এই আলোচনায় একটা বড় অংশ গ্রহণ করেন। কবিতায় অনুষঙ্গ ও ব্যঞ্জনাই যে মুখ্য এবং ভাবার্থ গৌণ—এ ধারণা তখনকার দিনের পাঠকসমাজের ছিল না। রবীন্দ্রনাথের নতুন ছন্দেও তাঁদের কান অভ্যস্ত ছিল না। রবীন্দ্রকাব্য বিচারের মানদণ্ড যে একান্তভাবে কবির সাধ ও সাধ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত এ ধারণা ক্রমশ স্বীকৃত হয়।

এরপর কল্লোল-যুগে কবিকে তরুণ সাহিত্যিকদের সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। তাঁরা মোটামুটি সকলেই কবির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু নতুন যুগের হাওয়া বইতে শুরু করেছে—এঁরা সব 'কন্‌টিনেন্টাল' সাহিত্য পড়ে জীবনের গভীরে প্রবেশ করতে চান, তাই রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টির অসম্পূর্ণতা এঁদের নজর এড়ায় নি। এঁদের একজন লিখলেন :

কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের সবটুকু দান এক করিয়া বিচার করিলেও মনে হয় যে, রবীন্দ্রনাথ জীবনের একটা দিক বাদ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সুচিত্রিত চরিত্রগুলোর সকলেই যে শুচিতায় ভরা; এমনকি বিনোদিনীর মধ্যেও পঙ্কিলতা নাই। মানুষ যেখানে সর্বাঙ্গে কাদা মাখিয়া বসিয়া আছে, তাহার অন্তরের গূঢ়তম প্রদেশে সত্যের স্ফুলিঙ্গটুকু বাঁচিয়া আছে মাত্র, সেখানে আমরা রবীন্দ্রনাথকে পাই না। (কল্লোল— শ্রাবণ, ১৩৩৪।)

নরেশ সেনগুপ্ত লিখলেন রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্য আভিজাত্য-আশ্রিত। কিছুটা রং চড়িয়ে শরৎচন্দ্র লিখলেন, "কবির হঠাৎ চোখে পড়িয়াছে যে সজিনা, বক, কুমড়া, প্রভৃতি কয়েকটি ফুল কাব্যে স্থান পায় নাই। রান্নাঘর তাদের জাত মারিয়াছে। ..অথচ হাতের কাছে বাগ্‌দেবীর বাহন হাঁস খাইয়া যে মানুষ উজাড় করিয়া দিল। কাব্যসাহিত্য ও কথাসাহিত্য এক বস্তু নয়।...সজিনা ফুলে ও বক ফুলে সোনার তরীর প্রয়োজন নাই, কিন্তু বিনোদিনীর রান্নাঘরে সেগুলো না হইলেই নয়।"

তরুণ সাহিত্যিকরা রবীন্দ্রনাথকে ক্ল্যাসিক করে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এ অবজ্ঞা সহ্য করলেন না। বাদানুবাদে তিনিও যোগ দিলেন; বললেন যে, এসব হচ্ছে "রিয়ালিটির নামে দারিদ্র্যের আস্ফালন ও লালসার অসংযম।" কবির পক্ষ নিয়ে প্রমথ চৌধুরী লিখলেন, "আধুনিকতার কোনো একটা নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়।" এর পরের যুগ রবীন্দ্র–সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার যুগ। কেন্দ্রীয় বিষয়টি হল রবীন্দ্র–মানসের ক্রমবিবর্তনের ধারা। টুকরো টুকরো ভাবে কবিতায়, গল্পে ও উপন্যাসে ভাষা ও আঙ্গিক বিশ্লেষণের ও মূল্যায়নের কিছু কিছু চেষ্টা যে না হয়েছে তা নয়। কিন্তু সমগ্র রবীন্দ্র–সাহিত্যের মূল্য নির্ধারণের তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পূর্ণাঙ্গ প্রচেষ্টা দেখতে পাই না। ব্যতিক্রম হিসাবে Thompson সাহেব ইংরেজদের কাছে নতুন করে সমগ্র রবীন্দ্র কাব্যকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলেন। নোবেল প্রাইজ পাওয়ার সময় ইউরোপে কবির যে প্রতিষ্ঠা ছিল উত্তর–সামরিক ইংল্যাণ্ডে তার বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। তার একটি কারণ রুচির পরিবর্তন, অপরটি রবীন্দ্র–সাহিত্যের সার্থক অনুবাদের অভাব। 'গীতাঞ্জলি'র কদর অবশ্য অনেকটাই কমে যায়। এমনকি Thompson সাহেবও লিখেছেন,

> Indeed the weakness of *Gitanjali* on its religious side is its minor tone, its wistfulness, almost its wailing. It lacks the sterner aspect of religion.

Thompson সাহেব যে রচনাগুলিকে প্রথম শ্রেণীর কবিতা বলে অভিহিত করেছেন, তাদের মধ্যেও তিনি দেখেছেন—monotony of style, narrowness of range, এবং inequality. তাঁর মতে, কবিকল্পনা যেখানেই সার্থক সেখানে প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে একটা নিবিড় ঐক্যানুভূতির আনন্দ কবি আস্বাদ করতে পেরেছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত অমিয় সেন রচিত একটি গ্রন্থের বক্তব্যও ঠিক তাই।

হিন্দু জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মোহিতলাল মজুমদার বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের স্থান সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান কথা বলেন এবং মৃত্যুর কিছুদিন আগে আধুনিক সমালোচনার ভাষায় যাকে বলা হয় Practical criticism সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে ধারাবাহিকভাবে 'সঞ্চয়িতা'র প্রত্যেকটি কবিতার কাব্যপাঠ শুরু করেন এবং প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত সাক্ষ্য প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত করে সার্থক মূল্যায়নের পথে অনেকটা দূর এগিয়ে যান। এ কাজ তিনি শেষ করে যেতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যের আলোচনায় বুদ্ধদেব বসু অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করে সমগ্র কথাসাহিত্যের মূল্যায়ন করেছেন। বুদ্ধদেবের মূল্যায়নে কথাসাহিত্যের ত্রুটির দিকটাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে যদিও তাঁর সিদ্ধান্তগুলি তিনি কিছুটা রেখেঢেকে বলতে চেষ্টা করেছেন। মানববাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিবনারায়ণ রায় কয়েকটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে রবীন্দ্র–সাহিত্যকে বিশ্ব–সাহিত্যের পটভূমিকায় দাঁড় করিয়ে বিচার করেন। আংশিকভাবে বুদ্ধদেব ও সুধীন দত্ত এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। সুধীন দত্ত রবীন্দ্র–কাব্যে ছন্দ–বিবর্তনের ধারাটি স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন এবং কবির গদ্যকবিতার মূল্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, "সুন্দরের অভ্যস্ত ধ্যানে তিনি এখনও বিমুখ নন বলেই, তাঁর হাতেও গদ্যকবিতা অল্পবিস্তর অপব্যবহৃত।"

সাম্প্রতিক সমালোচনার কয়েকটি সিদ্ধান্তকে ঘিরে রসজ্ঞমহলে তর্কের আসর বেশ জমে উঠেছে। সুধীন দত্তের মতে, "রবীন্দ্রনাথ যদিও আন্তর্জাতিক ঐক্যবোধের অন্যতম উদ্যোক্তা, তবু তাঁর কৃতিত্ব ঐকান্তিক আত্মোপলব্ধি; এবং সে কথা ভুলে তাঁকে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের, তথা যুগধর্মের দিকপাল রূপে দেখলে, আমাদের অন্ধ ভক্তিই ধরা পড়বে, তাঁর মান বাড়বে না।" মুক্তবুদ্ধিপ্রসূত এই বলিষ্ঠ উক্তিকে জোরালো করা হয়েছে আরেকটি

অনুরূপ মন্তব্যের দ্বারা—"জড়বাদী পশ্চিম তাঁর বাণী শুনে অন্তর্দর্শনের মূল্য বোঝে নি। বরং প্রাচীন জড়ভরতেরাই তাঁর মারফতে পাশ্চাত্য অধ্যাত্ম-তত্ত্বের সন্ধান পেয়েছে।" সমালোচকের আক্রমণের লক্ষ্য অন্ধ ব্যক্তিপূজা ও ততোধিক অন্ধ ভারতীয় জাতীয়তাবাদ। রবীন্দ্র-মানসের সীমা নির্দেশ করতে গিয়ে সুধীন দত্ত বলেছেন, "অন্ততপক্ষে এতে সন্দেহ নেই যে, রবীন্দ্রনাথের মানসজীবনে নব যৌবনের গুরুত্ব পরিণত বয়সের চেয়ে অনেক বেশি, এবং সুদীর্ঘ প্রৌঢ়তার শেষে তিনি বহির্জগৎ সম্বন্ধে আদৌ নিরাগ্রহ নন বটে, কিন্তু সে বিষয়ে তাঁর মনোভাব স্মরণে আনে সমাধিমগ্ন সোহংবাদীকে যিনি অদ্বৈত বলেই ইন্দ্রিয় থাকতেও নির্বিকার।" এই মন্তব্যের ইঙ্গিত হল এই যে, রবীন্দ্রনাথের ঋষিত্ব শেষ জীবনে তাঁর কবিত্বের পরিপন্থী হয়েছে। বিশ্বকবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে গ্যয়টের সঙ্গে তুলনা করে শিবনারায়ণ রায় লিখেছেন,

> অস্তিত্বের দুর্বহ জটিলতা এবং দুঃসমাধেয় বিরোধের মুখোমুখি হয়ে তিনি আড়াল খুঁজেছেন বিমূর্ত ভাবের সরল সমন্বয়ে।...গ্যয়টে যে তা করেন নি তা নয়, কিন্তু সমগ্রভাবে বিচার করলে সন্দেহ থাকে না তাঁর জীবনবোধ এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের তুলনায় অনেক বেশি বলিষ্ঠ, পরিণত, দায়িত্বশীল।...এই মৌলিক ত্রুটি থাকার ফলে আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠ লেখককে পৃথিবীর চিরকালের শ্রেষ্ঠ লেখকদের সমপর্যায়ে ফেলা কঠিন।

সমালোচকের মতে কবির "বহুরচনায় মানুষের প্রাতিস্বিকতা ঔচিত্যবোধের (যেমন চিত্রাঙ্গদা) চাপে খণ্ডিত এবং বিকৃত হয়েছে।" ফলে "ঋষি, বিশ্বকবি, গুরুদেব ইত্যাদি আখ্যার আড়ালে মানুষ রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস আজো আমাদের অজানা।" শুধু দেখতে পাই যে, রবীন্দ্রকাব্য আত্মনিগ্রহমূলক চরিত্রনীতি ও সৌন্দর্যপ্রীতির দ্বন্দ্ব দ্বারা দ্বিধাভক্ত। মানুষ রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকৃতি জানবার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হল কবির আত্মজীবনীতে এ ধরনের তথ্যের অভাব। রবীন্দ্রকাব্য-সমালোচনাও তাই এদিক দিয়ে কিছুটা ভাসা-ভাসা হতে বাধ্য। রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে যে legend তৈরি হয়েছে তার থেকে আসল মানুষটি উদ্ধার করে তাকে বুঝবার চেষ্টা করা দরকার। এ অবশ্য কাব্যরসিকের কাজ নয়, পণ্ডিতের কাজ; তবে পাণ্ডিত্যই রসজ্ঞের রুচিকে এ যাবৎ শোধন করে এসেছে।

নব্য হিন্দুদের গোঁড়ামিপ্রসূত বিরুদ্ধ সমালোচনা বাদ দিলে প্রথম যুগের সমালোচনার বৈশিষ্ট্য হল কাব্যের ধ্রুপদী আদর্শ ও স্বদেশী আত্মনিগ্রহাশ্রয়ী চরিত্রনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রকাব্য বিচার। বিপিন পালের দৃষ্টিভঙ্গি অপেক্ষাকৃত অগ্রসর। রোমাণ্টিক মানসিকতাকে পুরোপুরি বুঝতে না পারার ফলে তিনি কবির বিরুদ্ধে উগ্র আত্মকেন্দ্রিকতার অভিযোগ আনেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে কল্লোল-যুগের সমালোচনার ভিত্তিভূমি উনিশ শতকী Naturalism; অতিসাধারণ লোকের জীবনের গভীর অতলে যে অহরহ পাপপুণ্য ভালো-মন্দের দ্বন্দ্ব চলছে তার যথার্থ রূপায়ণ। রসসৃষ্টির চেয়ে রূপসৃষ্টিই এদের মূল লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথে এঁরা লক্ষ করেছেন ভিক্টোরীয় শুচিবাই ও রোমাণ্টিক রসপ্রবণতা। তৃতীয় পর্যায়ে আমরা একদিকে দেখতে পাই সনাতন ভারতীয় পন্থায় স্তুতি ও ভাবপ্রবণ ব্যাখ্যা, অন্যদিকে ঐতিহাসিক ও বৈশ্বিক পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের সার্থক মূল্যায়ন প্রচেষ্টা। আধুনিক যুগে রবীন্দ্র-সমালোচনা যেখানে এসে ঠেকেছে তার থেকে এগোতে হলে রবীন্দ্র-মানস কাব্য ও কথাসাহিত্যের সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা দরকার। সকলের চেয়ে বেশি দরকার প্রকৃত সমালোচকের যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গি।

একটি প্রশ্ন আমি নিজে তুলতে চাই। সেটি হল রবীন্দ্র-প্রতিভার রেনেসাঁসি সব্যসাচিত্বের সঙ্গে রবীন্দ্র-সাহিত্যের নিত্যমূল্যের কোনো সম্পর্ক আছে কি না? অবশ্য এই

বৈচিত্র্য-প্রয়াসের একটা ঐতিহাসিক ও নৈমিত্তিক মূল্য আছে যা তাঁর ব্যক্তিত্বকে করেছে বিশাল, আর তাঁকে দিয়েছে বিরাট সিদ্ধি। তাই আমার মতো সাধারণ লোকেরা বিস্ময়াভিভূত হয়ে তাঁর কাব্য-মূল্যের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্ব-মূল্যকে জড়িয়ে ফেলে। আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকেরা দেখিয়েছেন যে, ব্যক্তিপ্রতিভার বহুমুখিনতা অনেক সময় তাঁর সার্থক বিকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিল্পী লিওনার্দোর বিজ্ঞানসাধনার কথা উল্লেখ করে ফ্রয়েড দেখিয়েছেন যে, অবচেতন মনের এক নিগূঢ় ও আদিম অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রভাবে লিওনার্দো তাঁর শিল্পসাধনাকে সম্পূর্ণ না করেই বিজ্ঞানসাধনায় মনোযোগী হয়েছিলেন। আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের বেলায়ও এ কথা সমানভাবে প্রযোজ্য, যদিও এক্ষেত্রে কবি-মনের সেই নিগূঢ় অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকৃতি আমার জানা নেই। এই সূত্রে স্মরণীয় যে, 'বলাকা'-যুগের পর (১৯১৭) আট বৎসর কবি সাহিত্য সাধনা থেকে বিরত ছিলেন। কয়েকটি গান অবশ্য লিখেছিলেন। এই আট বৎসর বিশ্বভারতী সংগঠনের যুগ। এরপর যখন 'পূরবী'র যুগ আরম্ভ হয় (১৯২৪) তখন দেখা যায় কবির সাহিত্যপ্রতিভা অনেকটা নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে। দেখা দিয়েছে অর্থগত শৈথিল্য, ভাষা ও ভাবের পুনরাবৃত্তি, বাকচাতুরী, পূর্বরাগ ও বিবাহোত্তর প্রেম সম্পর্কিত নিস্তাপ কল্পনা। মাঝে মাঝে দু-একটি রচনায় প্রাণস্পন্দন অনুভব করা যায়, কিন্তু তাদের সংখ্যা খুবই অল্প। কেউ কেউ অবশ্য বলেন যে, এই শেষের দিকের রচনায় এমন এক হালকা ধরনের কৌতুকোজ্জ্বল রসের সন্ধান পাওয়া যায় যার তুলনা বিশ্বসাহিত্যে দুর্লভ। তাঁরা বোধহয় মুষ্টিমেয় কয়েকটি সার্থক রচনার কথা ভেবেই এ কথা বলেন। সে যাই হোক রবীন্দ্র ব্যক্তিপ্রতিভার বহুমুখিনতা তাঁর শিল্পকর্মকে নানা দিক দিয়ে ব্যাহত করেছে বলেই আমার বিশ্বাস। যে কারণ থেকে এর উদ্ভব সে সম্বন্ধে অধিকতর সচেতনতা থাকলে সম্ভবত কবির সাহিত্যসাধনা আরো বেশি একাগ্র ও সংহত হতে পারত। প্রতিভার বহুমুখিনতার অন্য যে কোনো মূল্যই থাকুক সাহিত্যসাধনায় তা গুণের চেয়ে দোষ হিসেবেই দেখা দিয়েছে বলে আমার মনে হয়।

এই বহুমুখিনতা কবির সাহিত্যসাধনাতেও পুরোপুরি দেখতে পাওয়া যায়। বাংলা গদ্যের অপরিণত অবস্থায় এই বহুমুখিন সাহিত্যিক প্রয়াসকে চরিতার্থ করার একটা সুযোগ ছিল। ইউরোপীয় গদ্য-সাহিত্যের রূপ-প্রাচুর্যের তুলনায় বাংলা গদ্যের দৈন্য কবি মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন এবং গদ্যে কবির স্বভাবসিদ্ধ দক্ষতা কাজে লাগাতে পেরেছিলেন। মোহিতলাল দেখিয়েছেন যে, রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের রচনায় গদ্য পদ্য থেকে অপেক্ষাকৃত পরিণত। কিন্তু এ সত্ত্বেও এটা আজ প্রায় সকলেই মানেন যে, কথাসাহিত্য ও নাটকের ক্ষেত্রে তাঁর হাত তেমন খোলে নি যেমন খুলেছে চিঠিপত্রে, ছোটগল্পে, ডায়েরি ও ব্যক্তিগত প্রবন্ধে। ঘটনাবিন্যাস বা চরিত্রাঙ্কনে যে উদ্ভাবনীশক্তি ও বাস্তবতাবোধ অপরিহার্য তা রবীন্দ্রনাথের কবিস্বভাবের প্রতিকূল। কবির প্রধান অবলম্বন থিম ও সুরেলা গদ্য। কথাসাহিত্যে এই দুটি বস্তু যেখানে যেখানে লাগসই হয়েছে সেখানেই তাঁর রচনা হয়ে উঠেছে নিটোল ও নিখুঁত। ছোটগল্পে এর সুযোগ সবচেয়ে বেশি, তাই ছোটগল্পেই তাঁর কৃতিত্ব সমধিক। সুরেলা গদ্যের নিপুণ প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথের জুড়ি মেলা ভার; কবির উপন্যাসে ও নাটকে নীরস তর্কও গানের সুরে লাবণ্যময় হয়ে ওঠে। কিন্তু এ তত্ত্বটি সম্বন্ধে কবি কতকটা সজাগ ছিলেন তা ঠিক বোঝা যায় না, যদি থাকতেন তবে হয়তো তাঁর কাব্যপ্রচেষ্টার অনেকটা এমন অজস্র বাণীবন্যায় অযথা অপচিত হত না। অবশ্য ফ্রয়েড এবং পরে এডমন্ড উইলসন দেখিয়েছেন যে, শিল্পীর এই অব্যবস্থিতচিত্ততা অবচেতন মনের অতি নিগূঢ় অন্তর্দ্বন্দ্বেরই ফল, যার ওপর শিল্পীর কোনো হাত থাকে না। আমার কথা হল, রবীন্দ্র প্রতিভার এই বহুমুখিত্বের সঙ্গে এখানে

সাহিত্যের নিত্যমূল্যের কোনো সম্পর্ক দেখা যায় না, বরঞ্চ এর ফলে কবির সাধ ও সাধ্যের মধ্যে বেশ কিছুটা ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে।

সর্বশেষে কবির নিজের ভাষায় রবীন্দ্র-সাহিত্য মূল্যায়নের মূল সূত্রটির উল্লেখ করব : সাহিত্যের চিত্রশালায় যেখানে জীবন-শিল্পীর নৈপুণ্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সেখানে মৃত্যুর প্রবেশদ্বার রুদ্ধ। সেখানে লোকখ্যাতির অনিশ্চয়তা চিরকালের জন্যে নির্বাসিত। তাই বলছিলেম, সাহিত্যে যেখানে সত্যকার রূপ জেগে উঠেছে সেখানে ভয় নেই। চেয়ে দেখলে দেখা যায়, কী প্রচণ্ড সব মূর্তি, কেউ বা নীচ শকুনির মতো, মন্থরার মতো, কেউ বা মহৎ ভীমের মতো, দ্রৌপদীর মতো—আশ্চর্য মানুষের অমর কীর্তি জীবনের চিরস্বাক্ষরিত। সাহিত্যের এই অমরাবতীতে যাঁরা সৃষ্টিকর্তার আসন নিয়েছে তাঁদের কারো বা নাম জানা আছে, কারো বা নেই, কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে তাঁদের স্পর্শ রয়ে গেছে। তাঁদের দিকে যখন তাকাই তখনই সংশয় জাগে নিজের অধিকারের প্রতি।

আজ জন্মদিনে এই কথাই ভাববার—রসের ভোজে কিংবা রূপের চিত্রশালায় কোন্ খানে আমার নাম কোন্ অক্ষরে লেখা পড়েছে। লোকখ্যাতির সমস্ত কোলাহল পেরিয়ে এই কথাটি যদি দৈববাণীর যোগে কানে এসে পৌঁছতে পারত, তাহলেই আমার জন্মদিনের আয়ু নিশ্চিত নির্ণীত হত। আজ তা বহুতর অনুমানের দ্বারা জড়িত বিজড়িত।

হাসান হাফিজুর রহমান

বাংলা কাব্যে মূল্যবোধের বিবর্তন : রবীন্দ্রনাথ

এমন একসময়ে রবীন্দ্রনাথের জন্ম যখন গঠনমান বাংলা সমাজের মনোভাব আর বাংলা কাব্যের সংবেদনার্থী রুচি পরস্পরকে ছুঁই ছুঁই করছে। মধুসূদনের গাঢ় ব্যক্তি-চেতনায় আমাদের আত্মবোধ জাগ্রত হয়েছে— কিন্তু এই উপলব্ধি প্রতীক-সত্যে বাঁধা বলে অনেকটা বিমূর্ত। ফলে, তা মনকে উদ্বুদ্ধ করেছে বটে, জীবনের মধ্য থেকে ঘটনার উদ্বোধন ঘটাতে সমর্থ হয় নি। কাব্যকলার পরিণত ফল এমন একটা জিনিস যাকে ঘিরে উপলব্ধির সোরগোল ওঠে। কিন্তু সে সোরগোল যদি জীবনের বস্তুকে আশ্রয় করে প্রবাহিত না হতে পারে তা হলে কাব্যের ভবিষ্যৎ যেমন সংকটগ্রস্ত হয়, সংস্কৃতিও তেমনি অত্যন্ত বাঞ্ছিত পরিণতির ফল থেকে বঞ্চিত হয়। আমার মনে হয়, জীবনের বস্তুকে বিলিয়ে দেবার কাজ কবিরই। একজন উপলব্ধির সঙ্গে সোরগোল তুললে আর একজন বস্তুকে চেনান, আরেকজন হয়তো বা চেনার উপযোগী মনন তৈরি করেন। মধুসূদনের কথা বলা হয়েছে। বাংলা কাব্যে বস্তু এবং সম্প্রীতি-জীবন-চেতনার প্রাথমিক কাজটা যাঁরা করলেন, তাঁরা ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল এবং বিহারীলাল চক্রবর্তী। ওঁদের কাব্যে আত্মচেতনা বাস্তব জীবনের বিভিন্ন কোণে প্রথম আশ্রয় লাভ করার সুযোগ পেয়েছে। বিশেষ করে বিহারীলালের কাব্যের আত্মমুখিনতা দেশজ মননকে নিজের রঙে রঞ্জিত হয়ে চারপাশের বাস্তবতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার অধ্যায় রচনা করেছে, এ কথা স্বীকার করতে হবে। এসবই কাব্যকলার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। কিন্তু এটাও লক্ষ করতে হবে যে, সমাজমানসের অগ্রগতির তুলনায় কাব্যক্ষেত্রে এই বিবর্তনমূলক উপাদানগুলো কতটুকু পরিণতি লাভ করতে পেরেছিল। বাংলা সমাজের অঙ্গে তখন আন্তর্জাতিক উত্থান-পতনের বিচিত্র চঞ্চল ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছিল। বিভিন্ন দেশের কাব্যের উদ্যমেও তখন নতুনত্বের ঢেউ লেগেছে। পুরাতনের স্থিতিশীল মূল্যবোধ এড়িয়ে তখন পুনর্গঠনের যুগের সূত্রপাত হয়েছে—যার একটা আবর্তের পরিণতিই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং তা থেকে অন্তঃপ্রবাহী ঢল আধুনিক যুগের বিপুল প্রসারের মধ্যে ব্যাপ্ত। এই দীর্ঘসূত্রী ধারাবাহিকতার যেখানে সূত্রপাত সে সময়ে বাংলা কাব্য কেবল আত্মচেতনা লাভ করে প্রসারের অপেক্ষায় হাঁটি হাঁটি পা পা করছে মাত্র। এবং সেই সময়েই রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব।

কোনো একজন সমালোচক বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্যে এক প্রাকৃতিক ঘটনা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনব্যাপী যে অসম্ভব অতিমানবীয় দায়িত্ব পালন করেছেন, তার তুলনা

তাঁর মতোই আর কোনো অতিমানব হতে পারে—তা গ্যেটে ছাড়া হয়তো আর কেউ নন। রবীন্দ্রনাথের জন্ম বাংলা কাব্যের নতুন মোড়ের যুগসন্ধিক্ষণে। তিনি সেই প্রাথমিক কাব্যিক বিবর্তন-স্বভাবকে যেমন প্রতিষ্ঠিত করেছেন তেমনি এর বাল্য-প্রবণতাগুলোকেও উৎকীর্ণ করেছেন। এর জন্য পৃথিবীর সমস্ত কাব্য আন্দোলনগুলোর দিকে তাঁকে সদাব্যাপৃত দৃষ্টি প্রসারিত করে রাখতে হয়েছিল। ফলে একদিকে যেমন বাংলা কাব্য একক রবীন্দ্রনাথের হাতেই পৃথিবীর বিভিন্ন কাব্যকলার সঙ্গে আত্ম-নির্মাণের মহান প্রচেষ্টায় এক হতে পেরেছে, অনেকগুলি বিবর্তনকে দ্রুত সম্পন্ন করে এক ঢলে যোগসংলগ্ন হতে পেরেছে, অন্যদিকে তেমনি বিভিন্ন কাব্যপ্রচেষ্টার সঙ্গে আদান-প্রদানে অনেক ঘনিষ্ঠও হয়ে উঠেছে, আত্মপ্রসারকামী অনুকৃতিতে নয় শুধুমাত্র আত্মসংস্থিত সম্প্রসারণের সমমাত্রায়।

এর জন্যে রবীন্দ্রনাথকে অভ্যন্তরীণ সংঘাতেও কম যেতে হয় নি। সেটা হল এই যে, দেবদেবী আশ্রিত আশ্রয়-আর্তিমূলক শঙ্কাবিধুর বাংলা কাব্যে এই সামান্য মানবজন্মের সার্থকতা ঘোষণার দায়িত্ব তাঁকেই নিতে হয়েছিল। চৈতন্য-চরিত ও বৈষ্ণব পদাবলীতে বাংলা কাব্যে প্রথম মানব-কেন্দ্রিকতার মোড় লক্ষ করা যায়। কিন্তু সেখানেও মর্ত্যের মরণশীল মানুষ দেবতার মোড়কে অঙ্কিত এবং কাব্যের বেদনানিগূঢ় অনুভূতিও উৎসারিত হয়েছে সংস্থাপিত আদর্শ-ব্যক্তিত্বকে নির্ভর করে। কবির বেদনানিগূঢ় উপলব্ধি আর ব্যক্তিজীবন—এই দুটোর মাঝখানের দেবতা বা আদর্শ-ব্যক্তিত্বের আড়ালকে দূর করতে হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী বাংলা কাব্যকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এ দায়িত্ব পালনও করেছেন বিপুল সচেতনতার সাহায্যে। একদিকে তাঁর বাংলার ভক্তি-বিহ্বল অত্যন্ত বিপুল দেশজ রসবোধ অন্যদিকে অসহিষ্ণু দ্রুত পরিবর্তনকামী উন্নতিস্পৃহ নগর-রুচি। একদিকে সংস্কার অন্যদিকে নির্মাণ। মধ্যখানে বিপুলতর ধৈর্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে দীর্ঘকাল ধরে স্থিতিস্থাপকতার কাজ করতে হয়েছে। কবিতা যাতে পাঠক থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়, তার সূত্র ধরতে হয়েছে। এক্ষেত্রে তাঁর দুটো সত্তার পরিচয় আমরা পাই। একজন আদি ও অন্তের বুনিয়াদ সৃজন করেছেন আর একজন অবারিত অনন্ত সম্মুখের জন্য গড়েছেন। বুনিয়াদ গঠনে তিনি যেমন সামন্তবাদী ক্ষয়িষ্ণুতার জড়কে উৎখাত করতে সচেষ্ট ছিলেন, তেমনি অতীতের রাজসিক বৈদগ্ধ্যকে অর্জন করেও রেখেছিলেন। আর নির্মাণের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক ভাবে সাধারণ মানুষের অচেতন বৃত্তিসমূহকে জীবনের ইহলীলার গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করেছেন এবং এই জীবনঘনিষ্ঠতাকে কাব্যবোধের সঙ্গে একাত্ম করে দিয়েছেন। কাব্যের ইতিহাস লক্ষ যাঁরা করেন তাঁরাই জানেন কী অপরিমেয় বৈপ্লবিক দান এ! একের মধ্যে এ বহুমুখী অঘটন ঘটাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বলীলার প্রকৃতি ও মানুষের সর্বস্তরে তাঁর প্রতিভা সঞ্চারিত করতে হয়েছে। এই উদ্যমকে বিশ্বাসযোগ্য এবং সর্বজন-গ্রাহ্য করার জন্য নগরচেতনা এবং লোকজ গ্রহণস্পৃহাকে এক রসবোধের পটভূমিতে সংস্থাপিত করতে হয়েছে তাঁকে। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎকে এক অন্তর্লীন জীবনচঞ্চল সূত্রে গাঁথতে হয়েছে। এই জন্য তিনি আমাদের নিজস্ব কবি। কারণ, প্রথমত, তাঁর মধ্যেই আমাদের সর্বজনীন ও গোত্রচিহ্ন-মুক্ত ঐতিহ্যিক পরিচয়ের এক আত্মলগ্ন আলেখ্য আমরা প্রথমবার বিধৃত দেখি। দ্বিতীয়ত, আমাদের স্তম্ভিত বিবর্তনকামী কাব্যিক উৎসারণের অনন্ত উৎসের খোঁজও আমরা রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই প্রথম পেয়ে বাঁচলাম। তৃতীয়ত, রবীন্দ্রনাথই প্রথম আমাদের সামনে একটা সর্বস্বজনগ্রাহ্য নিরপেক্ষ কাব্যিক standard তুলে ধরতে সক্ষম হলেন। তাঁর মধ্যেই আমরা পরিপূর্ণ সর্বজনীন দেশকে পেলাম, নিজের আত্মস্থ যোগাযোগ রক্ষা করার নিরপেক্ষ সূত্র খুঁজে পেলাম। এই কাব্যের মূল্য সবার সমৃদ্ধিরই দ্যোতক এবং

এর রসধারা সবার জন্যই অমূল্য শিক্ষণীয় পটভূমি রচনা করেছে। আমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ বলেই রবীন্দ্রনাথের ব্যাপ্তি অনেক ক্ষেত্রে হয়তো-বা বাধাগ্রস্ত হয়। ত্রুটি রবীন্দ্রনাথের অসম্পূর্ণতার নয়—সামাজিক সম্পূর্ণতার অভাবের কথাটা এক্ষেত্রে শ্রেণীগত ও মানসিক উভয় স্তরেই প্রযোজ্য।

এক জনের ভূমিকার এমন বিস্ময়কর ব্যাপ্তি কোনো অলৌকিক ঘটনার ফল নয়। রবীন্দ্রনাথের এই সম্পূর্ণতার পেছনে যা কাজ করেছিল, তা এক সামগ্রিক মানবতাবোধ যাকে রেনেসাঁর পরিণত ফল বলা যায় এবং যা গণতান্ত্রিক চেতনারই পরিশ্রুত অবদান—নিরপেক্ষ নিরঙ্কুশ এবং যে কোনো বিরুদ্ধতা, প্রবণতা বা bias -মুক্ত। এই মানবতাবোধের সঙ্গে জীবনকে ভালবাসার অপূর্ব ক্ষমতা তাঁকে প্রতি ক্ষেত্রে বাস্তব জ্ঞান ও আবেদনে সম্পৃক্ত করেছে। তাঁর যুক্তি, বোধ, বুদ্ধি এবং সঞ্চরণশীল মনোভাব—মানবতাবোধ ও জীবন ঘনিষ্ঠতাজনিত বাস্তব সচেতনতা ও সপ্রতিভতারই ফল। সেই জন্যই বাংলা কাব্যের নতুন মোড়ের এক নির্মাতা হিসেবে তাঁর নাম আলোচিত হবে। এ বিশ্বাস নয়—শুধু সত্য। যেমন গ্যেটের ক্ষেত্রে, শেক্সপীয়রের ক্ষেত্রে, টলস্টয়ের ক্ষেত্রে। এমন ঘটনা কি আবার ঘটবে? কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সেই মানবতাবোধ আর কোথায়?

দুই

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "একসময়ে জ্যোতিদাদারা দূরদেশে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন তেতলার ছাদের ঘরগুলি শূন্য ছিল। সেই সময় আমি সেই ছাদ ও ঘর অধিকার করিয়া নির্জন দিনগুলি যাপন করিতাম।

"এইরূপে যখন আপন মনে একা ছিলাম তখন, জানি না কেমন করিয়া, কাব্য রচনায় যে সংস্কারের মধ্যে বেষ্টিত ছিলাম সেটা খসিয়া গেল। আমার সঙ্গীরা যেসব কবিতা ভালবাসিতেন ও তাঁহাদের নিকট খ্যাতি পাইবার ইচ্ছায় মন স্বভাবতই যে সব কবিতার ছাঁচে লিখিবার চেষ্টা করিত, বোধ করি তাঁহারা দূরে যাইতেই আপনা আপনি সেই সকল কবিতার শাসন হইতে আমার চিত্ত মুক্তিলাভ করিল।"

জ্যোতিদাদারা দূরে যেতেই রবীন্দ্রনাথের আপন মন মুক্তিলাভ করল। কথাটায় হয়তো সম্পূর্ণ বলা হল না। বাংলা কবিতায় 'আপন মন' মুক্তিলাভ করল—এইটেই বোধ করি যথার্থ সত্য।

সহজেই লক্ষ করা যায় পুরোনো বাংলা কবিতার রসপট অচল পটের মতোই স্থির। তার বিবর্তনে ক্রমান্বয় নেই; আবর্তনের ক্রমান্বয় পরম বিত্তের সঞ্চয়ে ধীরে ধীরে ধনী হয়ে উঠেছে। ঢেউয়ের পর ঢেউয়ে কবির হয়তো মন পালটিয়েছে—সুর পালটায় নি, বিশেষ উত্থান তো নয়ই। এর কারণ সম্ভবত এই যে, সৌজন্যবিনীত বাঙালি কবি বাঙালি রসবোধের বেষ্টনীর বাইরে যেতে চান নি সহজে। পরপ্রীতিলোভী আবেগ দশ জনের স্থায়ী দেশজ মজলিসের কুটুম্বিয়ানাতেই মুগ্ধ হয়ে থেকেছে। আত্ম-উদ্বোধন তার কাছে আত্মবিলাস বলে মনে হয়েছে—এদিকেও মজ্জাগত বিনয় তাকে পা বাড়াতে দেয় নি।

বাংলা সমাজের বিবর্তনেও কমবেশি এই সত্য প্রয়োগ করা যায়। তা ছাড়া বাংলা কবিতা চিরদিন ছিল সমাজের সম্পদ—ব্যক্তির সম্পদ হয়ে উঠতে পারে নি এ কিছুতেই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের আগে। এর বহু বিদিত কারণ এই যে, বাংলা সমাজে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উদ্ভব হয়েছে দেরিতে—সেই ঊনবিংশ শতাব্দীতেই, তাও আবার বাইরের প্রভাবে। সুতরাং বাংলা কবিতা দেশজ-উত্তরাধিকারে সামাজিক রেওয়াজ নিয়েই বেঁচে থেকে

খুশি ছিল। অবশ্য ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধের প্রতিষ্ঠা বাংলা কাব্যে রবীন্দ্রনাথের পূর্বেই অর্জিত হয়েছিল—স্বাধিকার ভাবনার উৎসমুখ খুলে গিয়েছিল। যদি রবীন্দ্রনাথকে এই অর্গল খোলার কাজে হাত লাগাতে হত তবে হয়তো বাংলা কবিতার এই 'আপন মনের' অবারিত যাত্রা শুরু হত আরো দেরিতে। ফলে হয়তো বাংলা কবিতার আজকের এই বহুবিচিত্র বিকাশে দীর্ঘসূত্রতা প্রকাশ পেত। আমাদের সৌভাগ্য যে প্রতিষ্ঠিত রসবেষ্টনীর চাহিদা থেকে রবীন্দ্র-চিত্ত মুক্তি লাভ করেছিল সহজে। ফলে গীতিকবিতার মুক্তভূমির সিংহদ্বার খুলে গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনার শুরুতেই ! আর সকলেই জানেন গীতিকবিতাই শ্রেষ্ঠ কবিতা এবং আপন মনই হল গীতিকবিতার স্বাধীন স্বদেশ, নিজের হাতের স্পর্শ মাখানো নিকানো ঘর। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে আত্মস্বাতন্ত্র্য বাংলা কাব্যের মূল্যবোধে বিপ্লবের সৃষ্টি করল। তাই রবীন্দ্রযুগের পূর্বে ও পরের কাব্যে কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য খুব সহজেই লক্ষ করা যায়। এর প্রথম লক্ষণীয় বিষয়টি এই যে, সমাজ-মানসের ক্ষেত্রে ব্যক্তিমানস তার নিজস্ব নির্মাণ-বুদ্ধি, রুচি, গ্রহণ-প্রবণতা, সমন্বয়-ভাবনা, প্রতিক্রিয়া এবং পারিপার্শ্বিক সম্পর্কচেতনা প্রভৃতি নিয়ে বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এই ব্যক্তিমানস অবশ্য ভুঁইফোঁড় নয়—এর মানসবৃত্তির পূর্বলক্ষণসমূহ মাইকেল, দীনবন্ধু, ঈশ্বর গুপ্ত, বঙ্কিম, বিহারীলাল প্রভৃতির মধ্যেই সঞ্চারিত হয়েছে। মাইকেলের ব্যক্তিচেতনা ও আত্মজিজ্ঞাসা এবং প্রচলিতের প্রতি বিদ্রোহ, বঙ্কিমের জাতীয়তাবোধ, সমাজ-সজ্ঞানতা ও নির্মাণবুদ্ধি-দীনবন্ধুর সমাজসম্পৃক্তি, প্যারীচাঁদের প্রথম মধ্যবিত্তমানস এবং বিহারীলালের আপন মনের মাধুরীর উদ্ভাবনা প্রভৃতিই বাংলা সাহিত্যে নতুন নতুন মূল্যবোধের জন্মের আলোড়ন সৃষ্টি করেছে সন্দেহ নেই; কিন্তু এসবের ফলশ্রুতি রবীন্দ্রনাথই একক হাতে বাংলা সাহিত্যে সংস্থাপিত করেছেন, প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নতুনতর মূল্যবোধের বিবর্তন-সম্ভাবনার ক্ষেত্র স্বাভাবিক ও সহজ করে দিয়েছেন। সে কারণে রবীন্দ্রসাধনা বাংলা কাব্যের গঠনোন্মুখ শৈশব থেকে পরিণতি পর্যন্ত বিস্তৃত, মধ্যযুগীয় খোলস খোলার কাল থেকে আধুনিক সমাজ ও সচেতন খোলা চোখের কাল পর্যন্ত প্রসারিত। এবং এই দীর্ঘ যাত্রাপথে রবীন্দ্রনাথই নেতা, প্রধান উদ্ভাবক ও উদ্যোক্তা এবং কর্মী। আশি বছরে চার শ' বছরের দায় শোধ করেছেন তিনি। 'ভানুসিংহ' থেকে 'ওরা কাজ করে' পর্যন্ত এর বিস্তার। শ্রেণী-অচেতন মধ্যযুগ থেকে মধ্যবিত্ত চেতনার উদ্যোগকাল পেরিয়ে সমাজবাদী শ্রেণীভাঙার সংবেদনার সীমা পর্যন্ত এর ক্রমপ্রসার। কয়েক শতাব্দীর কাব্যবিবর্তনের সংক্ষেপ প্রতিরূপ যেন তাঁর মধ্যে বিস্তৃত।

২

কোনো সমাজের পক্ষে বহুদিন পর্যন্ত স্থিতাবস্থায় থাকার ঘটনা ইতিহাসে বিরল নয়। সমাজসংস্কার বিবর্তনের উপযোগী মৌলিক উপকরণগুলির সক্রিয়তার অভাবই এর কারণ। এই অভাব দূর হলেই নতুন প্রাণশক্তি সঞ্চার হয়, নতুন নতুন উদ্ভাবনায় সমাজদেহ চঞ্চল হয়ে ওঠে। এই হিসেবেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনার প্রথম যুগে প্রাথমিক মৌলিক মূল্যবোধগুলোও সংস্থাপিত হওয়া মাত্রই পরবর্তী পর্যায়ে আমরা লক্ষ করতে পারছি যে, রবীন্দ্রনাথের হাতেই মহত্তর পূর্ণতর আধুনিকতর মূল্যবোধের তরঙ্গ বাংলা কাব্যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। এই আলোড়নের পটভূমিতে দুটো বিষয়কে একসঙ্গে স্বীকার করা প্রয়োজন—এক, মানবচেতনা; দুই, সৌন্দর্যচেতনা। এদের একটিকে বাদ দিয়ে অপরটিকে রাখলে কারুরই গুরুত্ব বাড়বে বলে মনে হয় না। কেননা, একদিকে মানবিকতার উৎস

ধরেই বাংলা কাব্যে অতীতকে ঠেলে বর্তমান জায়গা করে নিয়েছে, সামাজিক প্রথা কেন্দ্রিকতার জায়গায় ব্যক্তিমানসের অন্তঃস্রোত অবারিত হতে পেরেছে এবং তার আনুষঙ্গিক হিসেবে বিশ্ব-চেতনা, সমাজ-চেতনা, যুগসম্পৃক্তি প্রভৃতি মূল্যবোধগুলোর অভ্যুদয় ঘটেছে। অন্যদিকে এক কথাও ভুলে গেলে চলবে না যে, ব্যক্তির স্বকীয় চেতনার বিকাশের ফলেই বাংলা কাব্য শিল্পবস্তুতে পরিণত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে, বাংলা কাব্য আধুনিক বৈদগ্ধ্যের পাদপীঠে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। একদিকে তাই জীবনরস এবং অন্যদিকে শিল্পরসের অর্গলমুক্তি ঘটল একসঙ্গে এই প্রথমবার এবং সকলেই জানেন জীবন এবং শিল্পের সার্থক সমন্বয়েই জাতির সাহিত্য গড়ে ওঠে। তা হলে এ ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বাংলা কাব্যের ঐতিহ্যসম্পন্ন শিল্পসম্ভাবনা এতদিনে নিরঙ্কুশ সৌন্দর্যভিত্তিক শৈল্পিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা পেল—জীবনের অঙ্কুরমান মূল্যধারা শিল্পরূপে রূপায়িত হওয়ার সার্থকতায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠল। বাংলা কাব্যে নতুন মূল্যের উদ্ভবকালে এই বিপ্লবের তাৎপর্য অবশ্যই তলিয়ে দেখা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে সেই বিপ্লবকে খুঁজেও পাওয়া যাবে না।

আমার এই কথায় এমন বিভ্রান্তি যেন না হয় যে, আমি রবীন্দ্রনাথকেই বাংলা কাব্যের প্রথম শিল্পী বলে উল্লেখ করছি। আমার বক্তব্য এইটুকুই যে, বাংলা কাব্যে মানবচেতনার উৎসমুখ খুলে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথই এবং তিনিই বাংলা কাব্যে বৈদগ্ধ্যের পাকাপোক্ত ভিত তৈরি করেছেন, যার ফলে বাংলা কাব্য একাধারে জীবন ও শিল্পের প্রতিভূ হওয়ার মর্যাদায় নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠা কথাটায় জোর দিচ্ছি।

রবীন্দ্রনাথ আদতে ছিলেন অভিজাত—সেইদিক থেকে গ্যেটে এবং টলস্টয়ের উত্তরাধিকারী। কিন্তু তাঁর মন উৎসারিত হয়েছে গণতান্ত্রিক প্রবণতা-চঞ্চল মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির মধ্যে। অভিজাত হিসেবে তিনি রেনেসাঁসের মূল্যবোধসমূহ বাংলা কাব্যে সঞ্চালিত করেছেন প্রথম জীবনেই। কিন্তু তাঁর জীবনকালেই এই মূল্যবোধ গ্রহণ করেও বাংলা কাব্য ও সমাজ তখন আরো নতুনের, আরো পরিবর্তনের মুখাপেক্ষী হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ এই পরিবর্তন-উন্মুখতার সঙ্গে বিরোধে উপনীত হন নি—এক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সমন্বয়ের ও সম্প্রসারণের। ফলে অভিজাতের অনেক মধ্যবিত্ত মূল্যবোধেরও উদ্যোক্তা হতে হয়েছিল তাঁকেই। সেই কারণে মধ্যবিত্ত সমাজের সঙ্গে সংঘাত তার বাধে নি—তাঁর সমন্বয়বৃত্তির ভিত্তিতে মধ্যবিত্ত মানসের সঙ্গে এক সারিতে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজের উদারতায় মধ্যবিত্ত মূল্যবোধেরও ক্রান্তিকালীন পুরোধার ভূমিকাও তিনি নিয়েছিলেন। এই উদারতার অনুকূল কারণ অভিজাত স্বার্থের যথার্থ বুনিয়াদ তখন ক্ষয়িষ্ণু। আর ক্ষয়িষ্ণুতার প্রতি তাঁর আকর্ষণ কোনো কালেই ছিল না। রবীন্দ্রনাথ তাই অভিজাতের আভিজাত্য, উদারতা, রুচি, বৈদগ্ধ্য এবং বড় কিছু করার ঝুঁকির সম্পদটুকুই পেয়েছিলেন, গলদটুকু নয়। সেইজন্যে রবীন্দ্রনাথের নির্মাণের পটভূমিকাই ছিল বিরাট। বাংলার দেশজ সাংস্কৃতিক চেতনা ও মূল্যবোধ মধ্যবিত্ত জাগরণের নতুন অন্বেষণ-চকিত তোড়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বাংলা সমাজের পরিস্থিতিতে অসময়ের অভিজাত ছিলেন বলেই পুরোনো এবং নতুনকে সমানভাবে, আবার দুটোকেই বিচ্ছিন্নভাবে তলিয়ে দেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। মানসগত ও বাস্তবগত উভয় দিক থেকে দুটোকে আপন বলে ভাবতেও তাঁর পক্ষে প্রকৃত কোনো বাধা ছিল না। রবীন্দ্রনাথের এই সংস্কারজয়ী মনোভাব বাংলা সাহিত্যের এক পরম সম্পদ। এর দরুনই আমরা দেখতে পাচ্ছি, দেশজ লৌকিক সংস্কৃতির সঙ্গে কিছুটা বিচ্ছিন্ন ও আলাদা মধ্যবিত্ত-ভবিষ্যৎ-উন্মুখ চেতনার যোগ ঘটাতে এবং এক্ষেত্রে সমন্বয়ের

নিশ্চিত পটভূমি খুঁজে নিতেও বেগ পেতে হয় নি। কারণ উঠতি–মধ্যবিত্তের বামুনে মেজাজ বা ফালতু দেমাগের হীনম্মন্যতা তাঁর মধ্যে ছিল না এবং অন্যপক্ষে লোক–প্রবণতার সংস্কারবদ্ধতা ও কল্পনা ও উদ্যমহীনতারও বশংবদ তিনি ছিলেন না। ফলে, বাংলা কাব্যের আধুনিক ধারা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে গেছে। মধ্যবিত্ত কণ্ডুয়নের দীর্ঘসূত্রতাপূর্ণ দায়গ্রহণের সঙ্কটও বদ্ধমূল ক্ষেত্র পায় নি। রবীন্দ্রনাথের হাতেই আধুনিক সংস্কৃতির এই বিপদ্‌মুক্তি ঘটেছে।

আর একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, বাংলা কাব্যে ইউরোপের সাহিত্যের মতো ফিউডাল নগরচেতনার বিকাশ ঘটে নি। অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যে ডিকেন্সের কালে ডিকেন্স, গ্যেটের কালে গ্যেটে, টলস্টয়ের কালে টলস্টয়ের উদ্ভব ঘটে নি কিংবা একজন সময়োচিত শেক্সপীয়রের আবির্ভাব হয় নি। বাংলা সাহিত্যে এই অসম্পূর্ণতার দায় শোধ করার কাজ রবীন্দ্রনাথের আগেই শুরু হয়েছিল—রবীন্দ্রনাথের শক্তিমন্ত হাত এই অবিশ্বাস্য দায়কে ভরাট করতে সবচেয়ে তৎপরতার স্বাক্ষর রেখেছে, সন্দেহ নেই। তবে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পরিশীলনবাদী। সেজন্য তাঁর পূর্বসূরিদের অনেকের মতো তাঁকে বাংলা সাহিত্যের কাঁধে ফিউডাল বৈশিষ্ট্যের খারাপ দিকটার অরাজকতা এবং প্রতিক্রিয়ামুখিনতা চাপিয়ে যেতে হয় নি। রবীন্দ্রনাথের এই অতিসজাগ প্রগতি–সজ্ঞানতার পেছনে সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে যা তা হল, স্বচ্ছদৃষ্টি, মুক্তবুদ্ধি এবং উন্মুক্তপ্রাণতা। বাংলা কাব্যের নতুন মূল্যবোধের গ্রন্থনে এর ভূমিকা কম মূল্যবান নয়। বাংলা কাব্যের তথা সাহিত্যের পক্ষে সাম্প্রদায়িক ও আধুনিক চরিত্র অর্জনে এই উদারতা যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল।

৩

রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী বিকাশের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় শশাঙ্কমোহন সেন লক্ষ করেছেন, "রবীন্দ্রনাথের এই উন্নতির মূল কারণ স্বাধীনতা। তিনি শৈশব হইতেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতার এমন কি, সময়ে সময়ে স্বেচ্ছাচারের বশবর্তী হইয়া স্বীয় শক্তির অনুসরণ করিতেছেন...।"

কথাটার তাৎপর্য অনেকখানি। বাংলা কাব্যের মজ্জাগত প্রথাবদ্ধতা যে কতখানি বদ্ধমূল ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রথম গীতিকবি বিহারীলালেরও সেই প্রথাগত বাংলা কাব্যের ধর্ম সংস্কারের মধ্যে ফিরে যাওয়াতে—অবশ্য এক্ষেত্রে তিনি আত্মগত প্রতীক সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছেন। সেটা অবশ্য আধুনিক কাব্যবোধের প্রভাবেই হয়েছে, এতে সন্দেহ নেই। আদতে কিন্তু ঐ সংস্কারপ্রবণতাটা বাংলা কাব্যে পুরাতনেরই জের। রবীন্দ্রনাথও ধর্মক্ষেত্রে এই ধরনের আত্মগত প্রতীক সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীবনের প্রতি ভালবাসাই হল তাঁর কাব্যপ্রেরণার মৌল নিয়ন্তা। এই ভালবাসা জীবনের সুখ–দুঃখ, মহত্ত্ব–বৈষম্য সবকিছুকেই বিধৃত করতে চেষ্টা করেছে। এবং এই ভালবাসার ঐকান্তিকতার তীব্রতাই তাঁকে বিচিত্র পথে ঠেলে নিয়ে গেছে। সর্বত্রগামী হওয়ার প্রচেষ্টায় তাঁর চৈতন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এই ভালবাসাই তাঁকে সমাজসত্যের অত্যন্ত সাম্প্রতিকতার সম্মুখীন করে দিয়েছে। মুক্তি দিয়েছে তাঁকে সংস্কার ও সংকীর্ণতায় আবদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা থেকে।

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতপক্ষে হয়তো নিরঙ্কুশ কাব্যের যুগে অনুকূল পরিবেশের পক্ষপাতী ছিলেন মালার্মেরই মতো। জীবনের, প্রকৃতির নিগূঢ় মহত্ত্বের, সৌন্দর্যের নিগূঢ়তর উপলব্ধিতে জেগে ওঠাতেই হয়তো সবচেয়ে তৃপ্তি ছিল তাঁর মনের। কিন্তু জীবনের প্রতি ভালবাসাই

তাঁকে নিরঙ্কুশ কাব্যের বিরোধী বাস্তবের কাছে টেনে নিয়ে এসেছে বারবার। আমি আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথের conflict ছিল কম, সমন্বয়বৃত্তিই ছিল তাঁর মানসের মৌলিক উপাদান। সেজন্যে শিল্পের ও বাস্তবের চাহিদার আগে তাঁর মনের চাহিদার বিরোধে তিনি উপনীত হন নি। এই সম্ভাব্য সঙ্কটকে তিনি আন্তরিক পর্যায়ে এড়িয়ে গেছেন এবং অন্যপক্ষে মানবতাবোধে উচ্চকিত হয়ে সুদূর অতীত থেকে সাম্প্রতিকতম বর্তমান এমনকি সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ পর্যন্ত অস্থিরভাবে বিচরণ করেছেন, নিজের অভিব্যক্তির সহস্রতম উৎসমুখ খুলে দিয়ে মানুষের কল্যাণের স্বরূপকে খুঁজেছেন, জীবনের অর্থকে খুঁজেছেন, জীবনমুখিনতা এবং প্রয়োজন সংসাধনের তাৎপর্য অনেক বড় করে দেখেছেন। এই খোঁজায় প্রায় সমস্ত আবশ্যিক মূল্যবোধেরই পথিকৃৎ হতে হয়েছে তাঁকে, সংগ্রাম করতে হয়েছে মজ্জাগত জড়তার সঙ্গে। আর প্রতি পদে শিল্পীর স্বাধীনতার অনিবার্য প্রয়োজনের উপলব্ধিতে শিহরিত হয়ে পথ করতে হয়েছে তাঁকে। বাংলার কবিতাকে যা তিনি দেখাতে পারেন নি তা হল সম্পৃক্তিবোধ অর্থাৎ আধুনিক কবির জীবন সমালোচনামূলক নিবিষ্টতা। কারণ, তিনি মূলত ছিলেন রোমান্টিক নির্লিপ্ত স্বভাবের কবি, কবিতার নিরঙ্কুশ উৎসারণের পিপাসু আত্মা। সেজন্যেই জীবনের তাৎপর্যের ভিত্তি রচনা করেই তার ভূমিকা নিঃশেষ হতে বাধ্য হয়েছে। এবং এখানে এসেই আধুনিক কবি তাঁর হাত থেকে নেতৃত্ব তুলে নিয়েছে। শুরু হয়েছে যুগচেতনার, ঘটমান বাস্তবের সঙ্গে একাত্মতার, বিরোধের, বিচারের, সমাজবিন্যস্ত মানবের পারম্পর্যবোধের দ্বান্দ্বিক ঐতিহাসিক অস্তিত্বধারণার নতুন যাত্রার। এক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ যা কিছু বলতে পেরেছেন তা শুধু তাঁর সর্বগ্রাসী, সর্বত্রগামী মনোবলের জন্যেই, অতন্দ্র মানবপ্রেমের তাড়নাতেই, শুভবুদ্ধির আপসহীন, ক্ষান্তহীন অনুপ্রাণনার উৎসাহতেই। তাঁর মনের স্বাধীনতাই তাঁর মানসগণ্ডির বাইরে তাঁকে অপরূপ উত্তেজনায় মুখর করে তুলেছে। অনেক ক্ষেত্রে তাঁর উত্তরসূরিদের সহযাত্রী করে তুলেছে তাঁকে। এর ফল হয়েছে এই যে, বাংলা কাব্যের নতুন নির্মাণে রবীন্দ্রনাথ যে বাধা ও বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছেন রবীন্দ্র-উত্তর নতুনতর উদ্ভাবনার গোড়াতেই সে বাধার বীজ উৎপাটিত হয়ে গিয়েছিল। বাংলা কাব্যের স্বাধীনতার উদ্‌গাতা রবীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্যের স্বাধীন উৎসারণের পথ চিরকালের জন্য অব্যাহত করে দিয়ে গেছেন।

৪

রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনাকে দুটো পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম পর্যায়ে তিনি বিশুদ্ধ রোমান্টিক। এটাই প্রধান ভাগ। দ্বিতীয় পর্যায়ে জীবনের সত্যাসত্যের পর্যালোচনা তিনি করতে চেয়েছেন, জীবনের সঞ্চালিত রূপের মর্মগ্রহণ এবং এর ভবিষ্যৎ-উন্মুখ প্রবণতার তাৎপর্য ও শক্তি উপলব্ধি করতে প্রয়াস পেয়েছেন। প্রথম পর্যায় অনুসৃতির রচনা তাঁর আজীবনে ছড়িয়ে আছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের রচনার বিশেষ সময়কাল নেই। তাঁর পরিণত বয়সের প্রথম পর্যায়ে অনুসৃতির বিভিন্ন স্তরে এ অনুপ্রবেশ করেছে। তাঁর প্রথম পর্যায়ের রচনাসমূহের ভাষাও বিশুদ্ধ রোমান্টিক ভাষা। উন্মুক্ত কল্পনা এবং অবারিত সৌন্দর্যদৃষ্টির ওপর নির্ভর করে তা গড়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে তিনি ব্লেক এবং কীটসের ইমাজিনেশন সম্পর্কিত ধারণার সমন্বয়সাধন করেছেন। ব্লেক পার্থিব বস্তুর আবরণ খুলে অনন্তের অভিসারী— এই অনন্ত রবীন্দ্রনাথের নিকট অত্যন্ত সত্য ছিল, তাঁর বিশ্বাসে গ্রথিত ছিল। অন্যপক্ষে কীটসের নিকট-দেখার জগতের অন্তর্গূঢ় সৌন্দর্য ছিল তাঁর কল্পনার উপজীব্য—এই দৃশ্যমান জগৎও রবীন্দ্রনাথের নিকট অত্যন্ত সত্য ছিল, তাঁর প্রত্যয়ে, উপলব্ধিতে একাত্ম ছিল। সেজন্যেই

সীমা ও অসীম এবং অন্ত ও অনন্তের মধ্যে তাঁর বোধ সঞ্চারিত হয়েছে। এর পেছনেও অবশ্য কাজ করেছে সেই অভাবপূরণের দায়িত্ব-ধারণা থেকে উদ্ভূত সমন্বয়বোধ। রবীন্দ্রনাথের রেনেসাঁস-চেতনা যে এত উদ্যমী তার কারণ মানবিক মূল্যবোধের প্রেরণা নয়, এই দায়িত্বপালনের তীব্র ধারণাও। রবীন্দ্রনাথ জানতেন বাংলা কাব্যে ব্লেকও নেই, কীটসও নেই, ওয়ার্ডসওয়ার্থও নেই, শেলীও নেই। এবং রবীন্দ্রনাথ এ কথাও জানতেন, তিনিই বাংলা কাব্যের প্রকৃত অর্থে প্রথম রোমান্টিক কবি। বিহারীলালের এ-সম্পর্কিত সূচনা তাঁকে সাহস যুগিয়েছে সত্যি, কিন্তু এ-ও তাঁর অজানা ছিল না যে, এই নতুন ভাবধারাকে অভাব পুরিয়ে পরিণত করার, স্থিতিস্থাপক করার, বলিষ্ঠ করার, সুন্দর করার, ঐশ্বর্যবান করার, সমৃদ্ধ করার দায়িত্ব তাঁরই। এ-কারণে তিনি দেশকে যেমন চোখ খুলে দেখেছেন, দেশের অতীতকেও দেখেছেন তেমনি চোখ খুলে। এবং এর জন্যেই বিদেশী রোমান্টিকতারও অন্তঃসারকে গ্রহণ করতে তাঁর বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় নি। দেশ ও বাইরের উভয় ক্ষেত্রেই সর্বগ্রাসী গ্রহণের প্রয়োজন ছিল তাঁর। নিজের বিকাশের জন্যে। না, বাংলা কবিতার শূন্যতা ভরিয়ে তোলার জন্যে একে বাড়িয়ে তোলার জন্যে। না, তাও না, বাঙালি ব্যক্তি ও বাংলা কাব্যের পরস্পর-যুক্ত পরিণতির জন্যে, বাংলা সমাজ ও কাব্যের পারম্পর্যপূর্ণ বৈদগ্ধ্যের জন্যে। তাঁর এই গ্রহণ অনুকরণ নয়, অনুসরণও নয়—এ দিয়ে তিনি বেড়েছেন, তাঁর সংস্থাকে বাড়িয়েছেন। নিজের তথা বাংলা কাব্যের বিকাশের ক্ষেত্রে পদ্ধতি হিসেবে একে ব্যবহার করেছেন মাত্র। যুগধারা এবং অভাব ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে এর তাৎপর্য ছিল। এ কথা আমরা আজকাল ভুলে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে ভুল বুঝি। তাঁকে নিরুত্তাপ নিঃসংশয় শোষক মাত্র বলে অভিযোগ আনি। তাঁকে প্রতিরূপ-সংগঠক মাত্র ভেবে দুঃখ পাই। ক্ষুণ্নতার দাবি তুলি, কেন তিনি তাঁর সমসাময়িক জ্যান্ত জটিলতার সঙ্গে জড়িত হয়ে অনন্যনির্ভর উৎসারণে টাটকা টাটকা ঝরলেন না। তাঁর সময়ের অভিন্ন যোগাযোগের উত্তপ্ত সজীব ফল কেন আমরা পেলাম না। রবীন্দ্রনাথের আয়ুষ্কালকে চূড়ান্ত ধরলে, যে কালে তিনি বেঁচে ছিলেন, তার এমন দাবি হয়তো যুক্তিযুক্ত। কিন্তু তা একচক্ষু—রবীন্দ্র-পটভূমি, ভূমিকা ও স্বভাবের দিকে তা চোখ বন্ধ করে রাখার নামান্তর। কারণ, শূন্যতায় যে মহার্ঘ পূর্ণতা রবীন্দ্রনাথকে আনতে হয়েছে, তার প্রতিষ্ঠায় যে স্বভাবের প্রয়োজন তা আধুনিক স্বভাবের অনেকাংশেই বিপরীত। রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়স পর্যন্ত বেড়েছেন বটে, কিন্তু অন্তিমকালে তাঁর পরবর্তীদের রূপও কেন তিনি পরিগ্রহ করতে পারলেন না—এ দাবি এমনকি রবীন্দ্রনাথের কাছেও অতিরিক্ত দাবি।

রবীন্দ্রনাথকে তাঁর জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তেরও অন্তর্নিহিত প্রয়োজন সারতে যে মানসিকতার ওপর নির্ভর করতে হয়েছে, জীবনের দীপ নেভার আগে হঠাৎ তারই বিপরীত মেজাজে তাঁকে দেখি না বলে ক্ষোভ করা তাই হাস্যকর বৈকি ! আধুনিক যুগ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন বলেই যেন এই বিপরীত দাবি। রবীন্দ্রনাথ যে প্রত্যয়কে, যে উদ্ভাবনাকে, যে অবারিত মনোভাবকে বাংলা কাব্যে প্রতিষ্ঠিত রাখতে চেয়েছেন, জটিলতা ও সংশয় দিয়ে তা বোধ করি কাব্য-সম্ভব হত না। এই বড় কাজ করতে হবে বলেই রবীন্দ্রনাথকে অনেক জ্বালা ভুগতে হয়েছে, অনেক অন্তর্দ্বন্দ্বকে এড়াতে হয়েছে। কবিস্বভাবের অনেক আত্মমগ্ন তীক্ষ্ণতা ছেঁটে ফেলতে হয়েছে। ভিত্তির নিটোলতা, ব্যাপকতা, সারগর্ভতা আনার জন্যে এ মস্ত বড় ত্যাগ। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বচেতনার পশ্চাতেও ছিল এই প্রবণতা, এই বোধ। বাংলা সমাজের স্ববিরোধ, অন্তর্বিরোধ, আপাতবিরোধ এবং একটি মুক্ত প্রাণের পক্ষে শ্বাসরোধকারী সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ তাঁকে বিশ্বচেতনার 'পলায়নবাদে' ঠেলে দেয় নি। সেখানে উন্মুক্ত হাওয়ার নির্ভেজাল নির্দ্বন্দ্ব আয়াসের আকর্ষণই তাঁকে টানে নি। তাঁর গভীরতর

দায়িত্ব-চেতনা ও আত্মবিশ্বাসই বাংলা কাব্যের অসম্পূর্ণতাকে ভরিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে একে বিশ্বের পটভূমির সঙ্গে যোগ করিয়ে দিতে তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে। এমন নিঃসঙ্কোচ তৎপরতা, আন্তর্জাতিকতায় মিলিয়ে দেখার আত্মস্থ শৌর্য এর আগে অন্য কোনো বাঙালি কবির ব্যক্তিত্বে ছিল না (মাইকেল 'সম্ভাবনা' ছিলেন), এবং বাংলা কবিতার সৌভাগ্যেও এই বিশ্ববোধ, আন্তর্জাতিক সম্পর্কবোধ এর আগে আসে নি। সুতরাং এই বিশ্বচেতনা তাঁর আত্মবিকাশোন্মুখ বাংলা কবিতার সাংগঠনিক উৎসরণেরই একটি দিক বলা যায়। সমাজের প্রতিক্রিয়া বা অন্তর্দ্বন্দ্ব এর পশ্চাতে কাজ করে নি। রবীন্দ্রনাথের নির্দ্বন্দ্ব রোমান্টিক বিকাশ-তৎপরতার এক চমৎকার ফল এ, বাংলা কাব্যের আত্মস্থ-সাহসের এক বিস্ময়কর ফসল।

প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ ইয়েটসের পূর্বসূরি। ইয়েটসের পূর্বের ইংরেজি কাব্যের পরিণতিকে তিনি বাংলা কাব্যে সংস্থাপিত করে গেছেন। আমাদের এ দুঃখও ভ্রান্ত যে, কেন রবীন্দ্রনাথ imagist নন ! কেননা তিনি ভাবনার চেতনার জটিলতা-নিরপেক্ষ সৌন্দর্য ধারণার ভিত্তি স্থাপনের শিল্পী— imagist-দের অব্যবহিত পূর্বের উদ্ভাবক সূত্রধর কবি। এক্ষেত্রে শেলীর গতিময়তা, ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রকৃতির ও অধ্যাত্মের সামগ্রিক চেতনা। সুইনবার্নের বিশুদ্ধ সৌন্দর্যবোধ, ব্রাউনিংয়ের রোমান্টিক অন্তরোচ্ছ্বাসের তীব্র তাৎপর্য এবং পূর্বোল্লিখিত বাংলা কাব্যে সংস্থিত তাঁকেই করতে হয়েছে, বাংলা কবিতাকে সাবালক করে তোলার জন্য। এই প্রাথমিক কাজ করে দ্বিতীয় স্তরে তিনি এলিয়টের অনুরণনকে পর্যন্ত স্পর্শ করেছিলেন।

কেননা, রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিণত বয়সে এ কথা জানতেন যে, ব্যক্তি-চেতনা, সৌন্দর্যচেতনা, বিশ্বচেতনা প্রভাবিত এবং অনন্ত, অধ্যাত্ম ও দেহাতীত আশ্রিত রোমান্টিকতা তাঁর হাতেই, তাঁর পরিচর্চা ও পরিকর্ষণের কালপরিধিতেই একটি পরীক্ষিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। অপরপক্ষে দ্রুত উদ্ভিন্নমান বাংলা সমাজের নতুনতর মূল্যবোধ-আকাঙ্ক্ষার কাছেও এ আর নতুন কোনো উদ্ভাবনার সৃষ্টি করতে পারছে না। রোমান্টিকতা অসহিষ্ণুতায় পর্যবসিত এবং এর প্রবর্তিত মূল্যবোধসমূহ ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত এবং এসব বাংলা কাব্যে কোনো সমস্যা বা আর্তির উপকরণও আর নয়। তাঁর কবিজীবনের প্রথমেই বাংলা কবিতায় চারণের যুগ শেষ হয়েছে—এ কথা তিনি যেমন বুঝেছিলেন, তেমনি তাঁর জীবনকালেই বিশুদ্ধ রোমান্টিকতার যুগ শেষ হয়েছে—এ সত্যকে স্বীকার করে নিতে তাঁর বাধে নি। কেননা রবীন্দ্রনাথের নির্মাণবুদ্ধি ছিল প্রগাঢ় এবং প্রাণশক্তি ছিল প্রবল। সব সময়েই সম্মুখপানে তাঁর গতি। তাই প্রথম পর্যায়ে তাঁর সাধনার প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়া মাত্রই তিনি নিজের অতীতকে অতিক্রম করে দ্বিতীয় পর্যায়ে জীবনের বাস্তবতার তাগিদের সঙ্গে একাত্ম হতে চেয়েছেন। তাঁর এই দুটো বোধ চিরকাল পাশাপাশি ছিল—জীবনের শেষ অধ্যায়ে দ্বিতীয় বোধটি সক্রিয়তর এবং রূপায়ণধর্মী হয়েছে। ফলে এই সময় তাঁর অনেক কবিতার বিষয়বস্তু যেমন হয়ে উঠেছে বাস্তবনির্ভর, এদের ভাষাও হয়ে উঠেছে বাস্তবধর্মী—বাংলা কবিতার পরবর্তী বিবর্তনের সঙ্গে এর যোগও তাই খুব ঘনিষ্ঠ। ফলে রোমান্টিক ভিত্তিস্থাপনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন পাওনার চেয়ে অনেক বেশি আর অন্যপক্ষে নতুন বাংলা কবিতাকেও পাথেয় হিসেবে দিয়েছেন অনেক কিছু। আর এ সব কিছুই সম্ভব হয়েছে সমস্ত যুগটাকে নিজের মধ্যে ধরতে চেয়েছেন বলে, সমস্ত পরিপার্শ্বকে সমন্বিত করতে চেয়েছেন বলে, সমগ্র সপক্ষ এবং বিপরীতকে সম্ভাব্য সূত্রে গ্রাহ্য এবং মিলিত করতে চেয়েছেন বলে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বিরোধের অন্তর্জ্বালা নেই, দ্বন্দ্বের বিপন্নতা নেই,

আনুকূল্যের অভাবজনিত ক্ষান্তি নেই। মৌল বৃত্তিটা অবারিত ছিল বলে অবারিত উৎসরণ তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল, সত্যি হয়েছিল। আর এই সত্য এ কথাই প্রমাণ করে যে, রবীন্দ্রনাথ কত বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন কবি ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিকতাও বিবর্তনকামী বাস্তবতার দাবি মিটানো ছাড়া আর কিছু নয়।

আর এতগুলো ঘটনার, এতবড় পটভূমির অভ্যুদয়ের পর্যায়ক্রমিক বিপ্লবটাই ঘটেছিল আস্তে আস্তে, শান্তির মধ্যে কোনো বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়ে নয়, ধাক্কার প্রতিক্রিয়ায় নয়। শুধুমাত্র আয়োজনের গভীর প্রজ্ঞাজাত উপলব্ধিই তাঁকে এই পথে চালিত করেছে। সেজন্য তিনি কোথাও স্খলিত নন, সর্বত্র সংস্থিত। এই যে সচল আত্মস্থ মোহমুক্ত প্রাণ—এর বুঝি তুলনা হয় না। এই সমগ্র পরিক্রমণের পেছনে সর্বত্রই রয়েছে গভীরতর বেদনা, ব্যাপকতর জীবনবোধ, উন্মুক্ত অন্তর্দৃষ্টি, অন্তরঙ্গ প্রত্যয় এবং সঞ্চালিত বিশ্বাস। সেইজন্যেই তো রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নন,—বড় কবি, মহাকবি, বিশ্বকবি মাত্র নন—তিনি রবীন্দ্রনাথ, এক কাল পার হয়ে অনন্তকালের দিকে যাঁর স্পর্শ প্রসারিত, নিয়তই আরো সম্পূর্ণতার দিকে যাঁর দৃষ্টি।

কবীর চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরেজি অনুবাদ

রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরেজি অনুবাদ–প্রসঙ্গে আমাদের সাধারণত সর্বাগ্রে মনে পড়ে ১৯১২ সালে প্রকাশিত কবির স্বকৃত ‘গীতাঞ্জলি’র কয়েকটি কবিতার অনুবাদের কথা। এবং সেই অনুবাদগুলিই তাঁর কবিতার প্রথম ইংরেজি অনুবাদ বলে আমাদের অনেকের ধারণা, যদিও সে–ধারণা নির্ভুল নয়। ১৯০৯ সালে, ইংল্যান্ডে, রবি দত্তের *Echoes from East and West*–এ সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথের নয়টি কবিতার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। কিন্তু এ অনুবাদ বিশেষ কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি। রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রতি সর্বপ্রথম প্রকৃত দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় পাশ্চাত্য শিল্পী স্যার উইলিয়াম রটেনস্টাইনের, ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারির *Modern Review*–তে প্রকাশিত ‘ক্ষুধিত পাষাণে’র ইংরেজি অনুবাদ Hungry Stones–এর মাধ্যমে। অল্প পরেই আনন্দ কুমারস্বামীর সহযোগিতায় অজিত চক্রবর্তীকৃত রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতার ইংরেজি অনুবাদের পাণ্ডুলিপির প্রতিও রটেনস্টাইনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু তখনো রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরেজি অনুবাদ সম্পর্কে সবাইকে এক রকম অনবহিত বলেই অভিহিত করা চলে।

এরপর ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ অবস্থায় শিলাইদহতে যান এবং সেখানে বসে নিজেই ‘গীতাঞ্জলি’র কয়েকটি কবিতার ইংরেজি অনুবাদে মন দেন। কোনো সুপরিকল্পিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তিনি এ–কাজে হাত দেন নি, বরং কিছুটা খেয়াল চরিতার্থ করা, কিছুটা অবসর–বিনোদনের অঙ্গ হিসেবেই তিনি একে গ্রহণ করেছিলেন। ১৯১২ সালেই, মে মাসে, একান্ন বছর বয়সে, তিনি যখন তৃতীয় বার বিলেত যাত্রা করেন তখন তাঁর অনূদিত কয়েকটি কবিতা তিনি সঙ্গে নিয়ে যান। বিলেত যাত্রার পথে জাহাজে বসে তিনি আরো কয়েকটি কবিতার অনুবাদ করেন। বিলেতে শিল্পী রটেনস্টাইনের বাড়িতে এক ঘরোয়া বৈঠকে কবির সেই ইংরেজি অনুবাদগুলি পড়া হয়। অনেকগুলি অনুবাদ পড়ে শোনান বিখ্যাত কবি উইলিয়াম বাটলার ইয়েট্স্, যিনি পরে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ইংরেজি ‘গীতাঞ্জলি’র একটি সুন্দর ভূমিকা লিখে দেন। ঘরোয়া বৈঠকে পড়া কবির সেসব ইংরেজি অনুবাদগুলি উপস্থিত সবাইকে গভীরভাবে আলোড়িত করে। সে সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন এভ্রিম্যান লাইব্রেরির সম্পাদক অর্নেস্ট রীস, ঔপন্যাসিক মে সিনক্লেয়ার, পরবর্তী কালে যিনি কবির গভীর অনুরাগী বন্ধু হন সেই সি. এফ. অ্যান্ড্রুস, এজরা পাউন্ড, অ্যান্ড্রু ব্র্যাডলী, ইভ্লিন আন্ডারহিল প্রমুখ লেখক। ‘গীতাঞ্জলি’র ইংরেজি

পাণ্ডুলিপি পড়ে ব্র্যাডলী উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠেছিলেন, "It looks as though we have at last a great poet among us again." এজরা পাউন্ড তখন ছিলেন বিখ্যাত মার্কিন পত্রিকা *Poetry*-র বিদেশস্থ সংবাদদাতা। তাঁর উদ্যোগে ১৯১২ সালের ডিসেম্বর সংখ্যায় *Poetry*–তে 'গীতাঞ্জলি'র ছটি কবিতার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এবং তার সামান্য পরেই ইন্ডিয়া সোসাইটি অব লন্ডন কর্তৃক প্রকাশিত ইয়েট্সের ভূমিকা–সংবলিত 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি সংস্করণের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য কবি–সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগীদের সামনে সগৌরবে আত্মপ্রকাশ করলেন। ইয়েট্স কবিকে অভিনন্দিত করলেন "Greater than any of us" বলে। আর্নেস্ট রীস *Nineteenth Century* পত্রিকায় ১৯১৩ সালের এপ্রিল সংখ্যায় লিখলেন, "the songs of Gitanjali even in the English prose-rhythms are irresistibly impressive." ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমেই কবি সারা বিশ্বে পরিচিত হলেন, তাঁর কবিতার সার্বজনীন আবেদন তাঁকে বিশ্বকবির শিরোপাতে ভূষিত করল। বিভিন্ন দেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিকবৃন্দ কবির নিজের করা ইংরেজি অনুবাদগুলি পড়ে মুগ্ধ হলেন, তা নিয়ে আলোচনা করলেন, নিজের ভাষায় সেসব কবিতার অনুবাদে ব্রতী হলেন। ফ্রান্সে আন্দ্রে জীদ 'গীতাঞ্জলি'র ফরাসি অনুবাদকর্মে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। তেমনি অনেকে আরো অনেক দেশে, আরো অনেক ভাষায়।

এবং ১৯১৩ সালের ১৩ই নভেম্বর সুইডিশ অ্যাকাডেমি কবিকে সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার দানের কথা ঘোষণা করলেন।

রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র অনুবাদই সবচাইতে বিখ্যাত, সাধারণের কাছে সুপরিচিত। এবং এ প্রবন্ধে সে সম্পর্কেই আমরা অপেক্ষাকৃত বিস্তৃততর আলোচনা করব। কিন্তু এ কথা বলা দরকার যে, 'গীতাঞ্জলি' ছাড়াও কবির আরো অনেক কবিতার ইংরেজি অনুবাদ হয়েছে, বিভিন্ন ব্যক্তি সেসব ইংরেজি অনুবাদ করেছেন, এবং সে অনুবাদকার্যের কালক্রম হচ্ছে ১৯০৯ সাল থেকে কবির মৃত্যুর পরেও একেবারে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত। রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রকাশিত ইংরেজি অনুবাদ গ্রন্থের একটি তালিকা দেবার চেষ্টা নিচে করা গেল।

১) *Gitanjali (Song Offerings)*, লন্ডন, দি ইন্ডিয়া সোসাইটি, ১৯১২। এতে আছে কবির নিজের অনুবাদ করা 'গীতাঞ্জলি', 'নৈবেদ্য', 'খেয়া', 'গীতিমাল্য' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি নির্বাচিত কবিতার গদ্য–অনুবাদ।

২) *The Gardener*, লন্ডন, ম্যাকমিলন, ১৯১৩। এতে আছে কবির নিজের করা 'ক্ষণিকা', 'কল্পনা', 'সোনার তরী' প্রভৃতি গ্রন্থের কয়েকটি নির্বাচিত কবিতার গদ্য–অনুবাদ।

৩) *The Crescent Moon*, লন্ডন, ম্যাকমিলন, ১৯১৩। এতে আছে কবির নিজের করা প্রধানত 'শিশু'র কয়েকটি কবিতার অনুবাদ।

৪) *Fruit-Gathering*, লন্ডন, ম্যাকমিলন, ১৯১৬। 'গীতিমাল্য', 'গীতালি', 'বলাকা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতার অনুবাদ এতে আছে। ১৯১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নিউইয়র্কের ম্যাকমিলন কোম্পানি *Fruit-Gathering* –কে *Gitanjali*–র সঙ্গে যুক্ত করে *Gitanjali and Fruit Gathering* নামে প্রকাশ করেন। এই সংস্করণে নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির আঁকা ছবি সংযোজিত ছিল।

৫) *Lover's Gift and Crossing*, লন্ডন, ম্যাকমিলন, ১৯১৮। 'বলাকা', 'ক্ষণিকা' ও 'খেয়ার' কয়েকটি কবিতা ও গানের অনুবাদ এতে আছে।

৬) *The Fugitive,* শান্তিনিকেতন, শান্তিনিকেতন প্রেস, ১৯১৯ (?)। বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত কয়েকটি কবিতার অনুবাদ এতে আছে।

৭) *The Fugitive,* লন্ডন, ম্যাকমিলন, ১৯২১। এতে আছে 'মানসী', 'সোনার তরী', 'গীতিমাল্য' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের কিছু কবিতা ও গান এবং 'লিপিকা'র কিছু রচনার ইংরেজি অনুবাদ।

৮) *The Augustan Book of Modern Poetry : Rabindranath Tagore,* লন্ডন, আর্নেস্ট বেন, ১৯২৫। এতে আছে এডওয়ার্ড টমসন অনূদিত কবির একুশটি কবিতা এবং বারটি এপ্রিগ্রাম।

৯) *Fifteen Poems of Rabindranath Tagore,* বোম্বাই, কে. সি. সেন, ১৯২৮। এতে আছে কেবলমাত্র সীমিত অন্তরঙ্গ মহলে বিতরণের জন্য মুদ্রিত ক্ষিতীশচন্দ্র সেন কর্তৃক ছন্দে অনূদিত 'বলাকা'র পনেরটি কবিতা।

১০) *Fireflies,* নিউইয়র্ক, ম্যাকমিলন, ১৯২৮। এতে আছে 'স্ফুলিঙ্গে'র কয়েকটি ছোট্ট কবিতার অনুবাদ।

১১) *Sheaves,* এলাহাবাদ, ইন্ডিয়ান প্রেস, ১৯২৯। এতে আছে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত অনূদিত কবির কয়েকটি নির্বাচিত কবিতা ও গানের অনুবাদ।

১২) *The Golden Boat,* লন্ডন, অ্যালেন অ্যান্ড আন-উইন, ১৯৩২। এতে আছে প্রধানত 'লিপিকা'র কয়েকটি রচনা এবং গৌণত কয়েকটি নির্বাচিত কবিতার অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন ভবানী ভট্টাচার্য।

রবীন্দ্রকাব্যের উপরোক্ত ইংরেজি অনুবাদগ্রন্থগুলি কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়। ১৯৪১ সালে কবির মৃত্যুর পরও তাঁর কবিতার অনেক ইংরেজি অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তার একটি বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল।

১) *Poems,* কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ফেব্রুয়ারি ১৯৪২। কবির কাব্যসাধনার একটি সমগ্র পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হয়েছে এই বইতে। শেষের নয়টি কবিতার অনুবাদ অমিয় চক্রবর্তীকৃত, বাকিগুলি রবীন্দ্রনাথের নিজের করা।

২) *A Flight of Swans,* লন্ডন, জন মারে, ১৯৫৫। অরবিন্দ বসুকৃত 'বলাকা'র কয়েকটি কবিতা এবং 'গীতাঞ্জলি'র 'হে মোর চিত্ত' কবিতাটির অনুবাদ আছে এতে।

৩) *Shyamali,* কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৯৫৫। শীলা চট্টোপাধ্যায় অনূদিত কবির 'শ্যামলী'র অনুবাদ এটি। শুধু 'The Eternal March' কবির নিজের করা।

৪) *The Herald of Spring,* লন্ডন, জন মারে, ১৯৫৭। অরবিন্দ বসুকৃত 'মহুয়া'র অনুবাদ।

৫) *Wings of Death,* লন্ডন, জন মারে, ১৯৬০। এতে আছে অরবিন্দ বসুকৃত 'প্রান্তিক', 'রোগশয্যা', 'আরোগ্য' এবং 'শেষলেখা'র কিছু কবিতার ইংরেজি অনুবাদ।

৬) *Poems of Puravi,* শান্তিনিকেতন, উমা রায়, ১৯৬০। এতে আছে সীমিত অন্তরঙ্গ মহলে বিতরণের জন্য মুদ্রিত ক্ষিতীশ রায় কর্তৃক অনূদিত 'পূরবী'র দুটি এবং 'শেষ লেখা'র একটি কবিতার ইংরেজি অনুবাদ।

এই প্রসঙ্গে ১৯৩১ সালে লন্ডনের জর্জ অ্যালেন অ্যান্ড আন-উইন কর্তৃক প্রকাশিত কবির *The Child* নামক ইংরেজি গদ্য কবিতার উল্লেখ করা উচিত। এইটিই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের

একমাত্র মূল ইংরেজি কবিতা। কবি পরে এরই বাংলা রূপ দেন 'পুনশ্চ'র "শিশুতীর্থ" কবিতাতে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরেজি অনুবাদের একটি মোটামুটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় ওপরে দেওয়া হল। কবির স্বকৃত 'গীতাঞ্জলি'র অনুবাদই বাইরে সর্বাধিক সমাদৃত। ১৯১২ সালে প্রকাশিত ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'র ভূমিকায় ইয়েট্স্ লেখেন :

> I have carried the manuscript of these translations about with me for days, reading it in railway trains, or on the top of omnibuses and restaurants, and I have often had to close it lest some stranger would see how much it moved me.

রবীন্দ্রনাথের এই অনুবাদগুলি ছন্দায়িত গদ্যে। ছন্দযুক্ত গদ্যকবিতায় রবীন্দ্রনাথের দক্ষতা এবং সৃষ্টিশীলতা আমরা অবশ্য কবির অনেক মূল বাংলা কবিতাতেও লক্ষ করি। এর প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৯২২ সালে প্রকাশিত 'লিপিকা'য়, যদিও সেখানে লাইনগুলি কবিতার ভঙ্গিতে না ভেঙে টানা গদ্যের ঢঙে মুদ্রিত। এরপর কবি এ বিষয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, এবং ১৯৩২ সালে প্রকাশিত 'পরিশেষ' ও 'পুনশ্চ'তে প্রত্যক্ষভাবে গদ্য কবিতায় তাঁর সৃষ্টির সার্থক স্বাক্ষর রেখে গেছেন। 'পত্রপুটে' ও শেষ দিককার আরো অনেক বইতে এই পরিচয় অবশ্য আরো স্পষ্টরূপে বিধৃত।

রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র কবিতা ও গানের স্বকৃত ইংরেজি অনুবাদগুলি গদ্যে হলেও তার মধ্যে কবিতার সুর ও রেশ নির্ভুলভাবে অনুভূত। সেদিক থেকে তাঁর অনুবাদ-কবিতার ভাষা সম্পর্কে 'লিরিক্যাল ব্যালাড্সে'র ভূমিকায় উল্লিখিত ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের বিখ্যাত উক্তির স্মারক। অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই আক্ষরিক ভাষান্তরকে বর্জন করে, অতিক্রম করে, নতুন সৃষ্টিকর্মে ব্রতী হয়েছেন। তাঁর ইংরেজি অনুবাদে বাহুল্য বর্জন, স্বল্পকথায় মূলের ভাবপ্রকাশের সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্য, অনায়াস গতিবেগ, গদ্যের মধ্যেও মূলের ছন্দোবদ্ধ কবিতার স্নিগ্ধ প্রাণরসটুকুর নিঃসন্দিগ্ধ প্রকাশ আমাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা কেড়ে নেয়। তাঁর এই অনুবাদগুলির কথা বলতে গিয়ে নন্দগোপাল সেনগুপ্ত এক জায়গায় লিখেছেন : 'কি শব্দবিন্যাসের দিক থেকে, আর কি রসসৃষ্টির দিক থেকে, রচনাগুলিতে কোথাও অনুবাদের আড়ষ্টতা দেখা যায় না। ইংরাজি লেখার ওপর স্বাভাবিক অধিকার কতখানি থাকলে, তবেই এ ব্যাপার সম্ভবপর, তা আশা করি আর বুঝিয়ে বলতে হবে না।'

কিন্তু কবির স্বকৃত অনুবাদগুলির সার্থকতা সম্পর্কে একটি কথা বলা প্রয়োজন। তাদের সার্থকতা ও সৌন্দর্য যেসব কারণে সম্ভব হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম একটি হল এই ক্ষেত্রে অনুবাদকার্যে অনুবাদকের স্বাধীনতা নেবার বিশেষ সুযোগটি। কবির মূল কবিতায় যে বিস্তার, যে বিন্যাস, যে বিশিষ্ট ইঙ্গিতময়তা, যে সুরঝঙ্কার, রবীন্দ্রনাথ তাকে প্রয়োজনবোধে অতি সহজে পরিবর্তিত করে ইংরেজি ভাষার নিজস্ব স্বল্পভাষণের ঐতিহ্যের সীমারেখার মধ্যে প্রকাশ করে তাঁর অনেক অনুবাদকে প্রায় নতুন মৌলিক ইংরেজি কবিতার রূপ দিয়েছেন। প্রচুর দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটিকে বিশদ করা যেত কিন্তু এখানে আমরা মাত্র তিনটি কবিতার উল্লেখ করব।

প্রথমে 'সে যে পাশে এসে বসেছিল তবু জাগি নি' কবিতাটি নেওয়া যাক। আগে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি গদ্য অনুবাদ এবং পরে কবির মূল বাংলা কবিতাটি উদ্ধৃত করছি। ইংরেজি অনুবাদ এই রকম :

> He came and sat by my side but I woke not. What a cursed sleep it was, O miserable me!

He came when the night was still; he had his harp in his hands, and my dreams became resonant with its melodies.

Alas, why are my nights all thus lost ? Ah, why do I ever miss his sight whose breath touches my sleep ?

বাংলা মূল কবিতাটি নিম্নরূপ :

সে যে পাশে এসে বসেছিল
তবু জাগি নি।
কী ঘুম তোরে পেয়েছিল,
হতভাগিনী।
এসেছিল নীরব রাতে
বীণাখানি ছিল হাতে,
স্বপনমাঝে বাজিয়ে গেল
গভীর রাগিণী।
জেগে দেখি, দখিন হাওয়া
পাগল করিয়া
গন্ধ তাহার ভেসে বেড়ায়
আঁধার ভরিয়া।
কেন আমার রজনী যায়—
কাছে ডেকে কাছে না পায়,
কেন গো তার মালার পরশ
বুকে লাগে নি।

অনুবাদ এবং মূল কবিতাটি পরীক্ষা করলেই কয়েকটি সত্য স্পষ্টরূপে ধরা পড়বে। মূল কবিতার যে প্রধান সুর, যে অনুভূতির গভীরতা, যে আবেগ আক্ষেপ এবং ব্যাকুলতা তা ইংরেজি অনুবাদে মোটামুটি সার্থকভাবে উপস্থিত। অবশ্য মূলে সুরের যে দোলা অনুবাদে তা অনুপস্থিত, কিন্তু অনুবাদের ভাষার বাহুল্যবর্জিত নিরাভরণ সহজ সৌন্দর্যের জন্য বক্তব্যের গভীরতা ক্ষুণ্ন হয় নি। তবু মূল কবিতার কিছু কিছু রেশ যে অনুবাদে ধরা পড়ে নি, তাও সত্য। 'কী ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী'র 'হতভাগিনী' কথাটির মধ্যে যে দ্যোতনা, যে নারীরূপের কল্পনা তা অনুবাদের 'O miserable me'-তে পূর্ণ প্রকাশিত নয়, যদিও 'স্বপনমাঝে বাজিয়ে গেল গভীর রাগিণী'র ভাষা ও ভাবমাধুর্য সাফল্যের সঙ্গে ইংরেজি অনুবাদে সঞ্চারিত। 'জেগে দেখি, দখিন হাওয়া পাগল করিয়া / গন্ধ তাহার ভেসে বেড়ায় আঁধার ভরিয়া' অংশটির অনুবাদ কবি করেনই নি। এবং 'কেন আমার রজনী যায় / কাছে ডেকে কাছে না পায় /কেন গো তার মালার পরশ বুকে লাগে নি'র অনুবাদে কবি বেশ খানিকটা স্বাধীনতা নিয়ে আক্ষরিক অনুবাদ বর্জন করে নবসৃষ্টির আনন্দে রচনা করলেন :

Alas, why are my nights all thus lost ? Ah, why do I ever miss his sight whose breath touches my sleep ?

ইংরেজি অনুবাদে শেষ বাক্যটির ভাব-ঐশ্বর্য, রূপকল্প এবং ভাষার সৌন্দর্য লক্ষণীয়, কিন্তু অনুবাদ বলতে যা অনেকে বোঝেন সেই বিচারে একে কি সার্থক অনুবাদ বলা সঙ্গত?

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত দিচ্ছি 'গীতাঞ্জলি'র ৬২ নম্বর কবিতা থেকে।

তোরা শুনিস নি কি, শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি,
ঐ যে আসে, আসে, আসে।

ইংরেজি অনুবাদ (ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'র ৪৫ নম্বর কবিতা) সুন্দর ও সফল, প্রায় আক্ষরিক হওয়া সত্ত্বেও। তবে একটি জায়গায় মূলের ভাব, অনুভূতি এবং ইঙ্গিতময়তা সার্থকভাবে অনুবাদে সঞ্চারিত করার চেষ্টায় অনুবাদক কয়েকটি বিশেষণ যোগ করেছেন। মূল কবিতায় আছে :

কত কালের ফাগুন–দিনে বনের পথে
সে যে আসে, আসে, আসে।
কত শ্রাবণ–অন্ধকারে মেঘের রথে
সে যে আসে, আসে, আসে।

ইংরেজি অনুবাদে আছে :

In the fragrant days of sunny April through the forest path he comes, comes, ever comes.

In the rainy gloom of July night on the thundering chariot of clouds he comes, comes, ever comes.

মূল বাংলা কবিতায় fragrant, sunny এবং thundering শব্দত্রয়ের কোনো বাঙ্ময় উল্লেখ নেই কিন্তু এই সংযোজনের ফলে অনুবাদে মূলের ভাবমণ্ডল নিঃসন্দেহে স্পষ্টতর রূপ পেয়েছে, কারণ 'ফাগুন–দিনে'র মধ্যে আমরা নির্ভুলভাবে রৌদ্রময় গন্ধের স্বাদ পাই, 'শ্রাবণ–অন্ধকারের মেঘের রথে' শুনি গুরুগুরু ধ্বনি। অবশ্য তবু মনে প্রশ্ন জাগে, 'কতকালের' কথাটির মধ্যে যে ব্যঞ্জনা তা কি অনুবাদে পেলাম?

তৃতীয় দৃষ্টান্ত উপস্থিত করছি 'গীতাঞ্জলি'র ৭৮ নম্বর কবিতা

'তুমি যখন গান গাহিতে বল'
গর্ব আমার ভরে ওঠে বুকে'

থেকে। ইংরেজি অনুবাদ (ইংরেজি গীতাঞ্জলির ২ নম্বর) এক্ষেত্রেও সুন্দর এবং মূলের প্রায় প্রতিটি চরণ–অনুসরণে আক্ষরিক। মূল এবং অনুবাদ নিম্নরূপ।

মূল :

তুমি যখন গান গাহিতে বল
গর্ব আমার ভরে ওঠে বুকে,
দুই আঁখি মোর করে ছল ছল
নিমেষহারা চেয়ে তোমার মুখে।
কঠিন কটু যা আছে মোর প্রাণে
গলিতে চায় অমৃতময় গানে,
সব সাধনা আরাধনা মম
উড়িতে চায় পাখীর মত সুখে।
তৃপ্ত তুমি আমার গীতরাগে,
ভালো লাগে তোমার ভালো লাগে—
জানি আমি এই গানেরই বলে
বসি গিয়ে তোমারি সম্মুখে।

মন দিয়ে যার নাগাল নাহি পাই,
গান দিয়ে সেই চরণ ছুঁয়ে যাই,
সুরের ঘোরে আপনাকে যাই ভুলে,
বন্ধু বলে ডাকি মোর প্রভুকে।

ইংরেজি অনুবাদ :

When thou commandest me to sing, it seems that my heart would break with pride; and I look to thy face, and tears come to my eyes.

All that is harsh and dissonant in my life melts into one sweet harmony and my adoration spreads wings like a glad bird on its flight across the sea.

I know thou takest pleasure in my singing. I know that only as a singer I come before thy presence.

I touch by the edge of the far spreading wing of my song thy feet which I could never aspire to reach.

Drunk with the joy of singing I forget myself and call thee friend who art my lord.

লক্ষণীয় যে, অনুবাদ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ দুটি জায়গায় খানিকটা স্বাধীনতা নিয়েছেন। মূলে যেখানে আছে 'সব সাধনা আরাধনা মম / উড়িতে চায় পাখীর মত সুখে' সেখানে অনুবাদে পাই '—and my adoration spreads wings like a glad bird on its flight across the sea' এবং মূলে যেখানে আছে 'মন দিয়ে যার নাগাল নাহি পাই / গান দিয়ে সেই চরণ ছুঁয়ে যাই', সেখানে অনুবাদে পাই 'I touch by the edge of the far spreading wing of my song the feet which I never could aspire to reach'। সাগরের বুকের ওপর দিয়ে ধেয়ে-চলা আনন্দিত-চিত্ত বিহঙ্গ এবং সুদূরপ্রসারী গানের পাখায় যে চিত্রকল্প, শব্দঝঙ্কার এবং রসানুভূতির স্বাদ আমরা ইংরেজি অনুবাদে পাই তা কি অনুবাদকের প্রায় নতুন সৃষ্টি নয়?

রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরেজি অনুবাদে অনেক সময় মূলের শুধু তথ্য, তত্ত্ব বা শব্দগত অর্থটুকু পরিবেশন করতে গিয়ে মূল বাংলা কবিতাকে বহুল পরিমাণে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই সংক্ষিপ্তকরণের জন্য মূল কবিতার বেদনাদায়ক অঙ্গহানি ও রসক্ষুণ্ণতা ঘটেছে। এর দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে কবির বিখ্যাত দুটি কবিতা 'যেতে নাহি দিব' এবং 'বলাকা'র অনুবাদের কথা। 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদ এই রকম :

At the sleepy village the moon was still like a sunny midnight when my holidays came to their end.

My little girl of four had followed me all the morning from room to room, watching my preparations in grave silence, till, wearied, she sat by the door-post strangely quiet murmuring to herself, "Father must not go!"

This was the meal-hour, when sleep daily overcame her, but her mother had forgotten her and the child was too unhappy to complain.

At last, when I stretched out my arms to her to say farewell, she never moved, but sadly looking at me said, "Father, you must not go !"

And it amused me to tears to think how this little child dared to fight the giant world of necessity with no other resource than those few words, "Father you must not go !"

আর 'বলাকার' ইংরেজি অনুবাদ করা হয়েছে নিম্নরূপ :

When like a flaming scimitar the hill stream has been sheathed in gloom by the evening, suddenly a flock of birds passes overhead, their loud-laughing wings hurling their flight like an arrow among stars.

It startles a passion for speed in the heart of all motionless things; the hills seem to feel in their bosom the anguish of storm-clouds, and trees long to break their rooted shackles.

For me the flight of these birds has rent a veil of stillness, and reveals an immense flutter in this deep silence.

I see these hills and forests fly across time to the un-known, and darkess thrill into fire as the stars wing by.

I feel in my own being the rush of the sea-crossing bird, cleaving a way beyond the limits of life and death, while the migrant world cries with a myriad voice, "Not here, but somewhere else, in the bosom of the Far-away."

পাঠক মূল 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটি স্মরণ করলেই কিংবা আবার পড়লেই দেখতে পাবেন যে ইংরেজি কবিতাটি বাংলা পূর্ণ কবিতাটির অনুবাদ নয়, বহুল পরিমাণে সংক্ষেপিত একটি নতুন কবিতা মাত্র, যাতে মূলের দার্শনিক তত্ত্বকথার গভীরতা বা বিস্তার নেই, পারিবারিক দাম্পত্য জীবনের স্নিগ্ধ সরসতা ও ভালবাসার ইঙ্গিত নেই, উজ্জ্বল উপমাসমৃদ্ধ প্রকৃতির নানা দৃশ্যের সার্থক বর্ণনার সমারোহ নেই।

আর 'বলাকা'র ক্ষেত্রে অনুবাদে মূলের ছন্দঝঙ্কারের অনুপস্থিতিজনিত যে অঙ্গহানি তার পূরণ অন্য কোনো উপায়ে সম্ভব নয়। এ ছাড়াও ইংরেজি অনুবাদে মূলের যেসব চরণের আবেগ, ইঙ্গিতময়তা ও ব্যঞ্জনা প্রায় কিছুই ধরা পড়ে নি, তাদের মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করছি :

মনে হল সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে,
বলিতে না পারে স্পষ্ট করি—
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি।।
হে হংসবলাকা,
ঝঞ্ঝা-মদরসে মত্ত তোমাদের পাখা
রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে
বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।
ওই পক্ষধ্বনি,
শব্দময়ী অপ্সর-রমণী,
গেল চলি স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি।
উঠিল শিহরি
গিরিশ্রেণী তিমির-মগন
শিহরিল দেওদার-বন॥

এ সন্ধ্যার স্বপ্ন টুটে বেদনার ঢেউ উঠে জাগি
সুদূরের লাগি,
হে পাখা বিবাগী।
বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে—
"হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোন্‌খানে !"

এসব ক্ষেত্রে অনুবাদক বোধহয় ইচ্ছে করেই মূল কবিতাকে সংক্ষেপিত করে তার্ অনুবাদ করা শ্রেয় মনে করেছেন। অন্য কোনো অনুবাদক হয়তো মূলের পূর্ণ আকারকে তাঁদের অনুবাদে উপস্থিত করতে প্রয়াসী হতে পারেন, কিন্তু তবু প্রশ্ন ওঠে, নিজস্ব সংস্কৃতিপুষ্ট বাংলা ভাষা ও শব্দের ঐতিহ্যের মধ্যেই যে-ব্যঞ্জনা তাকে অনুবাদক কী করে ইংরেজিতে রূপদান করবেন ? 'বলাকা' কবিতার 'শব্দময়ী অপ্সর-রমণী / গেল চলি স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি' চরণটির সার্থক ইংরেজি অনুবাদ কি সহজসাধ্য ?

রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরেজি অনুবাদের যে অসম্পূর্ণতা বা আংশিক অসাফল্যের উল্লেখ ওপরে করলাম তার কথা স্মরণ করেই বোধহয় নন্দগোপাল সেনগুপ্ত তাঁর 'রবীন্দ্রচর্চার ভূমিকা' বইয়ের এক জায়গায় লিখেছেন : 'কবির ইংরেজি রচনার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য স্বীকার্য হলেও, তাঁর স্বকৃত অনুবাদের বিরুদ্ধে একটা নালিশ আছে। তিনি প্রায় সর্বত্রই মূলের ভাবাংশ ইংরেজিতে নতুন করে লিখেছেন, কোনো ক্ষেত্রেই মূলের আক্ষরিক অনুবাদ করেন নি। বেশীর ভাগ স্থলেই মূলের অনেকাংশ ছেঁটে ফেলেছেন, নয়ত ইংরেজি ভাষার সহজ প্রবণতার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্যে মূল-বহির্ভূত কিছু কিছু কথা ইতস্তত সংযোজিত করেছেন। তার ফলে ইংরেজি রচনা হিসেবে উৎকর্ষ হয়ত বেড়েছে, কিন্তু অনুবাদ হিসেবে অধিকাংশ লেখারই সার্থকতা গেছে কমে।"

এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথা বলা দরকার। রবীন্দ্রকাব্যের যা অনুবাদ হয়েছে তা যথেষ্ট নয়। তাঁর কাব্যের যে ব্যাপকতা, যে বৈচিত্র্য, সেখানে যে আঙ্গিকগত নৈপুণ্য ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্বাক্ষর বিদ্যমান, সে পরিচয় তাঁর কবিতার ইংরেজি অনুবাদে এখনো সার্থকতার সঙ্গে বিধৃত নয়। শুধু 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি অনুবাদের ওপর পশ্চিমের দৃষ্টি বেশি মাত্রায় পড়ায় রবীন্দ্র-কাব্যের অধ্যাত্মসাধনার দিকটিই প্রধানত তাঁদের চোখে পড়েছে, কিন্তু তাঁর কাব্যের যে অসামান্য বৈচিত্র্য, যে আঙ্গিকগত রচনাশৈলী, বাকবিন্যাসের চাতুর্য ও অলঙ্করণ তার পরিচয় তারা পায় নি। এর প্রতি ইঙ্গিত করেই জনৈক সমালোচক লিখেছেন,

> The existing translations are rather mixed 'anthologies' than faithful presentations of Tagore's original works. New translations should be attempted, more exacting and thorough, not diluted and simplified, with textual notes or explanatory prefaces. These translations should give the foreign reader whole works of Rabindranath in the order of their artistic creation : a new and complete *Manasi,* an entire *Chitra* and *Sonar Tari,* the full collection of *Katha o Kahini* an integral *Balaka;* the rich poetry of *Purabi* and the entirely new art of *Punascha.*
>
> (Pierre Fallon, "Tagore in the West", *Rabindranath Tagore : A Centenary Volume.)*

তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক উপর্যুক্ত সমালোচক শুধু যে রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরেজি অনুবাদের অপূর্ণতার দিক সম্পর্কেই সচেতন তা নয়। 'গীতাঞ্জলি'র অনুবাদ–প্রসঙ্গে যে সপ্রশংস উক্তি তিনি ওই একই প্রবন্ধে করেছেন তাও তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিমিতিবোধের পরিচায়ক। একটু উদ্ধৃতি দেই :

> *Gitanjali,* recreated into English by the poet himself, has been the most successful of all the Tagore translations, The Western *Gitanjali* loses much of the musical beauty and evocative power of the original poems; yet, it is a jewel, even a jewel of English religious poetry. (প্রথম বাক্যের recreated শব্দটি লক্ষণীয়।)

বর্তমান প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের স্বকৃত অনুবাদ এবং অন্যান্য অনুবাদকদের অনুবাদ, আর ছন্দে অনুবাদ এবং গদ্যে অনুবাদের একটি তুলনামূলক আলোচনা করা প্রবন্ধকারের অপরিহার্য কর্তব্য ছিল, কিন্তু দুঃখের সঙ্গে সে ব্যাপারে অক্ষমতা ও অপারগতা স্বীকার করা ব্যতীত কোনো গত্যন্তর নেই, মূলত এই কারণে যে, চেষ্টা করেও সেসব অনুবাদ বর্তমানে সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। ভবিষ্যতে এ প্রবন্ধটি পুনরায় বর্ধিত ও পূর্ণতর আকারে লিখবার সংকল্প থাকল। তখন নিশ্চয়ই এ ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করা হবে।*

---

* এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত বহু তথ্যের জন্য প্রবন্ধকার ১৯৬১ সালে সাহিত্য আকাদেমী, নয়া দিল্লি কর্তৃক প্রকাশিত *Rabindranath Tagore : A Centenary Volume 1861-1961* এবং ১৯৬১ সালে -শ্রীপরাণচন্দ্র মণ্ডল, ১৪ রমানাথ স্ট্রিট, কলিকাতা–৯ কর্তৃক প্রকাশিত নন্দগোপাল সেনগুপ্ত রচিত 'রবীন্দ্র–চর্চার ভূমিকা' বইয়ের রবীন্দ্রসাহিত্য বিভাগের 'ইংরেজি রচনা' শীর্ষক প্রবন্ধটির নিকট ঋণী। অবশ্য এই প্রবন্ধে উপস্থাপিত সমস্ত মন্তব্য, মতামত এবং সিদ্ধান্তের সকল দায়িত্ব একমাত্র প্রবন্ধকারের।

সারওয়ার মুরশিদ

ইয়েট্‌স ও রবীন্দ্রনাথ

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্র-জীবনকথা'য় দুঃখ করে লিখেছেন, 'আশ্চর্য লাগে ভাবতে ইয়েট্‌সের শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর মানসিক আকর্ষণ প্রায় লোপ পেয়েছিল।'[১] এর কারণ সম্পর্কে প্রভাতকুমার আমাদের কোনো আলো দেন নি, এ-বইতেও নয়, তাঁর বৃহত্তম 'রবীন্দ্রজীবনী'তেও নয়।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি ইয়েট্‌সের মানসিক আকর্ষণ কেন লোপ পেয়েছিল তা বুঝতে হলে দুই কবির বন্ধুত্বের পশ্চাৎপটের দিকে ফিরে তাকাতে হবে। তাঁদের কবিপ্রকৃতি ও কাব্যিক পরিণতির কথা মনে রাখলে এবং সংশ্লিষ্ট সব তথ্য উপস্থিত করলে আশ্চর্য হবার কোনো কারণ থাকবে না।

এ প্রবন্ধে দেখা যাবে যে এক বিশেষ অর্থে, প্রাচ্য জীবনের প্রতীক হিসেবে, ইয়েট্‌সের কাছে রবীন্দ্রনাথের মূল্য শেষ পর্যন্ত অম্লান ছিল, যদিচ রবীন্দ্রনাথের ও প্রাচ্যের চিন্তার কোনো কোনো দিকের প্রতি তাঁর কিছুমাত্র আকর্ষণ ছিল না। আরো একটি বিষয়ে আমি রবীন্দ্রানুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করব : সেটি হল, যখন ইয়েট্‌স রবীন্দ্রনাথের চিন্তা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করছেন তাঁর কাছাকাছি সময় তাঁর একটি কবিতায় প্রায় রাবীন্দ্রিক অনুভূতি ও চিন্তার আকস্মিক ও বিস্ময়কর উপস্থিতি।

এক

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইয়েট্‌সের পরিচয় হয় প্রথম মহাযুদ্ধের দু' বছর আগে। এ সময়টা ইউরোপীয় সংস্কৃতির এক সঙ্কটকাল। ইউরোপের মানবতন্ত্রী এবং বিজ্ঞানতন্ত্রী সভ্যতা তখন বিস্ফোরণের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল। এ জটিল সভ্যতার নিচের তলায় ছিল কুটিল ক্ষয়, আর উপরতলায় ছিল কুৎসিত স্বার্থপরতা এবং শূন্যতা। এমন সময় এক অপেক্ষাকৃত সরল অথচ গভীর সংস্কৃতির মর্মস্পর্শী বাণী নিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথ। সংশয়দীর্ণ ও হৃত-প্রত্যয় ইউরোপীয় চিত্ত তাঁর আনন্দিত উপলব্ধি ও গভীর বিশ্বাসে মুগ্ধ হল।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইয়েট্‌সের পরিচয়ের ভূমিকাটি দীর্ঘ করে দেওয়ার প্রয়োজন আছে। আয়ারল্যান্ডের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ইতিহাস ইংল্যান্ডের থেকে স্বতন্ত্র এবং কোনো কোনো দিক দিয়ে ইউরোপে অনন্য। তা হলেও উনিশ শতকের শেষ দিকে ও বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে দু'দেশের লেখক আর ভাবুকদের অনেকে একই আধ্যাত্মিক সমস্যায়

পীড়িত ছিলেন। যুক্তিবাদ, বস্তুবাদ, প্রত্যক্ষবাদ ও যান্ত্রিক বিজ্ঞান আত্মাকে অস্বীকার করে, সহজ উপলব্ধিকে সংশয়াক্রান্ত করে এবং কল্পনাকে খর্ব করে অধ্যাত্মজীবনে এক নিদারুণ শূন্যতার সৃষ্টি করেছিল। ইসায়ী ধর্ম তখন যুক্তিবাদী প্রোটেস্টান্ট মানসিকতার কল্পনাহীন ও অসুন্দর আচার–অভ্যাসের বাহন মাত্র এবং ডারউইনীয় বিবর্তনতত্ত্বও বাইবেলের ঐতিহাসিক সমালোচনার মুখে বিপন্ন। এ ধর্ম অনেক ক্ষেত্রেই এ শূন্যতাকে পূরণ করতে সক্ষম হয় নি। জীবন ও জগতের সার্বিক ব্যাখ্যা হিসেবে, একই সঙ্গে বুদ্ধি, কল্পনা ও আত্মার আশ্রয় হিসেবে, এ ধর্ম অকেজো হয়ে পড়েছিল—ইয়েট্‌সের ভাষায়, 'এক বাক্স খেলনায় পরিণত হয়েছিল'।[২]

এ আধ্যাত্মিক পরিস্থিতিতে ইয়েট্‌স ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হন মোহিনী চট্টোপাধ্যায়ের দৌত্যে। খ্রিস্টের মতো প্রিয়দর্শন এই ব্রাহ্মণ যুবক গীতা ও শঙ্করাচার্যের বেদান্তের ব্যাখ্যা করে শতাব্দী–শেষের তরুণ ডাবলিন সমাজের কাছে জ্ঞান, উপলব্ধি ও কল্পনার এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিলেন। এ–কথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে পরবর্তীকালে যে স্বীকৃতি ও মুগ্ধতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইয়েট্‌সের পরিচয় হয়েছিল, তার ক্ষেত্র অনেকখানি তৈরি করেছিলেন এই দার্শনিক ব্রাহ্মণ। পরিণত বয়সে ইয়েট্‌স বলেছেন, 'এলকিবায়াডিস সক্রেটিসের কাছ থেকে পালিয়ে বেঁচেছিলেন পাছে সব ছেড়ে দিয়ে জীবনভর শুধু তাঁর কথাই শুনতে হয়। আর আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি, আমরা তরুণেরা, যারা কর্মে ও চিন্তায় অজানাকে খুঁজেছি, তারা ভেবেছি, শুধু এ মানুষটির কথা শোনা আর পরিশেষে তাঁর মতো ভাবতে পারা জীবনের সার্থকতম কাজ।'[৩] বস্তুত গ্রহণে, প্রতিক্রিয়ায়, বর্জনে ভারতীয় ধ্রুপদী দর্শনের এই ব্যাখ্যাকার কবি ইয়েট্‌সকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। মোহিনী চট্টোপাধ্যায়ের বাণী তাঁর স্মৃতিতে, গদ্যে ও কাব্যে সারা জীবন থেকে থেকে অনুরণন তুলেছে।

মোহিনী চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে ইয়েট্‌স কী পেয়েছিলেন? তাঁর কাছ থেকে ইয়েট্‌স পেয়েছিলেন এমন এক দর্শন যা 'যুক্তিসহ' এবং একই সঙ্গে 'নিঃসীম'।[৪] এ দর্শনের প্রধান প্রত্যয়, সব কিছুর উৎসমূল আত্মা। এ প্রত্যয় ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে দুর্বল হয়ে পড়েছিল, আর এ নিশ্চয়তার ওপরই তিনি জীবনের ভিত্তি স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। ইয়েট্‌সের বন্ধু জর্জ রাসেল বলেছেন,

> ভাগবৎ গীতা এবং উপনিষদের প্রজ্ঞায় এমন দৈব পরিপূর্ণতা দেখতে পাই যাতে আমার মনে হয়, এর রচয়িতারা যেন অবিক্ষুব্ধ স্মৃতি নিয়ে কামনাতুর সহস্র জীবনের দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখেছেন, দেখেছেন কায়াহীনের সাথে ছায়ার লোভে মানুষের জ্বারাক্রান্ত দ্বন্দ্ব। নইলে আত্মা যা নিশ্চয় জানে, তা এমন বিশ্বাসের সঙ্গে কী করে তাঁরা বলে যেতে পারলেন?[৫]

ইয়েট্‌স ও রাসেল দুজনেই এ নিঃসংশয় প্রত্যয়ের ওপর সাহিত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। ইয়েট্‌স বলেছেন,

> দার্শনিক কান্টের ধারণায় যে তিনটি জিনিস না হলে বাঁচা চলে না আমিও সে তিনটি জিনিসের উপর সাহিত্যের ভিত্তিকে দাঁড় করাতে চাই। এরা হল : মুক্তি, ঈশ্বর, অবিনশ্বরতা। বেকন, নিউটন এবং লকের প্রভাবে এ তিনটি জিনিসই ফিকে হয়ে গেছে। সুতরাং সাহিত্যও হয়ে গেছে ক্ষয়িষ্ণু। আইরিশ সাহিত্য তখনই আমাকে আনন্দ দিয়েছে যখন আমি এতে দেখতে পেয়েছি শুধু এ তিনের কোনো একটির স্বীকৃতি এবং আর সব কিছুর প্রতি উপেক্ষা। এ সাহিত্য তখনই আমাকে আনন্দ দিয়েছে যখন এতে দেখতে পেয়েছি এমন আবেগ বা বেহিসেবি চরিত্র, যা জরাহীন, মৃত্যুহীন বলে ভাবতে সক্ষম মানব–চিত্তের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ।[৬]

এসব যদিও ইয়েট্সের শেষ জীবনের উক্তি, তিনি এ-কথার সাক্ষ্য রেখে গেছেন যে নতুন আইরিশ সাহিত্যের পেছনে যে দর্শন তাতে মোহিনী চট্টোপাধ্যায়ের অবদান অনেকখানি।[৭]

মোহিনী চট্টোপাধ্যায়ের বেদান্ত দর্শনের মধ্যে ইয়েট্স আর একটি বড় সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছিলেন। ইয়েট্স আজীবন মানবসত্তার ঐক্যের সমস্যা নিয়ে ভেবেছিলেন। এর দুটো দিক, একটি ব্যক্তির ঐক্য, অপরটি সমাজের ঐক্য। কবি হিসেবে নিজের জন্যে, এবং তাঁর জাতির জন্যে, তিনি একটি দর্শনের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন। তিনি এমন একটা কিছু চেয়েছিলেন যা আধুনিক বিজ্ঞানের বিশ্লেষণী প্রক্রিয়ায় শতভাগে ভেঙে যাওয়া ব্যক্তিমনকে আবার এক করবে, যা সব শ্রেণীকে এক বৃত্তে স্থান দেবে এবং জাতির সমস্ত বিচ্ছিন্ন কার্যকলাপকে, অর্থনীতি, জাতীয়তা ও ধর্মকে এক আন্তরছন্দে মিলিত করবে। ইয়েট্স আধুনিক মানুষ হিসেবে এমন ধর্ম চেয়েছিলেন যা ব্যক্তির সম্পূর্ণ সত্তাকে পরিতৃপ্ত করবে, ভেতরের জগতের সঙ্গে সঙ্গে বাইরের জগৎকেও একটি আত্মিক সংহতি দান করবে। এই ঐক্যের সূত্র তিনি দেখেছিলেন মোহিনী চট্টোপাধ্যায়ের অসীম বিস্তৃত দর্শনের গভীর চিন্ময়তায়।

কিন্তু ইয়েট্স্ কবি, তিনি শুধু দর্শন খোঁজেন নি, তিনি দেখতে চেয়েছেন কাব্য এবং জীবনে তার রূপ। 'আমাদের সত্তার যে একটি কালাতীত স্থানাতীত দিক আছে তা হয়তো আমাদের যুক্তির কাছে আধুনিক দর্শনের কোনো কেতাব স্বচ্ছন্দে প্রমাণ করতে পারবে, তবু তো দেখতে পাই আমাদের কল্পনা নিসর্গের দাস হয়ে আছে।'[৮] তাই প্রয়োজন স্পন্দিত 'অভিজ্ঞতার'।[৯]

রবীন্দ্রনাথ কোনো কোনো দিক দিয়ে ইয়েট্সের এ দাবি মিটিয়ে ছিলেন। মোহিনী চট্টোপাধ্যায় যে দর্শন থেকে ইয়েট্সকে পাঠ দিয়েছিলেন সে দর্শন-লালিত সংস্কৃতির পরমাশ্চর্য প্রকাশ তিনি দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। 'গীতাঞ্জলি'র কবিতায় বেদ-উপনিষদের মর্মোত্থিত প্রত্যয় ও আশ্বাস বাংলাদেশের রোদভরা নিবিড় নীল আকাশের নিচে নতুন করে ধ্বনিত হয়েছিল। এ প্রত্যয়ের অতলতা ও প্রশান্তি ইয়েট্সকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথের আবেদন ছিল প্রধানত একটি স্থিতধী এবং সুসম্পৃক্ত সংস্কৃতির আবেদন। যেখানে কিষাণ ও অভিজাত জীবনে তখনো যোগ ছিল এবং দেহ ও আত্মাকে মানুষ আলাদা করে দেখে নি।

ইয়েট্স 'গীতাঞ্জলি'র ভূমিকায় লিখেছেন :

> ভারতীয় সভ্যতার মতো রবীন্দ্রনাথও আত্মাকে আবিষ্কার করে এবং তার মুক্তির কাছে নিজেকে সমর্পণ করেই খুশি।[৯]
>
> সারা জীবন আমি যে-জগতের স্বপ্ন দেখেছি এ কবিতাগুলোর চিন্তায় দেখতে পাই সেই জগৎ। এগুলো এক পরম সংস্কৃতির কীর্তি, তবু মনে হয় এগুলো যেন কাশ-দূর্বার সাধারণ মাটি থেকে বেরিয়ে এসেছে। কাব্য ও ধর্ম যাতে মিলে এক হয়ে গেছে এমন একটি ঐতিহ্য, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত থেকে ভাব ও উপমা গ্রহণ করেছে, এবং বিদ্বজ্জনের ও আমীরের চিন্তাকে আবার পৌঁছে দিয়েছে জনতার কাছে। যদি বাংলার সভ্যতা ভেঙে না যায়, যে মন সবার মধ্যে অন্তঃশীলা তা যদি আমাদের মনের মতো ভেঙ্গে খান খান হয়ে না যায় তা হলে কয়েক যুগের মধ্যে এদের সূক্ষ্ম সৌকর্যের কিছু না কিছু পথস্থিত ভিক্ষুকদের কাছে গিয়ে পৌঁছবে।[১০]

কিন্তু ইউরোপীয় হিসেবে ইয়েট্স সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের মধ্যে

দেহ ও আত্মার অনায়াস মিলন দেখে।

> ... Entering my heart unbidden even as one of the common crowd, unknown to me, my king, thou didst press the signet of eternity upon many a fleeting moment of my life.[১১]

ইয়েট্‌স 'গীতাঞ্জলি'র এ লাইন কটির ওপর মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেছেন :

> এ পবিত্রতার অনুভূতি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের ধর্মচর্চার অনুভূতি নয়, কিংবা কশার সাহায্যে আত্মনিগ্রহজনিত অনুভূতি নয়। এ যেন ধুলো আর সূর্যালোকের ছবি আঁকেন, এমন কোনো শিল্পীর অনুভূতি—শুধু তীব্রতর হয়ে উঠেছে এই যা। এ কণ্ঠ শুনতে হলে আমরা যাই, যাঁরা আমাদের হিংসাপূর্ণ ইতিহাসে নেহাতই বিদেশীর মতো, সেই সেন্ট ফ্রান্সিস আর ব্লেকের কাছে।[১২]

মোহিনী চট্টোপাধ্যায় তরুণ ইয়েট্‌সকে বলেছিলেন : 'শিশুদের শেখাও এ দেহ তাদের নয়'; আবার, 'এ দেহ-ই ব্রাহ্মণ'।[১৩] পরে ইয়েট্‌স 'গীতাঞ্জলি'তে পড়লেন :

> Life of my life, I shall ever try to keep my body pure, knowing that thy living touch is upon all my limbs.[১৪]

যা ছিল তত্ত্ব, কবির অভিজ্ঞানে তা উপলব্ধ সত্যের প্রত্যক্ষতা লাভ করল। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় দর্শনের মর্মকথা ইয়েট্‌সের কাছে মোহিনী চট্টোপাধ্যায়ের চেয়ে অনেক বেশি প্রাণস্পর্শী করে উপস্থিত করেছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আধুনিককালে খণ্ডিত সমাজ, খণ্ডিত কালচেতনা, এবং খণ্ডিত জ্ঞানের জন্য ইয়েট্‌স যতখানি ক্লিষ্ট বোধ করেছেন, রবীন্দ্রনাথের জীবনের এবং তাঁর সংস্কৃতির স্বতঃস্ফূর্ত ঐক্য দেখে তাঁর প্রতি ঠিক ততখানি আকৃষ্ট বোধ করেছেন। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ ইয়েট্‌সের মতো নিজ দেশের সংস্কৃতি ও চিন্তার ক্ষেত্রে এক জন নায়ক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আভিজাত্যও ইয়েট্‌সের ভালো লাগার কথা। আরো একটি কারণ সম্ভবত দুই কবির সখ্যের সহায়ক হয়েছিল। ভারতের আধ্যাত্মিক গৌরব এবং তার রাজনৈতিক পরাধীনতার মধ্যকার ব্যবধানটি আয়ারল্যান্ডের জীবনেও ছিল। ইয়েট্‌স ভারতবর্ষ ও আয়ারল্যান্ডের মধ্যে কি আধ্যাত্মিক মিল দেখেছিলেন তা প্রসঙ্গান্তরে আলোচিত হবে।

দুই

১৯৩২ সালে শ্রীপুরোহিত স্বামী নামে এক ভারতীয় সন্ন্যাসীর আত্মজীবনীর ভূমিকায় ইয়েট্‌স লিখেছেন : "আমি রবীন্দ্রনাথের সুন্দর কাব্যগ্রন্থ 'গীতাঞ্জলি'র জন্যে একটি ভূমিকা লিখেছিলাম, আর আজ বিশ বছর পর এমন একটি গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যা সমান গুরুত্বের বলে পরিগণিত হতে পারে।"[১৫] ইয়েট্‌সের এ ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয় নি। ইংল্যান্ডেও বইটি প্রায় অজ্ঞাত। তা হলে ইয়েট্‌স এ বই সম্পর্কে এমন বিস্ময়কর মন্তব্য করেছিলেন কী করে? পুরোহিত স্বামী পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তিনি ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার গুপ্ত ও রহস্যময় দিকের, শ্রদ্ধাহীনেরা বলবেন আষাঢ়ে দিকের, প্রতিভূও ছিলেন। স্বামীজির আত্মজীবনীটি অনেক অলৌকিক ঘটনায় পূর্ণ, এ বইয়ের সঙ্গে 'গীতাঞ্জলি'র তুলনায় রবীন্দ্রনাথের কাব্যখানির যে মূল্যায়ন প্রকাশ পেয়েছে তা সম্ভব হয়েছে ইয়েট্‌সের মনের কৌতূহলোদ্দীপক ইন্দ্রজাল ও অলৌকিক -প্রীতির জন্যে। এ কথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না যে আলোর চেয়ে অন্ধকারময় রহস্যের প্রতি ইয়েট্‌সের কম অনুরাগ ছিল না। অবশ্য এ-কথা স্বীকার্য যে অশরীরী যোনির অস্তিত্ব বিষয়ে ইয়েট্‌সের মনোভাবটি খুব সরল নয়।

ইয়েট্‌স পুরোহিত স্বামীর গ্রন্থের ভূমিকায় আরো লিখেছেন, কী করে আইরিশ প্রোটেস্টান্ট দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে লেডি গ্রেগরি এবং তিনি অলৌকিকে বিশ্বাসী আয়ারল্যান্ডের অজ্ঞ জনসাধারণের দেখা জিনপরীর কাহিনী সংগ্রহে ব্যাপৃত হয়েছিলেন। এই অনুসন্ধানের ফলে তাঁরা এসে উপনীত হয়েছিলেন 'এক ঝাপসা অন্ধকারের মধ্যে, এমন এক গর্ভাশয়ের মধ্যে যা থেকে সব কিছুর উৎপত্তি', এমন এক অবস্থার মধ্যে 'যেখানে উল্লাস ও যন্ত্রণা এবং কুকুর আর ঘোড়ার দেখা অপচ্ছায়া' যেন একই জায়গাতে স্থান পেয়েছে।[১৬] কিন্তু সবসময় কবির মনে হয়েছে কী যেন একটা পাওয়া যাচ্ছে না। আর সে জিনিসটি নিয়ে এলেন পুরোহিত স্বামী। তাঁর 'ব্যাখ্যাকারী বুদ্ধি' এ অন্ধকারে বার্তাবাহী খণ্ড খণ্ড তথ্যগুলোকে এক প্রাচীন দর্শনের সূত্রে গ্রথিত করে ইয়েট্‌সের মনকে তৃপ্ত করল।[১৭] আর এ অন্ধকারের সেতু দিয়ে আয়ারল্যান্ড ও ভারতবর্ষ ইয়েট্‌সের চিন্তা ও কল্পনায় মিলিত হল। পুরোহিত স্বামীর সহযোগিতায় ইয়েট্‌স শুধু যে উপনিষদের তরজমা করেছিলেন তা নয়, পাতঞ্জলি–নির্দেশিত যোগ–প্রক্রিয়া এবং তান্ত্রিক রহস্য বিষয়েও অনেক জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

তিন

ইয়েট্‌স ধীরে ধীরে ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করেছিলেন এবং তিনি এ আবিষ্কার সম্পূর্ণ করেছিলেন পুরোহিত স্বামীর সংস্পর্শে এসে। এ দীর্ঘ পরিচয়ের ইতিহাসে ইয়েট্‌স–রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব একটি ক্ষুদ্র ঘটনা মাত্র, এবং শেষ জীবনে যখন তিনি উপনিষদের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন তখন রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রতি তাঁর অনুরাগ অনেকখানি হ্রাস পায়। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে শুধু এ কারণেই রবীন্দ্রনাথের প্রতি ইয়েট্‌সের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছিল। এখানে ১৯৩৫ সনে রদেনস্টাইনের কাছে লিখিত ইয়েট্‌সের একখানি চিঠি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

> জাহান্নামে যাক রবীন্দ্রনাথ। স্টার্জ মুর আর আমি মিলে তাঁর তিনখানি সুন্দর বই বের করেছিলাম; তারপর তিনি বড় কবি হওয়ার চেয়ে ইংরেজী ভাষা জানাকে অনেক বড় জ্ঞান করলেন, আর ছাপলেন ভাবুকতার ভাপে–ভরা জঞ্জাল; এবং এ করে নিজের খ্যাতিকে নষ্ট করলেন। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজী জানেন না, কোনো ভারতীয় ইংরেজী জানে না। যে ভাষা শৈশবে শেখা হয় নি, এবং তখন থেকে চিন্তার বাহন হিসেবে ব্যবহৃত হয় নি, সে ভাষায় গীতময়তা বা বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে কেউ কিছু লিখতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে আমি আবার ফিরে আসব, তবে এখন নয়—ফিরে আসব এ কারণে যে সম্প্রতি তিনি ইংরেজীতে কয়েকটি অতি সুন্দর গদ্য রচনা প্রকাশ করেছেন যা তাঁর কবিখ্যাতি অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ায় উপেক্ষিত হয়েছে।[১৮]

আর ১৯১২ সালে ইয়েট্‌স রবীন্দ্রনাথের স্বকৃত অনুবাদের জন্যে তাঁকে ইংরেজি ভাষার কবি হিসেবে তাঁদের 'সংসদে' নির্বাচন করার জন্য ব্রিটিশ বন্ধুদের কাছে ওকালতি করেছিলেন।[১৯]

কিন্তু ইয়েট্‌সের কবিপ্রকৃতি এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বিরোধ এবং প্রতীচ্যের কবির প্রাচ্যের কবির প্রতি অসন্তোষের কারণ সম্পর্কে বিশেষ আলো পাওয়া যায় জোসেফ হোন লিখিত ইয়েট্‌স–জীবনী থেকে। ১৯৩৭ সালে একজন ভারতীয় অধ্যাপক ও ট্রিনিটি কলেজের ডক্টর ট্রেঞ্চ এবং ইয়েট্‌সের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এবং ভারতবর্ষ বিষয়ে একটি তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা হয়। এ আলোচনায় নাটকীয়তা ছিল :

> ইয়েট্‌স উত্তেজিত ছিলেন। তিনি এ বলে কথা শুরু করলেন, 'আমার বন্ধু রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরকে নিয়ে বড্ড বেশী লেখেন। তাঁর এ সব রচনার অস্পষ্টতায় আমার রাগ ধরে। আরেক রকম

মরমিত্ব কাব্যের ক্ষতি করে। তা হল পিটার বেল এবং প্রিমরোজ ঘটিত মরমিত্ব।' ডক্টর ট্রেঞ্চ বললেন, 'কিন্তু শিলার উপরের প্রিমরোজগুচ্ছ নিয়ে ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতাটি সম্পর্কে আপনি কী বলবেন? ফুল বৃন্তে, বৃন্ত পাথরে, পাথর বসুধায় সংলগ্ন, বসুধা তার মণ্ডলে নিষ্ঠ, এবং ঋতুর সব পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সব কিছুর উপর বিধাতা।' ইয়েট্‌স এ প্রচ্ছন্ন তিরস্কার অগ্রাহ্য করে বললেন, 'আমি সারাজীবন উপনিষদের দর্শন থেকে প্রাণরস গ্রহণ করেছি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মরমিত্বের একটি দিক আছে যা আমি অপছন্দ করি। ভারতীয় কাব্যে আমি ট্রাজেডি দেখতে পাই না। আর ভারতীয়দের লেখা উচিত উর্দু কিংবা বাংলায়।' অধ্যাপক বসু জবাব দিলেন, 'আমাদের সমস্যা দ্বন্দ্বে প্রবেশ করা নয়, দ্বন্দ্ব থেকে বেরিয়ে আসা।' ইয়েট্‌স আরো বললেন, 'অক্সফোর্ডে ভারতীয়দের আলাপ করার সময় মাত্র একজনকে দেখেছি যিনি ইংরেজীতে নিজেকে প্রকাশ করার চেষ্টাকে ঘৃণা করতেন। তার কারণ সে ব্যক্তি ছিলেন নেপালী, তাই কখনও স্বাধীনতা হারান নি বা জোয়ালে মাথা লাগান নি। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজী ছেড়ে দিন।' অধ্যাপক বসু বললেন, 'প্রশ্নটি জটিল। হিন্দু-মুসলমানের ভিন্ন ঐতিহ্যের সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়া করতে হচ্ছে। আপনি ভারতবর্ষের জন্যে একটি বাণী দিতে পারেন?' 'এ পক্ষের এক লক্ষ লোক অপর পক্ষের এক লক্ষ লোকের সম্মুখীন হোক। বিরোধের উপর জোর দিন, ভারতের প্রতি এই আমার বাণী।' এরপর ইয়েট্‌স দ্রুতবেগে ঘরের একদিকে গেলেন এবং সাতোর[২০] তরবারিটি নাটকীয় ভঙ্গিতে কোষমুক্ত করে চিৎকার করে বললেন, 'চাই দ্বন্দ্ব, আরও দ্বন্দ্ব'।[২১]

উপরের উদ্ধৃতি থেকে ইয়েট্‌সের কাব্যিক রুচি ও মেজাজ আন্দাজ করা যায়। এ থেকে এও স্পষ্ট যে তাঁর জীবনচেতনা এবং রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক জীবনচেতনার মধ্যে ব্যবধান কত দুস্তর। সম্ভবত ইয়েট্‌স রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরানুভূতিতে অস্পষ্টতা ছাড়াও তাগিদহীনতা, অভ্যাস ও ভাবালুতা দেখতে পেয়েছেন। এখানে লক্ষ করার মতো যে ইয়েট্‌স উপনিষদের একজন অনুরক্ত পাঠক, এ কথা তিনি জোরের সাথে ঘোষণা করেছেন। তিনি বোঝাতে চাইছেন যে উপনিষদে এমন গুণ আছে যা তিনি রবীন্দ্রনাথে দেখতে পান না। উপনিষদের অনেক গুণের মধ্যে এ গুণটি যে কী তার কিঞ্চিৎ ধারণা হয় ইয়েট্‌সের এক আলোচনায় ঈশ উপনিষদ থেকে উদ্ধৃত ক'টি লাইন থেকে। ১৯৩৬ সালে আধুনিক ইংরেজি কাব্য বিষয়ে এক বেতার-বক্তৃতায় ইডিথ সিটওয়েলের "Ass Face" কবিতাটির আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

গভীর দর্শনের সৃষ্টি ভয় থেকে। পায়ের তলায় অতলস্পর্শ গহ্বর উন্মোচিত হয়, আর উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সমস্ত পূর্বধারণা... এর অতলে বিলীন হয়। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক সেই প্রাচীন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতেই হবে : সত্য কোথাও আছে কি? ঈশ্বর আছেন কি? আত্মা আছে কি? আমরা ভারতের পবিত্র গ্রন্থের মত উচ্চকণ্ঠে বলে উঠি : 'ওরা সোনার ছিপি দিয়ে বোতলের মুখ বন্ধ করেছে; ওটা খুলে ফেল। সত্যকে মুক্ত কর'।[২২]

রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মবোধে এ তীব্রতা, তাঁর দার্শনিক কবিতায় হৃদয়রক্ত মথিত করা এ জাতীয় কোনো জিজ্ঞাসা ইয়েট্‌স দেখতে পান নি। জীবন্ত ঐতিহ্যের অনুপস্থিতি শিল্পীর পক্ষে কত বড় বিড়ম্বনাকর দুর্ভাগ্য, ইয়েট্‌স তা জানতেন। তিনি এও জানতেন, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বিশ্বাসও আবার অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাৎপর্য হারাতে পারে। তাই তিনি যেন বলতে চাইছেন, সত্যকে পেতে হবে প্রতি মানুষকে নিজ শোণিতে আদিম পৃথিবীর শূন্যতা ও ত্রাসের অনুভূতিতে।

উপরের দ্বিতীয় উদ্ধৃতির লক্ষ্য রবীন্দ্রনাথ নন, তবু প্রথমটির সঙ্গে এটি পড়লে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ইয়েটসের মনোভাব আলোকিত হয়। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যসূত্রে পাওয়া

আনন্দময় অধ্যাত্ম-নিশ্চয়তা, যার জন্য ইয়েট্‌স একদা তাঁকে ঈর্ষা করতেন, হৃত-ঐতিহ্য ইউরোপীয় কবির কাছে পরবর্তীকালে একটু বেশি আয়াসহীন ও প্রশ্নবর্জিত, এবং সে কারণে মূল্যহীন, মনে হয়েছে। কিন্তু ইয়েট্‌স জানতেন না যে ঐতিহ্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক আপাতচোখে যতটা সরল মনে হয় আসলে ততটা সরল ছিল না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : তাঁর ধর্ম তাঁর জীবনের মূলে, সে জীবন যতক্ষণ চলমান ততক্ষণ তাঁর ধর্মকে ডাক-টিকিট পরিয়ে জাদুঘরের কৌতূহলী দর্শকদের চোখের সম্মুখে ধরে রাখা যাবে না।[২৩] শেষ পর্বে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মবোধে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। ব্যক্তিক এবং নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাসের নানা ক্রূর অভিঘাতে তাঁর বিক্ষুব্ধ মন 'সেই সব' প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছে যার জন্ম ত্রাসে এবং শূন্যতাবোধে, যার উত্তর মহা নীরবতা।[২৪] এই সব নিরুত্তর প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথের চিন্তাকে ঐতিহ্য-সীমার বাইরে নিয়ে গেছে। একই সঙ্গে তিনি ঐতিহ্যিক কাঠামো থেকে ভাব বা রূপকল্প নিয়ে তাঁর চিন্তাকে শৃঙ্খলা ও দৃঢ়তা দিয়েছেন। উদাসীন বিশ্বে মানুষের নিঃসঙ্গ দুঃখ, প্রাণলোকের প্রতিকারহীন যন্ত্রণা, ইতিহাসের নির্মম অন্যায় ও পুঞ্জিত অশুভ তাঁর ঐতিহ্যলব্ধ মঙ্গলময় বিধাতার বিশ্বাসকে বিচলিত করেছিল। পরিণামে তিনি এমন এক বিধাতার ধারণায় উপস্থিত হয়েছিলেন যিনি মঙ্গলময় নন, মানবোত্তীর্ণও নন, বরঞ্চ মানুষের সম্পূর্ণ অধিগম্য, ইতিহাসের শুভাশুভে নিরন্তর প্রকাশমান, এক মানুষ-ভগবান—যাঁকে সম্ভবত মানুষের ভাগ্যের জন্য দায়ী করা চলে এবং মানুষের পূর্ণতায় যাঁর পূর্ণতা। আবার চরাচরব্যাপী সৃষ্টি ও ধ্বংস, মানবসমাজের মহৎ কীর্তি ও বিরাট ক্ষয়, জীবন-মৃত্যু, সুখ-দুঃখের 'চক্রনৃত্যে' অভিভূত কবি যখন এ নৃত্যের স্থিরবিন্দুতে দাঁড়াতে চেয়েছেন, ধ্যানীর নির্বিকার দৃষ্টি ও শিল্পীর রসদৃষ্টি কামনা করেছেন, 'সন্ন্যাসী' মহাকাল কিংবা 'নটরাজে'র রূপকল্প তাঁর ভাবজগৎকে আশ্চর্য নিরাপত্তা দান করেছে। কিন্তু শেষ পর্যায়ের বাইরে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ কাব্যসাধনা এবং তার বিস্তৃত ক্ষেত্রে ইয়েট্‌সের সমালোচনার সমর্থন মেলে।

ভারতীয় কাব্যে তথা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে 'ট্রাজেডি' নেই বলে ইয়েট্‌স অভিযোগ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের স্বভাবে গভীর দ্বন্দ্ব ছিল কি না, থাকলে তা কতখানি প্রকাশ পেয়েছে[২৫] এ বিতর্কে না গিয়েও বোধহয় বলা চলে, বেদান্তদর্শনের প্রবণতা অনুযায়ী তাঁর মন দ্বন্দ্ব ও দ্বৈতকে ততটা স্বীকার করে নি যতটা করেছে ঐক্যকে। তাই তাঁর কাব্যে কোনো মৌল, কোনো আত্যন্তিক বিরোধ প্রকাশ পায় নি, তিনি ইডিথ সিটওয়েলের মতো রাসভ-চর্মাবৃত বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের রাসভ চিৎকারে (!) কেইন ও এবেলের কলহ শুনতে পান নি,[২৬] কিংবা ইয়েট্‌সের মতো মানুষের স্বভাবের ভেতরকার ক্ষয়হীন weasel's tooth[২৭] দেখতে চান নি। 'পত্রপুটে'র 'পৃথিবী' কবিতায় তিনি 'বিপরীত', মানুষের জীবনের 'দুঃসহ দ্বন্দ্ব' এবং 'শুভ-অশুভে'র কথা বলেছেন। এগুলো তাঁর কল্পনায় অতি সামান্য স্থান অধিকার করেছিল। এমনকি তিনি যখন পৃথিবীর ইতিহাসের সেই 'আদিম বর্বরের' কথা বলেন যা 'স্বভাবের কালো গর্ত থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসে এঁকে বেঁকে', তখনো মনে হয় না যে এ কুটিল সরীসৃপ মৃত্যুহীন কিংবা তাকে দেবতারা বিবর্তনের আর কয়েক ধাপ পরে নিঃশেষে সংহার করতে সক্ষম হবে না। অন্তত রবীন্দ্রনাথের গোটা কাব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এ-কথা বলার উপায় নেই যে এ 'নাগদানবে'র হাতে শুভের অন্তিম পরাজয় তিনি মেনে নিয়েছিলেন, তাঁর কল্পনা অশুভের ওপর বেশিক্ষণ নিবদ্ধ থাকতে পারে নি। 'শিশুতীর্থে' তাঁর অশুভ কল্পনার ক্রূর বাস্তবতা যে প্রত্যয় সৃষ্টি করে তাঁর শুভ সম্ভাবনার চিত্র মোটেই তা করে না তবু কবিতাটির শেষ শুভে। 'পশুই শাশ্বত' এ কথা পাঠক ভুলতে না পারলেও কবিতার শেষে কবি ভুলে যান। সাধারণভাবে এ সত্য যে দ্বন্দ্ব দেখে রবীন্দ্রনাথ পীড়িত হন, অশুভ দেখে

তিনি মানুষের জন্যে উৎকণ্ঠিত হন, সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকুল প্রার্থনায় তাঁর দ্বন্দ্ব ও অশুভবোধ তলিয়ে যায়।

চার

ইয়েট্‌সও গভীরভাবে ঐক্য কামনা করেছেন, কিন্তু সে এক সুদূর সম্ভাবনা মাত্র। তাঁর কাব্যে বৃত্ত যে একীভূত সত্যের প্রতীক, তা এ দৃশ্যমান অব্যবস্থাপিত বিশ্বে লভ্য নয়, শুধু খুব বিরল মুহূর্তে মানুষের অভিজ্ঞতায় তা ধরা পড়ে। তাই তিনি কল্পনা করেছেন বৃত্তের ভেতর দুটি পরস্পর অনুবিদ্ধ বিপরীতমুখী গতি যার একটি অপরটির সাথে বিরামহীন দ্বন্দ্বে লিপ্ত। এ দ্বন্দ্ব নিয়মে বাঁধা, এক পক্ষের শক্তি যখন বাড়ে অন্য পক্ষের শক্তি তখন হ্রাস পায়, পর্যায়ক্রমে এ চলতে থাকে। হয়তো কোনো অনন্তে এ দ্বন্দ্বের অবসান হবে। কিন্তু পার্থিব সীমায় চেতনার অর্থ দ্বন্দ্ব[২৮] আর দ্বন্দ্ব মানুষের স্বভাবে, আত্মিক জীবনে এবং সভ্যতার ইতিহাসে। 'আমরা বাঁচতে শুরু করি, যখন থেকে জীবনকে ট্রাজেডি বলে ভাবি।'[২৯] তাঁর 'There' কবিতায় আমরা পড়ি :

> There all the serpent-tails are bit.[৩০]

কিন্তু ভুজঙ্গিনী প্রকৃতি মুখ দিয়ে ল্যাজ স্পর্শ করে যে বৃত্ত সৃষ্টি করে তা জীবনায়ত্ত নয়, অভীপ্সিত মাত্র; যা আপাতত বাস্তব এবং যা তিনি সাগ্রহে এবং সানন্দে গ্রহণ করেছেন তা হল :

> The frog spawn of a blind man's ditch
> A blind man battering blind men. [৩১]

কী হিংস্র আর আবেগময় বিরোধের চিত্রকল্পে কবির অন্ধ জীবনক্ষুধা প্রকাশ পেয়েছে। ইয়েট্‌স দ্বন্দ্বকে চিন্তার, অভিজ্ঞতার, ব্যক্তির এবং বিশ্বের সব সম্পর্কের মূলনীতি বলে গ্রহণ করেছিলেন; অভিজ্ঞতার রূপায়ণেও তিনি দ্বন্দ্বের কাঠামোকে বারবার ব্যবহার করেছেন। এমনকি দ্বন্দ্বের সূত্র ধরে তাঁর কাব্যে পরিণতি এসেছিল। প্রথম থেকেই ইয়েট্‌স দু' রকমের মূল্যবোধের মধ্যে বিরোধ দেখেছিলেন : একদিকে অক্ষয় সৌন্দর্য, প্রেম, সত্তার মুক্তি ও স্বতঃস্ফূর্ততা, অন্যদিকে ক্ষয়, নেতি, বিচ্ছেদ, বিশ্লেষণ। কিন্তু রেখার অস্পষ্টতায়, ভাষার অবসন্নতায় এবং ঘুম ঘুম ছন্দের ওঠাপড়ায় তাঁর পলায়নী কাব্য মরজগৎকে কার্যত অস্বীকার করেছিল। যখন থেকে কাব্যিক স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে ইয়েট্‌সের রচনায় বস্তুজগৎ অপর জগতের মুখোমুখি হল, অর্থাৎ যখন থেকে এ দুই জগতের সম্পর্ক দ্বন্দ্বময় হয়ে উঠল, তখন থেকে তাঁর কবিতা পেল রৌদ্র–উদ্ভাসিত পৃথিবীর তীক্ষ্ণতা এবং জ্যা–আঁটা ধনুকের দৃঢ়তা। আত্মপ্রকাশকামী কবি–নায়ক নিজ সত্তা ও বস্তুর সংঘাতবেগ থেকে পেলেন বস্তুকে অতিক্রম করার শক্তি। বৃত্তের যে ভগ্নাংশে মানুষের অস্তিত্ব তার কোনো অনুভূতি বা অবস্থার কথাই ইয়েট্‌স ভাবতে পারেন নি সংশ্লিষ্ট বিপরীতকে সামনে দাঁড় না করিয়ে। ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটিও যে এক ধরনের বৈরিতার সম্পর্ক তা আমরা যথাস্থানে দেখতে পাব। অবশ্য একটু ভেবে দেখলে বোঝা যাবে যে বিপরীতের মধ্য দিয়ে ইয়েট্‌স নিরন্তর পরিপূরককে খুঁজেছেন, সুতরাং সব বিরোধকে জ্ঞানের ও জীবনের অঙ্গীভূত করে ঐক্যকে আয়ত্ত করতে চেয়েছেন। দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে ঐক্য আসবে এ আশা তিনি এক সময় করতেন। তাঁর ক'টি পঙ্‌ক্তি প্রসঙ্গচ্যুত করে এখানে বলা চলে :

> For nothing can be sole or whole
> That has not been rent.[৩২]

ইয়েট্সীয় দ্বন্দ্ব জীবনে একই সঙ্গে সৃষ্টিশীল ও বিধ্বংসী, শিল্পে সম্পূর্ণ সৃষ্টিশীল; তা এত মূল্যবান বলেই তিনি ট্রাজিক অনুভূতির পরিমাপে জীবনে মূল্য নিরূপণ করেছেন, কিন্তু এ দ্বন্দ্বের অনবসানতা অসম্পূর্ণতাবোধকে অনতিক্রম্য করে তাঁর জীবনচেতনাকে গভীরতর অর্থে বিয়োগান্ত করে তুলেছিল।

ইয়েট্সের সঙ্গে তুলনায় রবীন্দ্রনাথের ঐক্যবোধ যে অনায়াসলব্ধ এবং সে কারণে তাঁর দ্বন্দ্ববোধ যে তীক্ষ্ণ হতে পারে নি, তা বোধহয় অনস্বীকার্য। ইয়েট্স একবার বলেছিলেন : 'প্রাচ্যের কাছে সব কিছুর সমাধান আছে, তাই সে ট্রাজেডি কাকে বলে জানে না?'[৩৩]

অধ্যাপক বসুর কাছে ইয়েট্স ভারতবর্ষকে যে বাণী দিয়েছিলেন তাতে আরো প্রমাণ হয় যে তিনি হিংসায় বিশ্বাসী ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর মনোভাবকে নাটুকে এবং একটু 'কাব্যিক' বলে ধরে নেওয়ার লোভ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু তাঁর হিংসার একটা দার্শনিক, অন্তত ভেষজতাত্ত্বিক ভিত্তি ছিল। তাঁর জীবনের সর্বশেষ কবিতায় তিনি লিখেছেন :

You that Mitchel's prayer have heard,
Send war in our time, O Lord !
Know that when all words are said
And a man is fighting mad,
Something drops from eyes long blind
He completes his partial mind.[৩৪]

সুতরাং পূর্ণতার জন্যে দ্বন্দ্ব এবং হিংসার প্রয়োজন আছে। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের কাছে এ দর্শন গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হত না।

ডাবলিন ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে রক্ষিত হোনের কাগজপত্রাদি থেকে জানা যায় রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর বিষয়ক কবিতার অস্পষ্টতা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে ইয়েট্স আরো একটু মন্তব্য করেছিলেন। তিনি ভারতীয় কবির সঙ্গে নিজের তুলনা করে বলেছিলেন যে তাঁর কবিতায় সব সময় তাঁর লক্ষ্য ছিল স্পষ্ট চিন্তা ও যুক্তিসহ নিখুঁত প্রকাশ। ইয়েট্স নিজের সম্পর্কে যে দাবি করেছেন তা অস্বীকার করা সম্ভব নয়, তবে এ-কথা সত্য যে রবীন্দ্রনাথ ও ইয়েট্সের ঈশ্বরবোধ এক ধরনের ছিল না। একজন পরম সুন্দরের লীলাকে অন্তর্লোকে ও বহির্লোকে প্রতিক্ষণে প্রত্যক্ষ করেছেন, নানারূপে নানা বর্ণচ্ছটায় তাঁর প্রকাশ দেখতে পেয়েছেন, আনন্দে প্রেমে শঙ্কায় তাঁকে আপন অস্তিত্বে উপলব্ধি করেছেন। আর একজন কাব্যের ধ্বনি ও মিলের খাতিরে ঈশ্বরের মহিমাকে প্রয়োজনমতো কমিয়েছেন বাড়িয়েছেন, কখনো জ্যামিতিক-নন্দনতাত্ত্বিক কারণে তাঁর বিশ্বকল্পনাকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্যে সৃষ্টিকর্তাকে 'ত্রয়োদশ সূচী ঘন ক্ষেত্র'[৩৫] বলে অভিহিত করেছেন, কখনো বা তাঁকে প্রতিপক্ষ হিসেবে গ্রহণ করে, বিরোধের মধ্য দিয়ে, একটু নিকটতর সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। কিন্তু ঘোর অহংবাদী ইয়েট্স রবীন্দ্রনাথের মতো ঈশ্বরের সঙ্গে কোনো মন্ময় সম্পর্ক স্থাপন করেন নি। এ কারণে তাঁর কবিতায় ঈশ্বর মন্ময় অনুভূতির অস্পষ্টতা থেকে মুক্ত, তাঁর উল্লেখ অতি সতর্ক, সুবিবেচিত এবং রবীন্দ্রকাব্যের তুলনায় বিরল। ইয়েট্স দু-একবার মরমী অভিজ্ঞতার দাবিও করেছেন।[৩৬] অন্তত একবার তাঁর 'আত্মা'-সচেতন অহঙ্কারকে বিসর্জন দিয়ে স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণও করেছেন, কিন্তু এসব ব্যতিক্রম মাত্র। তবে এসব ক্ষেত্রেও তার প্রকাশ সুমিত, ব্যঞ্জনাময় অথচ স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের কাছে ঈশ্বর সূর্যকর কিংবা বাতাসের মতো, তাঁকে তিনি এড়াতে পারেন নি, তাঁর দীর্ঘ জীবনের কাব্য-রচনায় তাই

ঈশ্বর নানা বেশে উপস্থিত; এমনকি, তাঁর অন্তিম পর্যায়ের দ্বন্দ্ব ও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রেও ঈশ্বর। ইয়েট্‌স রবীন্দ্রকাব্যের অতি পরিমিত অংশের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। সুতরাং তাঁর সমালোচনার যেটুকু যথার্থ তা হল এই যে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরানুভূতির সব প্রকাশে 'আবেগের চাপ', 'বিশ্বাসের উত্তাপ', 'ব্যঞ্জনার প্রাখর্য' সমানভাবে উপস্থিত ছিল না, এবং এ কারণে তা কাব্যিক বিচারে সমান সার্থক হয় নি। 'বলাকা'র কবি উচ্চাঙ্গের দার্শনিক মননে সক্ষম এ-কথা হয়তো ইয়েট্‌স জানতেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের আশ্চর্য পরিণতি, তাঁর মননের দৃঢ়তা, আবেগের সংযম, ভাষার নির্মম মিতাচার এবং ব্যঞ্জনার তীক্ষ্নতা ও জটিলতা, এসব তিনি কী করে জানবেন? প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে নিরাভরণতা, অর্থগাঢ়তা ও সংহত শক্তির দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্য ইয়েট্‌সের পরিণত রচনার সঙ্গে তুলনীয়।

পাঁচ

১৯৩৪ সালে, অর্থাৎ অধ্যাপক বসুর সঙ্গে কথোপকথনের তিন বছর আগে, ইয়েট্‌স 'Ribh Considers Christian Love Insufficient' কবিতাটি লেখেন। কবিতাটির ভাবের কাঠামো অনন্য এবং এর শেষ স্তবকের চিন্তা ও অনুভবের ভঙ্গি বিস্ময়করভাবে রবীন্দ্রনাথের কাছাকাছি, এবং তাঁকে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেয়।

কবিতাটির নামের মধ্যে খ্রিস্টীয় প্রেমের মূল্যায়ন স্পষ্ট। ইয়েট্‌স এর কারণ দিয়েছেন অন্য আরেকটি কবিতায় : মানুষ শুধু বংশবৃদ্ধি করে চলেছে আর ঈশ্বর মাত্র তিন, তার কারণ মানুষ ঈশ্বরের মতো ভালবাসতে পারে না। মানুষের প্রেম উত্তাপ ও তীব্রতা হারায় উত্তাপহীন দেহ কিংবা মনের স্পর্শে, তাই বিশ্বময় পুনরাবৃত্তির এ ঘটা, প্রকৃতিতে সংখ্যার এ বাড়াবাড়ি। আলোচ্য কবিতায় ইয়েট্‌স খ্রিস্টীয় প্রেম ছাড়া আধুনিক গণকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের মন ও দেহহীন নৈর্ব্যক্তিক প্রেমেরও সমালোচনা করেছেন। সবার উপরে 'ঘৃণা'কে ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভের উপায় বলে তিনি গ্রহণ করেছেন। ইতির জন্যেই নেতি, এ নেতির প্রকাশ নায়কের অতি সবল অতি সচেতন আমিত্বে উগ্র; কিন্তু সব মানবিক সম্পর্ক, কর্ম, ভয় ও ছলনাকে বর্জন করে, সব 'দৈহিক ও মানসিক আসবাব' পরিত্যাগ করে, নেতির গভীর থেকে গভীরে পৌঁছে 'আমি' আবিষ্কার করল ইতিকে, আর অমনি উদ্বেল আত্মসমর্পণে নত হল ভগবানের কাছে। কবিতাটির সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি প্রয়োজন :

Why should I seek for love or study it?
It is of God and passes human wit.
I study hatred with great diligence,
For that's a passion in my own control,
A sort of besom that can clear the soul
Of everything that is not mind or sense.

Why do I hate man, woman or event?
That is a light my jealous soul has sent.
From terror and deception freed it can
Discover impurities, can show at last
How soul may walk when all such things are past,
How soul could walk before such things began.

Then my delivered soul herself shall learn
A darker knowledge and in hatred turn
From every thought of God mankind has had.
Thought is a garment and the soul's a bride
That cannot in that trash and tinsel hide !
Hatred of God may bring the soul to God.

At stroke of midnight soul cannot endure
A bodily or mental furniture.
What can she take until her Master give !
Where can she look until He make the show !
What can she know until He bid her know !
How can she live till in her blood He live ![৩৭]

তৃতীয় স্তবকের ঈশ্বরবিদ্বেষের ভঙ্গিমাটি লক্ষণীয়। আরো লক্ষণীয় ইয়েট্‌সের আকস্মিক আত্মসমর্পণ। এ কবি নিজেকে সৃষ্টিকর্তার সমান না হলেও তাঁর প্রায় কাছাকাছি বলে মনে করতেন; তিনি শঙ্করাচার্যের মতো আপসহীন ঐক্যবাদী ছিলেন, সুতরাং আত্মা ও পরমাত্মা, বিষয় ও বিষয়ী, প্রার্থনাকারী ও প্রার্থনা–শ্রবণকারীর মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখতে চান নি। শুধু এ কবিতাটি এর ব্যতিক্রম। এখানে তিনি স্রষ্টার কাছে বিনম্র প্রার্থী।

বলা বাহুল্য, শেষের পঙ্‌ক্তি ক'টির সুর এবং 'গীতাঞ্জলি'র সুর এক এবং এ আত্মসমর্পণের ভাব 'গীতাঞ্জলি'র পাতায় পাতায় ছড়ানো। এখানে ইয়েট্‌সের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শব্দগত মিল থাকা নিষ্প্রয়োজন। ইয়েট্‌স ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক তাগিদ ও প্রেরণায় এ কবিতা লিখেছিলেন, যদিও এ তাঁর ভাবজীবনের এক বিশেষ আবহাওয়ায় রচিত। এ আবহাওয়া তৈরি করতে সাহায্য করেছিল বার্ধক্যের প্রশ্নসঙ্কুল মন, পুরোহিত স্বামীর দর্শন এবং তাঁর সাহচর্য। আরো প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে স্মরণযোগ্য যে, পুরোহিত স্বামী এবং রবীন্দ্রনাথ দু'জনেই প্রার্থী ও প্রভুর দ্বৈত স্বীকার করতেন। তাই ইয়েট্‌সের মন যখন প্রার্থনা এবং নিবেদনে আকুল ও আর্দ্র হল তিনি প্রায় 'গীতাঞ্জলি'র কবির ভাষায় কথা কয়ে উঠলেন।[৩৮]

ছয়

অবশ্য এই দুই কবির প্রকৃতি এত ভিন্ন যে তাঁদের সাদৃশ্য তাঁদের বৈসাদৃশ্যের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। রবীন্দ্রনাথ ইয়েট্‌স থেকে কিছু গ্রহণ করেন নি, এবং ইয়েট্‌সও দু–একটি ব্যতিক্রম ছাড়া রবীন্দ্রনাথ থেকে এমন কিছু লাভ করেন নি, যাকে বলা যেতে পারে মৌল।[৩৯] রবীন্দ্রনাথের রচনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর ইয়েট্‌স রদেনস্টাইনকে লিখেছিলেন যে তিনি তাঁর থেকে নিজ শিল্পে অনুপ্রেরণা পান।[৪০] তার অর্থ এ নয় যে তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় তাঁর মতো কবিতা লিখতে উদ্যোগ করেছিলেন। কোনো বড় কবি তা করেন না, ইয়েট্‌সের মতো স্বনিষ্ঠ মহৎ কবির বেলায় তো তা একেবারেই অচিন্তনীয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয়ের সময়ে ইয়েট্‌স আপন নির্দিষ্ট পরিণতির পথে দৃঢ়পদে অগ্রসরমান। তখন তাঁর বিশ্রুত 'cold and passionate' রীতি সূচিত হয়ে গেছে, যাতে 'রক্ত, কল্পনা এবং বুদ্ধি' একসঙ্গে প্রবহমান। রবীন্দ্রনাথ ইয়েট্‌সের কয়েকটি সাংস্কৃতিক অভীপ্সা এবং আধ্যাত্মিক

প্রত্যয়কে স্পষ্ট এবং শক্তিশালী করেছিলেন মাত্র।

আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে ভারতীয়দের সাথে আইরিশ কবির পরিচয় সার্থক হয়েছিল এভাবে। পরিণামে ইয়েট্স জীবনের মধ্যে সত্যকে অনুভব করে বস্তুর অন্তরে আত্মাকে দেখেছিলেন, এবং এ কারণে একদিকে বস্তুর আধিপত্য দৃপ্তকণ্ঠে অস্বীকার করেছেন, আর অন্যদিকে তাঁর অতিবস্তুবিহারী কল্পনাকে বস্তুর মর্মোদ্ঘাটনে নিয়োগ করেছেন, তাঁর কাব্যের মূল জীবনে ও ঘটনায় দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন। বস্তু ও আত্মায় কোনো ছেদ নেই, প্রতীক ও প্রতীকাতীত শেষ পর্যন্ত এক—Natural and supernatural with the self-same ring are wed[৪১]—এ-কথা যখন ইয়েট্স বুঝতে পারলেন, বস্তুর প্রতি তাঁর অনুরক্তি বাড়ল, সেইসঙ্গে তাঁর কবিতা হয়ে উঠল অসাধারণ স্পষ্ট এবং উজ্জ্বল। অবশ্য এ জন্যে ইয়েট্সের কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা উৎসবিশেষের কাছে ঋণ স্বীকারের প্রশ্নই ওঠে না, কেননা এ বোধ তাঁর সারা জীবনের অভিজ্ঞতা উপলব্ধি পড়াশোনা, এক কথায় তাঁর জটিল কাব্যজীবনের পরিণতির ফল।

উত্তরজীবনে ইয়েট্সের কাছে প্রাচী ও প্রতীচী মানুষের মনের কতকগুলো স্থায়ীগুণ বা প্রবণতার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। প্রাচীর আকর্ষণীয় দিক তার সরল স্বাভাবিক ঐতিহ্যবিন্যস্ত অনুষ্ঠানপ্রধান জীবন আর তার মন্দের দিক সুমিত আকার ও দৈহিক অস্তিত্বের প্রতি অবহেলা, নিরবয়বতা ও অস্পষ্টতার প্রতি ঝোঁক, সত্তার নিগ্রহ ও সহজ আত্মসমর্পণপ্রবৃত্তি। প্রতীচীর বৈশিষ্ট্য তার দেহী জীবন, বস্তুর প্রতি আনুগত্য, আক্রমণেচ্ছু মনোভঙ্গি, তার কল্পনার সাবয়ব স্ফূর্তি এবং কালোত্তরকে ইতিহাসে মূর্ত করার আগ্রহ। এ গুণগুলো ভৌগোলিক হলেও দেশকাল-নির্বিশেষে যে কোনো দেশে যে কোনো কালে দেখা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ইয়েট্স প্রাচ্যের প্রায় সব কটি চিত্তাকর্ষক গুণ দেখতে পেয়েছিলেন, এবং এ জন্যে শেষ অবধি তাঁকে মূল্য দিয়েছেন।

১৯৩১ সনে ইয়েট্স রবীন্দ্রনাথকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন :

> আপনার কবিতা আমাকে উদ্দীপ্ত করে। গত কয়েক বছর আপনার গদ্য রচনায়, 'ঘরে-বাইরে', 'জীবনস্মৃতি', গল্প ইত্যাদিতে প্রজ্ঞা ও সৌন্দর্য দুই-ই দেখতে পেয়েছি। আপনার সঙ্গে যখন দেখা তার পরে আমি বিয়ে করেছি, আমার দুটি ছেলেমেয়েও আছে। আমি এখন জীবনের সঙ্গে নিবিড়তরভাবে যুক্ত বোধ করি। যা জীবন নয়, যা জটিল গ্রন্থি, যা যান্ত্রিক, তা থেকে নিজেকে যখনই আমি আলাদা করে দেখেছি তখনই জীবন আমার কল্পনায় এশীয় রূপ নিয়েছে। এই রূপ আমি প্রথম দেখতে পাই আপনার বইগুলোতে, পরে কতগুলো চীনা কবিতায় এবং জাপানী লেখকের গদ্য রচনায়। আপনার কবিতা যখন প্রথম পড়ি কী উদ্দীপনাই না অনুভব করেছিলাম, মনে হয়েছিল এ যেন মাঠ আর নদী থেকে বেরিয়ে এসেছে তাদের অপরিবর্তনীয় সুষমা নিয়ে।[৪২]

কেউ হয়তো বলবেন, এ চিঠির পরও তো রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও কবিতা সম্পর্কে ইয়েট্স অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এর জবাবে বলা চলে যে রবীন্দ্রনাথের যে গুণ তাঁকে আকর্ষণ করেছিল তার সম্পর্কে তাঁর কখনো মত বদলাতে হয় নি—অন্তত তার কোনো প্রমাণ নেই—কেননা আইরিশ কবির কাছে এ সাহিত্যের এক বহুপ্রার্থিত গুণ।

আরো মনে রাখতে হবে যে ইয়েট্স জীবনের এশীয় রূপের অন্বেষণ করলেও তিনি এশিয়াকে ভয়ও করতেন। কারণ প্রাচী ও প্রতীচী পরস্পরের প্রতিপক্ষ, তারা মানবজীবনের অন্তিম বৈপরীত্যের বিশাল ভৌগোলিক প্রতিভূ। কালের যে অমোঘ আবর্তনে ইয়েট্স বিশ্বাস করতেন, তার ফলে তারা নিকটবর্তী হতে পারে, এশিয়া ইউরোপীয় হতে পারে, ইউরোপ

এশীয় হতে পারে নিজ নিজ সত্তা অক্ষুণ্ন রেখে কিংবা একে অন্যকে গ্রাস করে। দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি শেষ জীবনে ইয়েট্‌সকে বিচলিত করেছিল। তাঁর ধারণায় ইউরোপের গৌরবোজ্জ্বল কীর্তি সম্ভব হয়েছে এশিয়াকে দমন করে—খ্রিস্টধর্মের 'নিরাবয়ব অন্ধকারকে'[৪৩] অনুপাতে রেখায় আলোতে সীমিত চিহ্নিত ও মূর্ত করে। তিনি বিশ্বাস করতেন সালামিসের নৌ-যুদ্ধে এশিয়ার 'আকারহীন বিশালত্ব'কে পরাজিত করেছিল গ্রিসের নৌশক্তি নয়, পাইথেগোরাসের গণিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত ফিডিয়ুসের ভাস্কর্যের অনুপ্রেরণা। এশিয়ার অন্ধকার গর্ভাশয় থেকে বার হয়ে সুবিন্যস্ত গ্রিক-রোমক সংস্কৃতিকে বিপর্যস্ত করেছিল বলে ইয়েট্‌স খ্রিস্টধর্মকে কখনো প্রীতির চোখে দেখেন নি। অপরদিকে তিনি বাইজেন্টীয় ও রেনেসাঁস যুগের শিল্প ও স্থাপত্যের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত ছিলেন অন্যান্য কারণের মধ্যে এ কারণে যে তাতে তিনি অতীন্দ্রিয় ও অবিমূর্তকে দেখেছেন অবয়বে তীক্ষ্ণ ও দ্যুতিমান।[৪৪] ইউরোপীয় শিল্প সাহিত্যের প্রকৃতি ও প্রবণতা লক্ষ করে ইয়েট্‌স শঙ্কিত হয়েছিলেন এই ভেবে যে আবার বুঝি ইউরোপের মনে একটা এশীয় বিপর্যয় ঘনিয়ে আসছে, প্রাচীর মন্দ দিক বুঝি প্রতীচ্যের ভালো দিককে গ্রাস করবে। এ যুগের তিনটি প্রতিনিধিত্বমূলক রচনায় জয়েসের 'ইউলিসিস', ভার্জিনিয়া উলফের 'ওয়েভস' এবং এজরা পাউন্ডের 'ক্যান্টোজ'-এ ইয়েট্‌সের মতে 'অভিজ্ঞতার প্লাবন যেন ভেঙে পড়ছে সমস্ত রেখা ও রঙের সীমা গুলিয়ে'। তাঁর মনে হয়েছে এ নতুন সাহিত্যে 'মানুষ কিছুই নয়'।[৪৫] বলা বাহুল্য, এ পরিস্থিতি তাঁর কাছে মনে হয়েছে এশীয়। সুতরাং শঙ্কা এবং আত্মরক্ষার তাগিদে তিনি তাঁর ইউরোপীয় ঐতিহ্য সংস্কার ও সত্তার ওপর উগ্রভাবে জোর দিয়েছেন; সেইসঙ্গে তিনি মানুষের মূল্যহানি ও সচেতন মনের কর্তৃত্ব হারানোকে, অস্পষ্টতা সৃষ্টি ও সাধারণীকরণের প্রবণতাকে, তিরস্কার করেছেন। অস্পষ্টতার অপরাধে এ তিরস্কারের কিছু অংশ রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যেও জুটেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতি ইয়েট্‌সের অসহিষ্ণুতাকে এ পরিপ্রেক্ষিতেই বুঝতে হবে।

১ *রবীন্দ্র-জীবনকথা,* কলিকাতা ১৯৬০, পৃ ১১৫।
২ *Autobiographies,* London, 1955, p. 333.
৩ "The Pathway", *Collected Works,* Stratford, 1908, Vol VIII, p. 195.
৪ *Autobiographies,* p. 92.
৫ John Eglinton, *A Memoir of A. E.,* London, 1937, p. 20.
৬ *Pages from a Diary Written in 1930,* Dublin, 1944, pp. 49-50.
৭ "The Pathway", *Collected Works,* Vol. VIII. p. 191.
৮ *A Vision,* London, 1925, p. 251.
৯ *Gitanjali,* London, 1943, p. xx.
১০ *ibid.,* pp. xiii-xv.
১১ *ibid.,* p. 35.
১২ *ibid.,* p. xix.
১৩ 'The Pathway', *Collected Works,* Vol. VIII, pp. 193 & 195.
১৪ *Gitanjali,* p. 3.
১৫ Shri Purohit Swami, *An Indian Monk (His Life and Adventures),* London, 1932, p. xv.

১৬ *ibid.*, pp. xvii-xviii.

১৭ *ibid.*, p. xviii.

১৮ *The Letters of W. B. Yeats,* London, 1954, pp. 834-5.

১৯ *Ibid.*, pp. 572-73. ইয়েট্স এডমন্ড গসকে লেখেন : 'আমি ইন্ডিয়া সোসাইটিকে বলেছি রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলো আপনার কাছে পাঠাতে। এগুলো পড়ে আপনি আমার একটা কথা ভেবে দেখবেন। আমার মতে তাঁকে আমাদের সংসদে নির্বাচিত করলে বিশেষ কল্পনাশীলতার পরিচয় দেয়া হবে। তিনি বাংলাদেশের মহান কবি, তা হলেও শুধু তাঁর ইংরেজি অনুবাদের জন্যেই তিনি নির্বাচনযোগ্য।'

২০ ঐতিহ্যানুগ জাপানি কারুকৃতির নিদর্শন এ প্রাচীন তরবারিটি ইয়েট্সের প্রিয় ছিল। তিনি এটি সাতো নামক এক জাপানি ভদ্রলোকের কাছ থেকে উপহার পেয়েছিলেন। কবি তাঁর *Resurrection* নাটকটি এঁকে উৎসর্গ করেন।

২১ Joseph Hone, *W. B. Yeats,* London 1942, pp. 458-59.

২২ *Essays : 1931-36,* Dublin, 1937, p. 21.

২৩ *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* সপ্তবিংশ খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৫, পৃ ২১৪।

২৪ ইংরেজ কবি জেরার্ড ম্যানলি হপকিন্সের বিশ্বাসও এমনি দীর্ণ হয়েছিল তাঁর শেষ পর্বে।

২৫ 'সাহিত্য চিন্তা'য় শিবনারায়ণ রায় রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলাকে তাঁর অন্তর-জীবনের যে গূঢ় রহস্য ও দ্বন্দ্বের প্রতিফলন বলে দাবি করেছেন তার প্রকাশ কবির ব্যবহৃত অন্য কোনো শিল্পমাধ্যমে সন্দেহাতীত রূপে স্পষ্ট নয়। এর সঙ্গে ইয়েট্সের শেষ লেখার এ অকুণ্ঠস্বীকৃতি তুলনীয় :

You think it horrible that lust and rage
Should dance attention upon my old age;
They were not such a plague when I was young;
What else have I to spur me into song ?

("The Spur")

অথবা

Those masterful images because complete
Grew in pure mind, but out of what began ?
A mound of refuse or the sweepings of a street,
Old kettles, old bottles, and a broken can,
Old iron, old bones, old rags, that raving slut
who keeps the till. Now that my ladder's gone,
I must lie down where all the ladder's start.
In the foul rage and bone shop of the heart.

("The Circus Animals' Desertion")

২৬ ইয়েট্স ইডিথ সিটওয়েলের "Ass Face" কবিতাটি তাঁর *Essays : 1931-36* বইতে উদ্ধৃত করেছেন।

২৭ W.B. Yeats, *Collected Poems,* London, 1952, p. 235 :

We who seven years ago
Talked of honour and of truth
Shriek with pleasure if we show

The weasel's twist, the weasel's tooth.

২৮ *A Vision,* New York, 1955, p. 214.

২৯ *The Autobiographies,* New York, 1938, p. 165.

৩০ *The Collected Poems,* p. 329 :

There all the barrel-hoops are knit,
There all the serpent-tails are bit,
There all the gyres converge in one
There all the planets drop in the Sun.

৩১ *Ibid.,* p. 262.

৩২ *Ibid.,* p. 295.

৩৩ *Letters of W. B. Yeats,* London, 1954, p. 837.

৩৪ *Collected Poems, p. 398.*

৩৫ *A Vision,* p. 210.

৩৬ ইয়েট্‌সের *Essays*–এ একটি মরমী অভিজ্ঞতার বর্ণনা আছে (পৃ. ৫৪০), সেটি তাঁর "Vacillation" কবিতার চতুর্থ অংশে কাব্যিক রূপ নেয় এবং "A Dialogue of Self and Soul"–এ আবার কিঞ্চিৎ আত্মপ্রকাশ করে। অনুরূপ অভিজ্ঞতায় প্রতিভাস "Stream and Sun at Glendalough" কবিতায় দেখা যায়। ১৯৩১ সনের নভেম্বরে মিসেস অলিভিয়া শেক্সপীয়রকে লিখিত চিঠিটিও এখানে উল্লেখযোগ্য : 'সন্ধ্যার পরে আমি একটু বেড়াতে গিয়াছিলাম, কতকগুলো বিরাট গাছের নিচ দিয়ে যেতে যেতে উঁচু দার্শনিক চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়ি... মনে হল হঠাৎ অবশেষে যেন আমি বুঝতে পেরেছি, তারপর গোলাপের গন্ধ পেলাম। আমি কালাতীত সত্তার প্রকৃতি এখন বুঝতে পেরেছি।' *The Letters,* p. 785.

৩৭ *Collected Poems,* p. 330.

৩৮ ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'র অনেক কথার মধ্যে এগুলো এখানে স্মরণযোগ্য :

Ornaments would mar our union; they would come between thee and me. (7)
... thou art that truth which has kindled the light of reason in my mind. (4)
And give me the strength to surrender my strength to they will with love. (36)
In my life thy will is ever taking shape. (56)

৩৯ নরেশ গুহ এক প্রবন্ধে ইয়েট্‌সের "The Hero, the Girl and the Fool" এবং "For Anne Gregory" নামক দুটি কবিতায় 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকের স্মৃতিকে চিহ্নিত করেছেন। দ্রষ্টব্য : *Mahfil* : A Quarterly of South Asian Literature, Vol. III, No I, University of Chicago, 1966, pp. 66-67

৪০ Sir William Rothenstein, *Men and Memories, 1900-22,* p. 263.

৪১ *Collected Poems,* p. 328.

৪২ *The Golden Book of Tagore,* Calcutta, 1931, p. 269.

৪৩ W. B. Yeats, *On the Boiler,* 1939, p. 28

৪৪ *A Vision,* pp. 291-92.

৪৫ *Wheels and Butterflies,* London, 1934, p. 73.

মুনীর চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথের নাটক : উপলব্ধির রূপান্তর

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সহস্র বৎসর পুরাতন। এই ভাষায় রচিত সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্য আমার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যাঁর গল্প-নাটক, কবিতা-গান, প্রবন্ধ-উপন্যাস বাংলা ভাষার সর্বোত্তম বিকাশের ধারক ও বাহক সেই রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে আমার সত্তার সামগ্রিকতা ও পরিপূর্ণতা আজ কল্পনীয় নয়। আমার নিভৃততম চিন্তার গুঞ্জরণ, গভীরতম ভাবনার আলোড়ন, তীব্রতম উপলব্ধির জাগরণ সহস্র সূত্রে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অনুপ্রাণিত, রবীন্দ্রকাব্যের ভাষার ছন্দে স্পন্দিত, রবীন্দ্রকল্পনার আলোকে পরিপ্লাবিত।

অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্বীকার্য যে রবীন্দ্রকাব্যের পাঠকের শ্রেণীভেদ আছে। সে কাব্যের রসাস্বাদনের প্রবণতা দেশ কাল ও পরিবেশভেদে বিচিত্র পথে আবর্তিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সমকালীন পাশ্চাত্য জগৎ 'গীতাঞ্জলি'র যে আধ্যাত্মিকতামণ্ডিত শান্তরসে মুগ্ধ হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বহু পূর্বেই রবীন্দ্রকাব্যের বিদগ্ধ বাঙালি পাঠক সে বিহ্বলতা থেকে মুক্তি লাভ করে। সমকালে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের চেয়ে সম্ভবত তাঁর ছোটগল্প বেশি আদৃত ও পঠিত হয়েছে, রবীন্দ্রচিত্রে জীবনের যে অতৃপ্ত ও অশান্ত বিক্ষোভ প্রতিফলিত তার আবেদন নবমর্যাদা লাভ করেছে।

উনিশ শ সাতষট্টির পূর্ব-পাকিস্তানি পাঠক হিসেবে আমরাও রবীন্দ্রসাহিত্যের নব মূল্যায়নে ব্যাপৃত। যত কাল অতিবাহিত হচ্ছে ততই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের একাত্মবোধের কিছু বন্ধন দৃঢ়তর হচ্ছে, কিছু ছিন্নও হচ্ছে। পঞ্চাশ বৎসর ব্যবধানের দুই রবীন্দ্রভক্তের মধ্যে প্রকৃতিগত মিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। রবীন্দ্রদ্রোহীদের মধ্যেও। রবীন্দ্রনাথের অশ্লীলতা আজ কারো শিরঃপীড়ার কারণ নয়, তাঁর দুর্বোধ্যতা নিয়েও কেউ চিন্তিত হয় না। বরঞ্চ সমালোচনার পাঠ্যপুস্তকে আজো তাঁর যে জীবনদেবতার উপাখ্যান, নিরুদ্দেশলোকের সৌন্দর্যারাধনা ও সসীম-অসীমের মিলনতত্ত্ব ক্লান্তিহীন উদ্যমের সঙ্গে অসংখ্যবার পুনরাবৃত্ত হয়, যুগচেতনাস্পৃষ্ট নবীন পাঠক তাকে উপেক্ষা করে না হলেও, অতিক্রম করেই রবীন্দ্রকাব্য-পিপাসা নিবৃত্ত করে।

একটা সহজ দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাক। 'মুক্তধারা' নাটকটি। এই নাটকের মুখ্য প্রতিনিধি ধনঞ্জয়। তিনি বিপ্লবী নন, বৈরাগী মাত্র। তাঁর মধ্যে বিদ্রোহের ভাবের চেয়ে ভক্তির প্রবণতাই বেশি। তাঁর সত্যভাষণের নির্ভীকতা কখনো কখনো ক্ষয়িষ্ণু সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের উদ্দীপনা সঞ্চার করলেও তাঁর আসল প্রয়াস ভক্তিমার্গে জীবের মুক্তি প্রতিষ্ঠা

করা। এই উৎকণ্ঠা যুগধর্মের দ্যোতক নয়। সমকালীন পাঠক দর্শক শ্রোতা হয়তো 'মুক্তধারা'র মন্ত্রীর গানের চেয়ে যন্ত্রীর গানেই বেশি মুগ্ধ হবে। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির অগোচরে যুগের মূল্যবোধের পালাবদল ঘটেছে, অন্তত তাঁর জীবনাবসানের কালে তো বটেই। প্রকৃতি ও যন্ত্রের মধ্যে সত্য–মিথ্যা, পাপ–পুণ্যের যে দ্বন্দ্ব 'মুক্তধারা'য় ও রবীন্দ্রকাব্যের অন্যত্র পরিকল্পিত হয়েছে তা বর্তমানে অহেতুক এবং অকিঞ্চিৎকর বিবেচিত হতে বাধ্য। যন্ত্রের মর্যাদা এখন সংশয়ের বস্তু নয়, যেমন নগরও আর ধিকৃত হয় না গ্রামের বিরোধী শক্তিরূপে। উভয়ই মানবসমাজের ক্রমবিকাশের স্তর ও প্রকৃতিকে সূচিত করে মাত্র। যন্ত্রশক্তিকে বিভীষিকাময় করে তোলে মানবসমাজের এক বিশিষ্ট শ্রেণীর স্বার্থবুদ্ধি, গ্রাম ও নগর উভয়ের অগ্রগতি প্রতিহত করে শ্রেণীবিশেষের একই পাপবুদ্ধি। যুগচেতনার এই মৌল পরিবর্তনের ফলে 'মুক্তধারা'য় রবীন্দ্রকল্পিত মূল্যবোধের যে সংঘাত প্রদর্শিত হয়েছে আজ তার আবেদন দুর্বল ও গুরুত্বহীন বলে প্রতীয়মান হয়। তার ওপর যন্ত্রশক্তির বিরুদ্ধে মন্ত্রশক্তির যে মহিমা নাটকে কীর্তিত হয়েছে তার ভিত্তি মূর্তিপূজার ঐতিহ্যাশ্রয়ী হওয়ায় পূর্ব–পাকিস্তানি মুসলমান পাঠকের চিত্তে তার প্রতিষ্ঠা দুরূহতর। যা প্রশংসিত হয় তা হল নাটকীয় সংলাপের সূক্ষ্মতা ও সরসতা, সর্বাঙ্গীণ কলারীতির বৈদগ্ধ্য ও শালীনতা এবং কোনো কোনো তত্ত্বাংশের সামাজিক ও ইহলৌকিক প্রজ্বলন্ত স্পষ্টভাষিতা।

যেমন, কংকর চরিত্রের উক্তি : 'ওরে নরসিংহ, লোকটা তর্ক করে যে। দেশের পক্ষে ওর বাড়া আপদ নেই।'। অথবা সেই সম্পূর্ণ কৌতুকাবহ দৃশ্যটি যেখানে উত্তরকূটের গুরুমহাশয় উচ্চারণে অপটু জ্ঞানহীন ছাত্রদের সংগঠিত করছেন বিশেষ কোনো উৎসবে মহারাজের 'জয়ধ্বনি' চিৎকারের জন্য।

[একদল ছাত্র লইয়া অদূরে গাছের তলায় উত্তরকূটের গুরুমশায় প্রবেশ করিল।]

গুরু। খেলে, খেলে, বেত খেলে দেখছি। খুব গলা ছেড়ে বল্, জয় রাজরাজেশ্বর।

ছাত্রগণ। জয় রাজরা—

গুরু। (হাতের কাছের দুই একটা ছেলেকে থাবড়া মারিয়া)—জেশ্বর।

ছাত্রগণ। জেশ্বর

গুরু। শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী—

ছাত্রগণ। শ্রী শ্রী শ্রী—

গুরু। (ঠেলা মারিয়া) পাঁচবার।

ছাত্রগণ। পাঁচবার।

গুরু। লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর। বল্ শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী—

ছাত্রগণ। শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী—

গুরু। উত্তরকূটাধিপতির জয়—

ছাত্রগণ। উত্তরকূটা—

গুরু। —ধিপতির

ছাত্রগণ। —ধিপতির

গুরু। —জয়

ছাত্রগণ। —জয়।

রণজিৎ। তোমরা কোথায় যাচ্ছ?

গুরু। আমাদের যন্ত্রবাজ বিভূতিকে মহারাজ শিরোপা দেবেন তাই ছেলেদের নিয়ে যাচ্ছি আনন্দ করতে। যাতে উত্তরকূটের গৌরবে এরা শিশুকাল হতেই গৌরব করতে শেখে তার কোনো উপলক্ষই বাদ দিতে চাই নে।

রণজিৎ। বিভূতি কি করেছে এরা সব জানে তো?
ছেলেরা। (লাফাইয়া হাত তালি দিয়া) জানি, শিবতারাইয়ের খাবার জল বন্ধ করে দিয়েছে।
রণজিৎ। কেন দিয়েছে?
ছেলেরা। (উৎসাহে) ওদের জব্দ করবার জন্যে।
রণজিৎ। কেন জব্দ করা?
ছেলেরা। ওরা যে খারাপ লোক।
রণজিৎ। কেন খারাপ?
ছেলেরা। ওরা খুব খারাপ, ভয়ানক খারাপ সবাই জানে।
রণজিৎ। কেন খারাপ তা জান না।
গুরু। জানে বই কি মহারাজ। কীরে তোরা পড়িস নি—বইয়ে পড়িস নি—ওদের ধর্ম খুব খারাপ—
ছেলেরা। হাঁ, হাঁ, ওদের ধর্ম খুব খারাপ।
গুরু। আর ওরা আমাদের মতো—কী বল না—(নাক দেখাইয়া)
ছেলেরা। নাক উঁচু নয়।
গুরু। আচ্ছা, আমাদের গণাচার্য কী প্রমাণ করে দিয়েছেন—নাক উঁচু থাকলে কী হয়?
ছেলেরা। খুব বড় জাত হয়।
গুরু। তারা কী করে? বল্ না পৃথিবীতে—বল্—তারাই সকলের উপর জয়ী হয়, না?
ছেলেরা। হ্যাঁ, জয়ী হয়।
গুরু। উত্তরকূটের মানুষ কোনোদিন যুদ্ধে হেরেছে জানিস্?
ছেলেরা। কোনোদিনই না?
গুরু। আমাদের পিতামহ—মহারাজ প্রাগজিৎ দু-শ তিরেনব্বই জন সৈন্য নিয়ে একত্রিশ হাজার সাড়ে সাত-শ দক্ষিণী বর্বরদের হটিয়ে দিয়েছিলেন না?
ছেলেরা। হাঁ, দিয়েছিলেন।
গুরু। নিশ্চয়ই জানবেন মহারাজ, উত্তরকূটের বাইরে যে হতভাগারা মাতৃগর্ভে জন্মায়, একদিন এইসব ছেলেরাই তাদের বিভীষিকা হয়ে উঠবে। এ যদি না হয় তবে আমি মিথ্যে গুরু। কত বড়ো দায়িত্ব যে আমাদের সে আমি এক দণ্ডও ভুলি নে। আমরাই তো মানুষ তৈরি করে দিই, আপনার অমাত্যরা তাঁদের নিয়ে ব্যবহার করেন। অথচ তাঁরাই বা কি পান আর আমরাই কি পাই তুলনা করে দেখবেন।
মন্ত্রী। কিন্তু ওই ছাত্ররাই যে তোমাদের পুরস্কার।
গুরু। বড়ো সুন্দর বলেছেন মন্ত্রীমশায়, ছাত্ররাই আমাদের পুরস্কার। আহা, কিন্তু খাদ্যসামগ্রী বড়ো দুর্মূল্য—এই দেখেন না কেন, গব্যঘৃত, যেটা ছিল—
মন্ত্রী। আচ্ছা বেশ, তোমার এই গব্যঘৃতের কথাটা চিন্তা করব। এখন যাও, পূজার সময় নিকট হল।

[জয়ধ্বনি করাইয়া ছাত্রদের লইয়া গুরু মশায় প্রস্থান করিল।]

এসব দৃশ্যের আবেদন দেশকালের সঙ্কীর্ণ সীমা অতিক্রম করে বহু দেশের বহু চিত্তকে স্পর্শ করে। কৌতুকময় তির্যক বাক্‌ভঙ্গি বক্তব্যকে এমন একটা স্থিতিস্থাপতকা দান করেছে যে তার তাৎপর্য, পরিবেশ ও কালের ব্যবধান সত্ত্বেও প্রত্যক্ষ বলে অনুভূত হয়। শিল্পীর বিদ্রূপের লক্ষ্য যেমন উত্তরকূট, তেমনি উত্তরকালের সমগোত্রীয় সকল রাষ্ট্রশক্তির কূটবুদ্ধিও বটে।

নীলিমা ইব্রাহিম

তিন নারী : বিনোদিনী, নন্দিনী ও কুমুদিনী

রবীন্দ্রনাথের কবিমানস অঙ্গনা-প্রেম ও সৌন্দর্যে বিমোহিত। তাঁর এই বিমুগ্ধ অন্তরাত্মার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর বৃহৎ সাহিত্য-কর্মের যত্র তত্র—কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে, ছোটগল্পে। বাস্তব পৃথিবীর দেহধারী রমণী তাঁরা সৃষ্টিতে অভিনব রূপে লীলায়িত—কারণ কবির অন্তর-অনুভূতির জারকরসে তাঁরা 'অর্ধেক মানবী এবং অর্ধেক কল্পনার' মিশ্রিত রূপায়ণ। কবির চিত্তাকাশে প্রেম ও সৌন্দর্যের অখণ্ড অনুভূতিতে যে প্রকৃতির সঙ্গোপন অবস্থান তাই আবার পৃথিবীর বিচিত্র রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধে কত বিচিত্ররূপিণীতে আবির্ভূতা। রবীন্দ্র-মানস-কন্যাদের তাই বিশেষ শ্রেণী বা গোত্রের সীমারেখায় বাঁধা যায় না। অনেকেই রবীন্দ্রকাব্যের 'দুই নারী'র স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছেন। পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত বিশ্ব উর্বশী এবং তিল তিল সৌন্দর্যের আধার তিলোত্তমা স্বরূপিণী নারী রবীন্দ্র-মানসের এক কোটিতে অবস্থিত, অন্য কোটিতে আছেন পদ্মাসনা লক্ষ্মী যাঁর চরণে বিশ্বের ঐশ্বর্য উৎসর্গীকৃত, যাঁর হাতে আছে বরাভয় এবং সর্বমঙ্গল-দায়িনী চিরকল্যাণ ও শান্তি। কিন্তু কাব্যাকাশের এ নারী বাস্তব ক্ষেত্রে আরো বহুতর সঞ্চারী রসের সংমিশ্রণে নব নব রূপ ধারণ করেছে।

কুরূপা চিত্রাঙ্গদা তার শৌর্য-বীর্যকে মিথ্যা মনে করে মদন ও বসন্তের কাছে রূপ ভিক্ষা করেছে। কিন্তু ভিক্ষালব্ধ রূপ তার 'অন্তরে বাহিরে সতীন' হয়ে অহরহ তাকে জ্বালিয়েছে, আত্মধিক্কারের গ্লানিতে আবার নিজেকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে লক্ষ্মীর কল্যাণ-কুটিরে। 'ঘরে-বাইরে'র বিমলা নিশ্চিত আশ্রয় ছেড়ে অগ্নিদাহে নিজেকে প্রজ্বলিত করে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছে। সর্ব কল্যাণ কামনা আর প্রেমপূর্ণ হৃদয় নিয়ে আশা হয়েছে বঞ্চিত; উর্বশীর রূপ নিয়ে চরম অবমাননা ঘটেছে গৃহলক্ষ্মী কুমুদিনীর, কুবেরের পদপ্রান্তে নারীত্ব লাঞ্ছিত হয়েছে। প্রেমের দীপশিখা হাতে নিয়ে বঞ্চনার বেদনায় বুক ভরে এগিয়ে গেছে নন্দিনী তার অনাগত ভবিষ্যের পানে।

রবীন্দ্রসাহিত্যে নারী সমস্ত জগৎ সংসারের আকর্ষণ-বিকর্ষণের কেন্দ্র স্বরূপ। কবি নিজেই এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায় তা হলেই তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে। তখন মানুষ আপনার সৃষ্ট যন্ত্রের আঘাতে কেবলি পীড়া দেয়, পীড়িত হয়।'[১] এ বাধা ও তার প্রলয়ঙ্করী বহিঃপ্রকাশ আজ সমাজের সর্বস্তরেই আমরা দেখতে পাই।

রবীন্দ্র-মানসের তিন কন্যা কুমুদিনী, নন্দিনী এবং বিনোদিনীর ভেতর বিনোদিনী

বয়ঃজ্যেষ্ঠা। ১৩০৯ সালে 'চোখের বালি' উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। কবির মানসজগতে বিনোদিনীর আবির্ভাব প্রথম বলে তার জীবনের গতি বিচিত্র হলেও তুলনামূলকভাবে সহজবোধ্য। বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের উষালগ্নে মানুষের মনের সন্দেহ-দোলা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা-বেদনার সংঘাতে বিনোদিনীই আমাদের সর্বপ্রথম বারবার আকর্ষণ করে। এ চরিত্রে বঙ্কিমী সৌরভ আছে তবুও রোহিণী-হৃদয়ের অস্ফুট কমলকলি এখানে সহস্রদলে প্রস্ফুটিত।

বিনোদিনী বালবিধবা। তার রূপ আছে, গুণ আছে, আছে দেহভরা যৌবন। ধনী দেবর মহেন্দ্র—একদিন যার সঙ্গে তার বিয়ের কথা হয়েছিল—তার সংসারে আশ্রিতার জীবন গ্রহণ করেছে বিনোদিনী। সে সংসারে সেবাদাসীর কাজ করে তার গ্রাসাচ্ছাদন চলবে এই ছিল ভরসা। কিন্তু মুশকিল হল দেবরপত্নী আশাকে নিয়ে। মুগ্ধা বালিকা, তার রূপ থাকলেও নেই তাতে দাহিকা শক্তি, অন্তর থাকলেও তার বৃত্তির অনুশীলন হয় নি। শিক্ষা যার বর্ণপরিচয়ের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ সে কী না বিনোদিনীর রূপ-গুণ সব ব্যর্থ করে দিয়ে ধনীগৃহের স্বামীসোহাগিনী বধূ হল। কি অপরাধে আজ বিনোদিনী এ বস্তুভোগ থেকে বঞ্চিতা? কে জবাব দেবে? তার স্রষ্টা—না তাঁর সৃষ্ট এই কৃত্রিম সমাজ? সম্ভবত সমাজের কাছেই বিনোদিনীর রূপকার এ প্রশ্ন তুলেছেন। সর্বজনহৃদয়বেদ্য করবার জন্যেই বিনোদিনী-চিত্তের দাহিকা শক্তিকে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে পরিণীত করে একটি সুন্দর সংসারকে শ্মশানে পরিণত করবার উপক্রম লেখককে করতে হয়েছিল।

বিনোদিনীকে ঔপন্যাসিক রূপায়িত করেছেন প্রথম জীবনের আবেগ দিয়ে। তাই তার ভেতর প্রবৃত্তির তাড়নার উন্মাদনা যতখানি দেখতে পাই আত্মবিশ্লেষণের সূক্ষ্ম অনুভূতি ততখানি পাই না, ভোগসুখবঞ্চিতা নারীর মন তার রূপকার অনুভব করেছেন—

> অপরাহ্ণে বিনোদিনী নিজে উদ্‌যোগী হইয়া অপরূপ নৈপুণ্যের সহিত আশার চুল বাঁধিয়া সাজাইয়া তাহাকে স্বামী-সম্মিলনে পাঠাইয়া দিত। তাহার কল্পনা যেন অবগুণ্ঠিতা হইয়া এই সজ্জিতা বধূ পশ্চাত পশ্চাত মুগ্ধ যুবকের অভিসারে জনহীন কক্ষে গমন করিত।

আমাদের সমস্ত সহানুভূতি যেন তীব্রবেগে বিনোদিনীর অভিমুখে ধাবিত হয়। কিন্তু বিহারী বিচক্ষণ, জিতেন্দ্রিয়, সংযত, সে 'এটুকু বুঝিয়াছে, এ নারী জঙ্গলে ফেলিয়া রাখিবার নহে। কিন্তু শিখা এক ভাবে ঘরের প্রদীপ রূপে জ্বলে, আর এক ভাবে ঘরে আগুন ধরাইয়া দেয়।'

বিহারীর আশঙ্কাই উপন্যাসের কাহিনীতে বাস্তবায়িত হয়েছে, কিন্তু বিনোদিনীও যে গৃহের মঙ্গলদীপ জ্বালতে পারে সে পরিচয়ও প্রথম উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল বিহারীর কাছেই। দমদমের বাগানে বিনোদিনীর মুখে তার আত্মকথা শুনে বিহারী ভেবেছে 'বিনোদিনী বাহিরে বিলাসিনী যুবতী বটে, কিন্তু তাহার অন্তরে একটি পূজারতা নারী নিরশনে তপস্যা করিতেছে।' আর বিহারীর কাছে নিজের হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করে বিনোদিনীর মনে হল 'আজ সহস্র কলকণ্ঠে নিতান্ত সহজ হৃদয়ের কথা বলিয়া তাহার সমস্ত প্রকৃতি যেন নব বারিধারায় স্নাত স্নিগ্ধ এবং পরিতৃপ্ত হইয়া গেল।' পরবর্তীকালে এ অংশের প্রভাবেই কিরণময়ী স্বচ্ছন্দে উপেন্দ্রের কাছে নিজের হৃদয়সত্য নিবেদন করেছে।

কাহিনীর অগ্রগতিতে বিনোদিনীকে পাবার জন্যে মহেন্দ্র উন্মাদ হয়ে উঠল অথচ বিনোদিনীর হৃদয়পীঠে তখন বিহারীর অভিষেক সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু যে কামলোভাতুরা নারী বিনোদিনীর মাঝে নিয়ত মাথা কুটে মরছিল সে মহেন্দ্রকে আবার নিজের প্রতি আকর্ষণ করল, কারণ মহেন্দ্রর ঔদাসীন্য তার কাছে আত্ম-অবমাননাকর বলে মনে হয়েছিল। মহেন্দ্র বাড়ি ছেড়ে গেলে বিনোদিনী ভেবেছে, 'কোনও নারীর কি আমার মতো এমন দশা হইয়াছে, আমি মরিতে চাই, কি মারিতে চাই, তাই বুঝিতেই পারিলাম না।'

আশার প্রতি বিহারীর শ্রদ্ধা বিনোদিনীকে ঈর্ষাতুর করেছে, ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করেছে। সে জেনেছে বিহারী তাকে যতটুকু শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে, তা আশার জন্যে। আশার মঙ্গল–কামনায় বিহারী তার কাছে আকুল প্রার্থনা জানিয়েছে। বিনোদিনী বুঝেছে,

> বিনোদিনী নিজে কেহই নহে, আশাকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য আশার সমস্ত সুখ সম্পূর্ণ করিবার জন্যই তাহার জন্ম। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রবাবু আশাকে বিবাহ করিবেন সেইজন্য অদৃষ্টের তাড়নায় বিনোদিনীকে বারাসাতের বর্বর বানরের সহিত বনবাসিনী হইতে হইবে। শ্রীযুক্ত বিহারীবাবু সরলা আশার চোখের জল দেখিতে পারেন না সেইজন্য বিনোদিনীকে তাহার আঁচলের প্রান্ত তুলিয়া সর্বদা প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। একবার এই মহেন্দ্রকে, এই বিহারীকে বিনোদিনী তাহার পশ্চাতের ছায়ার সহিত ধূলায় লুণ্ঠিত করিয়া বুঝাইতে চায়, আশাই বা কে আর বিনোদিনীই বা কে।

আশার প্রতি এই সর্বদাহিকা ঈর্ষাই বিনোদিনীকে চরম সর্বনাশের পথে নিয়ে গেছে।

মহেন্দ্রকে নিয়ে বিনোদিনী ঘর ছাড়ল, কূল ছেড়ে অকূলে ভাসল কিন্তু তাকে দেহদান করল না। নিশ্চিত, নিরাপদ, পবিত্র গৃহাঙ্গন পরিত্যাগ করে বিনোদিনী বুঝল সে কি হারিয়েছে। এখানে তার ও মহেন্দ্রের সঙ্গে পরবর্তীকালের কিরণময়ী ও দিবাকরের তুলনা চলে। উপেন্দ্রর ঘৃণা কিরণময়ীকে প্ররোচিত করেছিল উপেনদার সাধের ধন দিবাকরের সর্বনাশ করে তাকে লাঞ্ছিত করতে। সম্ভবত অনুরূপ কারণেই বিহারীর ঘৃণা বিনোদিনীকে সহায়তা করেছে মহেন্দ্রকে অবলম্বন করে আশার সর্বনাশ করতে। কিন্তু মানুষের মন কতই না বিচিত্র ! মহেন্দ্র নিজেকে বিনোদিনীর পদপ্রান্তে উৎসর্গ করল কিন্তু তার কাম্য বস্তু দিতে পারল না। বিনোদিনী মহেন্দ্রকে নিজের মুঠোয় এনে ধুলোমুঠির মতো পথের মাঝে ফেলে দিল, কারণ একে সে চায় নি। শেষ পর্যন্ত নাটকীয়ভাবে বিনোদিনী ঘরে ফিরেছে, বিহারীর অন্তরে স্বাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে, বিহারী তাকে বিয়ে করে স্ত্রীর সম্মান দিতে চেয়েছে কিন্তু বিনোদিনীর মুখে আদর্শ প্রচারকারী ঔপন্যাসিক ভাষা দিয়েছেন,

> ছিঃ ছিঃ এ কথা মনে করিতে লজ্জা হয়। আমি বিধবা, আমি নিন্দিতা, সমস্ত সমাজের কাছে আমি তোমাকে লাঞ্ছিত করিব, এ কখনো হইতে পারে না। ছিঃ ছিঃ একথা তুমি মুখে আনিও না।.... আমাকে বিবাহ করিলে তুমি সুখী হইবে না, তোমার গৌরব যাইবে। আমিও সমস্ত গৌরব হারাইব। তুমি চিরদিন নির্লিপ্ত, প্রসন্ন। আজও তুমি তাই থাকো—আমি দূরে থাকিয়া তোমার কর্ম করি। তুমি প্রসন্ন হও, তুমি সুখী হও।

বিনোদিনীর এ চরিত্রগৌরবের মাঝেই পাঠকের সামনে অকস্মাৎ যবনিকা পতন হয়। এখানে বাহবা দিতে ইচ্ছে করে, কিন্তু পারি কি? সত্যিই কি দেহে উপবাসী বিনোদিনী সেবিকা–জীবনে তার চরম সার্থকতা খুঁজে পেয়েছিল? এ তার আত্ম–প্রবঞ্চনা, মহত্বের আবরণে ভিখারিনীর দারিদ্র্যকে আবৃত করা। এ চরিত্র সমাজের আদর্শ হলেও তার রূপকার তৃপ্ত হয়েছিলেন কি? তা হলে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ 'নিষ্কৃতি' কবিতায় মঞ্জুলিকাকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করলেন কেন? সেখানে আমরা পাই :

ঘরেতে নেই মঞ্জুলিকা। খবর পেলেন চিঠি পড়ে
পুলিন তাকে বিয়ে করে
গেছে দোঁহে ফরাক্কাবাদ চলে,
সেইখানেতেই ঘর পাতবে বলে।

বলিষ্ঠ কবিকণ্ঠ মঞ্জুলিকাকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এখানে তিনি সামাজিক বাহবার থেকে মানসকন্যার আত্মপ্রতিষ্ঠায় অধিক উল্লসিত।

বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে বিনোদিনী চরিত্র একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য। এ চরিত্রের আদর্শবাদ আমাদের এতই মুগ্ধ করেছে যে বঞ্চনার বেদনার অনুভূতিকে আমরা বিস্মৃত হয়েছি। তবে এ প্রসঙ্গে এ সত্য ভুললে চলবে না যে আলোচ্য তিন কন্যার ভেতর বিনোদিনী কবিমানসে যখন রূপলাভ করেছে তখনো তিনি তাঁর মানসকন্যাকে যতখানি স্বচ্ছন্দ বিহারের সুযোগ দিয়েছেন বহির্জগতে ততখানি সম্ভবপর হয় নি। এ ত্রুটি কবিমানসিকতার যতখানি, সেকালের গণজীবন-চেতনায় বিনোদিনীকে গ্রহণ করবার প্রস্তুতির অভাব তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

প্রকাশের ধারাবাহিকতায় দ্বিতীয়া কন্যা নন্দিনী। ১৩৩৩ সালে 'রক্তকরবী' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। শিলং-এর শৈলাবাসে কবি যক্ষপুরী নাটকটি রচনা করেন। পাণ্ডুলিপি আকারে এর নাম ছিল নন্দিনী, তারপর ১৩৩১ সালে 'রক্তকরবী' নাম নিয়ে প্রবাসীতে এর আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। নন্দিনী এ নাটকের নায়িকা; তার চারিত্রিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতই হওয়া উচিত ছিল এ নাটকের মুখ্য বিষয়বস্তু। কিন্তু 'রক্তকরবী' রূপক বা সাঙ্কেতিক নাটকের আখ্যা পেয়েছে। নায়িকাও তার পালাবদল করেছে। তাই নন্দিনী রূপায়িত হয়েছে একটি নৃত্যপরা ঝরনার মতো। নাটকে প্রেম ও আনন্দের একটি প্রবাহ বইয়ে দিয়ে সে সাগরে মিলিত হয়ে গেছে। যে পথ দিয়ে এই ঝরনা বয়ে গেছে সে পথকে সে ফুলে-ফলে, শস্যে-সম্পদে, আনন্দে-গানে ভরে দিয়ে গেছে, যেমন করে মর্ত্যের প্রেমিকা রমণী তার চারিদিকের জগৎকে স্নেহে প্রেমে আনন্দে পরিপূর্ণ করে দেয়।

নন্দিনী চরিত্র এবং তার পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে কবি নিজেই অনেক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কর্ষণজীবী ও আকর্ষণজীবী এই দুই জাতীয় সভ্যতার দ্বন্দ্ব এবং কর্ষণজীবীরাই যে সভ্যতার মাপকাঠিতে অর্থাৎ আধ্যাত্মিক চৈতন্যলাভে উন্নততর সামাজিক জীব এ সত্যই কবি এ নাটকে উদ্‌ঘাটিত করতে চেয়েছেন যান্ত্রিক সভ্যতার লীলাভূমি যক্ষপুরীর সুড়ঙ্গে সোনা খোঁজার পাগলামির মাধ্যমে। নন্দিনী চরিত্রের অবতারণা এই স্বর্ণলোভী রাবণদের মুক্তিকামনায়। এরা বৃহৎ, এরা অতিকায়, এরা প্রচণ্ড, এদের ক্ষমতা তুলনাহীন; কিন্তু অন্তরের কোমল স্পর্শের অভাবে একদিন এরা নিজেদেরকেই নিজেরা ভেঙে চুরমার করে। অতি পাবার নেশার চরম পরিণতি আত্মঘাত। এরা টিকে থাকবার তত্ত্ব জানে, বাঁচবার সঞ্জীবনীর সঙ্গে এদের পরিচয় নেই।

আধুনিক সংসারের উপন্যাসের নায়িকারূপে আমরা নন্দিনী চরিত্রের বিশ্লেষণ করতে পারি। যক্ষপুরীর রাজার অনেক আছে—ধন ঐশ্বর্য শক্তির মদমত্ততা দিয়ে সে নন্দিনীকে পেতে চায়। তার চারিদিকে অহমিকার কঠিন জাল। তার ভেতর থেকে হাত বাড়িয়ে সে নন্দিনীর স্পর্শ পেতে চায়। এ যেন আমাদের আজকের সমাজ-জীবনের এক জ্বলন্ত চিত্রপট। যান্ত্রিক সভ্যতা অনেক দিয়েছে, ধনের নেশায় পুরুষ উন্মাদ। তারপর ঐশ্বর্য ও শক্তি যখন তার করায়ত্ত হল তখন সে পেতে চাইল প্রেমের প্রতীকস্বরূপ নারীকে। বস্তুকে সে জয় করেছে, এখন চায় সে আত্মার আনন্দলীলা। কিন্তু উভয়কে একত্র পাওয়া যায় না। এমনিই প্রকৃতির অমোঘ বিধান। ঐশ্বর্যের দম্ভ আর প্রণয়-প্রীতি এক আধারে বাস করে না। কবির কণ্ঠে শুনেছি—'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বৈকুণ্ঠে আর যক্ষের ভাণ্ডার পাতালে'।

স্বর্ণলঙ্কার রাবণকে বিনষ্ট করেছিল ঘরশত্রু বিভীষণ। কবিগুরু এই সহোদর ভ্রাতার কাহিনীকে রূপক অর্থে গ্রহণ করে বলেছেন,

> আদিকবির সাতকাণ্ডে স্থানাভাব ছিল না এই কারণে লঙ্কাপুরীতে তিনি রাবণ ও বিভীষণকে স্বতন্ত্র স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু আভাস দিয়েছিলেন যে তারা একই, তারা সহোদর ভাই। একই নীড়ে পাপ ও সেই পাপের মৃত্যুবাণ লালিত হয়েছে। আমার স্বল্পায়তন নাটকে রাবণের

বর্তমান প্রতিনিধিটি এক দেহেই রাবণ ও বিভীষণ। সে আপনাকেই আপনি পরাস্ত করে। এ সত্য শুধু কাল্পনিক যক্ষপুরীর রাজা সম্পর্কেই প্রযোজ্য নয়, 'যোগাযোগে'র মহারাজা মধুসূদনও এই একই বৃত্তির শিকার।

যক্ষপুরীর জালের বাধা ছিন্ন করে নন্দিনী চায় রাজার কাছে যেতে। কারণ তার বুকে আছে রক্তকরবী—সে হচ্ছে তার রঞ্জনের ভালবাসার দান। এই সম্পদ দিয়ে সে রাজাকে মুক্ত করতে চায়, কিন্তু অধ্যাপক বলেন, 'দেবতার হাসি সূর্যের আলো, তাতে বরফ গলে কিন্তু পাথর টলে না।' প্রাণ থাকলে তাতে স্পন্দন জাগানো যায় কিন্তু জড়কে জাগাবে কে? বৃহৎ শক্তিতে নারী আকৃষ্ট হয়। তাই নন্দিনী বলেছে, 'যে বিপুল শক্তি দিয়ে অনায়াসে সোনার তালগুলোকে চুড়ো করে সাজাচ্ছিলে তাই দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম।' কিন্তু এত ঐশ্বর্য যার সে বলে, 'আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি, তোমার মতো ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি, আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত।' ঠিক যেমন করে মধুসূদন একদিন তার প্রচণ্ড শক্তি আর অহমিকা নিয়ে ক্ষুদ্র নবদূর্বারূপ কুমুর দিকে প্রচণ্ড আকর্ষণ অনুভব করেছিল। কিন্তু ধনৈশ্বর্যের দম্ভে তো সুন্দর ধরা দেয় না। তাই বিশু পাগল বলেছে, 'নরকেও সুন্দর আছে, কিন্তু সুন্দরকে কেউ সেখানে বুঝতেই পারে না, নরকবাসীর সবচেয়ে বড় সাজা তাই।'

নন্দিনী যক্ষপুরীর 'দুখ জাগানিয়া'। যে দুঃখকে বুকে নিয়ে মানুষ চিরকাল পরম মিলনের আনন্দ উপভোগ করেছে, যে বেদনামথিত হৃদয় অকূলে তরী ভাসিয়ে পথ হারাবার ভয়ে কাঁপে না, মুক্তির আনন্দে বিহ্বল হয় নন্দিনী সে দুঃখের অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলেছে যক্ষপুরীতে। সে ভয়কে জয় করেছে। রাজাকে সবাই ভয় পায়, শুধু নন্দিনী নির্ভীক। কারণ সে আগম পারের দূতী, রাজার বদ্ধ আত্মাকে সে মুক্তি দিতে এসেছে।

রাজা হার স্বীকার করে না। তার নেই কোনো সঙ্গী সাথী—কারণ রাজা মধ্যাহ্ন-সূর্যের মতোই দীপ্তিমান, তেজস্বী। নন্দিনী জানে রাজার বিকৃত মানসের খবর। তাই বলে, 'লোকে তোমাকে ভয় করে এইটেই দেখতে ভালবাস। আমাদের গাঁয়ের শ্রীকণ্ঠ যাত্রায় রাক্ষস সাজে—সে যখন আসরে নামে তখন ছেলেরা আঁতকে উঠলে সে ভারি খুসী হয়। তোমারো যে সেই দশা।' জলার বদ্ধ জীবকে অনুকম্পা করেছে মুক্তগতি ঝরনা।

বিভীষণের কাজ চলেছে কেমন করে তা আমরা অধ্যাপকের মুখে শুনতে পাই,

> আমাদের এই পাহাড়তলা জুড়ে একটা সরোবর ছিল, শঙ্খিনী নদীর জল এসে তাতে জমা হতো। একদিন তার বাঁ দিকের পাথরের স্তূপটা কাত হয়ে পড়লো, জমা জল পাগলের অট্টহাসির মতো খলখল করে বেরিয়ে চলে গেলো। কিছুদিন থেকে রাজাকে দেখে মনে হচ্ছে ওর এই সঞ্চয় সরোবরের পাথরটাতে চাড় লেগেছে, তলাটা ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ে এসেছে।

কিন্তু সত্যিই শক্তিধরের শক্তি দুর্বল হয়ে আসে প্রকৃতির কাছে, প্রেমের কাছে। সুন্দরের কাছে তার নতি স্বীকার না করে উপায় নেই। নন্দিনী বলে, 'আমি নারী বলে আমাকে ভয় কর না? বিদ্যুৎ শিখার হাত দিয়ে ইন্দ্র তাঁর বজ্র পাঠিয়ে দেন। আমি সেই বজ্র বয়ে এনেছি।' সত্যিই নন্দিনীর বজ্রের আঘাতে রাজার সুপ্ত যৌবন, জীবন, আনন্দ-চেতনা জেগে উঠেছে। নিজের ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে রাজা আর্তনাদ করে উঠেছে, 'আমি যৌবনকে মেরেছি এতোদিন ধরে আমি সমস্ত শক্তি নিয়ে কেবল যৌবনকে মেরেছি, মরা যৌবনের অভিশাপ আমাকে লেগেছে।'

এই আত্মসচেতনতার উপলব্ধিতে, চিন্ময় শক্তির জাগৃতিতে অহমিকার অবসানে মুক্তি পেলো রাজা। নন্দিনী তার নীলকণ্ঠ পাখির পালক পরিয়ে দিল রাজার মুকুটের চূড়ায়। বদ্ধ আশ্রয় ভেঙ্গে রাজা বেরিয়ে পড়ল প্রেম ও আনন্দের সন্ধানে।

নন্দিনী রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রেম ও কল্যাণের মূর্ত প্রতীক। জীবনের সর্ব গ্লানি থেকে সে শক্তিমান পুরুষকে বাঁচিয়েছে, মুক্তি দিয়েছে তাকে আত্মগ্লানির পাপপঙ্ক থেকে, সর্বনাশা আত্মদহন থেকে।

নন্দিনী চরিত্র 'অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা'র সূত্রে বিচার্য নয়। কবি সত্যিই বলেছেন, 'রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি নন্দিনী বলে একটি মানবীর ছবি। চারিদিকের পীড়নের ভিতর দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ। ফোয়ারা যেমন সঙ্কীর্ণতার পীড়নে হাসিতে অশ্রুতে কলধ্বনিতে ঊর্ধ্বে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে তেমনি।' এ সত্য বিনোদিনী সম্পর্কেও প্রযোজ্য। জীবনের শুরু থেকে যে পীড়ন চলেছিল তার দেহ ও মনের ওপর, তারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বিনোদিনী জ্বলে উঠেছিল। তার সেই জ্বালা তাকে ঘর ছাড়তে বাধ্য করেছিল, আবার সেই প্রেরণাই তাকে ঘরে ফিরিয়ে এনেছে। বিনোদিনীর জীবনে মুক্তির আনন্দ বয়ে এনেছিল তার ওই সহস্র বন্ধনের গ্রন্থি।

প্রকাশকালের ভিত্তিতে কুমুদিনী এ তিন কন্যার মধ্যে কনিষ্ঠা। ১৩৩৪-৩৫ সালে 'বিচিত্রা'য় ধারাবাহিকভাবে এ উপন্যাসখানা প্রকাশিত হয়। প্রথম দু' সংখ্যায় এর নাম ছিল 'তিন পুরুষ'। তৃতীয়বারে ঔপন্যাসিক এর নামকরণ করলেন 'যোগাযোগ'।

আত্মপ্রকাশের দিক দিয়ে 'রক্তকরবী' ও 'যোগাযোগে'র ব্যবধানকাল মাত্র তিন বছর, কিন্তু এ দু'খানা গ্রন্থের মুখ্য বিষয়বস্তুর অপূর্ব একাত্মতা বিস্ময়ের বস্তু। মনে হয় কবি-মানস এ সময়ে বাহ্যিক শক্তির দম্ভ ও কল্যাণস্পর্শের অভাবের বেদনায় ভেতরে ভেতরে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। আমাদের সমাজ-জীবনে নারীর স্থান দেখে সম্ভবত রুদ্ধশ্বাস কবি ভেবেছিলেন সেই প্রেমময়ী কল্যাণময়ীদের মর্মযাতনার কথা। সদ্য আমেরিকা থেকে ফিরে এ দিকে তাঁর দৃষ্টি আরো প্রখরভাবে পড়েছিল। করুণা অনুভব করেছিলেন সেই স্বর্ণস্তূপের অধিকারী আত্মদর্পী ক্ষুদে রাবণদের জন্যে।

'যোগাযোগ' উপন্যাসের নায়ক মধুসূদনও এমনি এক স্বর্ণলঙ্কার রাজা রাবণ বা যক্ষপুরীর জালের আড়ালে অবস্থিত ভয়ঙ্কর শক্তির প্রতীক। কুমুদিনী অনাঘ্রাত প্রভাতপুষ্পের মতোই কোমল নির্মল এবং পবিত্র, নন্দিনীর মতো সেও ভেসে যেতে চায় প্রেমের বন্যায়। কল্পনায় সে তার চিরসুন্দরকে স্থান দিয়ে রেখেছে তার মনের মণিকোঠায়। নন্দিনী ধ্রুবতারাকে প্রণাম জানিয়ে নীলকণ্ঠ পাখির প্রত্যাশায় থাকে, নীলকণ্ঠ তাকে জানিয়ে দেবে তার দয়িতের আগমনবার্তা। তেমনি মধুসূদনের সঙ্গে যখন কুমুর বিয়ের প্রস্তাব এল,

> ঠিক এই সময়ে কুমুর আবার বাঁ চোখ নাচল। শুভলক্ষণের কি অপূর্ব রহস্য। কিনু আচায্যি কতবার তার হাত দেখে বলেছে রাজরানী হবে সে। করকোষ্ঠির সেই পরিণত ফলটা আপনি যেচে আজ তার কাছে এসে উপস্থিত।—তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়েই সে পাঁজি খুলে দেখলে আজ মনোরথ দ্বিতীয়া।

সানন্দে নিঃশঙ্কচিত্তে কুমু বরণ করে নিল তার অনাগত ভাগ্যবিধাতাকে। একে ধর্মীয় কুসংস্কার বলে উপেক্ষা করা যায় না, এ নারী-মনের এক গোপন রহস্য। একে বাইরে এনে দিনের আলোয় বিচার করা যায় না। তাই ঔপন্যাসিক বলেছেন, 'হৃৎপিণ্ডটা পাঁজরের আড়ালে থেকেই কাজ করে।'

বিচক্ষণ বিপ্রদাস শিউরে উঠলেন কুমুর মনোভাবের পরিচয় পেয়ে। কারণ তিনি জানতেন, 'ভাগ্যের নিষ্ঠুরতা সবচেয়ে অসহ্য যখন সে সোনার রথ আনে যার চাকা অচল।' কিন্তু কুমুর কাজে বিচার-বিবেচনার যুক্তিতর্ক নেই, তার অন্তর্লোকে যুক্তিতর্কের প্রবেশ নিষেধ। বিশ্বাসের অধিকারে, ভক্তির প্রাচুর্যে সে তার নিজের জগৎ গড়ে নিয়েছে

আত্মসচেতনতার প্রথম লগ্নে। তার অদৃষ্ট–নিরূপিত ভাবীকালের দৃশ্যে সে দেখেছে তা। আপন মনে গড়া নিজের সংসার। 'তারই মাঝখানে নিজের সতীলক্ষ্মী রূপের প্রতিষ্ঠা—কতো ভক্তি, কতো পূজা, কতো সেবা।'

বিপ্রদাস এ বিয়েতে বাধা দিতে গিয়ে পরাজয় মানলেন, কারণ, 'অমাবস্যার সঙ্গে কুস্তি চলে না।' কুমুর চিত্তের অন্ধকার মহলের ওপর তাঁর দখলও নেই, জোরও চলে না।

বিয়ে ঠিক হবার পর থেকে কুমু 'রাত্রে বিছানায় বসে প্রণাম করে, সকালে উঠে বিছানায় বসে আবার প্রণাম করে। কাকে করে সেটা স্পষ্ট নয়—একটা নিরবলম্ব ভক্তির স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস।'

কিন্তু বিয়ের পর থেকে কুমুর ইষ্টদেবতা শঙ্কিত হয়েছে, স্বামীকে তার ভয় করছে। 'পাখীর মনে হচ্ছে তার জন্যে বাসা নেই, আছে ফাঁস।' স্বামীকে কুমু জানে না। শুধু এই ধারণাই কুমুর হল—'মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বদাই কি একটা প্রতিজ্ঞা যেন গুলি পাকিয়ে আছে, যেন ভাগ্যদেবতার কামান থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে চলেছে একটা একগুঁয়ে গোলা।' এখানে আর এতটুকু সংশয় থাকে না যে মধুসূদন যক্ষপুরীর রাজার সহোদর। এরা শুধু তাল তাল সোনা সঞ্চয় করেই চলেছে, ডাইনে–বাঁয়ে তাকাবার সময় বা প্রবৃত্তি তাদের নেই।

শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় কুমু তাই সহজ হতে পারল না। ইতোমধ্যেই কুমু বুঝেছে তার কল্পনার সংসার মাটিতে গড়া নয়, ধাতুতে গড়া। যাবার সময় কুমুর মনে হল—'ঝড়ে যখন নৌকাকে ডাঙ্গা থেকে টেনে নিয়ে যায় তখন নোঙ্গর যেমন করে মাটি আঁকড়ে থাকতে চায় দাদার পায়ের কাছে কুমুর তেমনি এই শেষ ব্যগ্রতার বন্ধন।' এ শুধু বিচ্ছেদের বেদনা নয়, যে বিভীষিকার ভেতর সে নবীনকে বরণ করে নিচ্ছে এ তারই অব্যক্ত ক্রন্দন।

মধুসূদন স্ত্রীকে প্রেমিকা অথবা জীবনের কল্যাণদাত্রী রূপে গ্রহণ করে নি। 'রক্তকরবী'র রাজা যেমন জালের আড়ালে থেকে এক হাত বের করে নন্দিনীকে স্পর্শ করতে চেয়েছিল মধুসূদনও তেমনি ভেবেছিল এ তার জীবনের শত কর্মের বন্ধনের মধ্যে অবসর বিনোদনের একটি সামগ্রী মাত্র,

> স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহার করবারও যে একটা কলানৈপুণ্য আছে, তার মধ্যেও যে পাওয়ার বা হারাবার একটা কঠিন সমস্যা থাকতে পারে এ কথা তার হিসাবদক্ষ সতর্ক মস্তিষ্কের এক কোণেও স্থান পায়নি; বনস্পতির নিজের পক্ষে প্রজাপতি যেমন বাহুল্য অথচ প্রজাপতির সংস্পর্শ যেমন তাকে মেনে নিতে হয়, ভাবী স্ত্রীকেও মধুসূদন তেমনি করেই ভেবেছিল।

মধুসূদনের স্বরূপে নিজেকে প্রতিবিম্বিত হতে না দেখে কুমুর অন্তর আর্তনাদ করে উঠল—'ঠাকুর, বল দাও, বল দাও, আমার জীবন কালি করে দিও না। আমি তোমার দাসী, আমাকে জয়ী করো, সে জয় তোমারই।'

কুমুর এ মানসিকতার খবর পেয়ে মোতির মা বিস্মিত হল, কারণ 'ছোট ছেলে কাঁচা ফলটাকে যেমন টপ করে বিনা আয়োজনে মুখে পুরে দেয় স্বামীর সংসার তেমনি করেই বিনা বিচারে আমাদের গিলেছে, কোথাও কিছু বাধেনি।' মোতির মা এদেশের নিরানব্বইটা মেয়ের প্রতিনিধি। মেয়েমানুষের মনের বালাই থাকবে সে কেমন কথা? তাই তো কুমু তার বিস্ময় উৎপাদন না করে পারে নি।

ফুলশয্যার প্রথম মিলনলগ্নে কুমুর মন বলেছে, 'এই আমার অভিসার, বাইরে অন্ধকার—ভেতরে আলো।' 'মেরে গিরিধর গোপাল, ঔর নাহি কোহি।' স্বামী এখানে ব্যক্তি নন, একটি সচেতন অন্তরসত্তা মাত্র।

কিন্তু দাদার দেওয়া আংটির অবমাননায় গোপালের অঙ্গে ফাটল ধরল, গিরিধর কেঁপে

উঠলেন, কুমুর মনে সংশয় জাগল তার ইষ্টে দেবতার স্বরূপ নির্ণয়ে। দ্বন্দ্ব বাধল স্বামীত্বে আর সতীত্বে। রবীন্দ্র–নারীমানসের এ সংঘাত সম্পর্কে হুমায়ুন কবির বলেছেন,

> সংস্কারের হঠাৎ আঘাতে মানুষের মনে যে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তা ব্যাখ্যার অতীত। পৃথিবীর সমস্ত দেশে মানুষের মন সংস্কারের মধ্যে বড় হয়। সংস্কার–আশ্রিত মনের ঠিক জায়গাটিতে আঘাত লাগলে তার কি পরিবর্তন হবে তা বলা কঠিন।

এ উক্তির সত্যতা আমরা উপলব্ধি করি 'নৌকাডুবি'র কমলা চরিত্রে। যে মুহূর্তে কমলা জেনেছে রমেশ তার স্বামী নয়, সেই মুহূর্তেই তার মনোবৃত্তি ভিন্নপথ ধরেছে। স্বামীত্বের সংস্কারে আঘাত লাগায় কুমুর সতীত্বের সংস্কার মাথা তুলে দাঁড়াল।

রাজবাড়ির পাষাণস্তূপে বন্দি হল কুমুর প্রাণ। প্রকৃতির সঙ্গে সহজ সম্পর্ক স্থাপনের একটুখানি মুক্তির স্বাদ পেতে সে খুঁজে নিল উন্মুক্ত ছাদের কোণটি। নন্দিনী বিশুকে বলেছে, 'এই বন্ধ গড়ের ভেতরে কেবল তোমার আমার মাঝখানটাতেই একখানা আকাশ বেঁচে আছে, বাকি আর সব বোঁজা।' মধু–প্রাসাদও ঠাস–গাঁথুনিতে সবার আকাশ বন্ধ করে দিয়েছে।

মধুসূদন যে মাঝে মাঝে নিজেকে না বোঝে তা নয়। সে উপলব্ধি করে, 'সে নিজে একটুও সহজ নয়, আর কুমু যেন একেবারে দেবতার মতো সহজ। তার সঙ্গে কুমুর এই বৈপরীত্য তাকে এমন প্রবলবেগে টানছে', যেমন টেনেছিল নন্দিনীকে যক্ষপুরীর রাজা। তাই দুপুর রাতে মধুসূদন কুমুর কাছে হার মানতে আসে। রাবণ জানতে পারে স্বদেহে বিভীষণের অস্তিত্ব।

এরপর কতভাবে মধুসূদন কুমুকে বুঝিয়েছে, 'তোমার কাছে আমি অসংকোচে হার মানছি।' কিন্তু কুমু তাকে আর সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে নি। প্রেমহীন দেহদানের অভিশাপ কুমু সইবে কী করে ? বিদ্রূপ করে মধুসূদন বলেছে, "তোমার দাদার সঙ্গে পরামর্শ করে স্বামীর ঘর করতে চাও?' প্রেম নিবেদনে কুমু বিচলিত হয়েছে, শঙ্কিত হয়েছে, কিন্তু আঘাতে জেগে উঠেছে, বলেছে, 'হ্যাঁ, দাদা আমার গুরু।' স্বামীর আদেশ দেবতার নির্দেশ মনে করে কুমু পালন করতে চেয়েছে, কিন্তু এভাবে মধুসূদনও তাকে গ্রহণ করতে পারে নি। তার মনে হল, 'এ যেন বিধবার মূর্তি—ওর স্বামী আর ওর মাঝখানে যেন একটা নিস্তব্ধ মৃত্যুর সমুদ্র। তর্জন করে এ সমুদ্র পার হওয়া যায় না। পালে কোন্ হাওয়া লাগলে তরী ভাসবে? কোনোদিন কি ভাসবে?' মধুসূদন বুঝেছে, 'এই মেয়েই তো পারে ঐশ্বর্যকে অবজ্ঞা করতে। সহজ সম্পদে মহীয়সী হয়ে জন্মেছে—ওকে ধনের দাম কষতে হয় না, হিসেব রাখতে হয় না—মধুসূদন ওকে কী দিয়ে লোভ দেখাতে পারে।'

ঠাকুরের ওপর, ইষ্টদেবতার ওপর অভিমান হল কুমুর,

> যে আহ্বানকে সে দৈব বলে মেনে ছিল সে কি ওই অশুচিতার মধ্যে এই আন্তরিক অসতীত্বে? ঠাকুর নরবলি চান বলেই শিকার ভুলিয়ে এনেছেন নাকি; যে শরীরটার মধ্যে মন নেই সেই মাংসপিণ্ডকে করবেন তাঁর নৈবেদ্য?

পরবর্তীকালে শরৎ–সাহিত্যের নারী–মানসে সংস্কার ও বুদ্ধিবৃত্তির যে দ্বন্দ্ব আমরা দেখতে পাই তা এই প্রেমহীন বিবাহবন্ধনের স্বীকৃতির সঙ্কোচ।

নিজের মন সম্পর্কে কুমু উক্তি করেছে :

> আমি নিজের মধ্যে যে কিছুই খুঁজে পাই নে। এতো বড়ো ফাঁকি নিয়ে আমি ওঁর সেবা করবো কি করে? কাল রাত্রিতে বসে বসে মনে হল আমি যেন বেয়ারিং লেফাপা, আমাকে দাম দিয়ে নিতে হয়েছে, খুলে ফেললেই ধরা পড়বে যে চিঠিও নেই।

এ কুমুর আত্মাবমাননা নয়, মধুসূদনের প্রতি তার শ্রদ্ধাহীন পত্নীপ্রেমের অভিশাপ, যে অভিশাপে আজ বিংশ শতাব্দীর সচেতন নারী–মানস ব্যথা–বেদনায় জর্জরিত। মোতির মা

এত কথা বোঝে না। সে জানে, 'স্বামী যে মুহূর্তে প্রসন্ন হবে, সেই মুহূর্তে অবিলম্বে স্ত্রী সেটাকে সৌভাগ্য বলে মনে করবে।' বাংলাদেশের সতী–সাবিত্রীর এই তো চিরাচরিত বদ্ধ ধারণা। পতিদেবতা তুষ্ট হলে জগৎ তুষ্ট। তাই ঔপন্যাসিক বলেছেন,

> যে চীনে মেয়ে প্রথার অনুসরণে নিজের পা বিকৃত করতে আপত্তি করে নি সে যদি শোনে জগতে এমন মেয়ে আছে যে আপনার ওই পদসংকোচ পীড়নকে স্বীকার করা অপমানজনক বলে মনে করে তবে নিশ্চয়ই সেই কুণ্ঠাকে সে হেসে উড়িয়ে দেয়, নিশ্চয়ই বলে ওটা ন্যাকামি।

স্বতন্ত্র চিন্তাশক্তি নিয়ে বিংশ শতাব্দীর কুমু তাই মোতির মায়ের বিস্ময়, তার আচরণও মোতির মায়ের কাছে তাই ন্যাকামি।

কুমু স্বামীর মনে যে আকাঙ্ক্ষার আসক্তি জাগিয়ে এল তার তৃপ্তি মিলল শ্যামাসুন্দরীতে। কিন্তু শ্যামাসুন্দরীকে তাই বলে মধুসূদন হৃদয় দান করে নি। কারণ ও বস্তু তার আদৌ আছে কি না তাই আমাদের সংশয়। তাই,

> শ্যামা সম্বন্ধে ওর কল্পনায় রঙ্ লাগে নি, অথচ খুব মোটা রকমের একটা আসক্তি জন্মেছে, যেন শীতকালের বহু ব্যবহৃত ময়লা রেজাইটার মতো তাতে কারুকাজের সম্পূর্ণ অভাব, বিশেষ যত্ন করবার জিনিস নয়, খাট থেকে ধুলোয় পড়ে গেলেও আসে যায় না। কিন্তু ওতে আরাম আছে।

এই স্থূল এবং কদর্য মানসিকতার খবর বিপ্রদাসের কানে পৌঁছেছে। তাই তিনি কুমুকে বলেছেন, 'অপমান সহ্য করে যাওয়া শক্ত নয়, কিন্তু সহ্য করা অন্যায়। সমস্ত স্ত্রীলোকের হয়ে তোমাকে তোমার নিজের সম্মান দাবি করতে হবে, এতে সমাজ তোমাকে যত দুঃখ দিতে পারে দিক।'

সন্তানের বন্ধনে আবদ্ধ কুমুকে ফিরে যেতে হল মধুপ্রাসাদে, এ কুমুর সুখের যাওয়া নয় কারণ এ যাওয়া সম্মানের নয়। 'আমি ওদের বড়বৌ তার কি কোনও মানে আছে যদি আমি কুমু না হই?'

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও অহংসত্তা বিসর্জন দিয়ে সংসারের অন্তঃসারশূন্য প্রতিষ্ঠা কুমু কামনা করে না। সে চায় প্রেমের মধ্যে মধুসূদনের হৃদয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে, সংসারে বাহ্যিক ঐশ্বর্যের চাকচিক্য তার জন্যে নয়। শক্তি তাকে জয় করতে পারল না। যেমন পারে নি তার সর্বশক্তি নিয়ে যক্ষপুরীর রাজা নন্দিনীকে জয় করতে। ধ্বজাপূজার দণ্ড ভেঙেই সে পেয়েছিল নন্দিনীকে।

রবীন্দ্রসাহিত্যের এ তিন নারীকে আমরা সাংসারিক স্থূলদৃষ্টিতে যে রূপেই প্রত্যক্ষ করি না কেন এদের আত্মিক অনুভূতি এক। এরা প্রেমের হাটে নিজেদের বিকিয়ে দিতে চেয়েছে কিন্তু পাশব–শক্তি বা ঐশ্বর্যের দম্ভকে করেছে ঘৃণা। সেখানে এরা ইন্দ্র–প্রেরিত বজ্র; আগুন জ্বেলেছে, দগ্ধ করেছে কিন্তু স্বদাহিকা শক্তিতে দগ্ধীভূত হয় নি। এ তিন কন্যা বিংশ শতাব্দীর বিনোদিনী, মঞ্জুলিকার রূপ, যারা জুতো মোজা পরেন, সোজা চলেন, অন্য দেশের চালে কথা বলেন। যাঁরা পিতামাতার জীবনে পর্যন্ত সংযমের অভাব দেখলে তাঁদের ঐ সম্পর্কিত নির্দেশ মানতে রাজি নন। উপরন্তু সগর্বে সমাজনীতি ও মনু–মহাভারতকে তুচ্ছ করে নিজের মনোধর্মের সমর্থনে পথ চলেন। তাঁরাই এ তিন কন্যার অন্তর প্রকৃতিতে রূপায়িত। এঁরা 'শেষের কবিতা'র লাবণ্যর মতো প্রাণ ঢেলে ভালবেসে বিয়ের বন্ধনকে অস্বীকার করে প্রেমকে চিরগৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। তাই রবীন্দ্রনাথ ওদের স্থান নির্দেশ করেছেন বর্তমান সমাজের হৃদয়শক্তিতে পুরুষের পাশে কল্যাণের আসনে, এঁদের জীবনে সংগ্রাম আছে, বিপদ আছে, আছে বাধা, কিন্তু স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আনন্দ এদের জীবনকে দিয়েছে মনুষ্যত্বের চরম চাওয়া, পরম পাওয়া, আত্মগৌরবের মহিমা।

আনোয়ার পাশা

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প : শেষ পর্যায়

[প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে প্রায় দেড় বৎসর ইউরোপ–আমেরিকা পরিভ্রমণান্তে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে কবি দেশে ফেরেন এবং তার মাসখানেক পরেই তাঁর নোবেল প্রাইজ পাওয়ার খবর প্রচারিত হয়। এই সময় কবির সমগ্র সৃষ্টি–সাধনায় একটা পরিবর্তনের পালা আসে। এই পরিবর্তনের ছাপ রয়েছে 'বলাকা'র কবিতাবলিতে, 'ঘরে–বাইরে' উপন্যাসে এবং 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত হতে থাকা 'হালদারগোষ্ঠী', 'স্ত্রীর পত্র' প্রভৃতি গল্পে। এইখান থেকেই রবীন্দ্র–ছোটগল্পের সবুজপত্র যুগের সূচনা। 'সবুজপত্রে' মোট দশটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল।]

'সবুজপত্র' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩২১ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ (১৯১৪ খ্রি.), কবির ৫৩তম জন্মদিনে। ঐ প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয় কবিগুরুর একটি কবিতা, একটি ছোটগল্প ও একটি প্রবন্ধ—যথাক্রমে, 'সবুজের অভিযান', 'হালদারগোষ্ঠী' এবং 'বিবেচনা ও অবিবেচনা'। 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধে কবি লিখলেন : 'দেশের নব–যৌবনকে আর নির্বাসিত করিয়া রাখিতে পারিবে না। তারুণ্যের জয় হউক, তাহার পায়ের তলায় জঙ্গল মরিয়া যাক, জঞ্জাল সরিয়া যাক, কাঁটা দলিয়া যাক, পথ খোলাসা হউক, তাহার অবিবেচনার উদ্ধত বেগে অসাধ্য সাধন হইতে থাক।' 'সবুজের অভিযানে'র প্রারম্ভসূচক চরণ কয়টি হচ্ছে,

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।

এই তারুণ্য এই নবীনের জীবন্ত বিগ্রহ কবি রচনা করলেন 'হালদারগোষ্ঠী'র বনোয়ারিলালের মধ্যে। বনোয়ারি হালদারগোষ্ঠীর চিরাচরিত প্রথা অনুসারে একটি নিয়মাবদ্ধ প্রণালীতে জীবনকে অতিবাহিত হতে না দিয়ে নবযুগের মানুষের দুরন্ত নবীন জীবন–সাধনাকে অঙ্গীকার করতে চেয়েছে। মানব–মাহাত্ম্যের এই নব–উপলব্ধিই কবিকে তাঁর সৃষ্টিক্ষেত্রে কোনোদিন জরাগ্রস্ত হতে দেয় নি। নব–উপলব্ধি কথাটা এইজন্যই বলতে হচ্ছে যে, এর আগেও মানব–মাহাত্ম্য সম্পর্কে কবি–চেতনা বিন্দুমাত্রও উদাসীন নয়, বা কোনোখানেই কবি মানুষের অসীম সম্ভাবনার প্রতি আস্থাহীন নন। 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ'—এই সবল ঘোষণা অশীতিপর বৃদ্ধ কবির কণ্ঠনিঃসৃত হলেও সব বয়সের রবীন্দ্রনাথেরই এ হচ্ছে অন্তরতম বাণী। তবু 'সবুজপত্রে'র যুগে নব তারুণ্যের জয়–ঘোষণা

সবিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত। লক্ষ করা যাবে, এর পর থেকেই কবি অধিকতর বাস্তবতার অভিমুখী; জীবনের রূঢ়তা ও প্রতিদিনের তুচ্ছতা তিক্ততা বাস্তবমূর্তি নিয়ে তাঁর রচনায় আত্মপ্রকাশ করছে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর নিষ্ঠুর স্পষ্টতাসহকারে। নিষ্ঠুর সেই মূর্তি যা বুদ্ধির রশ্মিপাতে রবীন্দ্র-সৃষ্টিতে, বিশেষ করে তাঁর গদ্য রচনাবলিতে অতঃপর রূপ পেতে লাগল। সাধারণভাবে আমাদের জীবনযাত্রায় থাকে একটা গতানুগতিকতা; বুদ্ধির আশ্রয়ে নয়, বিশ্বাসের অন্ধগুহায় স্বেচ্ছানির্বাসন লাভ করার একটা প্রবণতা আমাদের মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট, শান্তি ও স্বস্তির নামে অসত্য ও আত্মপ্রবঞ্চনা আমাদের চিরসঙ্গী,—এই সবেরই বিরুদ্ধে সচেতনভাবেই প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছে এই পর্যায়ের রচনাবলি। অবশ্য পূর্বেও দু-একটি গল্পে সমাজের মূঢ়তা ও অবিবেচনার প্রতি কবির বিদ্রোহাত্মক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে স্পষ্টরূপেই; 'মানভঞ্জন' গল্পের গিরিবালা, কিংবা 'দিদি' গল্পের শশি, কবির পরিণত পর্বের মৃণাল, কিংবা কল্যাণীর কথা অনেকখানি স্মরণ করিয়ে দেয়। পার্থক্য এইখানে যে, গিরিবালা কিংবা শশিতে হৃদয়ের আবেগ যত আছে, বুদ্ধির দীপ্তি তত নেই। মৃণালের তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার ব্যঙ্গ-কটাক্ষ, বুদ্ধির ঝলক এবং আবেগহীন বাস্তবদৃষ্টি ইতঃপূর্বে কোনো নারী-চরিত্রে লক্ষ করা যায় নি। এই 'সবুজপত্র'-যুগ সম্পর্কে এক সমালোচক মন্তব্য করেছেন :

> জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন-আধ্যাত্মিকতার সকল পথ ঘুরে কবির উপলব্ধির নৌকো জীবনের ঘাটে ঘাটে ফিরে এবার পরিণতির তীর্থ-মন্দিরের অভিমুখী হয়েছে। এখানে বলবত্তম মনীষা অখণ্ডতম উপলব্ধির সঙ্গে হরগৌরী সম্মিলনে বাঁধা পড়েছে। এবার কবির লেখায় কি গদ্যে, কি পদ্যে, কি উপন্যাসে-গল্পে-প্রবন্ধে, সর্বত্র এক অপূর্ব আলোকের দীপ্তি ঠিকরে পড়েছে। এ যেন নিজের শক্তিকে সম্পূর্ণ জানতে পারার প্রশান্ত প্রত্যয়ের আকাশে সহজস্ফূর্ত বুদ্ধির ধারালো বিদ্যুৎ ঝলক। এই সময় থেকে কবির মুখের কথা কেবল বাচ্যার্থকে নয়, ব্যঙ্গার্থকেও ছাড়িয়ে গেছে,—প্রকাশশৈলী হয়ে উঠেছে একসঙ্গে তীব্র ধারালো,—সাংকেতিক। বিশ্বসম্মান লাভের দায়িত্ব স্বীকার করে এবং বিশ্ববিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কবি-আত্মাও এই পর্যায়ে তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসাকে প্রাণের উত্তাপ দিয়ে দিয়ে অখণ্ড সম্পূর্ণ করে দেখতে চাইছিল। তাই ভাষার মধ্যে দূরযানিতা যেমন ছিল, তেমনি বুদ্ধিদীপ্ত তীক্ষ্ণতা আর তির্যক ভঙ্গিও ছিল প্রবল। ফলে, এই সময়কার রচনাপ্রবাহ বিশেষভাবে চেতনাকে আঘাত যত করে, আন্দোলিত করে তার চেয়ে আমূল। ('বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার' : ভূদেব চৌধুরী)।

এই পর্বেই উপন্যাসে ও ছোটগল্পে কথ্য ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি শুরু করেন তিনি। বলা বাহুল্য, প্রমথ চৌধুরী বাংলা-সাহিত্যে কথ্য ভাষার জনক বলে একটা যে কথা আছে সেটার মধ্যে সত্য অল্পই আছে। বহু পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ 'ছিন্নপত্রে'র অপূর্ব সাহিত্যগুণসম্পন্ন পত্রাবলিতে এবং 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রধারা'য় চলিত ভাষার ব্যবহার করেন। প্রমথ চৌধুরী যে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্তেই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন সেকথা নিঃসংশয়ে বলা চলে। তা হলেও 'সবুজপত্র' প্রকাশের আগে কোনো উপন্যাসে বা ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ যে চলিত ভাষার ব্যবহার করেন নি, এটিও লক্ষণীয়। রবীন্দ্র-ছোটগল্পের সংলাপের ভাষাও ইতঃপূর্বে, 'নষ্টনীড়', 'কর্মফল' প্রভৃতি দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া, সর্বত্রই ছিল সাধুভাষা। 'সবুজপত্রে'র প্রথম বছরে, অর্থাৎ ১৩২১ বঙ্গাব্দে, প্রকাশিত গল্পগুলিও তিনি রচনা করেন সাধুভাষায়, 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটি আগাগোড়াই পত্র বলে সেখানেই কেবল চলিত ভাষার প্রয়োগ লক্ষ করা যাবে। এ সবের দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় 'ছিন্নপত্রে'র রচয়িতা হয়েও চলিত ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করার ব্যাপারে অনেকদিন রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটা দ্বিধা সহজে কাটতে চায় নি, সেজন্য

প্রয়োজন হয়েছিল বীরবলী রীতির জনক বলে কথিত প্রমথ চৌধুরীর অভিযানের। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বলা হয়ে থাকে বাংলা সাহিত্যে 'চলতি ভাষা প্রয়োগের প্রথম বরমাল্য প্রমথ চৌধুরীরই প্রাপ্য' ('রবীন্দ্র-জীবনী' : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়)। প্রমথ চৌধুরীর দৃষ্টান্তেই শেষ পর্যন্ত সব দ্বিধা কেটে গিয়ে ১৩২২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকেই 'সবুজপত্রে' চলিত ভাষায় লেখা 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস প্রকাশিত হতে শুরু করে। এগার মাস ধরে 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসখানিই কেবল 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত হয়—কোনো ছোটগল্প এই সময় তিনি লেখেন নি। 'ঘরে-বাইরে' প্রকাশিত হয়ে যাবার পর মাস তিনেকের মধ্যেই আবার কবি বিদেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। জাপান-আমেরিকা ঘুরে দশ মাস পর তিনি দেশে ফেরেন ১৩২৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে। এরপর আবার তাঁকে আমরা 'সবুজপত্রে'র পাতায় পাচ্ছি ছোটগল্প-লেখক হিসেবে। কিন্তু গল্পের মৌসুম কবি-জীবনে আর আসে নি, অতঃপর কখনো আর এমন সময় কবির জীবনে আসে নি যখন ধারাবাহিকভাবে মাসের পর মাস তিনি গল্প লিখে চলেছেন। এখন থেকেই কবির গল্প লেখার গড় প্রায় দু-বছরে একটি করে। অথচ ১২৯৮ বঙ্গাব্দে 'হিতবাদী'তে গল্প লেখা শুরু করার পর প্রথম পাঁচ বছরে গল্প রচনার গড় ছিল বছরে নয়টি হিসেবে। ১৩২১ বঙ্গাব্দ গেছে তাঁর গল্প রচনার শেষ মৌসুম—এক বছরে সাতটি।

২

'সবুজপত্রে'র ১৩২৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হল রবীন্দ্রনাথের 'পয়লা নম্বর' গল্পটি। সংলাপ ও পত্ররীতির বাইরে রবীন্দ্র-ছোটগল্পে চলতি ভাষার ব্যবহার এই প্রথম। প্রকাশ-ভঙ্গিতেও এমন তীক্ষ্ণতা এবং তির্যক বাক্-বিন্যাস ইতঃপূর্বে ক্বচিৎ লক্ষ করা গেছে। নাগরিকতা ইতঃপূর্বেই রবীন্দ্র-ছোটগল্পকে স্পর্শ করেছিল। তবু 'পয়লা নম্বরে'র পূর্বে ভক্তিবাদের স্পর্শ-সম্পৃক্ত গ্রাম্য জীবনের সরল বিশ্বাসের ছবি তাঁর 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত গল্পেও পাওয়া যায়— 'বোষ্টমী'-এর উদাহরণ। কিন্তু দ্বিতীয়বার আমেরিকা-ভ্রমণ শেষে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনান্তে 'পয়লা নম্বরে' যে রবীন্দ্রনাথ আত্মপ্রকাশ করলেন, কোনোদিন তিনি আর ছোটগল্পের ক্ষেত্রে পল্লী-পটভূমিকায় কিংবা ভক্তিমার্গে প্রত্যাবর্তন করেন নি। 'পয়লা নম্বরে'র সামান্য আগে সবুজপত্রের জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪, সংখ্যায় প্রকাশিত 'তপস্বিনী' গল্পে শেষবারের মতো প্রাচীন ধর্মানুরাগ ও বিশ্বাসের আদর্শকে আঘাত হেনে রবীন্দ্রনাথ সেখান থেকে চিরতরে বিদায় নিলেন। 'তপস্বিনী'র ষোড়শী চূড়ান্তভাবে বঞ্চিত অতি হতভাগ্য একটি মানবাত্মা হওয়া সত্ত্বেও শিল্পী রবীন্দ্রনাথের এতটুকু সহানুভূতি লাভ করে নি। এখন আর ভক্তিমার্গে চিত্ত সমর্পিত করে শান্তি লাভের পুরোনো সনাতন পন্থায় আধুনিক ছোটগল্পকার রবীন্দ্রনাথের এক চুল আস্থা নেই। তিন বছর পূর্বেও 'বোষ্টমী' গল্পের লেখক একটি সামান্য গাভীকে 'বিকাল বেলাকার ধূসর রৌদ্রে লেজ দিয়া পিঠের মাছি তাড়াইতে তাড়াইতে নববর্ষার রসকোমল ঘাসগুলি বড়ো বড়ো নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে শান্ত আনন্দে খাইয়া বেড়াইতেছে' দেখে 'সহজ আনন্দময় জীবনেশ্বরকে প্রণাম' করেছিলেন, তাঁর মন ভক্তিতে ভরে উঠেছিল। কিন্তু সেই ভক্তিবাদই 'তপস্বিনী'তে চূড়ান্তরূপে বিদ্রূপ-জর্জরিত হওয়ার পর রবীন্দ্র-ছোটগল্পের আঙিনায় আর তার পুনরাবির্ভাব ঘটে নি। 'বলাই' গল্পের বলাই-চরিত্রে যে অযৌক্তিক অথচ নিষ্কলুষ প্রকৃতি-প্রীতি লক্ষ্য করা গেছে তাও শেষ পর্যন্ত বাস্তবের কাছে মার খেয়ে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত হয়েছে। বলাইয়ের প্রকৃতি-প্রীতি একান্তভাবে বলাইয়েরই— লেখকের কোনো মানস-পরিচয় সেখানে বিধৃত নয়। লেখক সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলাইয়ের প্রকৃতি-প্রীতির চিত্র অঙ্কন করেছেন। গল্পের সূচনাতে বলা হয়েছে,

> মানুষের জীবনটা পৃথিবীর নানা জীবের ইতিহাসের নানা পরিচ্ছেদের উপসংহারে, এমন একটা কথা আছে। লোকালয়ে মানুষের মধ্যে আমরা নানা জীব-জন্তুর প্রচ্ছন্ন পরিচয় পেয়ে থাকি, সে কথা জানা। বস্তুত আমরা মানুষ বলি সেই পদার্থকে যেটা আমাদের ভিতরকার সব জীবজন্তুকে মিলিয়ে এক ক'রে নিয়েছে।

ঠিক এই কারণেই গাছপালার মূল সুরও মানবপ্রকৃতিতে রয়েছে এবং তা বলাইয়ের প্রকৃতিতে ছিল সবচেয়ে প্রবলভাবে। অর্থাৎ বলাই চরিত্রকে বিজ্ঞানের ছাঁচে ফেলে গড়ে তোলার একটা চেষ্টা গল্পের মধ্যে অতি-প্রত্যক্ষ। লক্ষ্য করতে হবে, একমাত্র বলাইয়ের কাকী ছাড়া আর সবাই তার প্রকৃতি-প্রীতি নিয়ে হাসাহাসি করেছে। 'শেষকথা' গল্পে তো প্রকৃতিকে মানুষের বিকাশের পথে একটা অন্ধ শক্তির বাধা বলেই মনে করা হয়েছে। অচিরার উক্তিতেই শোনা যাক : 'এই চিরকালের বনের মধ্যে যে একটা অন্ধ প্রাণের শক্তি আছে, ক্রমেই তাকে আমার ভয় করছে।' এই ভয়ের কারণ অচিরা জেনেছে : 'দীর্ঘকালের প্রয়াসে মানুষ চিত্তশক্তিতে নিজের আদর্শকে গড়ে তোলে, প্রাণশক্তির অন্ধতা তাকে ভাঙে।' অচিরা প্রকৃতির প্রভাব থেকে আপনাকে রক্ষা করতে আবার অতি দ্রুত লোকালয়বাসিনী হয়েছে। তার বিশ্বাসের মধ্যে প্রকৃতির অন্ধ শক্তির উপলব্ধি আছে, কিন্তু তাকে মেনে নেবার প্রবৃত্তি নেই—তার জীবনাদর্শ অনুসারে ঐ অন্ধশক্তির হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারার মধ্যেই মনুষ্যত্বের এবং মনুষ্যজীবনের সার্থকতা। 'সুভা', 'সমাপ্তি' প্রভৃতি গল্পের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের এ পরিবর্তন সামান্য নয়।

অবশ্য 'তপস্বিনী' পর্যন্ত গল্প-বর্ণনার মধ্যে মাঝে মাঝে প্রকৃতির আবির্ভাব পূর্ববর্তী যুগের গল্পগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। মানুষের গল্পে অনেকখানি স্থান জুড়ে প্রকৃতির উপস্থিতি 'সাধনা'-'ভারতী'র যুগে রচিত গল্পগুলির বিশেষ বৈশিষ্ট্য, সেখানে অনেকখানি কথা রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন। উপমাসৃষ্টির, গল্প-বর্ণনার, এমনকি চরিত্রাঙ্কন-প্রয়োজনেও প্রকৃতির ব্যাপক অনুপ্রবেশ তৎকালীন রবীন্দ্র-ছোটগল্পে লক্ষ্য করা যায়। এই অবস্থাটা 'সবুজপত্রে'র যুগে এসে বিচলিত হতে দেখি, যদিও প্রথমদিকে কয়েকটি গল্পে ঐ ধারার একটা ক্ষীণ অনুসৃতি বিদ্যমান। 'বোষ্টমী' গল্পের কথা কিছু আগেই বলা গেছে, এ সময়কার আরো কয়েকটি গল্পে প্রকৃতির ভূমিকা এখানে অনুধাবন করা যেতে পারে। 'ভাইফোঁটা' গল্পের শুরুটাই হয়েছে এইভাবে :

> শ্রাবণ মাসটা যেন একরাত্রে একেবারে দেউলে হয়ে গেছে। সমস্ত আকাশে কোথাও একটা ছেঁড়া মেঘের টুকরাও নাই। আশ্চর্য এই যে, আমার সকালটা আজ এমন করিয়া কাটিতেছে। আমার বাগানের মেহেদি-বেড়ার প্রান্তে শিরীষগাছের পাতাগুলা ঝল্‌মল্ করিয়া উঠিতেছে, আমি তাহা তাকাইয়া দেখিতেছি।—আজ সমস্ত ভয়ভাবনা হইতে এমনি ছুটি পাইয়াছি যে, ঐ-যে আতা গাছের ডালে একটা গীরগিটি স্থির হইয়া শিকার লক্ষ্য করিতেছে সেটার দিকেও আমার চোখ রহিয়াছে।

সমস্ত গল্পের মূল সুরটিকেই এখানে প্রকৃতিবর্ণনার মধ্যে আভাসিত হতে দেখা যায় এবং প্রকৃতির এমনতরো ব্যবহার 'সাধনা'-'ভারতী'র যুগের কথাই স্মরণ করিয়ে দেবে। 'তপস্বিনী' গল্পেও শুরুতেই পাচ্ছি :

> বৈশাখ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। প্রথম রাত্রে গুমট গেছে, বাঁশগাছের পাতাটা পর্যন্ত নড়ে না, আকাশের তারাগুলো যেন মাথা ধরার বেদনার মতো দব্ দব্ করিতেছে। রাত্রি তিনটার সময় ঝির্ ঝির্ করিয়া একটুখানি বাতাস উঠিল।

এখানেও বোশেখ মাস শেষ হয়ে আসার কথাতেই গল্পের মূল সুরটি বাঁধা হয়ে গেছে।

তা হলেও, আলোচ্য দুটি গল্পেরই প্রারম্ভে প্রকৃতি আবির্ভূত হয়ে সেখানে একটা যে সবুজ শ্রী দিতে চেষ্টা করেছে সেটা বুদ্ধিধর্মিতার বিরোধী এ-কথা মেনে নিয়েও বলা যায়, গল্প দুটির অবশিষ্টাংশে ঐ বুদ্ধিধর্মিতাকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে প্রকৃতিরই একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি। 'সবুজপত্র'র যুগে রচিত গল্পে তা আশাও করা যায় না।

'তপস্বিনী'র পর প্রকৃতির ভূমিকা রবীন্দ্র-ছোটগল্প থেকে একরকম তিরোহিত। তার পরিবর্তে বিজ্ঞানের ক্রম-প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। বর্ণনায় সংলাপে এমনকি উপমা-সৃষ্টিতেও ক্রমেই বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তাধারা বেড়ে চলেছে—এটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

> তাদের বিদ্যার জগৎ টলেমির পৃথিবীর মতো আঠারো-উনিশ শতাব্দীর সঙ্গে একেবারে যেন ইস্ক্রু দিয়ে আঁটা; বাংলাদেশের ছাত্রের দল পুত্রপৌত্রাদিক্রমে তাকেই যেন চিরকাল প্রদক্ষিণ করতে থাকবে। (পয়লা নম্বর)
>
> আমি তাঁর মনোযোগ-মীটারের জিরো পয়েণ্টের নীচে ছিলুম। (পাত্র ও পাত্রী)
>
> আমার উৎসাহের তাপমাত্রা ৯৮-অঙ্কেরও নীচে ছিল। (নামঞ্জুর গল্প)
>
> মিটিয়রলজিস্ট্ তোমার মুখ দেখলে ঝড়ের সিগনাল দিত। (চোরাই ধন)
>
> যৌবনের গোড়ার দিকে নারী প্রভাবের ম্যাগনেটিজমে জীবনের মেরু-প্রদেশের আকাশে যখন অরোরার রঙিন ছটার আন্দোলন ঘটতে থাকে—(শেষ কথা)
>
> আসলে দরকার পৌরুষের ম্যাগনেটিজম। সেটা তার স্নায়ুর পেশীর ভিতরকার বেতার-বার্তার মতো। (ল্যাবরেটরি)

শুধু এইগুলোই নয়, এখন থেকেই রবীন্দ্র-ছোটগল্পে বিজ্ঞান-সাধকদের আবির্ভাব ও ক্রম-প্রাধান্য লক্ষণীয়। 'রবিবার', 'শেষ কথা', 'ল্যাবরেটরি' প্রভৃতি গল্পগুলির মানুষ অধিকাংশই বিজ্ঞান-ভিত্তিক। নন্দকিশোর বা নবীনমাধবের বিজ্ঞানপ্রীতি কেবলি ঐ দুটি চরিত্রকে একটা বৈশিষ্ট্য, একটা স্বাতন্ত্র্য প্রদান করেছে এমন নয়, সামগ্রিকভাবে তা লেখক রবীন্দ্রনাথেরই তৎকালীন যুক্তি ও বিজ্ঞান-নির্ভরতাকেও সূচিত করে। এই সব গল্পের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ এখন যথাসম্ভব আবেগবর্জিত যুক্তি-বিজ্ঞান-সমর্থিত প্রকাশরীতির পক্ষপাতী। প্রতিটি কথা বুদ্ধির তীব্র দীপ্তিতে ঝলসিত এবং নিরাবেগ তীক্ষ্ণতায় উচ্চকিত। এবং জীবন-সমীক্ষা বিজ্ঞান-নির্ভর বলেই চরিত্রাঙ্কনে লেখকের অসাধারণ নির্লিপ্তি ও নৈর্ব্যক্তিকতা সম্ভব হয়েছে এই পর্যায়ের গল্পগুলিতে। 'সবুজ পত্রে' গল্পলেখক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশরীতির এই পরিবর্তন লক্ষণীয়। 'ভারতী'-যুগের শেষ গল্প 'পণরক্ষা'র প্রারম্ভসূচক কথা কয়টি হচ্ছে :

> বংশীবদন তাহার ভাই রসিককে যেমন ভালবাসিত এমন করিয়া সচরাচর মাও ছেলেকে ভালবাসিতে পারে না। পাঠশালা হইতে রসিকের আসিতে যদি কিছু বিলম্ব হইত তবে সকল কাজ ফেলিয়া তাহার সন্ধানে ছুটিত। তাহাকে না খাওয়াইয়া সে নিজে খাইতে পারিত না। রসিকের অল্প কিছু অসুখবিসুখ হইলেই বংশীর দুই চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল ঝরিতে থাকিত।

এই পাশাপাশি 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত প্রথম গল্প 'হালদারগোষ্ঠী'র প্রারম্ভসূচক কথা কয়টি নেওয়া যাক :

> এই পরিবারটির মধ্যে কোনো রকমের গোল বাধিবার কোনো সঙ্গত কারণ ছিল না। অবস্থাও স্বচ্ছল, মানুষগুলিও কেহই মন্দ নহে। কিন্তু তবু গোল বাধিল। কেননা, সঙ্গত কারণেই যদি মানুষের সব-কিছু ঘটিত তবে তো লোকালয়টা একটা অঙ্কের খাতার মতো হইত, একটু সাবধানে চলিলেই হিসাবে কোথাও কোনো ভুল ঘটিত না; যদি বা ঘটিত সেটাকে রবার দিয়া মুছিয়া সংশোধন করিলেই চলিয়া যাইত।

মনে রাখতে হবে, দুটি গল্পের মধ্যেই চিত্রিত হয়েছে গ্রাম্যসমাজের অবক্ষয়ের চিত্র। একটিতে গ্রাম্য তন্তুবায় সম্প্রদায়ের একটি যুবক রসিক আপন পৈতৃক পেশা ত্যাগ করে শহরে নাগরিক জীবনে গিয়ে মিশে যাচ্ছে, আর একটিতে গ্রাম্য জমিদারবাড়ির ছেলে বনোয়ারি চিরাচরিত প্রথামতো বাড়ির বড় বাবু হতে না চেয়ে চাকরির সন্ধানে শহরে চলে গেছে। পল্লীজীবন থেকে নাগরিক জীবনে প্রস্থান দুটি গল্পেরই মূল উপজীব্য বিষয়। অথচ 'পণরক্ষা' গল্পের হৃদয়াবেগ প্রায় সবটাই 'হালদারগোষ্ঠী'তে' অনুপস্থিত। এখানে গল্পের প্রকাশ-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে যুক্তি-বুদ্ধির দ্বারা। সমাপ্তিতে 'পণরক্ষা'য় যেখানে একটি আবেগ-মথিত দীর্ঘনিশ্বাস ব্যক্ত হয়েছে—'হায়, কলিকাতা শহরে টাকার হাড়কাঠে চিরকালের মতো সে আপনার জীবন বলি দিয়া আসিয়াছে', সেখানে 'হালদারগোষ্ঠী'র সমাপ্তিতে পাচ্ছি—'সেই রাত্রেই বনোয়ারির আর দেখা নাই। কেবল সে একছত্র চিঠি লিখিয়া গেছে যে, সে চাকরি খুঁজিতে বাহির হইল। বাপের শ্রাদ্ধ পর্যন্ত সে অপেক্ষা করিল না! দেশসুদ্ধ লোক তাই লইয়া তাহাকে ধিক্ ধিক্ করিতে লাগিল।' পেছনে ফেলে-আসা চিরকালের সংসার, গ্রাম্য-সমাজ, পল্লী-প্রকৃতি—কোনো কিছুর জন্যই একটুখানি দীর্ঘনিশ্বাসও পড়ে নি।

৩

নারীকে আপন সত্য মূল্যে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখতে চাওয়ার বাসনা শিল্পী রবীন্দ্রনাথের নানা পর্যায়ের রচনায় বিদ্যমান। 'মানভঞ্জনে'র গিরিবালা রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রী হয়ে স্বামীর সংসার থেকে বেরিয়ে গেছে। বিপরীত পক্ষে 'দৃষ্টিদানে'র কুমুদিনী একটা আদর্শলোকের উত্তুঙ্গ-শিখরে আপন নারী-জীবনের সার্থকতা অনুসন্ধান করেছে। 'স্ত্রীর পত্রে'র মৃণাল এক নির্যাতিতা বালিকার পক্ষ অবলম্বন করে আপন শ্বশুরবাড়ির চিরকালের নিয়মধারা উপেক্ষা করেছে এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নি। হিন্দু সমাজে প্রচলিত দুটি বিশেষণকে নিয়েই অগ্রসর হয়েছে কবির অনুসন্ধিৎসা—দেবী ও দাসী। 'মধ্যবর্তিনী' গল্পের হরসুন্দরী এই দুই বিশেষণেই সার্থক হয়ে উঠতে চেয়েছিল তার স্বামীর জীবনে। তার স্বামীকে দ্বিতীয়বার বিয়েতে প্ররোচিত করে এবং আপন গহনারাশি নিঃশেষে সতিনের অঙ্গে তুলে দিয়ে নিজের স্বার্থত্যাগ করতে পারার মহত্ত্ব দ্বারা দেবী হতে চেয়েছিল সে এবং সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় সংসারের সমস্ত কাজ যথাসম্ভব নিজের ওপর নিয়ে দাসী হিসেবে সে স্বামীসেবায় নিজেকে নিয়োজিতও করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই দুইয়ের কোনোটাতেই হরসুন্দরীর জীবনে সার্থকতা আসে নি —তার স্বার্থত্যাগ স্বামী অথবা সতিন কারো কাছেই কোনোপ্রকার স্বীকৃতি লাভ করে নি। এবং তার দাসীবৃত্তি তাকে দিয়েছে কেবলি বঞ্চনা আর আত্মধিক্কার। 'দৃষ্টিদান' গল্পের কুমু দেবীত্বের পর্যায়ে উন্নীত হয়ে বস্তুত তার নারী-জীবনের মর্যাদাই হারাতে বসেছিল। শেষ পর্যন্ত তাই তাকে বলতে শুনি—'আমার দেবী হইয়া কাজ নাই, আমি তোমার ঘরের গৃহিণী, আমি সামান্য নারী মাত্র।'—এইভাবে লক্ষ করা যাবে, পুরুষ-জীবনে কোন সত্য ভূমিকায় নারীর স্থান যথার্থ ও স্বাভাবিক হতে পারে সেই চিন্তাটি রবীন্দ্রনাথের শিল্পী-জীবনে আবাল্য-লালিত। আমাদের আলোচ্য পর্যায়ের 'তপস্বিনী' গল্পে ষোড়শী যখন জানল যে তার স্বামী সন্ন্যাসী হয়ে চিরতরে তাকে ত্যাগ করে গেছে তখন সেও তপস্বিনী হয়ে স্বামীর আদর্শ-সঙ্গিনী হবার সাধনায় রত হল। ষোড়শীর মধ্যে সেই প্রাচীন মনোভাবের প্রাধান্য যা সর্ব অবস্থাতেই স্বামীকে জীবনের ধ্রুবতারা করে সার্থক হয়ে উঠতে চায়। যখন ষোড়শীর সাধনা চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছে তখন একদিন তার যোগী

শিক্ষকের সহায়তায় সে দিব্যচক্ষে দেখতে পেল, তার স্বামী বরদাকান্ত 'হিমালয়ের অতি দুর্গম জায়গায় লংচু পাহাড়ে বরফের উপর অনাবৃত দেহে বসিয়া আছেন। সেখান হইতে তপস্যার তেজ ষোড়শীকে আসিয়া স্পর্শ করিতেছে, এই এক আশ্চর্য কাণ্ড।' এবং এই আশ্চর্য উপায়েই ষোড়শী স্বামীসান্নিধ্য লাভ করে পুলকিত হয়েছে—'সেদিন ঘরের মধ্যে একলা বসিয়া ষোড়শীর সমস্ত শরীর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। তার স্বামীর তপস্যা যে তাকে দিনরাত ঘিরিয়া আছে, স্বামী কাছে থাকিলে মাঝে মাঝে যে বিচ্ছেদ ঘটিতে পারিত সে বিচ্ছেদও যে তার নাই, এই আনন্দে তার মন ভরিয়া উঠিল।' কিন্তু ষোড়শীর এই সাধের স্বর্গ ভেঙে দিয়ে যেদিন সত্য সত্যই বরদাকান্তের আবির্ভাব ঘটল সেদিন তার অঙ্গে ম্লেচ্ছ সাহেবি পোশাক এবং জানা গেল বিগত বারটা বছর সে কাটিয়েছে ম্লেচ্ছদের সঙ্গে আমেরিকায়। ষোড়শী তার নারী–জীবনের সার্থকতা অনুসন্ধান করেছিল একমাত্র স্বামীতে, তার স্বামী সন্ন্যাসী হয়ে গেছে জেনেই না সে তপস্যায় রত হয়েছিল—কিন্তু তার সেই অমানুষিক চেষ্টায় স্বামীকে আঁকড়ে ধরতে চাওয়ার ফল শেষ পর্যন্ত কী হয়েছে! স্বামীর প্রতি প্রেম–ভালবাসা এক কথা, কিন্তু নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর জন্য তপস্বিনী হয়ে সংসার–বিমুখতা সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। সেটা এই গল্পে সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ–বিদ্রূপের বিষয় হয়ে উঠেছে। এবং সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে এই কথাটি যে, নারী–জীবনে সার্থকতা ঐ ধরনের সংসার ও পরিবেশ–বিমুখতায় নয়, নারীর সার্থকতা স্বামীর তপস্যা–সঙ্গিনী বা মানস–সঙ্গিনী হওয়াতেই শুধু নয়।

'পয়লা নম্বর' গল্পটিকে এক হিসেবে 'তপস্বিনী' গল্পের পরিপূরক ধরে নেওয়া যেতে পারে। "তপস্বিনী"তে বরদাকান্তের নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার ফলে ষোড়শীর সঙ্গে তার যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল, গ্রন্থ–জগতে নিজেকে নির্বাসিত করে অদ্বৈতচরণ তার স্ত্রী অনিলার থেকে নিজেকে প্রায় ততদূরেই স্থাপিত করেছিল। অনিলা তার সংসার–সঙ্গিনী হলেও মানস–সঙ্গিনী ছিল না একদিনও। ষোড়শীর মধ্য দিয়ে এই কথাটিই যদি স্পষ্ট হয়ে থাকে যে, কেবলি স্বামীর আদর্শকে শিরোধার্য করে এবং বাস্তবকে উপেক্ষা করে অবাস্তব সাধনালোকে নারী তার জীবনে সার্থকতা অনুসন্ধান করলে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য—তা হলে 'পয়লা নম্বরে'র অনিলার জীবন–কাহিনী আমাদের কাছে এই সত্যকেই তুলে ধরবে যে, স্বামীকে চোখের সামনে, কিন্তু মনোজগৎ থেকে বহু দূরে, কেবল একটি মানুষ হিসেবে পেলেই শুধু নারী–জীবন সার্থক হতে পারে না, প্রতিদিনের সংসার–যাত্রায় দুজনের মানস–জগৎও পরস্পরকে অন্তত স্পর্শ করে থাকা চাই।

অনিলার জীবনে সিতাংশুমৌলির আবির্ভাব নানা কারণেই তাৎপর্যপূর্ণ। নারী–জীবনে স্বামীর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে অন্য প্রেমিকের আবির্ভাব রবীন্দ্র–ছোটগল্পে এই প্রথম। 'নষ্টনীড়ে' চারুলতার মন ধীরে ধীরে একদিন অমলের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল বটে, কিন্তু অমল কোনো সময়েই চারুলতার প্রেমিকের ভূমিকায় নিজেকে স্থাপিত করে নি। আর অমল বাইরে থেকে আসা, অতএব বহির্জগতের রূপরসের প্রতীক রূপেও আবির্ভূত হয় নি চারুলতার জীবনে। অনিলার জীবনের সকল অসম্মান ও দৈন্যকে পূর্ণ করে প্রেমের পুজো এনেছিল সেখানে কোনো–এক নরোত্তমপুরের জমিদার সিতাংশুমৌলি। কিন্তু সিতাংশুমৌলির প্রেমের মধ্যে অনিলার প্রতি সম্মান যথেষ্ট ছিল, পুজোও ছিল, ছিল না শুধু সেই বাস্তবতা যা অনিলাকে আপন মানবী–মূল্যে ষোল–আনা গ্রহণ করতে পারত। সিতাংশু অনিলাকে লিখেছে,

> আমি তোমাকে দেখেছি। এতদিন এই পৃথিবীতে চোখ মেলে বেড়াচ্ছি, কিন্তু, দেখবার মতো দেখা আমার জীবনে এই বত্রিশ বছর বয়সে প্রথম ঘটল। চোখের উপরে ঘুমের পর্দা টানা

> ছিল; তুমি সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছ—আজ আমি নবজাগরণের ভিতর দিয়ে তোমাকে দেখলুম, যে-তুমি স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার পরম বিস্ময়ের ধন সেই অনির্বচনীয় তোমাকে। আমার যা পাবার তা পেয়েছি, আর কিছু চাই নে, কেবল তোমার স্তব তোমাকে শোনাতে চাই।

বলাই বাহুল্য, এও এক ধরনের অবাস্তবতা। অদ্বৈতচরণ 'তত্ত্বলোকের কুয়াশার মধ্যে আপনার অবাস্তবতাকে চরম বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল' আর সিতাংশুমৌলি 'বাস্তবকে উপেক্ষা করিয়া ভাবলোক হইতে রসের পূজা নিবেদন করিয়াছিল' (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : 'রবীন্দ্র-জীবনী')। তাই দুজনের কারো মধ্যেই অনিলা তার নারী-জীবনের সার্থকতার পথ খুঁজে পায় নি। দুজনকেই পরিত্যাগ করে সে চলে গেছে অন্য কোথাও। 'চোরাই ধন' গল্পের নায়কের মধ্যে সেই বোধটি সঞ্চারিত হতে দেখি যেটি থাকলে তার সান্নিধ্যে নারী যথার্থ মূল্যে এবং মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে আপন সৌরভ বিস্তার করতে পারে। সুনেত্রার স্বামী যথার্থই উপলব্ধি করেছে যে, 'দাম্পত্যের স্বত্ব সাব্যস্ত করতে হয় প্রতিদিনই নতুন করে।' কথাটা সাধারণত পুরুষ জাতি উপলব্ধি করে না, 'তারা গোড়াতেই কাস্টম হৌসে মাল খালাস করে নিয়েছে সমাজের ছাড় চিঠি দেখিয়ে, তার পর থেকে আছে বেপরোয়া। যেন পেয়েছে পাহারাওয়ালার সরকারি প্রতাপ উপরওয়ালার দেওয়া তকমার জোরে; উর্দিটা খুলে নিলেই অতি অভাজন তারা।' 'পয়লা নম্বরে'র অদ্বৈতচরণ ছিল এমনি অভাজনদের একজন। এবং এমনিতর অভাজনদের সান্নিধ্যে প্রায় প্রত্যেকটি নারী-জীবনই এদেশে দুঃসহ অপমান ও লাঞ্ছনার মধ্যে দিনাতিপাত করে—অনিলা, এবং গিরিবালা ('মানভঞ্জন'), মৃণাল প্রভৃতি আরো অনেকের মধ্যে এই আত্ম-অপমান থেকে মুক্তির তীব্র পিপাসা বাঁধন-ছেঁড়া আবেগে রূপান্তরিত হয়েছে। যেখানে নারী-জীবনে এই ধিক্কার-লাঞ্ছনা নেই, কোনো অভাজন পুরুষের হাতে যারা পড়ে নি, সেখানে সেই নারী যে কত সহজে আপন মাধুর্য, সৌগন্ধ এবং লালিত্য বিস্তার করে সংসারকে সুন্দর করে তুলতে পারে তার চিত্র 'চোরাই ধন' গল্পে আছে। 'চোরাই ধন' গল্পের মূল কথাটাই হচ্ছে, প্রেম-ভালবাসার মধ্য দিয়ে দুজন নারী-পুরুষের মিলিত জীবনযাত্রায় যে সৌন্দর্য ও শক্তি সঞ্চারিত হয় কোনো দৈবশক্তির প্রতিকূলতাই তাকে ম্লান করতে পারে না।

কিন্তু এ যুগে দৈব-শক্তির প্রতিকূলতাই সব কথা নয়। প্রখর আত্মচেতনা ও আত্মপ্রীতি এ যুগের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ব্যবধানটাকে কেবলই মহাসমুদ্রের নয় মহাকাশের ব্যবধান করে তুলেছে যেন। 'রবিবার' গল্পের অভীক ও বিভার প্রেমের মাঝখানে একটা প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে আছে তাদের মতাদর্শ। আপন মতাদর্শের প্রতি নিষ্ঠা তাদের এতই অটল যে প্রচণ্ড দুঃখও তাতে এতটুকু ফাটল ধরাতে পারে না। 'চোরাই ধন' গল্পের নায়ক দৈবের লিখন অস্বীকার করে প্রিয়াকে জীবনে পাওয়ার জন্যই শুধু অশেষ দুঃখ কষ্টকে হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছে। কিন্তু 'রবিবারে'র অভীক প্রিয়াকে পাওয়ার আনন্দেও আপন নাস্তিক্যধর্ম থেকে বিচ্যুত হতে রাজি নয়। বিভার মধ্য দিয়ে সম্ভবত এই কথাটিই প্রকাশ পেয়েছে যে, আপন মতাদর্শ সহ সমগ্র মানবী যেখানে স্বীকৃতি না পায় সেখানে কেবলি প্রেমের জন্য নিজেকে নারী বিকিয়ে দিতে পারে না। বিভা যে স্বীয় প্রেমিকের কাছেও নিজের বিশ্বাসটিকে বিসর্জন দিয়ে ভাবাদর্শের দাসীবৃত্তি স্বীকার করে নি ঐতেই এ যুগের নারী-মনের বাসনার প্রকৃত চিত্রটি প্রকটিত হয়েছে। প্রেমের শক্তি ও মর্যাদাকে এই গল্পে যে খাটো করে দেখা হয়েছে তা কিন্তু সত্য নয়। বিভার প্রচণ্ড আস্তিক্যবাদ এবং অভীকের নাস্তিক্য ধর্ম দুটোই, গল্পশেষে দেখি, প্রেমের গৌরবের কাছে ম্লান হয়ে যেতেই তৃপ্তি পাচ্ছে যেন। অভীক বিভার বাড়ি আসা বন্ধ করলে 'ওর মন কেবলই বলতে লাগল—রাগ কোরো না, ফিরে

এসো, আমি তোমাকে আর দুঃখ দেব না।' আর অভীক বিদেশ যাত্রা-পথে স্টিমার থেকে বিভাকে চিঠি লিখেছে—'জগতে সবচেয়ে ভালোবেসেছি তোমাকে।—আবার আমি ফিরব—তখন আমার মত, আমার বিশ্বাস, সমস্ত চোখ বুঁজে সমর্পণ করে দেব তোমার হাতে; তুমি তাকে পৌঁছিয়ে দিয়ো তোমার তীর্থপথের শেষ ঠিকানায়, যাতে বুদ্ধির বাধা নিয়ে তোমার সঙ্গে এক মুহূর্তের বিচ্ছেদ আর কখনও না ঘটে।' প্রেমিকের চোখ দিয়ে অভীক বিভার এক লোকাতীত মহিমাকে উপলব্ধি করেছে, কিন্তু তার কর্মী পুরুষটিকে তাই বলে আচ্ছন্ন করতে পারে নি তা। অভীক এ কথা ঠিকই জেনেছে, পুরুষের সত্যকার পরিচয় তার কর্মজগতে এবং কর্মজগতের সাফল্য দিয়েই পুরুষ দাবি করবে মেয়ের ভালবাসা। মন্ত্র তো নয়ই, কেবল প্রেমও যথেষ্ট নয়; কর্ম-জগতে সিদ্ধিও চাই একটি পুরুষ-জীবনকে নারীর ভালবাসার যোগ্য আধার করে তুলতে হলে —এমনি একটি ধারণা অভীকের।

'ল্যাবরেটরি' গল্পের নন্দকিশোর এমনি একজন অসাধারণ কর্মী পুরুষ। তার জীবনে অত্যন্ত চমৎকারভাবে খাপ খেয়ে উদিত হয়েছে সোহিনী। নন্দকিশোর-সোহিনীর মধ্যে নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে রবীন্দ্রনাথের শেষতম চিন্তাভাবনার সাক্ষাৎ লাভ করি আমরা। অবশ্যই গল্পটি প্রেমের গল্প নয়। যন্ত্রযুগের অভ্যুদয়ে যে নতুন সমাজ অপরিহার্য সেই সমাজে নারী-পুরুষের সম্পর্কের রূপ কী দাঁড়াবে সেইটেই এ গল্পে লেখক প্রত্যক্ষ করেছেন। সোহিনী প্রথম পরিচয়েই নন্দকিশোরকে বলেছে :

> জানো তো বাবুজি, জগতে সব চেয়ে বড়ো নাম হচ্ছে ঐ শয়তানের। তাকে যে নিন্দে করে করুক, কিন্তু সে খুব খাঁটি। দেখো না, সরকার বাহাদুর শয়তানির জোরে দুনিয়া জিতে নিয়েছে খৃষ্টানির জোরে নয়। কিন্তু ওরা খাঁটি, তাই রাজ্য রক্ষা করতে পেরেছে, যেদিন কথার খেলাপ করবে, সেদিন ঐ শয়তানেরই কাছে কানমলা খেয়ে মরবে।

শয়তানের এই খাঁটিত্ব আছে সোহিনীর মধ্যে, প্রথম দিনেই নন্দকিশোর সেটা টের পেয়েছিলেন, তিনি লক্ষ করেছিলেন—'মেয়েটির ভিতর থেকে ঝকঝক করছে ক্যারেক্‌টরের তেজ'। এই ক্যারেক্টর এ দেশীয় সনাতন যৌন-সম্পর্কিত নীতিবোধ নয়। বরং এ দেশীয় সামাজিক নীতিশাস্ত্রের বিচারে সোহিনী রীতিমতো অসতী, অশুচি তার দেহ। তবু নন্দকিশোরের জীবনে অপরিহার্য সত্য মূল্যে সোহিনী নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে সেই ক্যারেক্টরের জোরে যা স্বামীর আদর্শকে অম্লান করে রাখার প্রশ্নে এতটুকু কোথাও নতি স্বীকার করে নি বা একচুলও আপস-নীতির পক্ষপাতী নয়। বিভা-অভীকের মিলনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাদের আদর্শ, এখানে আদর্শের প্রশ্নেই একত্রে মিলিত হতে পেরেছে সোহিনী-নন্দকিশোর। প্রেম ছাড়াও কেবল আদর্শের ভিত্তিতে মিলিত নারী-পুরুষের জীবনের সার্থকতা এই গল্পে চিত্রিত হয়েছে। নন্দকিশোরের মৃত্যুর পর সোহিনী তার স্বামীর সাধনাদর্শকে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, কিন্তু দেহের শুচিতার প্রশ্নে তার কোনো মাথাব্যাথা নেই। বরং সে দেহকে নারীর উদ্দেশ্যসিদ্ধির একটা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে একটুও কুণ্ঠিত নয়। সোহিনীর মধ্য দিয়ে এই কথাটাই বড় হয়ে উঠেছে যে, পুরুষ-জীবনে নারী আশীর্বাদস্বরূপ হয়ে ওঠে সতীত্বের জোরে নয়, আপন কর্মক্ষমতা ও আদর্শগত নিষ্ঠার জোরে। সোহিনীর জীবনের মটো হচ্ছে—'আমি সমাজের আইন-কানুন ভাসিয়ে দিতে পারি দেহের টানে পড়ে, কিন্তু প্রাণ গেলেও বেইমানি করতে পারব না'। আদর্শের প্রশ্নে কখনো বেইমানি সোহিনীতে প্রশ্রয় পায় নি। কিন্তু তার মেয়ে নীলাতে সেই আদর্শনিষ্ঠা ছিল না। সেজন্য নীলাকে রেবতীর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল সে। স্বামীর জীবনাদর্শকে রূপায়িত করতে হলে রেবতীর মতো একজন বিজ্ঞানসাধকের প্রয়োজন ছিল

তার; এবং সেজন্য পৌরাণিক যুগের রীতি অনুসারে নীলার যৌবন–সৌন্দর্যকে সে ফাঁদ হিসেবে ব্যবহার করেছে রেবতীকে ধরবার কাজে। কিন্তু নীলার সীমাবদ্ধতা মনে রেখেই নীলা–রেবতীর মিলনে সোহিনী বাধা দিয়েছে। নীলা তার মায়ের মতো হতে পারলে অবশ্যই কোনো কথা ছিল না। তবু যখন রেবতী বেশি করেই নীলার দিকে ভিড়ল এবং বিয়ে করতে চাইল তাকে, তখন সোহিনী স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিল এ–কথা যে বিয়ে তাদের হতে পারে, 'কিন্তু ল্যাবরেটরি থেকে শত হস্ত দূরে।' ল্যাবরেটরিতে গবেষণার জন্য যে টাকা জমা আছে নীলার একান্ত লোভ সেই টাকার দিকে, সেজন্য নীলা যেন কোনোমতেই ল্যাবরেটরির সংস্পর্শে না আসতে পারে সেইদিকে একান্ত দৃষ্টি সোহিনীর। নীলা যখন সন্তানের দাবিতে নন্দকিশোরের টাকার প্রতি আপন অধিকার বিস্তার করতে চেয়েছে তখন সোহিনী প্রকাশ করে দিয়েছে নীলার জন্ম–রহস্য—যার সঙ্গে তার নিজের অসতীপনার ইতিহাস জড়িত। নীলা সোহিনীর মেয়ে বটে, কিন্তু নন্দকিশোর তার বাপ নয়। সকলের সামনে অবলীলায় সে এইভাবে তার অসতীপনাকে প্রচার করেছে, তবু যে উদ্দেশ্যে তার স্বামী ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সে উদ্দেশ্যের গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগতে দেয় নি। এক্ষেত্রে মানুষ হিসেবে সোহিনীর মর্যাদা লঘু না হয়ে বরং বৃদ্ধিই পেয়েছে গল্পের মধ্যে এবং পাঠককে এই প্রশ্নের মুখোমুখি করেছে যে, দৈহিক শুচিতাই কি নারীর সব যার অভাবে সে পশুত্বের পর্যায়ে নেমে যায়? কিন্তু এ কথাও সত্য যে সোহিনীর ক্যারেক্টর আয়ত্ত করা খুব সহজ নয়।

৪

উদার যুক্তি–আশ্রয়ী মননশীলতার সঙ্গে মানবপ্রীতির সহজ যোগে কবির এই পর্যায়ের গল্পগুলি অনন্যসাধারণ মর্যাদার অধিকারী। সমাজের নিপীড়িত লাঞ্ছিত মানুষের প্রতি কবির ভালবাসা এখন আর কেবলি হৃদয়ের সহানুভূতির স্তরে আবদ্ধ নেই, নিম্নস্তরের মানুষকে ঈশ্বরের মূক সন্তান বলে তাদের মধ্যে কেবল একটা আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যকেই এখন আর উপলব্ধি করছেন না কবি। কয়েকটি গল্পে এদের প্রতি উপরের স্তরের মানুষের আচরণকে তিনি তীব্র ব্যঙ্গ–কটাক্ষে জর্জরিত করেছেন। 'পাত্র ও পাত্রী' গল্পের দীপালির মধ্য দিয়ে লেখক বিশ্বপতিদের মতো সমাজপতিদের খুব একচোট নিয়েছেন। বিশ্বপতির ছেলে শ্রীপতি দীপালিকে বিয়ে করতে চাইলে বিশ্বপতি গোপনে অন্যত্র দীপালির বিয়ে দেবার জন্য চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু সফল হল না। তার ছেলে 'শ্রীপতি দীপালিকে বিবাহ করবার আগ্রহে সমাজ ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিল।' কিন্তু দীপালিকে বিয়ে করে তাকে সমাজ ত্যাগ করতে হয় নি। কারণ ধনী সনৎকুমার বাবু তাদেরকে কন্যা–জামাইরূপে নিজের কাছে আশ্রয় দিলেন। দীপালির মতোই নিম্নবর্ণের একটি সামান্য জাতের মেয়ের গর্ভে জন্ম হয়েছিল 'নামঞ্জুর গল্পে'র অমিয়ার। অমিয়াকে অনিল ভালবাসত, কিন্তু যখন সে জানতে পারল যে অমিয়ার মা ছিল জাতিতে কাহার তখন এক নিমেষে তার ভালবাসা কোথায় দৌড় মারল। এই অনিল কিন্তু সামান্য লোক ছিল না, সে একজন রাজনৈতিক কর্মী। দেশের মানুষের মুক্তি আন্দোলন করে সে এবং 'হীনবর্ণের পরে অনিল শ্রদ্ধাপূর্ণ করুণা প্রকাশ করে থাকে।' এই গল্পে দেশের মানুষকে ঘৃণা করে দেশসেবা করার আদর্শকে লেখক চূড়ান্তভাবে বিদ্রূপ করেছেন, এবং তা করেছেন পরবর্তী 'সংস্কার' গল্পেও। এখানে কলিকার বিশ্বাস যে তার স্বামী স্বদেশকে ভালবাসে না, কেননা কলিকার অনুরোধে সে খদ্দর পরে না। এ হেন কলিকাই একদিন একজন নির্যাতিত রক্তাক্ত কলেবর মানুষকে তার স্বামী নিজেদের মোটর গাড়িতে উঠিয়ে নিতে চাইলে প্রচণ্ডভাবে বাধা দিল শুধুই এই কারণে যে লোকটি ছিল মেথর।

অবশ্যই বুড়ো মেথরটা সে সময় স্নান করে শুচি-শুদ্ধ পোশাকে ছিল। ভিড়ের মধ্যে চলতে কারো গায়ে একটু ছোঁয়া লেগে থাকবে, আর সেই অপরাধে সকলে ধরে ওকে মার দিয়েছে। কলিকারও মতে—'ওরই তো দোষ। রাস্তার মাঝখান দিয়ে যায় কেন। পাশ কাটিয়ে গেলে ওর মানহানি হত।' মনোবৃত্তির দিক থেকে অনিল ও কলিকা একই গোত্রভুক্ত এবং এরাই ছিল তৎকালের, এবং পরবর্তীকালেরও, সুপ্রসিদ্ধ দেশপ্রেমিকের দল। দেশপ্রেমিকদের প্রতি এই বিদ্রূপের পাশাপাশি হীনবর্ণভুক্ত মানুষদের প্রতি প্রকাশ পেয়েছে কবির ভালবাসাই শুধু নয়, একটা ন্যায়সঙ্গত ব্যবহারের দাবিও। অমিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে—'পূর্বপুরুষের কলঙ্ক জন্মের দ্বারাই স্খলিত হয়ে যায়, এ তো তোমরা অমিয়ার জীবনেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ। সে পদ্ম, তাতে পঙ্কের চিহ্ন নেই।' কলিকার স্বামীও কলিকাকে বুঝাতে চেষ্টা করেছে—'দেখছ না স্নান করে ধোপ দেওয়া কাপড় পরেছে? এদের অনেকের চেয়ে ও পরিষ্কার।'

আলোচ্য গল্পগুলিতে মানুষে-মানুষে ভেদাভেদের ছবি আঁকা হয়েছে দেখা গেল, কিন্তু পরবর্তী শেষ পর্যায়ের গল্প 'রবিবার' ও 'ল্যাবরেটরি'তে এমন দুটি চরিত্র রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন যেখানে এই ভেদাভেদের কোনো বালাই নেই। 'রবিবারে'র অভীককে সেজন্য নাস্তিক বানিয়েছেন লেখক। গভীর ধর্ম-বিশ্বাসের আবহাওয়ায় আবাল্য-লালিত রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে একেবারে বৃদ্ধ বয়সে অভীকের মতো একটি চরিত্রের জন্ম খুব স্বাভাবিক ঘটনা মনে করলে ভুল হবে। অনিল বা কলিকা এদেশে ব্যতিক্রম নয়, সংখ্যায় তারা হয়তো শতকরা নিরানব্বইকেও ছাড়িয়ে যাবে। এমন একটি দেশে নাস্তিক্যধর্ম ছাড়া মানুষের মুক্তি কোথায়? অভীকের মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলিয়েছেন—'যে দেশে দিনরাত্রি ধর্ম নিয়ে খুনোখুনি সে দেশে সব ধর্মকে মেলাবার পুণ্যব্রত আমার মতো নাস্তিকেরই। আমিই ভারতবর্ষের ত্রাণকর্তা।' আমি অর্থাৎ একজন নাস্তিক ভারতবর্ষের ত্রাণকর্তা—এ-কথার পেছনে রবীন্দ্রনাথের বহুকালের সামাজিক ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার প্রজ্ঞা যে কাজ করেছে তা সহজেই বোঝা যায়। অভীক জন্মগ্রহণ করেছিল ধনী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বংশে। অর্থাৎ সবদিক থেকেই সে ছিল সমাজের মধ্যে চরম সুবিধাভোগী মানুষদের এক জন। সেইখান থেকে সে নেমে এসেছে সেই স্তরে যেখানে 'ময়লা টুপি আর তেল-কালীমাখা নীলরঙের জামা ইজের পরে বার্‌ন্ কোম্পানির কারখানায় প্রথমে মিস্ত্রিগিরি ও পরে হেডমিস্ত্রির কাজ পর্যন্ত চালিয়ে দিয়েছে। মুসলমান খালাসিদের দলে মিশে চার পয়সার পরোটা আর তার চেয়ে কম দামের শাস্ত্রনিষিদ্ধ পশুমাংশ খেয়ে ওর দিন কেটেছে সস্তায়।' অর্থাৎ সবদিক থেকেই দেশের সর্বহারাদের সঙ্গে সে নিজেকে মিলিয়ে দিয়েছে সানন্দে। সানন্দে এইজন্য যে, নাস্তিক্যধর্ম অঙ্গীকার করার জন্য কেউ তাকে বাধ্য করে নি, ওটা সে করেছে অন্তরের তাগিদে। এমনকি প্রেমের তাগিদেও সে তার নাস্তিক্যধর্ম ত্যাগ করতে রাজি হয় নি, কারণ ওটা বাদ দিলে সকলের সঙ্গে মিলনের পথে বাধা পড়ে যায়। অভীকের জানা আছে, কেউ 'নাস্তিকের জাত মারতে পারে না', নাস্তিক্যধর্ম ছেড়ে দিলেই তখন আস্তিকের জাত বাঁচাবার জন্যে মানুষে-মানুষে ভেদাভেদও স্বীকার করতে হবে।

'ল্যাবরেটরি'র নন্দকিশোরও সামাজিক অর্থে কোনো ধর্ম স্বীকার করে না। অথচ করলে পারত। টাকা এবং বিদ্যাবুদ্ধি—সবই তার প্রচুর ছিল। অতএব অন্য মানুষের প্রতি ঘৃণা ও প্রবল জাত্যাভিমান মনে পোষণ করার ষোলো আনা অধিকার তার ছিল। কিন্তু সে কোনো কিছু মানত না। সোহিনীর মতো নিম্নস্তরের একটি মেয়েকে সে জীবনসঙ্গিনী করেছিল কেবল এই কারণে যে তার মধ্যে ক্যারেক্টারের তেজ ছিল—জাত বা ধর্ম বলে কোনো কিছু তার থাক বা না থাক। সোহিনীকে সে বিয়ে করেছে কি না এ প্রশ্নের উত্তরে নন্দকিশোর একটুও

ইতস্তত না করে বলত—'বিয়েটা খুব বেশি মাত্রায় নয়, সহ্যমত।' প্রচুর পরিমাণে ধনী হয়েও 'নন্দকিশোর কোনোদিন বাবুগিরি করেননি। ... কারখানা ঘরের দাগ-দেওয়া কাপড় বদলাবার ওঁর সময় ছিল না। কেউ ঠাট্টা করলে বলতেন,—মজুর মহারাজের তকমা-পরা আমার এই সাজ।' কি জীবনসঙ্গিনী নির্বাচনে, কি সাজ-পোশাক নির্বাচনে—কোথাও নিজেকে দেশের নিম্নশ্রেণীর মানুষের সমপর্যায়ে নামিয়ে আনতে নন্দকিশোরের কোনো সঙ্কোচ ছিল না। বিজ্ঞান-সেবার মধ্য দিয়ে দেশ-সেবার ব্রত ছিল তার। অভীক চিন্তার দাসত্ব থেকে দেশের মানব-মনকে মুক্তি দিতে চেয়েছে, আর নন্দকিশোর চেয়েছে বিজ্ঞান-চর্চার দৈন্য থেকে দেশকে উদ্ধার করতে। এই দুটি দিকের মারাত্মক দৈন্যই দেশের সর্বনাশের কারণ —এ-কথা মনে রেখে বলতেই হবে, স্বদেশ-চিন্তার সুষ্ঠু অভিব্যক্তিতে রবীন্দ্র-সাহিত্যের একেবারে শেষতম অধ্যায়টিও অতি উজ্জ্বল।

৫

বস্তুত 'ল্যাবরেটরি'কেই এক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের শেষ ছোটগল্প বলা চলে। এর পরেও যে চারটে গল্প তিনি লিখেছিলেন, সেগুলো একটাও কবি নিজে কলম ধরে লিখতে পারেন নি। মৃত্যুর কিছু আগে যখন আর লেখনী ধারণ করতে পারতেন না, তখন তিনি মুখে মুখে বলে যেতেন, অন্যেরা লিখে নিতেন—এইভাবে চলত তাঁর সাহিত্যচর্চা। 'রবীন্দ্র-জীবনী'কার লিখেছেন—সেবার 'ভীষণ অনাবৃষ্টি—অসহ্য গরম; কবি সারা দিন air conditioned ঘরে থাকেন। সন্ধ্যার পর বারান্দায় আনিয়া কবিকে বসানো হয়; মাঝে মাঝে নূতন নূতন গল্পের প্লট বলেন, তাহারই একটি 'বদনাম' নামে প্রকাশিত হয়।' (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : 'রবীন্দ্র-জীবনী', ৪র্থ খণ্ড)। এইভাবেই মুখে মুখে তিনি রচনা করেছিলেন আরো তিনটে গল্প—'প্রগতিসংহার', 'শেষ পুরস্কার' ও 'মুসলমানীর গল্প'।

'বদনাম' গল্পের বিপ্লবী নেতা অনিলকে ধরবার জন্য পুলিশ ইনস্পেক্টর বিজয়বাবু তার পেছনে লেগেছেন, এদিকে বিজয়বাবুর স্ত্রী সৌদামিনী স্বামীর চোখে ধুলো দিয়ে গোপনে অনিলকে সাহায্য করতে থাকে অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে। গল্পের শেষে সৌদামিনী তার স্বামীকে বলল, 'আমরা দেশের মেয়েরা যদি এইসব সুসন্তানদের আপন প্রাণ দিয়ে রক্ষা না করি তবে আমাদের নারীধর্মকে ধিক্।' সৌদামিনী সম্পর্কে অনিলের ভাষায় বলা যায় —'ও একটি অসাধারণ মেয়ে, জন্মেছে আমাদের দেশে, একেবারে খাপছাড়া সমাজে।' গল্পটি সম্পর্কে কথাচ্ছলে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন,

> প্রথম আমি মেয়েদের পক্ষ নিয়ে স্ত্রীর পত্রে বলি। বিপিন পাল তার প্রতিবাদ করেন, কিন্তু পারবেন কেন? তার পরে আমি যখনই সুবিধে পেলুম, ছাড়ব কেন, সদুর মুখ দিয়ে কিছু বলিয়ে নিলুম। ('আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ' : রানী চন্দ)

পরবর্তী 'প্রগতিসংহার' গল্পেও 'মেয়েদের পক্ষ নিয়ে' কথা বলা হয়েছে, লক্ষ করা যাবে। একদিকে মেয়েদের আত্মত্যাগ এবং সেজন্য কঠিন নিগ্রহকে স্বেচ্ছায় বরণ করার চিত্র এই গল্পে আছে, অন্যদিকে তেমনি আছে পুরুষের চূড়ান্ত স্বার্থপরতার কাহিনী। চরিত্রগুলি এই গল্পে খুব মোটা তুলি দিয়ে যেন আঁকা।

'শেষ পুরস্কার' এবং 'মুসলমানীর গল্প' সম্পর্কে প্রথমেই মনে রাখা উচিত যে —এ দুটি ঠিক ছোটগল্প হয়ে ওঠে নি, ছোটগল্পের কঙ্কাল হয়ে থেকে গেছে, শিল্পী তাতে রক্তমাংস সঞ্চার করার সময় পান নি। তবে খসড়া থেকেই এ-কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে 'মুসলমানীর গল্প' রবীন্দ্র-সাহিত্যের একটি অনন্যসাধারণ সৃষ্টি হতে পারত। হিন্দু-মুসলিম

সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্প্রীতির ওপর অসাধারণ জোর দেওয়া হয়েছে এই গল্পে। কমলা বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পথে ডাকাতদের হাতে পড়লে হবির খাঁ তাকে উদ্ধার করে। কিন্তু এই ঘটনার পর কমলার আত্মীয়-স্বজনেরা কেউ তাকে আর বাড়িতে নিল না। তখন হবির খাঁ তাকে আপন কন্যারূপে গ্রহণ করে পৃথক একটি বাড়িতে হিন্দুয়ানী সম্পূর্ণ বজায় রেখে জীবন যাপনের ব্যবস্থা করে দিল। কিন্তু কমলার যৌবনধর্ম অল্প দিনেই এ ব্যবস্থার মধ্যে হাঁপিয়ে উঠল। সে হবির খাঁর ছেলে করিমের প্রেমে পড়ল এবং হবির খাঁকে এসে বলল,

> যে ধর্ম চিরদিন আমাকে জীবনের সব ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করেছে, আঁস্তাকুড়ের পাশে আমাকে ফেলে দিয়েছে, সে ধর্মের মধ্যে আমি তো দেবতার প্রসন্নতা কোনো দিন দেখতে পেলুম না।...আমি প্রথম ভালোবাসা পেলুম বাপজান, তোমার ঘরে। জানতে পারলুম হতভাগিনী মেয়েরও জীবনের মূল্য আছে। যে দেবতা আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন সেই ভালোবাসার সম্মানের মধ্যে তাঁকেই আমি পুজো করি, তিনিই আমার দেবতা—তিনি হিন্দুও নন, মুসলমানও নন।

কমলা অতঃপর করিমকে বিয়ে করে মেহেরজান নাম নিল। কিছুকাল পর কমলার কাকার এক মেয়ে সরলাও বিয়ের পর ঠিক এমনই দুর্ঘটনায় পতিত হলে মেহেরজানের নির্দেশে তার লোক-লস্কর এসে সরলাকে উদ্ধার করল। মেহেরজান সরলাকে তার বাপের কাছে পৌঁছে দিয়ে বললে—'কাকা, প্রণাম তোমাকে। ভয় নেই, তোমার পা ছোঁব না। এখন একে তোমার ঘরে নিয়ে যাও, একে কিছুতে অস্পৃশ্য করেনি।' সবশেষে, সরলাকে লক্ষ্য করে মেহেরজান বলেছে—'আমার বোন যদি কখন দুঃখে পড়ে তবে মনে থাকে যেন তার মুসলমান দিদি আছে, তাকে রক্ষা করার জন্য।' ছোটগল্প-লেখক রবীন্দ্রনাথের এইটেই শেষ বাক্য।

সন্তোষ গুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার স্বরূপ

এক অপ্রধান প্রচেষ্টার দুর্মর প্রকাশ যদি কোথাও ঘটে থাকে, তবে তা রবীন্দ্রনাথেই সম্ভব হয়েছে। আর সেটা তাঁর চিত্রকলায়। স্বভাবতই কবি বলে যাঁর খ্যাতি সর্বত্র সঞ্চারিত আর যাঁর গদ্য স্বতোৎসারিত, নিশ্চেষ্টলব্ধ, অধ্যবসায়ের ম্লানশ্রী কোথাও চিহ্ন রাখে নি বলেই এতদিন জানি আর নানাভাবেই তা আমাদের কাছে উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চিত্র সম্পর্কে আলোচনা সে তুলনায় দীন আর অকিঞ্চিৎকর। বছরে বছরে রবীন্দ্রচর্যায় তাঁর বিভিন্ন দিকের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়। হয়তো সেখানে বক্তব্য সুস্পষ্ট—কি কবিতায়, কি প্রবন্ধে, গল্পে, উপন্যাসে—অথচ শিল্পী হিসেবে রবীন্দ্রনাথের ছবির বক্তব্যের মৌন দিকটির কথা ভেবেই এ নিরুৎসুক্য। রেখার প্রগলভতা রয়েছে—তবু যুক্তিতর্ক তুলে তার প্রায়োগিক দিকটির নেতিবাচক ভূমিকার কথা ভেবে হয়তো কিংবা ঘরোয়া প্রয়োজন মেটানো যাবে না ভেবে রবীন্দ্র-চিত্রসম্পদকে একদিকে দুর্জ্ঞেয় আর অন্যদিকে উপেক্ষণীয় করে রাখা হয়েছে।

সত্য বটে তাঁর কবিকৃতির তুলনায় রবীন্দ্রনাথকে চিত্রশিল্পী হিসেবে তুলে ধরার প্রয়োজন ও ভিত্তি নেই বড় একটা। প্রায় সত্তর বছরের কাছাকাছি পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ প্রথমে রেখার বন্ধনে আনলেন মনের ভাবকে বাইরে টেনে। ১৯২৪ সালের আগে তাঁর চিত্রাঙ্কনের প্রয়াস তেমন চোখে পড়ে না। পাণ্ডুলিপি সংশোধন করতে গিয়ে হিজিবিজি দাগ টানার মধ্যে অচেতনভাবে হলেও একটা সম্পর্ক, একটা সমন্বয়ের রূপ কবির চোখে ধরা পড়েছে এই সময়। হয়তো প্রস্তুতিকালকে আরো কয়েক বছর পিছিয়ে দেওয়া চলে, তবে সেখানে রূপের জগৎ তখনো রেখার মাধ্যমে কবির চোখে ধরা দেয় নি। অক্ষর লেখা আর ছবি আঁকার মধ্যে একটা রূপগত সাদৃশ্য রয়েছে। পাণ্ডুলিপি পরিমার্জনা ও সংশোধনকালে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সেখানে চোখ ফিরিয়ে থাকে নি। ধরা পড়েছে তাঁর রূপদক্ষ চোখে রেখার জগতের ছন্দ। তাঁর ভাষায়,

> এই উদ্ধারকর্মের প্রক্রিয়ায় একটি তথ্য আবিষ্কার করি যে রূপের জগতে রেখার প্রাকৃতিক নির্বাচনের একটি নিরন্তর ক্রিয়া চলছে। এবং যার মধ্যে ছন্দ সুষমার যোগ্যতা আছে একমাত্র সেই যোগ্যতমই টিকে থাকে।

এই যোগ্যতমের উদ্বর্তন ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথের চিত্রে। সহসা মনে হলেও, এটা আকস্মিক ছিল না। ছবি আঁকা না শিখেও তাই রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে বিস্তর ছবি এঁকেছেন। প্রায় দু'হাজারের মতো তাঁর ছবিকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা চলে—আদিম বলিষ্ঠতায় ভাস্বর নির্বস্তুক রেখার জগৎ; কিম্ভূতকিমাকার জীবজন্তু ও স্থাপত্য সুষমামণ্ডিত ছবি;

বাস্তবানুগ প্রতিকৃতি-চিত্রণ। ছবি আঁকার পাঠ গ্রহণ করেন নি বলেই তার কোনো স্তরের ছবিতেই আলেখ্যপ্রথ্য রীতি সোচ্চার তো নয়ই, বরং প্রায় অনুপস্থিত।

শিশু যখন নিজের মনে আঁক কাটে, তার অস্পষ্ট অশাসিত অথচ বলিষ্ঠ কল্পনা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সীমারেখাকে নিঃসঙ্কোচে অতিক্রম করে, তখন তার অর্থবহতা-শক্তিকে ছাপিয়ে ওঠে প্রকাশ-শক্তি। চারিপাশের জীবনের গভীরতায় তার দখল নেই অথচ সেখানে স্বীয় উপস্থিতির সচলতা যেমন জীবন্ত, তেমনি তা বেগধর্মী। আদিম শিল্পচর্যায় সেই বলিষ্ঠতা লক্ষ করা গেছে গুহাচিত্র কিংবা বুশম্যান শিল্প-নিদর্শন তার সাক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথের মনের কল্পনার সেই শিশুচিত্তটি তেমনি কৌতূহলী, দুরন্ত ছবির ক্ষেত্রে তার তুলির অবাধ সঞ্চরণ সমস্ত কূল ভেঙে প্রবাহিত হল। পৌনঃপুনিক রেখাচিত্র একবর্ণা ছবি যখন পাণ্ডুলিপিকে অন্য মানে দিচ্ছিল, সেই ভিত্তিভূমির দৃঢ়তা তাকে ঠেলে দিল পর মুহূর্তে বর্ণশালিনী চিত্রের ঐশ্বর্যসম্ভার উন্মোচনে—তুলি, আঙুল আর জোব্বার প্রান্ত কিংবা আঙুলে ন্যাকড়া পেঁচিয়ে যে রং আর রূপে আসর বসিয়েছেন। প্রথম দিককার রেখাপ্রধান চিত্রে ব্যঞ্জনার উপস্থিতি নেই বরং এক অনির্ণেয় রেখার রূপজাল ঘুরে ঘুরে সৃষ্টি করেছে এক অনির্দেশ্য জগৎ। ক্যালিগ্রাফির এই প্রাধান্য তার ছবির মূল দিঙ্নির্ণয় হিসেবে শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল। এই রৈখিক চর্চার নিবিড়তা ব্যতীত মধ্যবর্তীকালের প্রাণিবিজ্ঞানবহির্ভূত কিম্ভূতকিমাকার জন্তু-জানোয়ারের উদ্ভাবন সম্ভব ছিল না। এই মধ্যবর্তী স্তরে উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই রবীন্দ্রনাথের সাদা-কালোর মনুষ্যমূর্তি রূপ লাভ করেছে ফাউন্টেনপেনের কালিতে; ন্যাকড়ার ফালি কালিতে চুবিয়ে নিয়েছেন অনেক ক্ষেত্রে রং ছড়াবার কাজে। এই একবর্ণা ছবিতে আবেগ অনুপস্থিত, শুধু মনঃসমীক্ষকের দৃষ্টিতে দেখা জগৎ এখানে প্রচ্ছন্ন প্রচ্ছায় থেকে সদ্য উঠে এসেছে। কবি উইলিয়ম ব্লেকের মতো কোনো আর্টস স্কুল থেকে রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্কনবিদ্যা আয়ত্ত করেন নি। তাই তাঁর ছবিতে শারীরবৃত্তি-সংস্থান কিংবা ব্যাকরণের সঙ্গতি অনুপস্থিত (এই প্রসঙ্গে 'ছায়াবৃতা' ছবির কথা উল্লেখ করা চলে, উল্লেখ করা চলে 'হে মাধবী দ্বিধা কেন' গানের পাণ্ডুলিপিতে সৃষ্ট কুণ্ঠিত নারীমূর্তিটির কথা)। কিন্তু প্রখর বর্ণরুচি তার সঙ্গতি এনেছে। আদিম জীবনের ভাস্বরতার মতো রঙের ঔজ্জ্বল্য সব ছাপিয়ে উপচিয়ে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথে যেহেতু দৃশ্যজগৎ বনাম কাব্যে অঙ্গীভূত জগতের একাত্মতার মধ্যে বিচ্ছেদ ছিল দুরারোহ, তার একে অন্যকে আবিষ্ট করে নি। তাই 'পূরবী'র কাব্যানুভূতি আর তার পাণ্ডুলিপির চিত্রণের মধ্যে কোথাও চিত্রকল্পগত সাদৃশ্য নেই। এক অবচেতন মনের সৃষ্ট পরাবাস্তব জগতের স্বরূপের উন্মোচন ঘটেছে স্তরে স্তরে, কখনো ভয়ঙ্কর, অর্থহীন, বাস্তবে অনুপস্থিত জন্তু-জানোয়ারের চিত্রে—কখনো বা বাস্তবানুগ প্রতিকৃতি চিত্রণের মনঃসমীক্ষক ধারার নির্বাধ উপস্থিতি।

জার্মান চিত্রশিল্পী এমিল নোল্ডের সাথে রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য খোঁজেন অনেকে। এ কথা ঠিক বর্ণের উগ্র ব্যবহারে, আপন মর্মবাণীকে রূপ দেওয়ার ও স্বীয় স্বজ্ঞাকে অনুসরণের ও প্রতিফলনের ইচ্ছা ও আয়োজন উভয়ের মধ্যে উপস্থিত। শিল্পী হিসেবে নোল্ডের বক্তব্য রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য; শুধু প্রযোজ্য বললেই যথেষ্ট নয়— সার্থক ও সুষ্ঠুভাবে প্রযোজ্য :

> ......little technical discoveries of one's own, in one's relation to the tool, the material and the colours. What the artist learns matters little. What he himself discovers has a real worth for him, and gives him the necessary incitement to work.

ভারতীয় চিত্রকলার একজন বড় পৃষ্ঠপোষক হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের ছবিতে ভারতীয় ধারার অনুপস্থিতি লক্ষ করবার মতো। অবশ্য ইউরোপীয় বিভিন্ন রচনাশৈলীও তাঁকে আচ্ছন্ন করে নি কোনোরূপ নির্দিষ্ট সীমায়। তাঁর অবাধ বিচরণ ঘটেছে স্বপ্নচারীর জগতে, আপন

অন্তর্দ্বন্দ্বের গ্রন্থিমোচনে, মগ্নচেতনের অপরূপ সম্ভার-উন্মোচনে। নারীর মুখাঙ্কনে যদি বা ভিক্টোরীয় যুগের মণ্ডন-সর্বস্বতার আভাসের ক্বচিৎ উপস্থিতি থাকে তবে তদপেক্ষা বেশি অবাস্তব, ভয়ঙ্কর, আদিম বলিষ্ঠতায় মণ্ডিত বিভিন্ন জীবজন্তুর আকৃতি, চিত্রকল্পে রয়েছে নিসর্গ-দৃশ্য, তীর্থযাত্রীর রোমান্টিকতা, নারীর বিষণ্ন মুখচ্ছবি, পাণ্ডুময় সন্ধ্যা, রক্তাক্ত প্রান্তর-পারে দিবাবসান—এক সতেজ বর্ণের প্রচ্ছদে চৈতন্য লোপের প্রাক্কালে দূরাপসারী শৈশবস্মৃতির আর কামনার পরস্পর অধিক্রম অথচ পরিচ্ছন্ন উপস্থিতি।

অঙ্কনপদ্ধতি কোনো রীতির ঋণ স্বীকার না করলেও একান্তভাবেই বিংশ শতকের অস্থিরচিত্ত ইউরোপের মগ্নচৈতন্যে যাত্রার ধারাটা তাঁর চিত্রে দুর্নিরীক্ষ্য নয়। কারণ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় : 'মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি এমন একটা জিনিস জাতিবিশেষে যাহার তারতম্য আছে, কিন্তু প্রকারভেদ নাই। যুক্তির নিয়ম সকল দেশেই সমান ...।' কিন্তু বিংশ শতাব্দীর কোন বুদ্ধিবৃত্তি দেশকালকে অতিক্রম করেছে যদ্দ্বারা শিল্পী আক্রান্ত? স্যার উইলিয়ম অর্পেন 'দি আউটলাইন অব আর্ট' পুস্তকে বলেছেন :

> It is fascinating to realise that the whole movement of thought in the twentieth century has been towards a greater subjectivity than prevailing during the materialistic nineteenth; and art reflects this. Freud has tremendously stimulated our interest in the subconscious and the irrational; the scientists and physicists have come near to dissolving all matter into energy and motion. Modern art must be seen in the light of such movements of human thought.

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সর্বত্র একটা প্রসন্ন রুচির পরিচ্ছন্নতা। এক ঔপনিষদিক প্রশান্তিতে সংশয়ের মুখোমুখি তাঁর ঘোষণা :

মাঝে মাঝে যদি ছিঁড়ে থাকে তার
তারি লাগি কেবা করে হাহাকার

অপরদিকে তাঁর চিত্রকর্ম এর বিপরীত মেরুতে। ঘাত-অভিঘাতে ধ্বস্ত মননের উগ্র ঐন্দ্রিয়িক আবেগের নির্মমতা, ক্ষুব্ধ তপ্ত উদ্বেল কটাহের দাহদীপ্ত ইন্দ্র-ধনুচ্ছটা। কবিতার ক্ষেত্রে যেমন তাঁর অসংখ্য চিত্রকল্পের মধ্যে সমস্ত বিবর্তন সত্ত্বেও কয়েকটি পুনরুক্তি তাঁর কবিকর্মে সর্বত্র উপস্থিত, তেমনি নীল দ্যুতিময় বিষণ্নতায় রমণীয় পেলব ডিম্বাকৃতি মুখে, সন্ধ্যায় নিঃসহ মৌনতায় বারংবার তাঁর পরবর্তী চিত্র আক্রান্ত—যেখানে রেখার দীপ্ত সমুদ্র থেকে অবয়ব তরঙ্গায়িত হয়েছে নারীর উত্তীর্ণ মুখে। ছন্দের চারুতা অবশ্য এখানেও লক্ষণীয়ভাবে উপস্থিত। নির্বস্তুক (non-material) জগতের রেখা রচনায় নব নব আবিষ্কারে অক্লান্ত রবীন্দ্রনাথকে তাই বস্তুর রূপজগতে এসে খেদোক্তি করতে দেখি : 'আমি ছবি আঁকতে শিখি নি।' রেখার জগতে যতদিন রবীন্দ্রনাথের বিচরণ স্বচ্ছন্দ নির্ভার ছিল, ততদিন তাঁর প্রকাশভঙ্গিমায় বিক্ষুব্ধ প্রহরের মধ্যাহ্ন দীপ্তিতে মেজাজের প্রাতঃসূর্যরুচি বিলীয়মান ছিল। অবয়বসাশ্রয়ী বাস্তবানুগ প্রতিমূর্তনে তাঁর সেই স্বকীয়তা ব্যাহত বলেই আমার মনে হয়।

নীলরঙে কবির আনন্দ সুবিদিত। তাই কি তাঁর ছবিতে নীলরঙের এত ছড়াছড়ি? যদিও তাঁর ছবি স্পষ্টত কোনো আবেগজাত নয়, তবু এক অনুচ্চ স্বতোৎসারিত আবেগ তাঁর বাস্তবানুগ ছবিতে উপস্থিত। এগুলো তাঁর শেষের দিকের ফসল। মধ্যবর্তীকালের আঁকা ছবিগুলো যারা আদিম মানুষের উত্তুঙ্গ কল্পনার শীর্ষকে আশ্রয় করে ভাস্বর, দুঃস্বপ্নমথিত অন্ধকারের আলোড়নে যাদের চলাফেরা, সেখানে বলিষ্ঠতা স্থাপত্যের সুঠাম ঋজু ভঙ্গিতে প্রকাশমান। রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের সাথে সেখানে কোনো মিল নেই। কথাটা অবশ্যই আপেক্ষিক অর্থে; আর হেতুও রয়েছে।

গদ্যকবিতার সপক্ষে কবি বলেছেন, এরা বনের আপনস্থানে ফুলের মতো নির্বাধ শোভার আধার, রংবেরঙের জরির সুতোয় তোড়া করা ফুল নয়। ছন্দের কবিতা পুরনারীর মতো, তাদের চলা নিষেধের শাসনে বাঁধা। গদ্য কবিতায় প্রয়োজন ছিল যন্ত্রযুগের বহুধাবিস্তৃত রুচির যোগান দেওয়ার জন্য। সামন্তবাদের নির্দিষ্ট মানের রুচি যখন রাজদরবারে কিংবা অভিজাতপাড়ায় সীমিত ছিল, সেখানে ছন্দের শাসন ছিল অপরিহার্য। কিন্তু জনসভার আসরে বিচারের কোনো সর্বসম্মত মানদণ্ড নেই। তাই গদ্যকবিতার বিকাশ জনসভার যুগেই সম্ভব। তেমনি কথার বাঁধন যেখানে মনের সবকিছুকে উজাড় করে দিতে পারে না—সেই দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ডাইনে-বাঁয়ে নিন্দার পঙ্কের মাঝখানে রবীন্দ্রনাথ আপন খেয়াতরীকে মুক্তি দিলেন রেখার প্রগলভতায়। এখানে সামাজিক ভিত্তিভূমিকে অস্বীকার করার একটা অচেতন প্রয়াস, অর্থহীন ভাবময় স্বরূপ প্রকাশের তাগিদ চোখে পড়ে। এখানে শিল্পীর দায় রয়েছে কিন্তু দায়িত্ব নেই সমাজের কাছে। দিনান্তের তাপদগ্ধ ফুলের মতো কোনো কুণ্ঠা শিল্পীচিত্তকে আচ্ছন্ন করে নি। রেখার সতেজ সরল প্রবাহ অনির্দেশ্যপানে চলেছে। কলম, যন্ত্রখণ্ড আর আরো পরে তুলির ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথের উত্তরণ লক্ষণীয়। চিত্রে তার প্রকাশভঙ্গিকে তুলনা করা চলে সমুদ্রে ভাসমান হিমশৈলের সাথে, যার এক-নবমাংশ মাত্র ভাসমান আর সবই নিমজ্জিত। এই মগ্নচৈতন্যের রূপময়তা রবীন্দ্রচিত্রে সর্বত্রসঞ্চারী। চেষ্টাহীন, ভাস্বর আর প্রাচুর্যের এই ফসল বিশুদ্ধ রূপের জগতে পদার্পণের ফলে খুবই স্বল্পকালস্থায়ী। কবিতার রোমান্টিক জগতের ঘাটে নোঙর-বাঁধা কবি এখানে এসে আধুনিককালের দ্রুতধাবমান শকটে আরোহী হলেন। মগ্নচৈতন্যে তার অবরোহ প্রণালী ও অভিযাত্রা ইউরোপীয় আধুনিকতায় তদ্গত হল। এক জঙ্গম সত্তার নির্ভার চেতনার দ্যুলোক যেন মুহূর্তেই তার তমিস্রা যবনিকা উত্তোলন করে এক বিশুদ্ধ আলোর জগৎসত্তায় অন্তর্লীন যাত্রার পাথেয় এনে দিল।

ছবির রাজ্যে রবীন্দ্রনাথ সমাজবন্ধনের উর্ধ্বে উঠে ফ্রয়েডের মনোজগতের অবদমিত অচেতনলোকে যাত্রা করেছেন, তবু যান্ত্রিক সভ্যতার মুখরিত কর্মচাঞ্চল্যে শিল্পীর সত্তাকে মুহূর্তের জন্য বিস্মৃত হন নি। নির্মোহ চিত্তে তিনি ঘোষণা করেছেন :

> যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে কলের কাছে মানুষের রুচির পরাভব সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া ঘটিতেছে সেখানে ভারতবর্ষ নিষ্কৃতি পাইবে এমন আশা করি না, যেখানে পণ্যের হাট সেখানে বাণিজ্যলক্ষ্মীর হাতে সৌন্দর্য লক্ষণীয়, কলের হাতে কলার অপমান বর্তমান যুগের ললাটলেখা।

এই সচেতনতার পর কবির আত্মরক্ষার প্রয়াস শিল্পী হিসেবে ও মানবতাবাদী হিসেবে হ্যামলেটের চরিত্রের সাথে তুলনীয়। একাই নিঃসঙ্গভাবে অন্যায়ের প্রতিরোধে উদ্বুদ্ধ হ্যামলেটের দ্বন্দ্ব-বিদীর্ণ হৃদয়ের আর্তির প্রচ্ছন্ন আভাস রবীন্দ্রনাথের পরাবাস্তব ছবিতে—সেখানে তিনি দায়িত্বমুক্ত হতে চেয়েছেন বাইরের অন্ধকারাচ্ছন্ন জগৎ থেকে দূর নির্জনে এক আলোকিত তাঁবুতে—শিল্পীর আপন জগতে। তাই রবীন্দ্রনাথের ছবি বস্তুজগতের সাথে এমন নির্মমভাবে সম্পর্করহিত। কিন্তু শিল্পীর সচেতনতা তাঁকে রেহাই দেয় নি। 'রক্তকরবী' নাটকের চিত্রিত পাণ্ডুলিপিতে তার স্বাক্ষর। চিত্রশিল্পী হিসেবে তাঁর কবিকর্মের—রবীন্দ্রনাথের—বিচ্ছিন্নতা সমাজ থেকে পলায়নপ্রয়াসী মনের বিলাস নয়—এক নির্বস্তুক আত্মপ্রতিষ্ঠ লক্ষ্যের মুখে অভিযাত্রা। সজীব, বর্ণাঢ্যময়, সাবলীল, স্বচ্ছন্দ ভয়ঙ্কর প্রপাতের মতো।

তাই গ্যেটের প্রতি ভালেরির শ্রদ্ধার্ঘ্যের মতো আমরা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলতে পারি : 'জগতের জুয়াখেলার টেবিলে এক মহাভাগ্যবান দান।'

সন্‌জীদা খাতুন

রবীন্দ্রসঙ্গীত, শিল্পী ও শ্রোতা

সঙ্গীত-পরিবেশনের ব্যাপারে শিল্পীর দায়িত্ব বিরাট। সবক্ষেত্রে গায়কই অবশ্য একমাত্র পরিবেশক নয়। গায়ক যে-অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করছেন তার ব্যবস্থাপকদের ওপরেও পরিবেশন-সংক্রান্ত কিছু দায়িত্ব বর্তায়। তবে ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে, আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রকৃতি এবং গায়কদের সহায়তা—যেমন, যন্ত্র অনুষঙ্গ বিষয়ক আয়োজনের প্রকার ইত্যাদির মধ্যে ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব মোটামুটিভাবে সীমাবদ্ধ থাকে, বলা যায়। অনুষ্ঠানের প্রকৃতির মধ্যেই শ্রোতাসমাবেশ সম্বন্ধীয় দায়িত্বের উল্লেখ নিহিত থাকছে।

তবু, সঙ্গীত পরিবেশনে গায়কের দায়িত্ব প্রধান। বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীত-গায়কের জন্য এই দায়িত্বের চেতনা একান্ত আবশ্যিক। প্রচলিত ধারণা মতে রবীন্দ্রসঙ্গীত শ্রেণীবিশেষের গান, সর্বসাধারণের কাছে এর কোনো আবেদন নেই। বস্তুত, উনিশ শ সাতান্ন-আটান্নর দিকে এই প্রদেশে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সমাদর যেন উঠে গিয়েছিল। যে-কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আধুনিক বাংলা গান এবং গিটারে আধুনিক বাংলা গানের সুরবাদনই অনুষ্ঠানসূচির বিষয় ছিল (মফস্বল অঞ্চলে এখনো এই অবস্থা বিরাজমান)। সাধারণত শ্রোতাদের চাহিদামতোই এসব অনুষ্ঠানের আয়োজন হত। অর্থাৎ তা থেকে ধরে নেওয়া যায়, এসব অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসঙ্গীতের কোনো আবেদন ছিল না। অথচ, এই সব অনুষ্ঠানে সমবেত শ্রোতারা সকলেই ছিলেন শিক্ষিত। কাজেই, এই অবস্থায়, সর্বসাধারণ বলতে যে বিশাল জনসমাজকে বোঝায়, সেই সমাজে রবীন্দ্রসঙ্গীতরসজ্ঞতা আরো দূরের ব্যাপার, সে-কথা অত্যন্ত পরিষ্কার।

উনিশ শ একষট্টিতে রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীর বিশ্বব্যাপী আয়োজন এদেশে রবীন্দ্রসঙ্গীতপ্রীতি পুনরুজ্জীবিত করল। এ সময়ে বাধা অগ্রাহ্য করেও ঐতিহ্য রক্ষা করবার অকৃত্রিম আগ্রহ লক্ষিত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীর যে শ্রোতৃসমাবেশ তাও সর্বসাধারণের সমাবেশ নয়—শিক্ষিত জনেরই সমাবেশ। কাজেই এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, আমাদের দেশেও শতবর্ষেও রবীন্দ্রসঙ্গীত সাধারণের সঙ্গীত হতে পারল না।

কিন্তু তার দায় কি রবীন্দ্রসঙ্গীতের—না রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিল্পীর—না সর্বসাধারণের? না কি এর পিছনে অন্য কারণ বর্তমান?

রবীন্দ্রসঙ্গীত বাংলা গানের সাগরপ্রবাহে মিলিত একটি বহু শাখাবিশিষ্ট স্রোতস্বিনী। বাংলাদেশের উচ্চাঙ্গ ও লোকসঙ্গীত এবং আংশিকভাবে পুরোনো বাংলা গানের থেকে

উপযোগী রস গ্রহণ করে আপন প্রকৃতি অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গীতের ভাণ্ডার পূর্ণ করেছেন। বিশেষ করে সুরের দিক থেকে বিচার করলে এই কথা দাঁড়ায়। তা হলে এই বাংলাদেশেরই সুর ছেনে যে সুরলোকের সৃষ্টি তার সঙ্গে সাধারণের যোগটা বিচ্ছিন্ন হল কিসে? প্রথমেই যে-কথা মনে আসে, সে রবীন্দ্রনাথের গানের বাণী। সাধারণভাবে আমরা মনে করি, রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাষা ও ভাব সাধারণের অনধিগম্য। কিন্তু বাউল গানের বাণীর রহস্যময়তা যে-দেশের সাধারণ মানুষের চিত্ত স্পর্শ করেছে—কীর্তনের ভাবাবেগ যে-সাধারণ চিত্তকে উদ্বেলিত করেছে—রবীন্দ্রনাথের গানের ক্ষেত্রে সেই চিত্তের জড়তা কি সত্যিই স্বাভাবিক ব্যাপার? এর পিছনে গভীরতর কারণ নিহিত নেই? বাণীর দিক থেকেও বাঙালি সংস্কৃতির সন্তান রবীন্দ্রনাথের গানের বাণী সাধারণের চিত্তে সাড়া জাগাতে পারছে না কেন, বিস্ময়ের কথা বটে।

'সাধারণের মনে আবেদন সৃষ্টি' বিষয়টি আলোচনাসাপেক্ষ। সঙ্গীতরসজ্ঞতা সাধারণ ক্ষমতার ব্যাপার নয়। যে-কোনো প্রকার সঙ্গীত শুনে মুগ্ধ হবার লোক সংখ্যায় অনেক হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতরসজ্ঞ বা সমঝদারের সংখ্যা কোটিকে গুটিক। কাজেই বাংলাদেশের উচ্চাঙ্গ বা লোকসঙ্গীতের বোদ্ধা শ্রোতাই বা ক'জন রয়েছেন যাঁরা সেইসব সঙ্গীতের সঙ্গে যোগের সূত্রে রবীন্দ্রসঙ্গীতের রসে বিভোর হতে পারবেন—এও ভাববার কথা বটে। রবীন্দ্রসঙ্গীত যে বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র সঙ্গীত—উচ্চাঙ্গ বা লোকসঙ্গীত নয়—তা উপলব্ধি করতে হলেও তদোপযুক্ত ক্ষমতা চাই। একান্তভাবে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে যাঁর রুচি—উচ্চাঙ্গসঙ্গীত দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত রবীন্দ্রসঙ্গীত—বাণীপ্রাধান্য আদি নানা কারণে তাঁর কাছে নিতান্ত জোলো। লোকসঙ্গীতরসিকের কাছেও রবীন্দ্রনাথের লোকগীতিপ্রভাবিত গানকে লোকসঙ্গীতের পাশে নিতান্ত জোলো মনে হওয়াই স্বাভাবিক। সেইজন্য প্রচলিত সঙ্গীতকে ভেঙেও যে গুণে রবীন্দ্রসঙ্গীত স্বতন্ত্র ধারার সঙ্গীত হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে—সেই গুণটি কী এবং তার রস কোন্‌খানে সেই উপলব্ধি প্রয়োজন রবীন্দ্রসঙ্গীতরসজ্ঞতার জন্য। লোকসঙ্গীত বা উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের রচয়িতা একজন নন। ভিন্ন ভিন্ন জনের সৃষ্টি হয়েও সেইসব সঙ্গীত আপন বিশেষ ধারার সঙ্গীতরূপেই স্বীকৃত। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে অবস্থাটি সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ এই বেলা বিভিন্ন শ্রেণীর বা ধারার সুর একজনের হাতে এমন বিশেষ একটি অবয়ব পাচ্ছে—যাতে তা সেই একজনের সৃষ্টি বলে চিহ্নিত হয়ে পড়ছে।

কাজেই সাধারণভাবে সঙ্গীতমুগ্ধ শ্রোতা বা বিশেষ কোনো ধারার সঙ্গীতরসিকের পক্ষেও রবীন্দ্রসঙ্গীত রসোপলব্ধির জন্য ভিন্ন ধরনের চেতনা প্রয়োজন।

গানের বাণীর আলোচনাতেও কতকগুলি বিষয়ে লক্ষ রাখতে হবে। বাউল বা কীর্তন গানের ভাব এ দেশে বহুদিন ধরে প্রচলিত সুপরিচিত ভাব। তার মর্ম গ্রহণের জন্য নতুন চিন্তা বা বোধশক্তির প্রয়োজন নেই। এবং যত গীতকারই বাউল বা কীর্তন রচনা করুন না কেন—গানের ভাব সেই এক চিরপুরাতন। অথচ, রবীন্দ্রনাথের গানের কথায় তাঁর শিক্ষিত ও কর্ষিত বিশিষ্ট চিন্তা ও বোধ ভিন্ন গানে ভিন্নভাবে ধরা দিচ্ছে। প্রতিটি গানই বিভিন্ন ভাবের বাহন, গান হয়েও কবিতা আর ভিন্ন ভিন্ন উপলব্ধির আকর। রবীন্দ্রচিন্তা এবং ভাবকল্পনার সঙ্গে পরিচিত শিক্ষিত চিত্তের কাছে এই কাব্যগীতি যতখানি ভাব ও রসে পূর্ণ, সাধারণের কাছে তেমন হওয়া দুষ্কর।

এখানে আরেকটি কথা। রবীন্দ্রনাথ বাঙালি সংস্কৃতির সন্তান হলেও, উনবিংশ শতাব্দীর যে সীমিতসংখ্যক বাঙালির সমাজ সমগ্র দেশকে ছেড়ে শিক্ষায় অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল, তিনি সেই সমাজের সৃষ্টি। তারপরে দিন অনেক কেটেছে। তবু বছরের পর বছর ধরে শিক্ষার

পথ শুধু সৌভাগ্যবান ব্যয়ভার বহনক্ষম মুষ্টিমেয়ের জন্যই খোলা থেকেছে। এহেন দেশের শিক্ষিতের সংস্কৃতি সর্বসাধারণের সংস্কৃতি হয়ে ওঠাই আশ্চর্য। সকল স্তরে সমভাবে শিক্ষার বিস্তার না ঘটা পর্যন্ত সর্বসাধারণের সঙ্গে শিক্ষিত মনের যোগ কল্পনা নিতান্তই অবাস্তব কল্পনা।

এই অবস্থায়, সাধারণের কাছে আবেদন নেই বলে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে নিন্দনীয় কলঙ্কের ভাগী মনে করবার পক্ষে যুক্তি নেই।

তবে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির ব্যাপারে রবীন্দ্রসঙ্গীত-পরিবেশক, বিশেষত গায়কের জন্য দায়িত্বসচেতনতার আবশ্যকতা স্বীকার করতে হবে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিপুল ভাণ্ডারের সকল কোষ সম্পর্কে গায়কের বিধিবদ্ধ শিক্ষা ও অবহিতি এবং তার উপরে মোটামুটি দখল এবং আপন ক্ষমতা সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান সুষম পরিবেশনের সহায়ক। মানুষের রুচি দেশে দেশে, কালে কালে, জনে জনে পর্যন্ত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত বা আবর্তিত হয়ে চলে। শ্রোতৃ-সমাবেশের প্রকৃতির প্রতি লক্ষ রেখে সঙ্গীত-নির্বাচনের উপর অনেক সময় গায়কের সাফল্য ও শ্রোতার সন্তুষ্টি নির্ভর করে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ডালিতে বিচিত্র ধরনের গান সঞ্চিত আছে—তা থেকে শ্রোতা-অনুযায়ী বাছাইয়ের অপেক্ষা। তা ছাড়া আপন কণ্ঠে কোন জাতীয় সঙ্গীত কীভাবে পরিবেশিত হলে রসসৃষ্টি সম্ভব সে-বিষয়ে ধারণা থাকা প্রয়োজন। অনেক সময়ে গায়কের পরিবেশন-সাফল্যে ভিন্ন শ্রেণীর রসার্থী শ্রোতাকেও বিমুগ্ধ হতে দেখা গেছে। এ থেকেও শ্রোতৃসাধারণের চিত্তে রসোপলব্ধি সঞ্চারের ব্যাপারে রবীন্দ্রসঙ্গীত-গায়কের দায়িত্বচেতনার প্রয়োজনীয়তা বোধ করা যায়।

এই প্রসঙ্গে, বর্তমান প্রবণতার বিচারে আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রসঙ্গীত-গায়ককে একথা ভুললে চলবে না যে তিনি এক বিশেষ ধরনের গান গেয়ে সেই বিশেষ রসটি পরিবেশনে উদ্যত হয়েছেন। শ্রোতার চাহিদামাফিক তিনি গান বাছাই করে নিতে পারেন। কিন্তু, তা-বলে তিনি কোনোমতেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের রসবিকৃতি ঘটিয়ে এই সঙ্গীত প্রচার করতে পারেন না। এমন উপায়ে শ্রোতাকে মত্ত করা যেতে পারে — কিন্তু তাতে যে রসবিকৃতি ঘটে তা বিকারের ফল সন্দেহ নেই। বিকারকে প্রশ্রয় দিতে গেলে গায়ক হিসেবে নিজের অযোগ্যতা প্রমাণ করে সম্মান বলে ভুল করে অপমান কুড়ান হয়।

এই জন্যই রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিধিবদ্ধ শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। গুরুগম্ভীর চালের রাগভিত্তিক ধ্রুপদ বা খেয়ালাঙ্গের গান থেকে শুরু করে হালকা হাসির গান পর্যন্ত সকল প্রকার গানই রবীন্দ্রনাথের রচনাতে পাওয়া যায়। এ-ব্যাপারে 'কাঁটাবনবিহারিণী সুরকানাদেবী'র ভক্তদেরকে রবীন্দ্রনাথ নিরাশ করেন নি তো বটেই, এমনকি 'চা-স্পৃহ চঞ্চল'দের তৃষ্ণা নিবারণের আয়োজনেও পরম উৎসাহ ঘোষণা করেছেন।

কিন্তু এই বৈচিত্র্য সত্ত্বেও রবীন্দ্রসঙ্গীত মূলত ধ্রুপদভিত্তিক গান। ধ্রুপদ গান বর্তমানে প্রায় অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে। আধুনিক বাংলা গানে না-ধ্রুপদ না-খেয়াল না-রবীন্দ্র না-নজরুল এক বিজাতীয় ও মিশ্রচাল অবলম্বিত হয়েছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতকেও সেই চালে 'পপুলার' করবার প্রবণতা দেখা দিলে ক্রমে রবীন্দ্রসঙ্গীতের উপরে ন্যস্ত এক গুরুদায়িত্বের প্রতি অবহেলার সূত্রপাত হবে। সমাদর হ্রাস হওয়াতে আজ ধ্রুপদ গান বিস্মৃত হতে চলেছে। এ দেশীয় সঙ্গীতের আদিরূপ স্মরণ করতে গিয়ে ভবিষ্যতের কোনো একদিনে যখন ধ্রুপদের খোঁজ পড়বে সেদিন রবীন্দ্রসঙ্গীতরূপে প্রচলিত, স্বরলিপিতে সংবদ্ধ ও সুরক্ষিত ধ্রুপদ গানগুলিই ('বাণী তব ধায় অনন্ত গগনে', 'তাঁহারে আরতি করে চন্দ্র তপন', 'প্রথম আদি তব শক্তি', 'আজি মম মন চাহে জীবনবন্ধুরে' ইত্যাদি) হবে আমাদের নির্ভরযোগ্য

অবলম্বন। এই সকল গানের গীতভঙ্গির পরিবর্তনের সম্ভাবনায় সমূহ সর্বনাশের ইঙ্গিত রয়েছে।

ধ্রুপদের চাল সযত্ন শিক্ষাসাপেক্ষ। কিন্তু সেই শিক্ষার ক্ষেত্রই বা আমাদের এখানে কোথায় ! ধ্রুপদ গানে অভিজ্ঞ গুণীই কি আমাদের এ-অঞ্চলে চোখে পড়ে ! শুধু ধ্রুপদ কেন রবীন্দ্রনাথের টপ্পাঙ্গের এবং দক্ষিণ ভারতীয় সুরের গানগুলি শিখবার জন্যও বিশেষজ্ঞের সাহায্য প্রয়োজন। অথচ সে-সাহায্যও সুদুর্লভ। বিশেষজ্ঞের সহায়তায় শিক্ষণীয় রবীন্দ্রসঙ্গীতগুলির আদর্শস্বরূপ আমাদের সামনে স্বরলিপি আকারে তার কাঠামোটুকু মাত্র আছে। সেই লিপি থেকে স্বর এবং তা প্রয়োগের ভঙ্গি বুঝে নিতেও যথেষ্ট মুনশিয়ানার প্রয়োজন। স্বরলিপিতে যেখানে শ্রুতির উল্লেখ আছে সেখানে হার্মোনিয়মের চাবি-টেপা বিদ্যায় আর কুলোয় না। এইখানে এসে রাগসঙ্গীতভিত্তিক যথাযথ সুরজ্ঞান ব্যতীত ঠিক পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই, সমস্যা সামান্য নয়। যে পরিবেশকমণ্ডলীর কাঁধে দায়িত্বের বোঝা চাপানো হচ্ছে—তাঁদের শিক্ষার দায়ই বা বুঝে নেয় কে! ফলস্বরূপ, এই প্রদেশে যাঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা করছেন তাঁদের কেউই বিধিবদ্ধ শিক্ষা ও প্রয়োজনীয় সাধনা সম্পাদিত ও সমাপ্ত করে সাফল্যের তৃপ্তি আস্বাদন করতে পারছেন না।

এবংবিধ দুরবস্থায় মনে হয়, আমাদের দেশের গায়কদের একমাত্র মূলধন তা হলে রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুরের চাল ও ভাবোপলব্ধির ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা। এ ছাড়া অকূলের কূল অগতির গতি আর কী হতে পারে !

এ কথা অবশ্যই ঠিক যে ভাবোপলব্ধি ব্যতীত রবীন্দ্রসঙ্গীতের রসমূর্তি সৃজন কোনো গায়কের পক্ষে সম্ভব নয়। হতে পারে সুরের ভঙ্গির সঙ্গে গানের ভাবের সামঞ্জস্য থাকে। তবু, সমগ্রভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং বিশেষত যে গানটি যখন গাওয়া হচ্ছে সে গানের ভাব সম্বন্ধে গায়কের ধারণা না থাকলে রসাভাস দোষ ঘটবার সর্ব সম্ভাবনা থেকে যায়। সেইজন্য রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে কেবলমাত্র সুরজ্ঞান যথেষ্ট নয়, সঙ্গীতের সুর ও বাণীর ভাব গ্রহণ করবার ক্ষমতাও অপরিহার্য।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ শিক্ষার জন্য এ সঙ্গীতের সর্ববিধ তালও আয়ত্তে আনা কর্তব্য। ত্রিতাল, একতাল, চৌতাল, সুর-ফাঁক্তা, ঝাঁপতাল, দাদরা, কাহারবা, তেওরা প্রভৃতি ছাড়াও কতকগুলি নতুন তাল—যেমন ঝম্পক, ষষ্ঠী, রূপকড়া, নবতাল, একাদশী ও নবপঞ্চতাল সম্বন্ধে জ্ঞান রাখতে হবে। এতদ্ভিন্ন সাধারণ তালের গানেও ঝোঁকের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা তালের বহুবিচিত্র ভঙ্গি সৃষ্টি হয়েছে। এই সমস্ত তাল এবং তার বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতি লক্ষ না করে গান গাইতে গেলে অনেক গানই মাঠে মারা যাবে। রবীন্দ্রনাথের বহু গানে নাটকীয় ভঙ্গি ফুটিয়ে তুলবার জন্যে ঝোঁকের বৈশিষ্ট্য বা একই গানে নানান তাল প্রয়োগ দেখা যায়। তালের ঝোঁকের প্রতি পরিমাণ মতো মনোনিবেশ না করলে সুরস্রষ্টার ঐকান্তিক সাধনার ফলস্বরূপ এইসব রচনা নিরর্থক হয়ে যাবে।

রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনের সার্থকতার ব্যাপারে শ্রোতাদেরও কিছু দায়িত্ব স্বীকার করা সঙ্গত। সর্বসাধারণের কথা বাদ দিলেও শিক্ষিত শ্রেণীর শ্রোতাদের মধ্যেই প্রকৃত রসজ্ঞতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্রসঙ্গীত শ্রবণের দীর্ঘকালীন অভ্যাস থেকে ক্রমে রসবোধ তৈরি হতে পারে। এখানে ব্যক্তিগত ক্ষমতা-অক্ষমতার কথাও অবশ্যই মনে রাখতে হবে। গায়কের জন্য উপযুক্ত পরিবেশের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয় যে শ্রোতা-দর্শকের অমনোযোগের দরুন আহত গায়ক কিছুতেই আত্মনিমগ্ন হয়ে শ্রোতাদেরকে রসের উপলব্ধিতে প্রবুদ্ধ করতে পারছেন না। দুর্লভ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত পরিবেশে

আয়োজিত সঙ্গীত-উৎসবেও দেখা গেছে শ্রোতৃমণ্ডলীর অধিকাংশই পরিবেশ ও সঙ্গীতকে প্রাণে অনুভব করবার বিন্দুমাত্র প্রয়াস না করে উচ্চকলরবে বন্ধু-সম্মিলন জমিয়ে তুলেছেন। অনুষ্ঠানের শেষে আবার তাঁদের মুখেই মন্তব্য শোনা যাবে—সঙ্গীতানুষ্ঠান মোটেই জমল না। যেন জমাবার দায়িত্ব শুধুমাত্র হতভাগ্য গায়ক এবং ব্যবস্থাপকদের উপরেই ন্যস্ত। শ্রোতা-দর্শকের মানসিক গঠন, গ্রহণক্ষমতা বা প্রচেষ্টার যেন কোনো অংশই নেই এতে! 'গানভঙ্গ' কবিতার বরজলালের দুর্দশার কাহিনী মনে পড়ে এ-প্রসঙ্গে। আমাদের স্মরণ রাখা দরকার,

একাকী গায়কের নহে তো গান, মিলিতে হবে দুই জনে—
গাহিবে এক জন খুলিয়া গলা, আরেক জন গাবে মনে।
তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ তবে সে কলতান উঠে,
বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে তবে সে মর্মর ফুটে।

প্রকৃতপক্ষে, সর্বসাধারণের রবীন্দ্রসঙ্গীত-রসগ্রহণে অক্ষমতার সরল সহজ কারণ রয়েছে— শিক্ষার থেকে তাদের বঞ্চিত করে ব্রাত্য করে রাখা হয়েছে। তাদেরকে এ সংস্কৃতিতে অধিকার দেওয়া হয় নি। কাজেই তাদের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের আবেদন না থাকবার দায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের নয়—শিল্পীর বা সর্বসাধারণেরও নয় পুরোদস্তুর। কাজেই এই সর্বসাধারণের অবস্থার চাইতে শিক্ষিত শ্রোতাদের মধ্যে যে রসগ্রাহিতার অভাব দেখা যায়—রুচির পরিশীলনে অনাগ্রহ লক্ষ করা যায় সেই অবস্থাই বরং অধিকতর উদ্বেগের কারণ। এর মূলে আছে বর্তমান সামাজিক ও বিদ্যালয়ভিত্তিক বিচিত্র শিক্ষার প্রভাবে গঠিত জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি। আজকাল নানা উপায়ে এমন সব শিক্ষা আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে যার ফলে শিক্ষিত সমাজের এই বিভ্রান্ত অবস্থা। সমগ্র দেশে জাতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটা ধোঁয়াটে ধারণার সৃষ্টি করে, বহুকালগত ঐতিহ্যকে অস্বীকারের প্রবণতা এবং একটা বিজাতীয় জগাখিচুড়ি সংস্কৃতিকে অনুকরণ করবার হীন প্রবর্তনা দেবার সুশৃঙ্খল চেষ্টা থেকেই এই অবস্থার উদ্ভব। তা ছাড়া, শিক্ষা যদি মনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব সংশয় ঘুচাবার আলোক না হয়ে জীবিকা আহরণের উপায়টুকু মাত্র হয়ে ওঠে তবেই এমন দুর্দশা সম্ভব। জাতির জীবনে এর চাইতে বড় দুর্দিন আর কী হতে পারে যখন আপন ঐতিহ্যকে স্বীকৃতি দিতেও দ্বিধা—নিজের জন্ম কোন সংস্কৃতির উত্তরাধিকার নিয়ে সে-সম্বন্ধেও সন্দেহ-সংশয়।

রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন সম্পর্কে বর্তমান আলোচনা থেকে মনে হওয়া সম্ভব যে, উক্ত সঙ্গীতশিল্পীর জন্য আজ বড়ই দুর্দিন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, যেনতেন প্রকারে দু'চারখানি গান শিখেই কেবল সুকণ্ঠের গুণে কোনো কোনো আসরে শিল্পী হিসেবে বাহবা পাওয়া দেখে বরং বলতে হয় রবীন্দ্রসঙ্গীত-গায়কের পক্ষে দিব্য সুদিন যাচ্ছে। আমাদের দেশে বর্তমানে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আলোচ্য সঙ্গীতের শ্রোতার হারও বহুল পরিমাণে বেড়েছে। এবং যেহেতু শহরের বাইরে থেকে আগত নব্য শিক্ষিত শ্রেণীর রবীন্দ্রসঙ্গীত-রসজ্ঞান এখনো অনতিকর্ষিত পর্যায়ভুক্ত রয়েছে সেহেতু এই শ্রেণীর একাংশের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পীর পক্ষে জনপ্রিয়তা অর্জন নেহায়েতই সহজ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এই সহজলভ্য সমাদর উন্নতির লক্ষণ নয়। রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পীর সেই দুর্দিন কবে আসবে যেদিন আমাদের মানুষ শিক্ষা ও চিৎপ্রকর্ষের গুণে যথার্থ রসজ্ঞ হয়ে উঠবে, যেদিন সুনাম আর এত সুলভ থাকবে না? সেই শুভদিনের জন্যই ব্যাকুল আমাদের প্রতীক্ষা—যেদিন রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী যথাযথ শিক্ষার গুণে সুরুচিসম্পন্ন সমালোচনক্ষম শ্রোতার সামনে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন দ্বারা আপন ক্ষমতার যাচাই করে যথার্থ সম্মান অর্জন করতে পারবেন।

হায়াৎ মামুদ

দুই যৌবনে কৃষ্ণ শোণিত

সমগ্র রবীন্দ্রসৃষ্টিসৌধে তাঁর গীতধারা যেন-বা মর্মরস্ফটিক, অপূর্ণ রয়ে যেত প্রাসাদের কারুতা তারা না হলে। যে-কোনো আগন্তুক, এমনকি জহুরী কন্যোশারও, অঙ্গনে পা রেখেই শিহরিত হবেন উল্লাসে, দিশা হারাবেন—চোখ ধাঁধিয়ে দেবে সমুখস্থ স্ফটিকের বহুপ্রভ রঙিনায়ুত বর্ণালী; আর তাই পায়ের সামনে লিখি, তার কৃষ্ণোজ্জ্বল স্রোতঘূর্ণি তখন চোখেই পড়ে না। কবিগুরুর লিরিক পুরাণোক্ত কামাক্ষীর মতোই মায়াবিনী প্রতারক; রবীন্দ্রসঙ্গীতই পৌঁছে দেয় আমাদের ভুল স্বর্গে।

একদা যে তিনি আশা পোষণ করেছিলেন, বাংলা দেশের লোককে তাঁর গান গাইতেই হবে, বর্তমানে, তা অবিশ্বাস্য সত্য।[১] ফলে যে-রবীন্দ্রনাথ আমাদের আত্মার সঙ্গী তিনি রাজকবি নন, সুরের গুরু। রবীন্দ্র-মিথের[২] জনকও তাই যত না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা, তদপেক্ষা বহুগুণ বেশি তাঁর 'সঙ্গীত মধুরিমা'। এই সঙ্গীতেরই কল্যাণে তাঁর প্রতিকৃতি বারংবার খণ্ডিত হয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। 'তোমার মোহন রূপে কে রয় ভুলে'—সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যদিও এক গানে, তথাপি অনাস্থাপোষণ তো দূরের কথা, তাঁর খ্রিষ্টীয় সৌমশ্রীতে দেউলে হয়ে বসে আছি।

কিন্তু তাঁর 'গানের ভুবন' যদি তার স্থপতির যথার্থ প্রতিবিম্ব না হয়, তবে তা কী ? দুর্ভাগ্য, তাঁর কবিতাও নয়। কেননা, তাঁর সঙ্গীত ও কাব্য শুধু সমান্তরালই নয়, সমপাতীও বটে; রবীন্দ্রছন্দোসম্ভারকে হয়তো সঙ্গতভাবেই একক নামে উচ্চারণ করা যেতে পারে : গান। তাই তাঁর অনরেখ কিন্নরীয় রূপ সর্বদা চোখে ভাসে যখন কেবল গান নয়, তাঁর কবিতাও হৃদয়ে ধারণ করে থাকি। না, এই প্রতিজ্ঞায় কিঞ্চিৎ অতিশয়োক্তি বর্তমান। আসলেই কি তাঁর সমুদয় কবিকৃতি আমরা লালন করি আমাদের চৈতন্যে ? তাও না। 'বনফুল' থেকে 'শেষ লেখা'র স্রষ্টার রূপাবয়ব হ্রস্ব করে নিই অন্তরে; সমগ্র নয়, আমরা ধারণ করি তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের বৃহত্তম অংশটুকু কেবল। আর সেই চতুর্দিগন্তস্পর্শী ভুবনের বৃহত্তম অংশ ব্যতিরেকে যে-শীর্ণ প্রদেশ পড়ে থাকে, তাকে কবিগুরু চিরদিন অবহেলা করেছেন; সূর্যকর ও বাতাসের জীবনাভিসার খেলা সেখানে চিত্রিত নয়, যেন-সে আফ্রিকার মহাকালপোষিত বনানী, বিরাট পুরুষের অমৃতধারাবঞ্চিত। অথচ আশ্চর্য নয় কি, এই শীর্ণাবহেলিত ভূখণ্ডের ধূমল ও নষ্ট জলবায়ুতে রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝেই এসে প্রবেশ করেছেন, তাও হয়তো সজ্ঞান সচেতনে নয়—বলা যেতে পারে, যেমন করে নিদ্রাচারীরা

গভীর ঘুমের মধ্যে একান্ত পরিচিত মহলে যাতায়াত করে অথবা হত্যাকারী অপ্রতিরোধ্য ধমনীর তাড়নায় বারবার অকুস্থল দেখে যায়। আরো আশ্চর্য : একবার তিনি এসেছিলেন সেখানে যৌবনপ্রারম্ভে, পরে যেন ভুলেই গেলেন কৈশোরস্মৃতি, এলেন বহু পরে একেবারে আয়ুকালের প্রান্তসীমায়।

১

"হৃদয়ের একূল ওকূল
দুকূল ভেসে যায়"

রবীন্দ্রনাথের আত্মজৈবনিক রচনাবলির যাঁরা পাঠক তাঁদের উপলব্ধি না করে উপায় নেই যে, কবির শৈশবজীবনের পরিমণ্ডল সর্বতোভাবে অসাধারণ ও অস্বাভাবিক ছিল। শতকরা নিরানব্বই জন বঙ্গশিশুর ন্যায় খেলাধুলো, মাতাপিতা ও পরিজনবর্গের আদরচ্ছায়ায় প্রচলিতভাবে কালক্ষেপণ ঘটে নি তাঁর ভাগ্যে পারিবারিক পরিবেশের জন্যই। অথচ 'ভৃত্যরাজকতন্ত্রে'র অভিশাপ তাঁর মনোজগতে বিন্দুমাত্র রেখাপাতেও নিষ্ফল হল। মাতৃস্নেহকার্পণ্যে[৩] বালকের পক্ষে মানসিক সঙ্কটে ক্ষুব্ধ হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল, অবদমিত বাসনার বিস্ফোরণ সহজেই রঞ্জিত করে দিতে পারত অশীতিপর জীবন। অথচ, কিছুই ঘটে নি। তার প্রথম কারণ, রবীন্দ্রস্বভাবে সমর্পণচিত্ততা এবং দ্বিতীয়, আকাশস্পর্শী কল্পনাকারুতা। 'জীবনস্মৃতি'র সাক্ষ্য সত্য বলে মেনে নিলে আমাদের এ-ধারণা অতিশয় সঙ্গত মনে হয় যে, তিনি বিদ্যাসাগর বা বোদলেয়ারের সমধর্মী ব্যক্তিত্ব ছিলেন না। বিদ্যাসাগরের শৈশবী বিদ্রোহী ক্রিয়াচয় যেমন অস্তিত্বহীন তাঁর বাল্যস্বভাবে, ফরাসি কবির অকালবয়সী গ্লানি ও মানসিক সঙ্কটও তাঁর অচেনা ছিল। শৈশবচরিত্রে তিনি আরো সহস্র বাঙালি বালকের ন্যায় অল্পতুষ্ট ও ভীরুচারী ছিলেন।[৪]

কিন্তু শুধুই কি তাই? অন্যতর এক তৃতীয় কারণ হয়তো বর্তমান। রবীন্দ্রনাথের সপ্তমবর্ষীয় বয়ঃক্রমকালে এক বালিকা আগন্তুক ঠাকুর-পরিবারে বধূরূপে প্রবেশ করেন।[৫] বালিকাবধূ ও কিশোর দেবরের সখ্যের কোনো প্রাথমিক চিত্র আমাদের সামনে উপস্থিত নেই; কিন্তু হিমালয়-প্রত্যাবর্তিত দ্বাদশবর্ষী বালকের বাক্‌মুখরতাও ভুলবার নয়।[৬] ভিতরবাড়ির সান্ধ্যকালীন অন্তঃপুরিকা-সম্মেলনে বালক রবি যেন নবরত্ন-সভায় কালিদাস, আর তাঁর সমস্ত অনুভব একটিমাত্র প্রাণীর প্রশংসালাভে উন্মুখ,—তিনি 'নতুন বৌঠান' কাদম্বরী দেবী। রবীন্দ্রচৈতন্যে উক্ত সমবয়সী ভ্রাতৃবধূর স্মৃতি ও প্রভাব বড়ো গূঢ়মূল; এমনকি, কবির ব্যক্তিচরিত্র-নির্মাণে এই ক্ষীণায়ু মহিলার[৭] দান প্রশ্নাতীত। রবীন্দ্রনাথ যে নিউরটিক বা মর্বিড হন নি, তার প্রধানতম কারণই এই ভ্রাতৃজায়া। বহির্বাটির 'ভৃত্যরাজকতন্ত্রে' শাসিত বালকের নিকট অন্তঃপুর যেন এক স্বপ্নপুরী :

> শিশু বয়সে অন্তঃপুর যখন আমাদের কাছে দূরে থাকিত তখন মনে মনে সেইখানেই আপনার কল্পলোক সৃজন করিয়াছিলাম।... তাহার পরে গলায় সোনার হারটি পরিয়া বাড়িতে যখন নববধূ আসিলেন তখন অন্তঃপুরের রহস্য আরো ঘনীভূত হইয়া উঠিল। যিনি বাহির হইতে আসিয়াছেন অথচ যিনি ঘরের, যাঁহাকে কিছুই জানি না অথচ যিনি আপনার, তাঁহার সঙ্গে ভাব করিয়া লইতে ভারি ইচ্ছা করিত।[৮]

কিন্তু স্বপ্নপুরীর বন্ধ দুয়ার এতদিন খোলে নি, আর এই 'ভাব করা', যতদূর মনে হয়, হিমালয়-ভ্রমণের পূর্বে ঘটে ওঠে নি। আজ প্রথম কৈশোরে সমবয়সী দেবর-বৌদির যে আলাপ অঙ্কুরিত হল তার দূরপ্রয়াণী ফসল রবীন্দ্রনাথের কাব্যশরীরে আমৃত্যু বর্তমান দেখি।

যে-একনিষ্ঠ মনোযোগ ও সার্বিক সহানুভূতি শিশুর অপ্রতিরোধ্য দাবি তার মা-র কাছে, বালক রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সে দাবিপূরণ কখনো ঘটে নি । যে-বালক একান্ত নৈঃসঙ্গ্যে জানালার নিচে 'ঘাটবাঁধানো পুকুরে' স্নানার্থী এবং রাজহাঁস এবং পাতিহাঁসের ক্রিয়াকলাপ দর্শন করে প্রহর কাটাত, নিশ্চুপ দ্বিপ্রহরে অনিদ্র সঙ্গীহীন যে-শিশুর চিন্তা দূরবর্তী শতঝুরি বটের 'অন্ধকারময় জটিলতাকে ঘিরে স্বপ্নময় হতো', তার শিশুপ্রাণের শূন্যতা সহজেই অনুমেয়। হয়তো সেই রুদ্ধ জীবনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও ক্রোধাবেগের বহিস্ফুরণ কদাচিৎ আহার প্রত্যাখ্যানে দেখা দিত, কিন্তু তৎকালীন ঈশ্বর নামক পরিচারকটি এতে কখনো বিন্দুমাত্র চিন্তিত হয় নি।[৯] 'জীবনস্মৃতি'র '"ভৃত্যরাজকতন্ত্র" অধ্যায়ে ব্যথিত হৃদয়ে তিনি শৈশবকে স্মরণ করেছেন : "শিশুকালের শাসনকর্তাদের মধ্যে অনেকেরই স্মৃতি কেবল কিল চড় আকারেই মনে আছে—তাহার বেশি আর মনে পড়ে না।"

রবীন্দ্রচিত্ত কেন, কোনো শিশুচিত্ত বিকাশের পক্ষেই এই পরিবেশ অনুকূল নয়। হয়তো বিস্ফোরণ কবিকিশোরেও সর্বনাশী হত, যেমন হয়েছিল বায়রনের। কিন্তু অবদমিত এষণার ফল্গু প্রকাশ যে-বয়সে সোচ্চার হয়, তখনই তিনি সম্মুখীন হলেন অন্য এক ভুবনপ্লাবী বোধের,—প্রেমের। কাদম্বরী দেবীর প্রতি উন্মুখচিত্ততাই সর্ববিধ মানসিক বৈকল্য থেকে রক্ষা করল তাঁকে। এ-কথা সন্দেহাতীত যে, নতুন বৌঠানের অস্তিত্ব ব্যতিরেকে সেইসব দিনে তাঁর নিজের কোনো ভিন্নসত্তা ছিল না। বিপুল রবীন্দ্ররচনাবলির অসংখ্য স্থানে উক্ত অকালমৃত মহিলা নানা প্রসঙ্গে বহুবার উপস্থিত হয়েছেন; কবিগুরু নিজেই যে-চিত্র উপস্থিত করেছেন তাঁদের সম্পর্কের, তাতে প্রেম ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায় তাকে? অনতিচব্বিশ কবিপুরুষের কাব্যভাবনা উক্ত 'পরমা সুন্দরী কন্যা'কে[১০] ঘিরে অনুবর্তিত তো হতই, এমনকি দৈনন্দিন কর্মপ্রবাহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশেও তাঁর প্রেরণা সদাসক্রিয় ছিল। প্রমাণাভাবে তাঁদের যথার্থ সম্পর্কনির্ণয় কঠিন হলেও এ-কথা অবশ্যই অনুভবগ্রাহ্য, প্রেমের যে-আবেগ, শক্তি ও সর্বগ্রাসী ক্ষুধা প্রেমিকার চতুর্দিকে ব্যূহ রচনা করে ও নিজের সৃজনচেতনাকে[১১] তুঙ্গস্পর্শী করে তোলে তার সাথে কিশোর রবীন্দ্রনাথের বোধের কোনো পার্থক্য ছিল না। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের দূরকল্পনায়[১২] যদি আমাদের সায় নাও থাকে, তবু হেন অনুমান অত্যন্ত হৃদয়সংবেদী যে, রবীন্দ্রনাথ—ঠিক লৌকিক অর্থে না হলেও—কাদম্বরী দেবীকে ভালবাসতেন। কবি-জীবনীকার ও আত্মীয় কৃষ্ণ কৃপালনী যদিও এরূপ কোনো অনুমানকে অসঙ্গত ও অশোভন বলতে ইচ্ছুক[১৩] তথাপি ইত্যাকার অনুমানের ফলেই কবি-আত্মার একটি দিক উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। অবশ্য আমাদের মনে রাখা দরকার রবীন্দ্রহৃদয় আমাদের নিকট স্পষ্ট হলেও তাঁর প্রেরণাদাত্রী চিরকালই অন্তরালবর্তিনী; এমনও হতে পারে, অনুজ দেবরের অস্তিত্ব কাদম্বরী দেবীর নিকট সামাজিক সম্পর্কের উর্ধ্বে ছিল না। যাই হোক, শৈশবে যে-প্রেম শিশু রবীন্দ্রনাথের অভীপ্সিত অথচ অলভ্য ছিল, কৈশোর ও প্রথম যৌবনে তা, যেন ক্ষতিপূরণ রূপেই, ফিরে এল তাঁর কাছে অজস্র স্রোতধারায়,—মা নয়, মাতৃস্বরূপা প্রেমিকার কল্যাণহস্ত দিয়ে। এরই ফলে শৈশবশূন্যতা ভরাট হয়ে গেল তাঁর, নিষ্প্রেম ধূসর কবিচিত্ত অজস্র বাণী ও বর্ণে সংরক্ত হল। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'র কালে রচিত 'বিবিধ প্রসঙ্গ' গ্রন্থের সর্বশেষ রচনা স্মর্তব্য :

> আর আমার পাঠকদিগের মধ্যে একজন লোককে বিশেষ করিয়া আমার এ ভাবগুলি উৎসর্গ করিতেছি; এ ভাবগুলির সহিত তোমাকে আরও কিছু দিলাম, সে তুমিই দেখিতে পাইবে। সেই গঙ্গার ধার মনে পড়ে? সেই নিস্তব্ধ নিশীথ? সেই জ্যোৎস্নালোক? সেই দুইজনে কল্পনার রাজ্যে বিচরণ? সেই মৃদু গভীর স্বরে গম্ভীর আলোচনা? সেই দুই জনে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া

> থাকা? সেই প্রভাতের বাতাস, সন্ধ্যার ছায়া! একদিন সেই ঘনঘোর বর্ষার মেঘ, শ্রাবণের বর্ষণ, বিদ্যাপতির গান? তাহারা সব চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমার এই ভাবগুলির মধ্যে তাহাদের ইতিহাস লেখা রহিল। এই লেখাগুলির মধ্যে কিছু দিনের গোটাকতক সুখ দুঃখ লুকাইয়া রাখিলাম, এক এক দিন খুলিয়া তুমি তাহাদের স্নেহের চক্ষে দেখিও, তুমি ছাড়া আর কেহ তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে না! আমার এই লেখার মধ্যে লেখা রহিল— এক লেখা তুমি আমি পড়িব, আর এক লেখা আর সকলে পড়িবে।[১৪]

এ সুখস্মৃতিচারণ ও "নষ্টনীড়ে"র অমল–চারুলতা সংবাদ বড়ো নিকটাত্মীয় মনে হয়। আর কবির বাইশ বছরের কাব্য 'ছবি ও গানে'র উৎসর্গ? "গত বৎসরকার বসন্তের ফুল লইয়া এ বৎসরকার বসন্তে মালা গাঁথিলাম। যাঁহার নয়ন–কিরণে প্রতিদিন প্রভাতে এই ফুলগুলি একটি একটি করিয়া ফুটিয়া উঠিত, তাঁহারি চরণে ইহাদিগকে উৎসর্গ করিলাম।" 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'শৈশব সঙ্গীত' ও 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'ও স্পষ্টতই কাদম্বরী দেবীকে নিবেদিত, যদিও পরিষ্কার নামোল্লেখ কোথাও নেই। হার্দিক অনুভবের যে–গাঢ়তা নতুন বৌঠানকে একাধিক গ্রন্থ[১৫] উৎসর্গের প্রেরণা যুগিয়েছিল, সেই একই হৃদয় কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর তিরিশ বৎসর পরেও রচনা করেছিল একটি অমর কবিতা বৌঠানের প্রতিকৃতি-দর্শনে।[১৬]

তা হলে কি মেনে নেব, গোপন সুড়ঙ্গের মতো সুবিপুল জীবনের গভীরে প্রবাহী ছিল অনুভবের অস্তিত্ব? আমার কোনো সন্দেহ নেই।

২

"দাঁড়াও আমার
আঁখির আগে..."

ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ বয়ঃক্রমের কবিতাসমূহ নিয়ে রচিত হয়েছিল 'শৈশব সঙ্গীত'।[১৭] কিন্তু আমরা জানি, প্রবীণ কবি পরবর্তী জীবনে প্রত্যাখ্যান করেন এই আত্মজকে। অথচ পূর্বতর 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'[১৮] ও 'প্রভাতসঙ্গীত'কে[১৯] যৌবরাজ্যে বসাতে এতটুকুও তাঁর বাধে নি। নির্দ্বিধচিত্তে বলেছিলেন,

> ... আমার কাব্যরচনার প্রথম পরিচয় নিয়ে দেখা দিয়েছে সন্ধ্যাসঙ্গীত। তার পূর্বেও অনেক লেখা লিখেছি, কিন্তু সেগুলিকে লুপ্ত করবার চেষ্টা করেছি অনাদরে।... অতএব সন্ধ্যাসঙ্গীতেই আমার কাব্যের প্রথম পরিচয়। সে উৎকৃষ্ট নয়, কিন্তু আমারই বটে।'[২০]

তবে কি 'শৈশব সঙ্গীত' তাঁর নয়? এ যেন পরিত্যক্ত কর্ণ, কুন্তী ফেলে গেছেন অনাদরে নয়, লজ্জায়। কিন্তু কোন্ দোষে অপরাধী হল সে ? আমাদের পক্ষে বলা সহজ নয় যখন দেখি, কী সলজ্জ স্নেহে মণ্ডিত গ্রন্থস্থিত ভূমিকা। এবং উৎসর্গ পত্রে চোখ পড়লেই অনুভব করি হৃদয়ে কোন্ গোপন ক্ষত লালন করে বেড়াচ্ছেন :

> এই কবিতাগুলিও তোমাকে দিলাম। বহুকাল হইল, তোমার কাছে বসিয়াই লিখিতাম, তোমাকেই শুনাইতাম। সেই সমস্ত স্নেহের স্মৃতি ইহাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছে। তাই, মনে হইতেছে তুমি যেখানেই থাক না কেন, এ লেখাগুলি তোমার চোখে পড়িবেই।

বৌঠান গতায়ু মাত্র চল্লিশ দিন।

তা হলে কি কৈশোরক যৌবশোণিতে লজ্জা অনুভব করেছিলেন কবি ? সত্য বটে, 'শৈশব সঙ্গীত' ইত্যাদি রচনা অস্বীকার করে রবীন্দ্ররচনাবলির বিভিন্ন খণ্ডে ক্রমপ্রকাশের

যখন প্রশ্রয় দেন, তখন তিনি জীবনসায়াহ্নে উপনীত। "অস্তসিন্ধুকূলে এসে রবি পূরবদিগন্তপানে" দৃষ্টিক্ষেপে যা দেখেন তাতে অন্তর সায় দেয় না। যে-শৈশবশোক সমগ্র জীবনকে খিন্ন করেছিল, তার এহেন নগ্নপ্রকাশ বার্ধক্যে খুব সম্ভব স্বস্তি দেয় নি তাঁকে। কিন্তু তারও চেয়ে প্রয়োজনীয় এই তথ্য যে, 'শৈশব সঙ্গীত' নামক গ্রন্থেই ছিল ইত্যাকার কবিতাবলি : "ফুলবালা", "অপ্সরাপ্রেম", "কামিনী ফুল", "লাজময়ী", "প্রেমমরীচিকা", "ভগ্নতরী", "পথিক" প্রভৃতি। তন্নিষ্ঠ পাঠকমাত্রেই লক্ষ করবেন, এই সকল কবিতার কেন্দ্রবিন্দু এমন এক কৌমার স্বপ্ন, আবেগ, লজ্জা, হৃদয়ের শিহরণ ও বোধ যা মনুষ্যজীবনের বিশেষ কোনো সময়ে অধিকাংশ মানবই অনুভব করে। কবিতা হিসেবে তাদের ভালোত্ব তর্কসম্ভব সন্দেহ নেই, কিন্তু জনৈক কিশোর কবির হৃদয়ের উল্লোল তলদেশ পর্যন্ত দেখে নিতে পারি আমরা। আর এই বিরল গুণ, হৃৎপিণ্ডের শোণিতোৎসারণ, রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্য 'বনফুল'[২১], 'কবিকাহিনী' এবং 'ভগ্নহৃদয়ে' ও ফেনিল। এমনকি 'বিবিধ প্রসঙ্গ' নামক সমকালীন প্রবন্ধগ্রন্থও রঞ্জিত এই হৃদয়ক্ষরণে।

সন্দেহ হয়, শৈশবিক আত্মার চিত্র তিনি লুকোতে চেয়েছিলেন বয়সকালে। কিন্তু তা সম্ভব হল না; কেননা, পূর্ববর্তী 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'ই এমন কিছু রচনার সম্মুখীন হতে হয় আমাদের যার ফলে কিশোর কবির আগুন আমরা চিনে ফেলি। "তারকার আত্মহত্যা", "সুখের বিলাপ", "অসহ্য ভালোবাসা" প্রভতি কবিতায় প্রেমজ অন্ধ আবেগ, জ্বালা ও নৈঃসঙ্গ্যচেতনা প্রতিশব্দ ও বর্ণে দ্যুতিমান।

প্রেমের অনুভবের মধ্যে এই জ্বালা, কটুস্বাদ একান্তভাবে দৃষ্টিকর্ষী। মানবিক অভিজ্ঞতা হিসেবে প্রেমিক চিত্তের নির্জনতায় আমরা সায় দিই ঠিকই; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'নির্জন'? হঠকারী উক্তি বৈকি ! প্রকৃতপক্ষে তিনি কোথাও—এমনকি তাঁর অযুত সঙ্গীতেও—নিঃসঙ্গ নন ; যখন তিনি ললিতকলালাপে বলে ওঠেন "কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে / সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়" কিংবা "মরি লো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে", তখনো সন্দেহ থাকে না যে বক্তার মনোবেদনার এই ভঙ্গি এক কুশলী ছল, আসলে তার জন্য এ উৎকাঙ্ক্ষা তিনি অন্তরেই ঘনিষ্ঠ। কিন্তু কবির কৈশোর ও প্রথম যৌবনের কাব্যে তিনি যেন কোনো বিচ্ছিন্ন সুদূর দ্বীপ, একাকী, বেদনাভারাতুর, অন্তর্গত বাসনার তাড়নায় অস্থির ও সংক্ষুব্ধ।

যতদিন বেঁচে ছিল
আমি জানি কী তারে দহিত।
সে কেবল হাসির যন্ত্রণা,
আর কিছু না!

'সে কেবল হাসির যন্ত্রণা'? "তারকার আত্মহত্যা"য় এই বোধ কেমন করে উদ্ধৃত হল? যে-লোকের মুখমণ্ডলে জ্যোৎস্নার অমলতা সর্বদা দেখি, তিনি ধিক্কার দিচ্ছেন হাসিকে? প্রেম ও অমৃতের যিনি পুরোহিত তিনিই ভালবাসার নামকরণ করেন "হলাহল"।[২২] আর প্রেম যে আত্মবিনাশী হেন-বোধও অপরিচিত নয় তখন।[২৩] 'প্রভাতসঙ্গীত' কাব্যের নান্দীমুখ[২৪] যে-জগতের অলিন্দ খুলে দেয় তাও কী অবিশ্বাস্য : বিকার, মৃত্যু, গ্লানি ও ক্লেদ পুঞ্জিত সেখানে। এই সুদীর্ঘ কবিতার ("আহ্বানসঙ্গীত") প্রথম তিন স্তবক অন্ধকার বা গহ্বরের গান বলে প্রতীত হয়। 'ছবি ও গানে'ও কিছু কবিতার সাক্ষাৎ পাব যা ক্রোধ, হতাশা, অন্ধকার ও উদামশোণিতের সমারোহে কিমাকার চলচ্ছবি।[২৫] আর "রাহুর প্রেমে"র ভুবনও তো কবি

পরবর্তীকালে অপর কোনো কবিতায় সৃজন করেন নি। এতদ্ব্যতীত 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের কতিপয় কবিতার শিরোনামও দৃষ্টিমনোহারী : "স্তন", "চুম্বন", "বাহু"।

অন্তরালের উৎসকে চিনে নিতে ভুল হয় না আমাদের।

৩

'এ মোহ-আবরণ
খুলে দাও, দাও হে।।
সুন্দর তব মুখ দেখি নয়ন ভরি, ...'

তা হলে কৈশোর-অভিজ্ঞতার[২৬] মর্মস্থলে এমন সব বোধের উপস্থিতি ছিল রবীন্দ্রমানসে যা নন্দনশুভ্র নয়। অর্থাৎ যে-সকল গুণপ্রত্যয় নির্বিকল্প রাবীন্দ্রিক নামে অদ্যাবধি চিহ্নিত আমাদের নিকট, তার উদ্ভাসে ব্যঞ্জিত নয় কৈশোরক কবিতাগুচ্ছ। বর্তমান উপপাদ্য মেনে নিলে আমরা অন্তত এই মনে করে লাভবান হতে পারি যে, রবীন্দ্রনাথ কিন্নরলোকের অধিবাসী ছিলেন না এবং পরবর্তীকালে তাঁর উপর যে-ধর্মধ্বজ ও আর্ষ মূর্তিই স্থাপিত হোক না কেন প্রকৃতপক্ষে তিনি আমাদের মতো 'স্বাভাবিক মানুষ' হিসেবেই জন্মগ্রহণ করেন।

স্বাভাবিক মানুষ, সন্দেহ নেই। অন্যথায় 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'থেকে 'কড়ি ও কোমল' প্রথম প্রেমের অনুভবে বিক্ষত, যন্ত্রণাক্ত, খিন্ন ও জ্বালাময় হত না।[২৭] কোনো হৃদয়ক্ষরণকেই দৃষ্টির আড়ালে রেখে দিতে চান নি তিনি। ফলে যাঁকে পাই তার সাথে "আলোয় আলোকময় করে হে এলে আলোর আলো" যিনি উচ্চারণ করেছিলেন তাঁর মুখশ্রী মেলে না কোথাও। উক্ত নবীন কবির বেদনা যত না নান্দনিক তদপেক্ষা সহস্রগুণ মানববেদ্য। আর এই বিশ্বাস্য আর্তির যা কেন্দ্রগ শক্তি তা তাঁর রোমান্টিক, নভোচারী কল্পনা। কিন্তু কবিগুরুতে 'কল্পনা' নামক ঐশীবৈভব অপ্রতুল কোথায় যে সবিশেষ লক্ষণীয় কেবল প্রাথমিক কাব্যাবলি ? যথার্থই, কমতি নেই কোথাও। তবু অবশ্যই স্বীকার্য যে, রবীন্দ্রমানসে কৈশোরস্বপ্নের সঙ্গে যোজন ব্যবধান ছিল পরিণত কবির কল্পনার। অতএব, রোমান্টিকতা কেবলই পরিচয়জ্ঞাপক সামান্যীকরণ মাত্র, নতুবা কিশোর কবির রোমান্টিক কল্পনার সাথে কোনো সাযুজ্য মিলবে না ভবিষ্যৎ রবীন্দ্রনাথের।

এখানেই পিঠোপিঠি আরেক প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের উত্তর প্রাপণীয় : রবীন্দ্রমানসের পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছিল কোন্ উপায়ে? আশ্চর্য হওয়া স্বাভাবিক, যিনি লিখেছিলেন :

রোদন, রোদন, কেবলি রোদন
কেবলি বিষাদশ্বাস—
লুকায়ে, শুকায়ে, শরীর গুটায়ে
কেবলি কোটরে বাস।[২৮]

বা এ-হেন অগ্নিগর্ভ পঙ্ক্তি :

যত বর্ষ বেঁচে আছি তত বর্ষ মরে গেছি,
মরিতেছি প্রতি পলে পলে,
জীবন্ত মরণ মোরা মরণের ঘরে থাকি
জানিনে মরণ কারে বলে।[২৯]

কিংবা "জীবন যাহারে বলে মরণ তাহারি নাম"[৩০], তিনি অতঃপর কান্ত-কোমল পদাবলী লিখলেন কীভাবে? আদি কবিতাবলির উষ্ণ আবেগ, যন্ত্রণা, অতৃপ্তি তীব্রতর আকাঙ্ক্ষায় প্রজ্বলিত হল না কেন আর? সবিস্ময়ে লক্ষ করি, 'মানসী' থেকেই কণ্ঠস্বর ভিন্নতর হচ্ছে,

আবেগের স্বভাবজ বন্য প্রকাশ নয়, বরং সংহতি দৃশ্যমান, এবং যে-যন্ত্রণার মূলে ছিল বাস্তব অভিজ্ঞান সেখানে মায়াবী আলোক ক্রীড়াশীল ক্রমশ। মাতার মৃত্যু[৩১], কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যা, প্রিয়-বিয়োগের দুঃসহ শোক, মহর্ষির শিক্ষা, উনিশ শতকী নৈতিক মূল্যবোধে শ্রদ্ধানত আস্থা—সম্ভবত এসকল ঘটনাধারা তাঁর মানসপ্রকৃতি পরিবর্তনের সহায়ক ছিল। তথাপি অন্যতর নিগূঢ় কারণ বর্তমান বলেও আমি মনে করি : বয়ঃসন্ধিক্ষণের চৈতন্যের পুনর্বয়ন। এই সেই সময় যখন বাস্তব অভিজ্ঞতা ও যুক্তি খর্ব করে বাসনার প্রাবল্য, বহুবিধ নৈসর্গিক কামনার অবদমন ঘটে, পলাতক শৈশবী ভুবন অবশেষে গুটি বাঁধে অবচেতনে।[৩২]

এখানে আমি দুটি প্রসঙ্গে সর্বোপরি গুরুত্বারোপে যত্নশীল : অবচেতন ও রোমান্টিকতা।

কোন্ গুণে কবির উত্তরকাব্যসমূহ বিশিষ্ট হল প্রাথমিক রচনাবলি থেকে ? সকলেই স্বীকার করবেন, প্রথম যৌবনের বর্ণিল ইচ্ছার দাবদাহ কী রকম নিস্তাপ হতে হতে মিলিয়ে গেল এবং নব্য এক বিভূতি, sublimation, ধীরে ধীরে তার স্থান দখল করে নিল। এই ঐশী বিভাই সম্পর্কসূত্র ছিন্ন করল দুই সহোদরের। এবং আমরা ক্রমে ক্রমে শুভ্র নিরঞ্জন এক সাত্ত্বিকতার নামকরণ করলাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিন্তু আরেকটু তলিয়ে দেখা যাক এই শুদ্ধতার (sublimation) উৎসমূল। এর্নেস্ট জোন্স স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন :

> Some of the constituents of the infantile sexuality have been deflected into entirely non-sexual channels—i.e., sublimated; others have been repressed, and survive only in the unconscious mind; a few still find expression in a furtive manner withdrawn from adult view.[৩৩]

আর রোমান্টিকতা ? এক্ষেত্রেও আমাদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন যে, কবিগুরুর রোমান্টিকতা তাঁর গুরু বিহারীলালের উত্তরাধিকার নয়, দূরঅগ্রজ মাইকেলেও তা অনাভাসিত। রোমান্টিকতার সমার্থক যদি ধরে নিই কল্পনার অবিশ্বাস্য প্রসার ও বেদনার আর্তি, তবে মাইকেল বিহারীলালের বহু পূর্বে পদাবলী সাহিত্যে তার চরণধ্বনি শুনি; আর বেহুলার সমুদ্রগামী ভেলা যে-ত্রিলোকপ্লাবী অশ্রুসলিলে ভাসে, তাও তো রোমান্টিক। এবং তা হলে সমুদয় বিশ্বসাহিত্যের প্রাচীন সম্ভারও, যাকে আমরা 'ক্লাসিক' বলে থাকি, সমগোত্রভুক্ত হওয়ার দাবিদার। ফলে, উক্ত অভিধায় কালিদাস, দৌলত কাজী এবং গ্রিক ও রোমক মহাপূজ্যগণ পাশাপাশি আসনে উপবেশন করেন।[৩৪]

সন্দেহাতীত যে, উপর্যুক্ত সংজ্ঞাব্যাপ্তিতে রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক তো বটেই। কিন্তু যে-দিক্‌দর্শনে তিনি রোমান্টিক, সে-অর্থে আবার মাইকেল, বিহারীলাল বা মধ্যযুগীয় কাব্যকারগণ নন। তার প্রধানতম কারণ, রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি অর্থেই রোমান্টিক।[৩৫] এক্ষেত্রে স্মরণীয় যে, বিদেশী কবিকুলের মধ্যে যাঁরা বারংবার তাঁর বন্ধু বলে বিবেচিত, তাঁরা ইংরেজ রোমান্টিকগণ। শেলী ও কীটস্ সম্বন্ধে আমৃত্যু অতিশয় দুর্বল তিনি, যদিও ক্ষেত্রবিশেষে ইংরেজি রোমান্টিকতার বিরুদ্ধেও তিনি সরব।[৩৬] ইংরেজ কবিদ্বয়ের সৌন্দর্যচেতনা ও আবেগ রবীন্দ্রনাথে উপস্থিত ছিল, আমরা জানি; মনের মানুষ অনতিবিলম্বে তিনি চিনেছিলেন; "Axioms in philosophy are not axioms until they are proved upon our pulses" (কীট্‌স্), "I never can feel certain of any truth but from a clear perception of its Beauty" (কীট্‌স্) তো কবিগুরুতেও সত্য, এবং শেলীর প্রেমধারণার সমপাতী চিন্তা বঙ্গকবিরও ছিল। কিশোর রবীন্দ্রনাথের মানসভুবন যে-পারিবারিক সংস্কৃতিতে লালিত সেখানে ইংরেজ কবিদের বাঁশরী বাতাসে উত্তাল; অক্ষয় চৌধুরীকে অসংখ্যবার স্মরণ

করেছেন কবি পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক স্থাপনার জন্য। প্রাক্‌-বিলাত পর্বে বিদেশী সাহিত্য অধ্যয়নের সূত্রপাত হয়েছিল আহমেদাবাদে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লাইব্রেরিতে, অতঃপর সেই অভ্যাস আর অপসৃত হল না; তারপর সতের বৎসর বয়সে লন্ডন গমন ও অধ্যাপক হেনরি মর্লির তত্ত্বাবধানে ইংরেজি সাহিত্য পাঠ। অন্নদাশঙ্কর রায় বড় যথাযথ মন্তব্য করেছেন :

> বিস্তর ইংরেজি বই তিনি স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে পড়েছিলেন। অনেক ইংরেজি কবিতা তিনি নিজের হাতে খাতায় তুলেছিলেন। লঘু-চেতাদের মতো তিনি গণনা করেন নি যে, এটা আমাদের, ওটা ওদের। শেলী কীট্‌স্‌ টেনিশন সুইনবার্ন স্বদেশী বা বিদেশী এ প্রশ্ন তাঁর মতো কবিপ্রকৃতির মানুষের পক্ষে অবান্তর বা গৌণ। আর তিনিও তাঁদেরি মতো রোমান্টিক স্বভাবের বলে একই ভাবের ভাবুক। ধাত বলে একটা জিনিস আছে, সেটা জাত কুলের সীমা ছাড়িয়ে যায়।[৩৭]

না হয় পরিষ্কার বোঝা গেল, দূরপ্রাচ্যের বাঙালি কবি গভীরভাবে ইংরেজ রোমান্টিকদের আত্মীয়; কিন্তু এই সামান্যলক্ষণ—রোমান্টিকতার স্বরূপ? সাধারণ পরিচিত সমস্ত গুণসম্পাতের বাহিরে আমি বিশেষভাবে অরাবীন্দ্রিক, অথচ রোমান্টিকতার জন্য আবশ্যিক, একটি গুণে আলোক প্রতিফলিত করতে ইচ্ছুক; মারিও প্রাৎস্‌ তাকে 'অদ্ভুত' বা 'বৈনাশিক' সৌন্দর্য[৩৮] নামে চিহ্নিত করেছেন :

> The very objects which should induce a shudder—the livid face of the severed head, the squirming mass of vipers, the rigidity of death, the sinister light, the repulsive animals, the lizard, the bat—all these give rise to a new sense of beauty, the beautiful imperilled and contaminated, a new thrill.[৩৯]

'সন্ধ্যাসঙ্গীত' থেকে 'চিত্রা' পর্যন্ত এই বৈনাশিক সৌন্দর্য ও প্রেতকল্পনার উদ্ভাস রবীন্দ্রনাথে কখনোসখনো হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসে। এমনকি পরবর্তী গল্প-উপন্যাসেও তা অদুর্নিরীক্ষ্য এবং অন্তিম কবিতাবলি ও চিত্ররূপায়ণে তা বর্ণাঢ্য ও তুমুল।

৪

"আমার সকল নিয়ে বসে আছি,
সর্বনাশের আশায়"

রবীন্দ্রনাথও ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন মানুষী সংসারে। ধুলো মাটি ক্লিন্নতাও তাঁর অঙ্গে ছাপ রেখেছিল অন্য অনেকের মতো। নিরুপদ্রব শিশুর অন্তর্জগৎ যে সমূহ তরঙ্গের অভিঘাতে গর্জিত, বাসনামলিন আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল তার রঞ্জিত উদ্ভাস দেখি তাঁর প্রাথমিক কাব্যকলায়। বহির্জগতে বিষণ্ণ ভ্রাতৃজায়া ছাড়া কেউ ছিল না, এবং অভ্যন্তরে যে-ভুবন তা খিন্নতা, নৈঃসঙ্গ্য, ধূমল ও রক্তাক্ত গগনের ব্যঞ্জনায় কিমাকার। 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' লগ্ন কবিতাগুচ্ছের একটি প্রধান চালচিত্র অন্ধকার ও গোধূলি। নারী চিত্রকল্পগুলির অধরকোণে অঙ্কিত ভঙ্গি তো জিয়োকন্দা হাস্যেরই সহোদরা। লক্ষ্যযোগ্য, যে-"সন্ধ্যা"য় কাব্য উন্মীলিত তা রহস্যময়ী ; আর "তারকার আত্মহত্যা"য় যখন আত্মহননের কারণসন্ধানে আমরা উন্মুখ তখনই গভীর বিস্ময়ে চমকে উঠি জীবনানন্দের কোনো এক কবিতার[৪০] সাথে আত্মীয়তা দেখে।

তেমনি, তেমনি তারে হাসির অনল
দারুণ উজ্জ্বল—
দহিত; দহিত তারে, দহিত কেবল।

এবং অতঃপর

গেল, গেল, ডুবে গেল, তারা এক ডুবে গেল,
আঁধারসাগরে—
গভীর নিশীথে
অতল আকাশে।

অনুজ কবির নায়কটিও পার্থিব সমস্ত কিছুর পাওয়ার পরেও কোন্ অনির্দেশ্য কারণে অশ্বত্থের ডালের কাছে সংগোপনে চলে যায়। জীবনের আনন্দ ও হাসির পরপারে আর কার সম্মোহন নেকাব সরিয়ে ইঙ্গিত করে ? সমগ্র কাব্যটিতে কবি ফলত আত্মপীড়নের তপস্যাচারী। আর

ঘুমাই বা জেগে থাকি, মনের দ্বারের কাছে
কি যেন বিষণ্ন প্রাণী দিনরাত বসে আছে—
চিরদিন করিতেছে বাস,
তারি শুনিতেছি যেন নিশ্বাস-প্রশ্বাস।[৪১]

অথবা,

আয় দুঃখ হৃদয়ের ধন,
এই হেথা পেতেছি আসন
প্রাণের মর্মের কাছে
এখনো যা রক্ত আছে
তাই তুই করিস শোষণ।[৪২]

কিংবা

প্রণয় অমৃত এ কি? এ যে ঘোর হলাহল—
হৃদয়ের শিরে শিরে প্রবেশিয়া ধীরে ধীরে
অবশ করেছে দেহ, শোণিত করেছে জল।[৪৩]

উক্ত্যাকার চৈতন্যসমূহ যে-গোপন ছবি খুলে দেখায় তা এক আত্মতাড়িত পুরুষের।

'মানসী'তে, পূর্বেই বলেছি, কণ্ঠস্বর ভিন্নতর হতে থাকে। তবু সম-ভাবনার প্রপাত কলরোল করে কিছু কবিতায়। "মরণ স্বপ্ন" নামে সুধীজন-অবহেলিত একটি কবিতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রেতকল্পনার (macabre phantasy) হেন আলেখ্য রবীন্দ্রকাব্যে দুর্লভ : প্রতিপদ কৃষ্ণপক্ষের প্রথম সন্ধ্যায় "ঘনচ্ছায়া আম্রকুঞ্জ", গঙ্গার ভাঙা তীর, "তীর, তরু, গৃহ, পথ / জ্যোৎস্নাপটে চিত্রবৎ" রূপধারণে অলৌকিক হয়ে আছে ; অতঃপর চাঁদ ডুবে গেলে

বিশ্ব নিবু-নিবু, যেন দীপ তৈলহীন।
গ্রাসিয়া আকাশকায়া ক্রমে পড়ে মহাছায়া,
নতশিরে বিশ্বব্যাপী নিশা
গনিতেছে মৃত্যুপল এক, দুই, তিন।
চন্দ্র শীর্ণতর হয়ে লুপ্ত হয়ে যায়,
কলধ্বনি ক্ষীণ হয়ে মৌন হয়ে আসে।

...

বিঁধিতে পারে না আঁখিতারা
তুষারকঠিন মৃত্যুহিম অন্ধকার।
অসাড় বিহঙ্গ-পাখা পড়িল ঝুলিয়া,
লুটায়ে সুদীর্ঘ গ্রীবা—নামিল মরাল।

ধরিয়া অযুত অব্দ হুহু পতনের শব্দ
কর্ণরন্ধ্রে উঠে আকুলিয়া,
দ্বিধা হয়ে ভেঙে যায় নিশীথ করাল।

এই চালচিত্র প্রাৎসীয় ভাষায়, সন্দেহ নেই, "horribly beautiful"[৪৪]; এবং উক্ত কালিমাঘন জগৎ অপর এক কবিতাতেও—"সন্ধ্যায়"—অঙ্কিত। "নিষ্ফল প্রয়াস" ও "হৃদয়ের ধন" কবিতাদ্বয়ের পাঠকও অনুভব করবেন রোমান্টিকতার নিত্যসঙ্গী বিভূতি : আদিম আবেগের নগ্ন উৎসার, নারীশরীরের ইন্দ্রিয়বেদ্য বর্ণনা ও এক নষ্ট চেতনা, *d'un air de corruption*।[৪৫] এতদ্ব্যতীত, এ-গ্রন্থেই আমরা "নারীর উক্তি", "পুরুষের উক্তি", "ব্যক্ত প্রেম", 'গুপ্ত প্রেম" প্রভৃতি উত্তাপসঘন, passionate, কবিতার মুখোমুখি দাঁড়াই।

অবশ্য আমি অতিশয় সচেতন যে, 'মানসী' কাব্যেই "সুরদাসের প্রার্থনা" নামক অলৌকিক ভাস্বর কবিতাটিও অন্তর্ভুক্ত এবং রবীন্দ্র-চৈতন্যপ্রবাহের সর্বাপেক্ষা সক্রিয় অনুভব ঐ প্রার্থনাতেই সংশ্লেষিত। বাস্তবিক, রবীন্দ্রনাথ পরিবর্তিত হচ্ছেন। তথাপি, 'চিত্রা' পর্যন্ত মাঝে মাঝেই তাঁর মনন ও কল্পনায় শৈশবের শতঝুরি বটের অন্ধকার[৪৬] করাল ছায়া হানে।

আমার বিশ্বাস, "সিন্ধুপারে"র[৪৭] সমতুল্য কবিতা আর একটিও কবি রচনা করেন নি। অন্তিম চৌদ্দ চরণে যদিও অপরূপ আস্তিক্যে জীবনদেবতার পদতলে সব নিবেদিত হল এবং ভবিষ্য-রবীন্দ্রনাথ তাঁর শুভ্রতায় আবির্ভূত, তবু তৃপ্ত হতে পারি না আমরা; এই শেষাংশটুকু বর্জিত হলে বিন্দুমাত্র ক্ষতি হত না। অবশ্য উপর্যুক্ত অন্তিমের কারণেই রবীন্দ্রনাথের sublimation প্রবণতার পদচিহ্ন অনুসরণ সহজ হয় আমাদের পক্ষে।

ভ্রমণদৃশ্য উন্মোচিত পৌষের শীতরাত্রে, যিনি কৃষ্ণ অশ্বে আসীনা, অবগুণ্ঠনবতী, তাঁর কণ্ঠ "তীক্ষ্ণ শাণিত তীরের মতন"। মনে পড়ে যায়, আরো এক "নিদয় নীরব ললনা"[৪৮] এমনই তীব্র হিমে প্রেমিককে মৃত্যুর উপান্তে এনে রেখেছে। ফলত কেবল কীট্‌সের সেই নিষ্ঠুরাই নয়, এলান পো ও বোদলেয়ারীয়[৪৯] পৃথিবীর বাসিন্দার আত্মীয় এই মোহিনী। এবং সমগ্র ভ্রমণের প্রেক্ষাপট "পাণ্ডু আকাশে খণ্ডচন্দ্র" "দূর নদীপারে শূন্য শ্মশানে" শৃগালের নির্জন হাঁক, "পল্লবহীন বৃদ্ধ অশথ" ও "কৃষ্ণ অশ্বের" শাবল্যে বিষণ্ণ ও ভয়াল। Fatal Woman বা সর্বনাশী ভয়ঙ্করী এই একবার যেন চিত্রিত রাবীন্দ্রিক ভূমণ্ডলে।[৫০] এ কেমন প্রণয়িনী যার স্পর্শে :

হিম হয়ে এল সর্বশরীর শিহরি উঠিল প্রাণ—
শোণিত প্রবাহে ধ্বনিতে লাগিল ভয়ের ভীষণ তান।।

এতদ্ব্যতীত প্রেমিক-প্রেমিকার যুগল-যাত্রায় যে-অনুভব অঙ্কিত কবিগুরুতে তা একান্ত আকস্মিক ও অবিশ্বাস্য বলে ভ্রম হয় :

হেনকালে হায় বাহির হইতে কে ডাকিল মোর নাম—
নিদ্রা টুটিয়া সহসা চকিতে চমকিয়া বসিলাম।
তীক্ষ্ণ শাণিত তীরের মতন মর্মে বাজিল স্বর—
ঘর্ম বহিল ললাট বাহিয়া, রোমাঞ্চকলেবর।
ফেলি আবরণ, ত্যাজিয়া শয়ন, বিরলবসন বেশে
দুরু দুরু বুকে খুলিয়া দুয়ার বাহিরে দাঁড়ানু এসে।...
দেখিনু দুয়ারে রমণীমুরতি অবগুণ্ঠনেঢাকা—
কৃষ্ণ অশ্বে বসিয়া রয়েছে, চিত্রে যেন সে আঁকা।
আরেক অশ্ব দাঁড়ায়ে রয়েছে, পুচ্ছ ভূতল চুমে,

ধূম্রবরন, যেন দেহ তার গঠিত শ্মশানধূমে।
নড়িল না কিছু, আমারে কেবল হেরিল আঁখির পাশে—
শিহরি শিহরি সর্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল ত্রাসে।

অতঃপর কিছুই আর অনুভূত হয় না, চারদিকে নিদ্রার রাজত্ব, তীরগতি অশ্বের উভয় পার্শ্বে পলায়নপরা প্রকৃতি, কোনোদিকে বিন্দুতম শব্দের উৎক্ষেপ নেই, এমনকি "সাগরে না শুনি জলকলরব"। এই নিস্তব্ধতা, বস্তুর আয়তন (dimension) সম্পর্কে অচৈতন্য, নিদ্রিত পুরী মৃত্যুরই দ্যোতক। এবং শেষকালে জনহীন সিন্ধুপুলিনে কোনো কৃষ্ণশৈলগুহার অভ্যন্তরে যখন বিবাহলগ্ন উপস্থিত, তখন

পুরোহিত শুধু মন্ত্র পড়িল আশিস করিয়া দোঁহে—
কী ভাষা, কী কথা, কিছু না বুঝিনু ; দাঁড়ায়ে রহিনু মোহে।[৫২]
অজানিত বধূ নীরবে সঁপিল শিহরিয়া কলেবর
হিমের মতন মোর করে তার তপ্ত কোমল কর।

সমুদয় আখ্যানভাগে যে করাল অপচ্ছায়া ঘনীভূত তার দোসর বস্তুত এলান পো। পো-র বাসরশয্যাও মৃত্যুর প্রেতাভাসে আক্রান্ত : "The bridal couch...... low, and sculptured of solid ebony, with a pall-like canopy above,"[৫৩] আর সেই শয্যার অধীশ্বরী?—"I cannot succeed in loving Beauty if she does not breathe Death."[৫৪] "সিন্ধুপারে"র নায়িকার পারিপার্শ্বিকও প্রাসঙ্গিক মার্কিন ও ফরাসি কবির সৃজিত পৃথিবীর সমান্তরাল। উজ্জ্বল দীপালোক, চতুর্দিকে নিনাদিত বীণাবেণু, ঘোমটার অন্তরালে "হাসিল রমণী মধুর উচ্চহাসি" এবং তার হস্তধৃত কনকদণ্ড, অন্ধকার, শঙ্খ ও কিরাত নারীবাহিনী—সমস্ত কিছুর সমন্বয়ে নব্যভুবন যেন দ্যলাক্রোয়ার চিত্র : macabre phantasy ও vampirism[৫৫] যুগপৎ ক্রীড়াশীল এখানে।

মাস সাতেক পূর্বে একটি গল্প রচিত হয়েছিল : "ক্ষুধিত পাষাণ"।[৫৬] বহু আলোচিত ও সমালোচনাদষ্ট উক্ত গল্পেও ইত্যাকার গুণসম্পাত লক্ষণীয়; "ক্ষুধিত পাষাণে"র অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণের মূলে একই exoticlsm[৫৭], ধূম্রলিপ্ত পরিমণ্ডল, মোহিনী কালান্তক ও কালিমাঞ্জন বর্ণ ব্যাপ্তিময়, এবং পাষাণ যে ক্ষুধিত হল তাকে vampirism ব্যতীত কোন্ অভিধায় শনাক্ত করি? সমধর্মী আরো কতিপয় গল্প স্মরণীয় : "সম্পত্তি সমর্পণ", "একরাত্রি", "স্বর্ণমৃগ", "মহামায়া" ও "নিশীথে"।[৫৮]

আর সাত বৎসর পরে তিনি একটি উপন্যাস লেখেন, তাঁর প্রথম দুরন্ত কাহিনীনির্মাণ : চোখের বালি[৫৯]। উপন্যাসটিতে রবীন্দ্রনাথ প্রেমের কোন্ মূল্যকে প্রতিষ্ঠা করলেন? সমগ্র আখ্যানভাগে আশার অমলত্ব সত্ত্বেও বিনোদিনী কেন্দ্রগ শক্তি, এবং বিনোদিনী পরাজিত হলেও অন্তিমে যেভাবে তার মহাপ্রস্থান হল তাতে এই কুটিল, ব্যর্থ ও সর্বাপেক্ষা মানবিক নারীটিকে ভুলে যাওয়া অসম্ভব হয় আমাদের পক্ষে। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন : বিনোদিনী ও মহেন্দ্রের সম্পর্ককে তিনি কী রূপে চিত্রিত করেছেন? গোবিন্দলাল ও রোহিণীর সম্পর্ক প্রতিতুলনায় শালীনতর বলে মনে করি। বঙ্কিমচন্দ্রের নায়ক-নায়িকার মনোগত বাসনার নাম কলুষিত প্রেম আখ্যায় অভিহিত করা চলে; কেননা উপন্যাসশেষে রোহিণীর লাম্পট্যচিত্র আকস্মিক্ ও কার্যকারণরহিত। কিন্তু যে-বাসনার তাড়নায় বারবার যুবক মহেন্দ্র যুবতী বিনোদিনীর নিকটে ছুটে যায় এবং তাদের কার্যাবলি মানসিক বৈকল্য, কথোপকথন-ঢং ইত্যাদি যেভাবে রূপায়িত তাতে বিনোদিনীকে মূর্তিময়ী কামপিণ্ড, জীন দ্যুভালের যমজ, বলে মনে হয়; এবং মহেন্দ্র নপুংসক কামুকের rapist মনোভঙ্গি। অত্যন্ত রবীন্দ্রভক্ত পাঠকও

নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, মহেন্দ্রের বাসগৃহটি বৃন্দাবনের রাসলীলাক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়েছিল। নর–নারীর মোহজ আকর্ষণের এহেন গ্লানিকর চিত্র রবীন্দ্রনাথে বিরল।

শুধু 'চোখের বালি'ই নয়, আরো এক উপন্যাস তাৎপর্যবাহী। বহু বৎসরের ব্যবধানে রচিত সেটি; ১৯২৯ সাল, 'পূরবী' প্রকাশিত হয়ে গেছে ইতোমধ্যে, কবির অন্তিম কাব্যপর্ব তখন। রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ'৬০। সুন্দর ও দানবের বিবাহ দিলেন তিনি এই উপন্যাসে। মধুসূদন নামক বিপরীত প্রকৃতির পুরুষের সান্নিধ্যে ললিতকুমার পাঠক পর্যন্ত জুগুপ্সা বোধ করেন, অথচ কুমুদিনীর নান্দনিক শুভ্রতাকে তার আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত করতে তাঁর বাধল না। তাদের সংঘর্ষের যে–চরিত্র তা সৌন্দর্যস্বরূপের সঙ্গে পশুচৈতন্যের দ্বন্দ্ব। কুমুর হৃদয়ে প্রজ্বলিত অনির্বাণ শুভ্রতা ও তার তপস্যার জ্যোতি মধুসূদনের সংস্পর্শে এলেই তিমিরাচ্ছন্ন হয়ে যায়। অথচ ভ্রাতৃসংবন্ধিত (brother fixed) মহিলার মানসিক সংকট শেষাবধি কোনো উপয়েই পরিত্রাণ পায় না; নিষ্ঠুর অকরুণভাবে রবীন্দ্রনাথ বারংবার মধুসূদনের ক্লিন্ন আলিঙ্গনের চাপে কুমুর অস্তিত্বকে রক্তাক্ত করেছেন। গ্রন্থের সপ্তত্রিংশৎ অধ্যায়ের যিনি অভিনিবিষ্ট পাঠক তিনিই এই বিষমমানসিক দম্পতির মিলনচিত্র দর্শনে শিহরিত ও ব্যথিত হবেন : তাদের প্রথম দাম্পত্য মিলন বলাৎকারের রূপ নেয় আর পশুত্বের ধর্ষণে নন্দনগুণ কুমুদিনী, হায়রে, গর্ভিণী হল অবশেষে, এবং কী আশ্চর্য, তখন রবীন্দ্রনাথ ত্রাণ খুঁজে পান। অন্তঃসত্ত্বা কুমুদিনীকে শেষকালে স্বামীগৃহে ফিরতে হল—এর চেয়ে অসম্মানজনক, গ্লানিময়, অসত্য ঘটনা আর কিছুই হতে পারে না।

প্রকৃতপক্ষে, কবিগুরু এই কালিমালিপ্ত উপন্যাসে তাঁর চিরআরাধ্য 'সুন্দরে'র পরাজয় ঘোষণা করলেন।

৫

"আমি চিনি গো চিনি তোমারে
ওগো বিদেশিনী
তুমি থাক সিন্ধুপারে ..."

তা হলে কোন্ ভুবন থেকে যাত্রা করে রবীন্দ্রনাথ কোথায় এসে পৌঁছুলেন? শৈশবে মহর্ষি হিমালয়সানুতে বসে স্তব্ধ নিশীথে জ্যোতির্ময় ভুবন দেখাতেন পুত্রকে। তিনি কি ভুলে গেলেন পিতৃশিক্ষা, অথবা সচেতন চৈতন্যে যে–চারুনন্দনতা লালন করেছেন এতকাল, তার প্রতি অবিশ্বাস জেগেছে ইদানীং ? যদি তাই হয়, তবে ঐসব অরূপরতন? সমগ্র গীতরসধারায় "অরূপ, তোমার বাণী / অঙ্গে আমার চিত্তে আমার মুক্তি দিক সে আনি", "চিরসখা, ছেড়ো না মোরে ছেড়ো না" নামক প্রার্থনা বা "দিনের বেলায় বাঁশি তোমার বাজিয়েছিলে অনেক সুরে", কি "এখনো তারে চোখে দেখি নি, শুধু বাঁশি শুনেছি" ইত্যাদি হোমাগ্নি তা হলে ব্যর্থ হল? প্রশ্নটি বিচারসাপেক্ষ, এবং অন্তিমে ভিন্ন সিদ্ধান্তেও উপনীত হতে পারি হয়তো–বা।

তথাপি কোনো সন্দেহ নেই যে, কবি–জীবনের শেষ পনের বৎসর বহুমুখী অভিজ্ঞতা ও দ্বৈতচেতনার সংগ্রামে উত্তাল।

'পূরবী'৬১ পর্যায় থেকে 'শেষ লেখা'৬২ পর্যন্ত সময়পরিধিতে রবীন্দ্রমানসের শেষ চিত্র প্রাপ্তব্য বলে মনে করি। এ সময়ে বহির্বিশ্বে, কিছু ঘটনা ঘটেছিল, ব্যক্তিজীবনে দুর্দিনের করাল আক্রমণে নিঃশব্দে বিক্ষত হয়েছিলেন তিনি এবং অন্তর্লোকে কার "নূপুর বেজে যায় রিনিরিনি"।

কবি যখন 'পূরবী' রচনা করছেন তখন বার্ধক্যের প্রথম সীমান্তে উপনীত তিনি। ইতঃপূর্বে শেষ বাঁক ঘুরে এসেছেন 'বলাকা'তে[৬৩] ; মধ্যবর্তী দশ বৎসরে তীব্রতর কোনো কাব্য নেই, কেবল 'পলাতকা' – 'শিশু ভোলানাথে'[৬৪] ভিন্ন স্বাদের আস্বাদন। 'পূরবী' গ্রন্থ প্রণিধানযোগ্য বিশেষত দুটি কারণে এবং উভয় কারণই কবির অন্তর্লোকের সহিত সম্পর্কিত। প্রথমত, এ সময়েই শ্রীমতী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে এবং দ্বিতীয়ত, চিত্রকলাভুবনের দ্বার উন্মোচিত এখন থেকেই।

পেরু রাজ্যের আমন্ত্রণ রক্ষার্থে কবি ১৯২৪ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রা করেন। তখন শরীর অসুস্থ, মানসিক ক্লান্তিও প্রবল। জাহাজে যেতে যেতে ডায়ারি লিখছেন, 'পূরবী'র কবিতাবলিও রচিত হচ্ছে তৎসঙ্গে। কিন্তু শেষাবধি পেরু যাওয়া হল না। আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনোস এয়ারিস পৌঁছে শরীর বিদ্রোহ করল, ডাক্তারদের পরামর্শে স্থগিত থাকল পেরু–যাত্রা; কুড়ি মাইল দূরে সান ইসিদ্রোতে 'মিরাল্‌রিও' নামক এক বাগানবাড়িতে বিশ্রাম গ্রহণের ব্যবস্থা হল। দক্ষিণ আমেরিকায় এই প্রথম ও শেষ আগমন; কিন্তু এখানেই সাক্ষাৎ হল 'বিজয়া'র সঙ্গে।

'পূরবী'র পাঠকমাত্রেরই জানা যে, কবি তখন কোন্ ভাবনাসমূহে স্পন্দিত হচ্ছিলেন। সহোদরা দিনলিপি 'পশ্চিম–যাত্রীর ডায়ারি'তে লিখছেন :

> কিশোর বয়সে যারা আমাকে কাঁদিয়েছিল, হাসিয়েছিল, আমার কাছ থেকে আমার গান লুঠ করে নিয়ে ছড়িয়ে ফেলেছিল, আমার মনের কৃতজ্ঞতা তাদের দিকে ছুটল। তারা মস্ত বড়ো কিছুই নয়; তারা দেখা দিয়েছে কেউ বা বনের ছায়ায়, কেউ বা নদীর ধারে, কেউ বা ঘরের কোণে, কেউ বা পথের বাঁকে। তারা স্থায়ী কীর্তি রাখবার দল নয়,... তারা চলতে চলতে দুটো কথা বলেছে, সব কথা বলবার সময় পায় নি; তারা কালস্রোতের মাঝখানে বাঁধ বাঁধবার চেষ্টা করে নি,...অনেকেই এসেছিল ক্ষণকালের জন্য, আধো–স্বপ্ন আধো–জাগার ভোরবেলায় শুকতারার মতো, প্রভাত না হতেই অস্ত গেল। মধ্যাহ্নে মনে হল তারা তুচ্ছ; বোধ হল, তাদের ভুলেই গেছি। তার পরে সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন নক্ষত্রলোক সমস্ত আকাশ জুড়ে আমার মুখের দিকে চাইল তখন জানলুম, সেই ক্ষণিকা তো ক্ষণিকা নয় ; তারাই চিরকালের।[৬৫ক]

অথবা

> এবারে ক্লান্ত দুর্বল শরীর নিয়ে বেরিয়েছিলুম। তাই অন্তরে যে নারীপ্রকৃতি অন্তঃপুরচারিণী হয়ে বাস করে ক্ষণে ক্ষণে সে আপন ঘরের দাবি জানাবার সময় পেয়েছিল।[৬৫খ]

কিংবা

> আমার ভোলা সামগ্রীগুলো চৈতন্যের রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে নীচের তলায় নেপথ্যে এসে জড়ো হয়; সেখানে নতুননতুন বেশপরিবর্তনের সুযোগ ঘটে। আমার মনটাকে বিধাতা নাট্যশালা করতে ইচ্ছা করেছেন, তাকে তিনি জাদুঘর বানাতে চান না। তাই, জমা করে পাওয়া আমার লোকসান, হারিয়ে হারিয়ে পাওয়াই আমার লাভ।[৬৫গ]

আসলে এ পর্যায়ে এসে তিনি পুনর্বার প্রেমের দিগন্তযানী অস্তরাগ হৃদয়মধ্যে অনুভব করলেন, বিদায়ী জীবনের প্রতি নস্টালজিয়া ফের কবি–চৈতন্যে জারিত হতে লাগল।

বুয়েনোস এয়ারিস পৌঁছুলে জনৈকা মহিলা—সিনোর বিত্তোরিয়া দ্য এস্‌ত্রাদা (ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, আমরা জানি ; কিন্তু 'মিরাল্‌রিও'' স্থানে যাত্রার পূর্বে তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক গাঢ়তর হয় নি। সান ইসিদ্রো–তে তিনি যাত্রা করেন ১২ই নভেম্বর; সেদিনই একটি কবিতা লেখা হয়েছিল, ''বিদেশী ফুল'' :

হে বিদেশী ফুল, যবে আমি পুছিলাম—

"কী তোমার নাম",
হাসিয়া দুলালে মাথা, বুঝিলাম তবে
নামেতে কী হবে।
আর কিছু নয়,
হাসিতে তোমারে পরিচয়।...
হে বিদেশী ফুল, যবে তোমার শুধাই, "বলো দেখি,
মোরে ভুলিবে কি?"
হাসিয়া দুলাও মাথা; আমি জানি মোরে ক্ষণে ক্ষণে
পড়িবে যে মনে।
দুই দিন পরে
চলে যাব দেশান্তরে,
তখন দূরের টানে স্বপ্নে আমি হব তব চেনা;—
মোরে ভুলিবে না।

ধারণা মিথ্যে হয় নি; 'বিদেশী ফুল' ভোলেন নি কবিকে। এক মাস কুড়ি দিন রবীন্দ্রনাথ সান ইসিদ্রোতে ছিলেন। পরিকল্পিত সপ্তাহখানেকের বিশ্রাম দীর্ঘায়িত হয়েছিল এ বিদেশিনীর জন্যই। ভিক্টোরিয়ার আতিথ্য ও সেবার স্বীকৃতি দিয়েছিলেন কবি; তাঁর নামকরণ করেছিলেন 'বিজয়া' এবং 'পূরবী' কাব্য উৎসর্গও করেন 'বিজয়ার করকমলে'। কী দেখেছিলেন তিনি এই ভিন্‌দেশী মহিলার মধ্যে যার জন্য অজস্র আকুতি এঁকে রাখলেন কবিতায়?

আর কোনোদিন আসবে না কি
আমার পরাণ ছেয়ে
যুথীর মালার গন্ধখানি
রাতের বাতাস বেয়ে? ("অন্তর্হিতা")

কিংবা

ভালোবাসার মূল্য আমায় দু-হাত ভরে
যতই দেবে বেশি করে,
ততই আমার অন্তরের এই গভীর ফাঁকি
আপনি ধরা পড়বে না কি?
তাহার চেয়ে ঋণের রাশি রিক্ত করি
যাই না নিয়ে শূন্য তরী।
বরং রব ক্ষুধায় কাতর ভালো সে-ও,
সুধায়ভরা হৃদয় তোমার
ফিরিয়ে নিয়ে চলে যেয়ো। ("আশঙ্কা")

বা

শুধু এবারের মতো
বসন্তের ফুল যত
যাব মোরা দুজনে কুড়াতে।
তোমার কাননতলে ফাল্গুন আসিবে বারম্বার,
তাহারি একটি শুধু মাগি আমি দুয়ারে তোমার। ("শেষ বসন্ত")

নয়তো

হায় রে তোরে রাখব ধরে,
ভালবাসা,
মনে ছিল এই দূরাশা। ("চঞ্চল")

প্রভৃতি বিষণ্ন–ধীর পঙ্‌ক্তিসমূহ যখন পড়ি তখন কবির নির্জনতা ও দীর্ণ হৃদয় আমাদের সম্মুখে স্বচ্ছ হয়ে আসে।

কবিপুত্রবধূ প্রতিমা ঠাকুর 'নির্বাণ' গ্রন্থে লিখেছেন,

> ভিক্টোরিয়া ইংরেজি খুব ভাঙা–ভাঙা বলতেন, ফরাসি ভাষাতেই তাঁর দক্ষতা ছিল বেশি। তাঁকে সুন্দরী বলা চলে না। কিন্তু বুদ্ধির প্রখরতা তাঁর মুখে একটি সৌন্দর্যের দীপ্তি এনে দিত। তাঁর বড় বড় পল্লব–ঢাকা গাঢ় নীল চোখে একটি স্বপ্নময় আকর্ষণী ক্ষমতা ছিল। তাঁর দীর্ঘদেহ গৌরবময় আভিজাত্যের পরিচয় দিত। তিনি যখন নতজানু হয়ে বাবামশায়ের পায়ের কাছে বসতেন, মনে হোত ক্রাইস্টের পুরনো কোনো ছবির পদতলে তাঁর হিব্রু ভক্ত মহিলার নিবেদন–মূর্তি।

যেদিন (৪ জানুয়ারি ১৯২৫) বুয়েনোস এয়ারিস ছেড়ে জুলিয়ো চেজারে জাহাজে কবি ইতালি যাত্রা করলেন সেদিন ভিক্টোরিয়াই cabin de luxe রিজার্ভ করেন এবং তাঁর ড্রয়িংরুমের বিশাল এক আরামকেদারা কবির উপবেশনার্থে জাহাজে তুলে দেন। কেবিনের ছোট দরজা দিয়ে 'বিজয়া'র উপহার প্রবেশ করে নি; কাপ্তেনের সঙ্গে প্রচুর ঝগড়াঝাঁটি করে ভিক্টোরিয়া শেষ পর্যন্ত কাপ্তেনকে রাজি করান এবং মিস্ত্রিকে ডেকে দরজা খুলিয়ে সেই চেয়ার কেবিনে দেওয়া হয়েছিল। একেবারে জীবনসায়াহ্নে উদয়নের বারান্দায় রবীন্দ্রনাথ 'বিজয়া'–প্রদত্ত কেদারাটিতে[৬৬] বসে বিশ্রাম করতেন।

শেষ বয়সে কবি প্রায়ই পরিচিতদের গল্প শোনাতেন দক্ষিণ আমেরিকার, ভিক্টোরিয়ার স্মৃতি নিশ্চিহ্ন হয় নি কখনো। নিজেই বলেছিলেন পুত্রবধূকে একবার,

> যদি বা ফেরবার জাহাজ পাওয়া গেল কিন্তু ভিক্টোরিয়া আমাকে কিছুতেই ছাড়তে চায় না। [এল্‌মহার্স্ট] সাহেবের সঙ্গে তাঁর ছিল একটু রেষারেষির সম্পর্ক, কারণ সাহেব সর্বদা আমার কাছাকাছি থাকত, সেটা সে সইতে পারত না।...স্প্যানিসরা ভাবপ্রবণ জাত, ওদের সামলানো বড়ো কঠিন, তবে এই জাতই আবার পারে আবেগের উদ্দীপনায় আত্মোৎসর্গ করতে। এই বিদেশিনীর মধ্যে দেখেছিলুম সেই অনুরাগের আগুন।[৬৭]

তবে কি শেষে 'অনুরাগের আগুনে'ই দীর্ঘদিনের শিলীভূত তুষারে ঢল নামল? শুরু হল নিজেকে ভিন্নতর পথে উপলব্ধি, ছবি আঁকা ?

রবীন্দ্রনাথের ছবি–অঙ্কনপর্ব ও 'পূরবী' পর্যায় সমান্তরাল। শ্রীমতী ওকাম্পোর স্মৃতিচিত্র থেকে জানতে পারি যে, 'পূরবী' পাণ্ডুলিপির কাটাকুটি থেকে তিনি ক্রমশ রেখাঙ্কনের দিকে ঝুঁকছেন।[৬৮] স্মর্তব্য, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে চিঠি লিখেছিলেন সেই সুদূর ১৮৯৩–র জুলাইয়ে,

> মদগর্বিতা যুবতী যেমন তার অনেকগুলি প্রণয়ীকে নিয়ে কোনোটিকেই হাতছাড়া করতে চায় না, আমার কতকটা যেন সেই দশা হয়েছে। মিউজদের মধ্যে আমি কোনোটিকেই নিরাশ করতে চাই নে—কিন্তু তাতে কাজ অত্যন্ত বেড়ে যায়...কী মুশকিলেই পড়েছি বব! আবার লজ্জার মাথা খেয়ে সত্যি কথা যদি বলতে হয় তো এটা স্বীকার করতে হয় যে, ঐ–যে চিত্রবিদ্যা বলে একটা বিদ্যা আছে তার প্রতিও আমি সর্বদা হতাশ প্রণয়ের লুব্ধ দৃষ্টিপাত করে থাকি—কিন্তু আর পাবার আশা নেই, সাধনা করবার বয়স চলে গেছে।[৬৯]

'ছিন্নপত্রাবলী'তেই সাক্ষ্য[৭০] বর্তমান যে, রবি বর্মার ছবি দেখতে দেখতে কোনো এক সমগ্র

সকাল কেটে যাচ্ছে তাঁর। ফলত 'সোনার তরী' পর্যায় থেকেই দেখি যে, পাণ্ডুলিপির কাটাকুটি অবিকল নিরর্থক নয়, লেখকের অন্য অভিপ্রায়ও যেন উঁকি দেয়। কিন্তু 'পূরবী' থেকে এই যে খামখেয়ালিপনার শুরু তার অনিবার্য পরিণতি হিসেবে ১৯২৯-এর শেষ দিকে রং ও রেখার অরূপনিকেতনে প্রবেশ করলেন তিনি এবং ১৯৪০ অবধি স্থিত রইলেন সাধনায়।

কবি রবীন্দ্রনাথ জীবনসন্ধ্যায় চিত্রী—তথ্যটি চমকপ্রদ ও ভাস্বর। কিন্তু তদপেক্ষা গুরুত্বময় তাঁর চিত্রালেখ্যের থিম। কী আঁকছেন তিনি? লক্ষ করলেই দেখা যাবে, তাঁর চিত্রাবলীর কোনো নাম বা identity নেই। লেওনার্দো থেকে শুরু করে পিকাসো পর্যন্ত হেন মহৎ চিত্রশিল্পী নেই যিনি তাঁর সৃজিত আলেখ্যের কোনো নামকরণ করেন নি। তা হলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে এই ব্যতিক্রম কেন? *Chitralipi* প্রথম খণ্ডের নান্দীমুখে তিনি লিখেছিলেন:

অয়ি চিত্রলেখা দেবী, ক্ষম মোরে, তোমার মহিমা
যদি খর্ব করে থাকি দিতে গিয়ে বাক্যে ঘেরা সীমা,
বাক্যের অতীত তুমি। আপন প্রকাশ আপনাতে
নিয়ে সাথে নিজে দাও দেখা, বচনের মল্লিনাথে
ভ্রূক্ষেপ কর না কভু। সসঙ্কোচে যে কয়টি শ্লোক
এনেছি সম্মুখে তব, তারপরে নাই দিলে চোখ।...

উপর্যুক্ত স্বীকারোক্তি তাৎপর্যময় এবং অন্যান্য শিল্পী-আত্মার সাথে তাঁর পার্থক্য তীব্রভাবে এখানেই ধ্বনিত। তাঁর ছবি যেন কুশলী খেয়ালিয়ার রাগবিন্যাস; ব্যাকরণ ও নিয়মচারিতা যতটুকু আছে তা ভেসে যায় কণ্ঠধ্বনির ভাবাবেগে, বিভিন্ন তানের ছোট ছোট কারুতায় এবং সমগ্র সত্তায় যা স্তনিত হতে থাকে তা রসের আবর্ত। প্লট মনে রেখে তুলি হাতে নেন না তিনি, অঙ্কনের শুরু থেকে শেষাবধি বর্ণলেপের মধ্যে ও রেখাচিত্রণের সুষমায় কোন সময় কিছু একটা অঙ্কিত হয়ে যায় : হয়তো তা কোনো মানবীর মুখ কিংবা ধূমল ক্ষয়িষ্ণু কোনো ল্যান্ডস্কেপ, কখনো-বা তা রূপ নেয় অতিপ্রাকৃত জনৈক পশুপ্রাণে। অগত্যা, নির্দিষ্ট কোনো শনাক্তকরণী সংজ্ঞায় চিহ্নিত হয় না সে, নিজের ছবির কোনো নাম দিতে পারেন না চিত্রী, লিখে রাখেন শ্লোক :

বিস্মৃত যুগে গুহাবাসীদের মন
যে ছবি লিখিত ভিত্তির কোণে
অবসর কালে বিনাপ্রয়োজনে
সেই ছবি আমি আপনার মনে
করেছি অন্বেষণ।।

(১৪ নং চিত্র, *Chitralipi I*)

অথবা

পসরাতে কী আছে তা নাইবা জানিলাম
চিরকালের তুমি বিদেশিনী।
ধ্যানের পটে ধরা দিলে শুনালে না নাম
চিনি তবু নাইবা তোমায় চিনি।।

(১৫ নং চিত্র, *Chitralipi I*)

এবং শ্লোকের আদিষ্টদের যখন দেখি তখন চোখে পলক পড়ে না। প্রথমটিতে ছ'টি পশুমূর্তি দু'দলে বিভক্ত হয়ে একে অন্যের দিকে ভ্রূকুটি করছে, এ জন্তুদের সঙ্গে আমাদের কোনো পরিচয় নেই। চিত্রকর নিজেও কখনো দেখেন নি তাদের; কৃষ্ণবর্ণের চালচিত্রে পশু ষষ্টকের

দেহভঙ্গি আবার যত না হিংস্র তদপেক্ষা দৃষ্টিমনোহারী অদ্ভুত। দ্বিতীয়টি 'বিদেশিনী'র ছবিই বটে! কিন্তু মহিলাটি বড়ই রহস্যাবৃতা,—ক্যানভাসের রং স্যাঁতসেঁতে শ্যাওলাময় গুহান্ধকার যেন, তা থেকে আবার রক্তিম আভাও দ্যুতি ছড়ায়; আর অঙ্কিত নারী অসুন্দর, দৈহিক contour একাকার বর্ণলেপনে অদৃশ্য, ডিম্বাকার মুখাকৃতি ভল্‌কানিক লাভার আভাসে লাল-উজ্জ্বল; পোশাকও তার চমকপ্রদ : পশ্চাদ্দেশের কাপড় নান্‌দের মতো কিন্তু তার বর্ণ সাদা নয়, রক্তিম; আর কাপড়ের সামনের দিক বেগুনে রঙে বিবর্ণ। কোন দেশী মেয়ে সে? কোমরে তার গামলাজাতীয় এক প্রাগৈতিহাসিক পাত্র, কিন্তু ভঙ্গি আবার 'জল্‌কে চলা'র। ক্যানভাসের উপরের এক প্রান্তের সামান্য এক অংশ এমন ফিকে নীল যে সমুদ্রের গন্ধ হানে। প্রকৃতপক্ষে ইত্যাকার ছবির সত্যিই কি কোনো একক বিচ্ছিন্ন নাম দেওয়া সম্ভবপর?

লক্ষণীয়, প্রায় সমকালেই আঁদ্রে ব্রেতঁ ঘোষণা করছেন সুররিয়ালিজমের মৌল বিভূতি :

> The fundamental discovery of Surrealism is, in fact, that the pen writing automatically and the pencil drawing automatically, without preconceived aim, spin out an infinitely precious substance all of which may not be gold but which at least seems to radiate the brilliance that the poet or painter draws from his emotions.[৭১]

কিন্তু কবিগুরু কোনো চিত্র-আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন না, এমন কি দেশী বা বৈদেশিক কোনো আন্দোলনের উৎক্ষেপে বিন্দুমাত্র আলোড়িত হয়েছিলেন—এমন প্রমাণ আমার জানা নেই। অথচ *Chitralipi I*-এর My Pictures নামী ভূমিকাতে যা বলেছেন তার সাথে সুররিয়ালিজম-তত্ত্বের বিরোধ নেই। এবং সেজন্যই, আমার বিশ্বাস, তাঁর চিত্রকলাদেবীবন্দনার নিভৃত প্রেরণা খুঁজতে হবে তাঁর ব্যক্তিগত অন্তর্মানসে, বহির্বৈশ্বিক বা শিল্পৌচিত্যবোধক কার্যকারণে নয়।

দীর্ঘকাল পূর্বে শিবনারায়ণ রায় একটি ভীরু প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন যে, 'রবীন্দ্রনাথের চিত্রচর্চার সঙ্গে বিক্তোরিয়ার কোনো নিগূঢ় প্রাক্‌চেতন সম্পর্ক আছে' কি না[৭২]। এ-প্রসঙ্গে একটিও আলোচনা অদ্যাবধি আমার চোখে পড়ে নি। অথচ, প্রশ্নটি যথার্থই চিন্তনীয়।

প্রসঙ্গত শ্রীমতী বিজয়ার সাক্ষ্য স্মরণ করিয়ে দিতে চাই :

> I took such delight in his doodles (অর্থাৎ 'পূরবী'-পাণ্ডুলিপির কাটাকুটি) that it encouraged him to go on. When I met him, six years later, in France, he was painting, not doodling, and the exhibition I arranged for him with the help of my French friends was a success.'[৭৩]

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ন্যায় শিল্পীসত্তা জনৈকা মহিলার আকস্মিক ইচ্ছাপূরণের জন্য পাণ্ডুলিপির আঁকিবুকি ছেড়ে তদ্গত চিত্রলেখায় ঝুঁকলেন—হেন ধারণা ধৃষ্টতার চরম। আসলে, শিল্পী-অন্তরেই বহু ভাবনার নিরন্তর সংঘর্ষ চলেছিল তখন। কী কী সংগুপ্ত বাসনার আলোড়নে তিনি উত্তাল ও-সময়, আমাদের জানবার কিছুমাত্র উপায় নেই। সন্দেহাতীত যে, ভিক্টোরিয়া তাঁর অন্তর স্পর্শ করেছিলেন। এবং বিদেশিনীর 'অনুরাগের আগুন' তাঁর গভীরে যে-আলো জ্বেলেছিল তারই উদ্ভাস তাঁর চিত্রকলা। সহজেই মনে পড়ে সমান্তরাল পূর্ববর্তী ঘটনা : কাদম্বরী দেবী ও তৎকালীন কবিতার toxic নির্যাস।

কবিগুরুর ন্যায় শুদ্ধচৈতন্যপুরুষ আরো এক বিদেশী কবি চিত্রকর ছিলেন : উইলিয়ম ব্লেক। ব্লেকের কাব্যকলাও কী অপরূপ সাত্ত্বিকতায় বিধৌত। এবং তাঁর চিত্র সমচৈতন্যের

রূপায়ণেই বৈভবমণ্ডিত। ইংরেজ কবির কবিতা ও ছবির মধ্যে কোনো বৈষম্য দেখি না, তাঁর 'illuminated printing' চিৎপ্রকর্ষের দিক থেকেও ইল্যুমিনেটিং সন্দেহ নেই। তাঁর কাব্য ও চিত্রকলা যে একই শুদ্ধসত্তার মানস-ফসল, বুঝে নিতে বিলম্ব হয় না আমাদের। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ফলশ্রুতি আশা করা আমাদের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত; যিনি আমাদের সর্বপ্রকার আশাভাবনাকে পরম ঐশিতায় অপার্থিব ভাস্বরতায় উন্নীত করেছেন, তাঁর চিত্রাবলিও তারই দোসর হবে—এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু নির্বিচারে যে-কোনো একটি ছবিও তাঁর যদি হাতে তুলে নিই, বিস্ময়ে উপলব্ধি করব দ্বিতীয় ভুবন রূপায়িত সেখানে।

দূর অতীতে (১৯৩০) পারীর গালারি পিগাল্-এ কবির চিত্র প্রদর্শনী দেখে কঁতেস দ্য নোএই-ও (Comtesse de Noailles) প্রশ্ন করেছিলেন :

> ...Why has Tagore, the great mystic, suddenly, without knowing, set at liberty that which in him scoffs, banters and perhaps despises?... I love you and have more admiration for you, Tagore, since when you made to us such rich and sometimes such cruel confidences; but would I ever find again the great ingenuous angel that you were, when your silent feet, on the garden gravel, made me think of my sins, imaginary perhaps, and of your sublime innocence?[৭৪]

প্রখ্যাত শিল্পবেত্তা আনন্দ কেন্টিশ কুমারস্বামী অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, রবীন্দ্রচিত্রকলা 'genuine examples of modern primitive art' এবং 'This is a genuinely original, genuinely naive expression; extraordinary evidence, of eternal youth persistent in a hoary and venerable personage...'[৭৫]

বাস্তবিক এই ব্যাসকূট অনুধ্যায়ী পাঠকের নিকট মর্মান্তিক হয়ে ওঠে : একই সময়-পরিধিতে কেমন করে 'মহুয়া' 'পরিশেষ' 'চিত্রাঙ্গদা' লেখা সম্ভব এবং তারই পাশাপাশি কালিমাঞ্জন মহাকাশতলে চিরকালীন মানবাত্মা রচনা?

রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্পর্কে রসজ্ঞ সমালোচকবৃন্দ মোটামুটি এ-স্থলে একমত যে, তাঁর ছবির স্বাদ ও বাণী পূর্ণভাবে ভিন্নতর। কিন্তু হেন নির্দ্বিধ অভিমত কি সর্বাংশে সত্য?

বলা সহজ নয়। কেননা, স্পষ্টতই দেখছি, অন্তিম কাব্য-পর্যায়—অন্তত 'পরিশেষ' থেকে—পূর্বগামীদের অনুসরণ করে নি। তাঁর চিত্রাবলির মতোই ইদানীংকার কবিতাসমূহে অচেনা অন্ধকার ছায়া ফেলে, নবতর কোনো ক্লেশ ও যন্ত্রণা-ভাবনা ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিচ্ছে আগেকার অমল ঔজ্জ্বল্য। সমর্পিত হৃদয়ে অকস্মাৎ দুঃস্বপ্নের মতো কোনো হতাশা ও সন্দেহ যেন উঁকি দেয়, অবিশ্বাসীর চিন্তা ও প্রশ্নে বারবার কম্পিত হন কবি।

অন্তিম দশক, পূর্বেই বলেছি, বহু ঘটনার অভিঘাতে অর্জিত। ১৯২৯ থেকে ১৯৪০ এর মধ্যে ঘনিষ্ঠতমদের ছ'জন লোকান্তরিত হলেন;[৭৬] ১৯৩৬ থেকে ইউরোপীয় ও এশীয় রাজনীতিতে পশ্বাচার প্রবর্তনা, কলকাতায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা (১৯২৬), স্বদেশে দ্বিতীয় অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থ পরিণতি ও রাজনৈতিক ঝঞ্ঝা, '৩৭-এ তাঁর নিজস্ব মৃত্যুনিভ ব্যাধি এবং '৩৯-এ মানবতার সংকট—সবই তাঁর মানস-ভূগোলের জলবায়ু-পরিবর্তনে প্রয়াসী ছিল।

'পরিশেষে'র "প্রশ্ন" কবিতাতেই সম্ভবত তাঁর আর্তচিৎকার প্রথম ধ্বনিত হয়। অতঃপর 'বীথিকা'র "দুর্ভাগিনী", 'পুনশ্চি'র "বিশ্বশোক"/ "শিশুতীর্থ", কিংবা 'নবজাতকে'র "কেন" প্রভৃতি সেই একই আন্তঃসংগ্রামের দিনলিপি। আরো এক দিক সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য : সাম্প্রতিক কবিতায় মৃত্যুভাবনার পৌনঃপুনিক উপস্থিতি। 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য' ও

'জন্মদিনে' সন্দেহাতীতভাবে মৃত্যুপথযাত্রীর চৈতন্যপ্রবাহ। কিন্তু যে-মৃত্যুকে তিনি শৈশব থেকে বহু প্রিয় নামে বারংবার আহ্বান করেছেন, এই কি সেই? দ্বিধান্বিত না হয়ে পারি না আমরা, কেননা মৃত্যুর সেই পরিচিত মুখচ্ছবি এখানে পাল্টে যায় :

গহন রজনী-মাঝে
রোগীর আবিল দৃষ্টিতলে
যখন সহসা দেখি
তোমার জাগ্রত আবির্ভাব,
মনে হয়, যেন
আকাশে অগণ্য গ্রহতারা
অন্তহীন কালে
আমারি প্রাণের দায় করিছে স্বীকার
তার পরে জানি যবে
তুমি চলে যাবে,
আতঙ্ক জাগায় অকস্মাৎ
উদাসীন জগতের ভীষণ স্তব্ধতা।।[৭৭]

কিংবা

মনে হয়, হেমন্তের দুর্ভাষার কুজ্মটিকা-পানে
আলোকের কী যেন ভর্ৎসনা
দিগন্তের মূঢ়তারে তুলিছে তর্জনী।
পাণ্ডুবর্ণ হয়ে আসে সূর্যোদয়
আকাশের ভালে,
লজ্জা ঘনীভূত হয়,
হিমসিক্ত অরণ্যছায়ায়
স্তব্ধ হয় পাখিদের গান।।[৭৮]

'উদাসীন জগতের ভীষণ স্তব্ধতা' দ্বারা কবিকে ভীত হতে ইতঃপূর্বে আমরা দেখি নি; আর কোন লজ্জা বা ভয়ে সূর্যদেব পাণ্ডুর হয়ে লুকিয়ে যান দিগন্তের আড়ালে?

কবি-আত্মার এই প্রয়াণী চিত্র তাঁর শেষ পর্যায়ের কাব্য-ভাবনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে আরো স্পষ্টতর হতে পারে। কিন্তু বর্তমানে আমার বক্তব্য কেবল এইমাত্র যে, অন্তিম কতিপয় বৎসরে রবীন্দ্রনাথ বহুবিধ আত্মিক চেতনাসংকটে সংক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। 'গীতাঞ্জলি'-'গীতিমাল্য'-'গীতবিতানে'র কবির হৃদয়ে ইদানীং শুধু ঐশী আলোকের প্রপাত উচ্ছল ছিল না, আরো মলিন জলরাশি, বর্ণিল জিজ্ঞাসা, অপার যৌবনস্মৃতি ভীষণ রবে কলরোল তুলেছিল। 'পূরবী' থেকে 'শেষ লেখা', অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করি, তাঁর যৌবনে ফিরে যাওয়ার আবেগে শিহরিত; এবং বহু দূরে ফেলে আসা প্রেমের বৈভব (যার শুরু 'পূরবী'তে) এ সময় পর্যন্ত একান্ত ক্রিয়াশীল। 'রোগশয্যায়' গ্রন্থের ক্লান্ত পদাবলীর সর্বশেষ পদ স্মরণীয় :

তোমারে দেখি না যবে মনে হয় আর্ত কল্পনায়,
পৃথিবী পায়ের নিচে চুপি চুপি করিছে মন্ত্রণা
সরে যাবে বলে।
আঁকড়ি ধরিতে চাহি উৎকণ্ঠায় শূন্য আকাশেরে
দুই বাহু তুলি।

চমকিয়া স্বপ্ন যায় ভেঙে;
দেখি, তুমি নতশিরে বুনিছ পশম
বসি মোর পাশে
সৃষ্টির অমোঘ শান্তি সমর্থন করি।।

কিংবা 'আরোগ্য'র ত্রয়োদশ সংখ্যক কবিতা :

ভালোবাসা এসেছিল একদিন তরুণ বয়সে
নির্ঝরের প্রলাপকল্লোলে,
অজানা শিখর হতে
সহসা বিস্ময় বহি আনি
ভ্রূভঙ্গিত পাষাণের নিশ্চল নির্দেশ
লঙ্ঘিয়া উচ্ছল পরিহাসে,
বাতাসেরে করি ধৈর্যহারা,
পরিচয়ধারা-মাঝে তরঙ্গিয়া অপরিচয়ের
অভাবিত রহস্যের ভাষা,
চারি দিকে স্থির যাহা পরিমিত নিত্য প্রত্যাশিত
তারি মধ্যে মুক্ত করি ধাবমান বিদ্রোহের ধারা।
আজ সেই ভালোবাসা স্নিগ্ধ সান্ত্বনার স্তব্ধতায়
রয়েছে নিঃশব্দ হয়ে প্রচ্ছন্ন গভীরে।
চারি দিকে নিখিলের বৃহৎ শান্তিতে
মিলেছে সে সহজ মিলনে,
তপস্বিনী রজনীর তারার আলোয় তার আলো,
পূজারত অরণ্যের পুষ্প-অর্ঘ্যে তাহার মাধুরী।

আর এই বিদায়ী বৎসরসমূহে রচিত শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে উদ্দিষ্ট প্রায় পাঁচ শত (না কি পঞ্চশতাধিক?) পত্রও তো সায়াহ্নী কবির প্রেমিক-মানসের আলোছায়া-বর্ণালীতে চিন্ময়।

ফলত, উক্ত সমুদয় অন্ধকার জিজ্ঞাসা ও উপলব্ধি, বাসনা ও আবেগের আরেক রূপার্চনাই তাঁর চিত্রাবলি।

৬

'মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল-মাঝে
আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে, ভ্রমি বিস্ময়ে।'

প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ এক মানবজন্মে মনুষ্যপ্রাণের যাবতীয় অভিজ্ঞতা ও চেতনাকে স্পর্শ করতে চেয়েছিলেন এবং এখানেই তাঁর সার্বভৌমত্ব।

দীর্ঘ অশীতিবর্ষী তীর্থপথ অজস্র উপলব্ধি, যন্ত্রণা, আনন্দ ও বাসনার সংরাগে বিচিত্রিত হয়ে আছে, 'জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা'। মানবচিত্তের যে-নান্দনিক উল্লাস অরূপকে অন্তরে অনুভব করতে চায়, তার তুঙ্গশীর্ষ মহিমা স্ব-হৃদয়ে তীব্রতম উপলব্ধি করেছিলেন কবি; অন্যদিকে আমাদের বাসনার যে তামসিক অভিজ্ঞান দিবানিশি আমাদের আত্ম-স্বরূপকে অক্টোপাস-বাঁধনে জড়িয়ে রেখেছে তার চাপেও তিনি দীর্ণ হয়েছিলেন। এক দিকে যদি তাঁর আর্য মহানতা, অন্য দিকে মানুষী বাসনার তাড়নায় তাঁর লৌকিক

স্বাভাবিকত্ব। এক দিকে যদি জ্যোৎস্নাধৌত অমল গীতিমাধুরী ও অজস্র কবিতার বিশাল ঐশ্বর্য; অপর পক্ষে ক্ষীয়প্রাণ, জান্তব, কৌমারস্বপ্ন ও ভীষণতায় জারিত শীর্ণ কবিতাগুচ্ছ ও চিত্রকলাভুবন। মনুষ্যপ্রকৃতির এই দুই অবশ্যম্ভাবী দিকই পরম নিশ্চিতিতে দুয়ার খুলে রেখেছিল তাঁর দিকে। বিশ্বসাহিত্যে এ-রকম ঘটনা বিরল; নিয়তি যদি-বা একটি দরজা খোলে, তো অন্যটি আমোঘরুদ্ধ। সঙ্গতভাবেই জনৈক রসবেত্তা[৭৯] মন্তব্য করেছেন, "কোনো কালে কোনো দেশে একজন মানুষও যদি 'নিজ মর্ত্যসীমা' চূর্ণ করে থাকে" তা হলে তিনি রবীন্দ্রনাথ।

আসলে আমাদের মনুষ্যত্বকেই ধারণ করেছিলেন তিনি। বিস্ময়গত চিত্তে, গভীর প্রত্যয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখেছিলেন কী সম্ভার লুকোনো মহাকালের সিন্দুকে; যা হাতে এসেছে তাতেই মূল্য যোজনা করেছেন, বৃথা নয়—ব্যর্থ নয় কিছুই; আমৃত্যু যত অনুভবে আন্দোলিত তিনি মনুষ্যহৃদয়ের মৌলিক প্রার্থনায় সমস্তই মর্যাদাবান। আর এ সকল কিছুরই সারাৎসার তাঁর দ্বিবর্ণ কাব্যালোক এবং চিত্রের কারুময় প্রাসাদ।

তাঁর মহিমা এখানেই যে, আমাদের মানবজন্মের ভালোত্ব যেমন ঐশ্বরিক তাঁর প্রত্যয়ে, গোপন সুড়ঙ্গবাসীরাও দুষ্ট শোণিত হিসেবে পরিত্যক্ত নয়।

আমাদের চৈতন্যের সর্বস্তরের, আমাদের হৃদয়ের সহস্রমুখী আবেগ ও বাসনার অপরূপ আলকেমি তিনি, শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

টীকা

১ প্রসঙ্গত একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উল্লেখ করি। ১৯৬৪-র শেষদিকে আমাকে একবার কলকাতা যেতে হয়েছিল। একদিন হাওড়া-বর্ধমান লাইনে বৈদ্যুতিক রেলে হাওড়া থেকে চুঁচুড়া যাচ্ছি। শীতের সময়। তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় বসে বিলাসী রৌদ্র এবং সহগামী যাত্রীদের বিশ্বকৌষিক আলাপ উপভোগ করছি। হঠাৎ সমস্ত অনুভব সচকিত করে মৃদু গান উত্থিত হল : 'কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস।' আমার প্রিয় গান বলেই নয়, প্রভাতী সূর্যকর, কামরার অন্তরঙ্গ আবহাওয়া, নিজের ভ্রামণিক লঘুচিত্ততা ইত্যাদির চালচিত্রে গানটি হৃদয় মথিত করে দিতে লাগল। কিন্তু গানের উৎস কোথায়? মিনিটখানেক যেতেই দেখি প্রায়-গতযৌবন অন্ধ এক ব্যক্তি, গলায় ঝোলানো হারমোনিয়াম, গান গাইতে গাইতে পার্শ্ববর্তী কামরা থেকে আমাদের কামরায় এলেন। তাঁর পিছনে ছায়ার মতো তরুণী স্ত্রী—শ্যামল মুখে তপস্যার চারুতা। এ ছবি আমি জীবনে ভুলব না। তাঁদের বেশি সাহায্য করা সে-মুহূর্তে আমার সঙ্গতিতে কুলোয় নি—এ দুঃখ আমার অদ্যাবধি বর্তমান।

২ শব্দটি অশ্রদ্ধাপ্রসূত মনে করে পাঠক লেখকের ওপর অবিচার করতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব, দৈহিক শ্রী ইত্যাদি যে-ব্যক্তিস্বরূপের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটায়, তা কবি-তিরোধানের এত বর্ষ পরে আসলে মিথের রূপ নিয়েছে বলেই আমি মনে করি। আর এ-কথা নিশ্চয়ই চরম তার্কিকও মেনে নেবেন, 'রবীন্দ্রনাথ' নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই যে-গুণপ্রত্যয় প্রমূর্ত হয়, তা তাঁর জ্যোতিষ্মান মুখশ্রীর মতোই সাত্ত্বিকতা, কল্যাণচেতনা, ঈশ্বরবিশ্বাস—অর্থাৎ এক কথায় জ্যোতির্ময় নান্দনিক উদ্ভাস।

৩ এখানে একটি কথা পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, রবীন্দ্রনাথ অনেকটা যেন পরিত্যক্ত শিশুর ন্যায় মানুষ হয়েছিলেন। সান্ধ্যকালীন বিদ্যাভ্যাসে অনিচ্ছাজনিত পেটব্যথায় তাঁকে মায়ের দ্বারস্থ হতে দু-একবার দেখি বটে 'জীবনস্মৃতি'তে, কিন্তু গুরুত্ব ও সংখ্যায় তা অতি নগণ্য। শিশু বয়সে তিনকড়ি দাইয়ের হাতে, কৈশোরে ব্রজেশ্বর, শ্যাম ও ঈশ্বরের শাসনাধীনে এই অকালচেতন (precocious) বালকের প্রহর কেটেছে ভাবলে কষ্টই হয়। কী ভাবতেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর মা সম্বন্ধে? আমাদের জানবার

কোনো উপায় নেই। কিন্তু আশ্চর্য নয় কি, 'শিশু' ও 'শিশু ভোলানাথে'র স্রষ্টা স্বীয় জন্মদাত্রী প্রসঙ্গে তাঁর অতিপ্রজ জীবনে, 'জীবনস্মৃতি'র দু-এক স্থান ব্যতীত, প্রায় কিছুই লেখেন নি। অথচ মহর্ষি সম্পর্কে তিনি চিরকাল ভক্তিপ্রণত বাঙ্‌মুখর। সন্দেহ হয়, মাতৃত্যাজ্য শিশুর অভিমানজনিত হয়তো-বা এই নীরবতা।

৪ 'ইমারত-অরণ্যের ফাঁকায় ফাঁকায় পুকুরের জলের উপর সূর্যের আলো ঝিকিয়ে যেত, বিকেলবেলায় অশথের ছায়া দীর্ঘতর হয়ে পড়ত, হাওয়ায় দুলত নারকেল গাছের পত্র-ঝালর, বাঁধা নালা বেয়ে গঙ্গার জল ঝর্ণার মতো ঝরে পড়ত আমাদের দক্ষিণ বাগানের পুকুরে, মাঝে মাঝে গলি থেকে পালকি-বেহারার হাঁইহুই শব্দ আসত কানে, আর বড়ো রাস্তা থেকে সহিসের হেইও হাঁক। সন্ধ্যাবেলায় জ্বলত তেলের প্রদীপ, তারই ক্ষীণ আলোয় মাদুর পেতে বুড়ী দাসীর কাছে শুনতুম রূপকথা। এই নিস্তব্ধ প্রায় জগতের মধ্যে আমি ছিলুম এক কোণের মানুষ, লাজুক, নীরব, নিশ্চঞ্চল।' দ্র. অবতরণিকা, পৃষ্ঠা ১৯ (রবীন্দ্র রচনাবলী ১ম খণ্ড)।

৫ কাদম্বরী [পৈতৃক নাম : কাদম্বিনী] দেবীর সাথে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবাহ হয় ১২৭৫ সালের ২৩শে আষাঢ়, ইং ১৮৬৮-এর ৫ই জুলাই। নববধূর বয়স তখন মাত্র ৮ বৎসর। জন্ম : ২১শে আষাঢ় ১২৬৬ সাল, ইং ১৮৫৯-এর ৪ঠা জুলাই।

৬ রবীন্দ্রনাথ মহর্ষির সঙ্গে হিমালয়যাত্রা করেন তাঁর উপনয়নের অব্যবহিত পরেই। উপনয়নের সময় (১৮৭৩-এর ফেব্রুয়ারি)- তাঁর বয়স ছিল ১১ বৎসর ৯ মাস। মহর্ষির অনুচর কিশোরী চাটুজ্জের সাথে কলকাতায় ফিরে আসেন মাস কয়েক পরেই। দ্রষ্টব্য, 'প্রত্যাবর্তন' (জীবনস্মৃতি)।

৭ কাদম্বরী দেবী তাঁর দেবরের বিবাহের চার মাস পরে ২৫ বৎসর বয়সে কোনো অজ্ঞাত কারণে আত্মহত্যা করেন। সেদিন ছিল ৮ই বৈশাখ ১২৯১ সাল, ইংরেজি ১৮৮৪-এর ১৯শে এপ্রিল।

৮ দ্র. 'প্রত্যাবর্তন' (জীবনস্মৃতি। পৃষ্ঠা ৫৬-৫৭)।

৯. দ্র. 'ভৃত্যরাজকতন্ত্র' (জীবনস্মৃতি, পৃষ্ঠা ১৬)।

১০. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনীকার মন্মথনাথ ঘোষ কাদম্বরী দেবী সম্পর্কে উক্ত বিশেষণই আরোপ করেছেন।

১১ 'সৃজনচেতন' শব্দটি আক্ষরিক অর্থেও প্রয়োগসিদ্ধ। প্রেমিক মানসের অঙ্গীভূত এই সৃজনাকাঙ্ক্ষা। এ কারণেই সাধারণ লোক প্রেমাস্বাদনের পরেই প্রেমিকাকে মানসিক ও দৈহিকভাবে অধিকার করতে চায় এবং অতঃপর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। আর বিবাহের মূলসূত্র যে সৃষ্টিমানস, এ কথা সকলেরই জানা। কিন্তু যদি প্রেমিক ব্যক্তি অসাধারণ হন? তখন ঐ একই সৃজনেচ্ছা কেবল ভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়; জৈবপ্রক্রিয়ার স্থান দখল করে নেয় মানসক্রিয়া। তাই পৃথিবীর অমর কাব্য ও শিল্পকলা তাদের জনকের প্রেমিকচিত্তের অবদান।

১২ 'That in course of time he (Rabindranath) and the wife of his brother Jyotirindranath fell desperately in love with each other did not mend matters at all and when the family married him of presumably to prevent scandal, bad got worse and worse until his sister-in-law killed herself.' ত্রৈমাসিক Quest পত্রিকার ১৯৬১-র মে সংখ্যা।

১৩ 'If the secret (অর্থাৎ কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যারহস্য) was known to any members of the family it has died with them. In the absence of any authentic evidence any surmise or guess would be not only profitless but disrespectful to the memory of one of the finest specimens of Indian womanhood.'—*Rabindranath Tagore : A Biography*. পৃষ্ঠা ১১৪, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি সংস্করণ।

১৪ 'সমাপন'। *রবীন্দ্ররচনাবলী : অচলিত সংগ্রহ* প্রথম খণ্ড।

১৫ কানাই সামন্ত তাঁর 'রবীন্দ্রপ্রতিভা' গ্রন্থে স্পষ্ট দেখিয়েছেন যে, রবীন্দ্রনাথ কাদম্বরী দেবীকে মোট সাতটি গ্রন্থ উৎসর্গ করেন; পাঁচটি তাঁর জীবদ্দশায় এবং বাকি দুটি তাঁর আত্মহত্যার পরে। দ্র. *রবীন্দ্রপ্রতিভা,* পৃষ্ঠা ৩৯২–৯৩।

১৬ 'বলাকা' কাব্যের "ছবি" কবিতা। রচনাকাল : ৩রা কার্তিক ১৩২১ সাল। 'I hade once asked Gurudev directly as to whethar the poem 'Chhabi' in *Baklaka* was inspired by Mrinalini Devi's portrait. He replied, 'No. The poem was addressed to Notun Bouthan's photograph.'—'রবীন্দ্রপ্রতিভা' গ্রন্থে কানাই সামন্ত কর্তৃক উদ্ধৃত কৃষ্ণ কৃপালনীর ৮ই জুন ১৯৬১–তে লেখা একটি পত্র। এতদ্ব্যতীত, কৃপালনী মহাশয় রচিত *Rabindranath Tagore : A Biography* গ্রন্থের ২৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

১৭ 'শৈশবসংগীত' ১২৯১ সালে (২৯ মে ১৮৮৪) প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু গ্রন্থস্থিত কবিতাসমূহ ১২৮৪ থেকে ১২৮৭–এর মধ্যে রচিত। চারটি কবিতা ("অতীত ও ভবিষ্যৎ", "ফুলের ধ্যান", "প্রভাতী", "লাজময়ী") ব্যতিরেকে তেরটি কবিতাই ১২৮৫–এর কার্তিক থেকে ১২৮৭–এর পৌষ পর্যন্ত 'ভারতী'র বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

১৮ 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' প্রকাশিত হয় ১২৮৮ সালে। 'ইহার অধিকাংশ কবিতাই গত দুই বৎসরের মধ্যে রচিত হইয়াছে,...'—প্রথম সংস্করণে গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন।

১৯ 'প্রভাতসঙ্গীত' প্রকাশিত হয় ১২৯০ সালের বৈশাখে।

২০ 'রবীন্দ্ররচনাবলী : প্রথম খণ্ড'—'সন্ধ্যাসঙ্গীত' কাব্যের 'সূচনা' দ্রষ্টব্য। এটি লিখিত হয় প্রথম খণ্ড 'রবীন্দ্ররচনাবলী'র প্রকাশকালে, অর্থাৎ ১৯৩৯ সালে, যখন কবির বয়স আটাত্তর বৎসর।

২১ 'কবিকাহিনী'র পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলেও, বনফুল দুই বৎসর পূর্বে রচিত ও মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়।' 'বনফুল' প্রকাশিত হয় ১২৮৬ সালে (৯ই মার্চ ১৮৮০), এবং 'এই কাব্যের রচনাকাল অন্তত আরো চার বৎসর পূর্বে।'—রবীন্দ্ররচনাবলী : অচলিত সংগ্রহ (১)–র গ্রন্থ পরিচয় দ্রষ্টব্য।

২২ 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' কাব্যগ্রন্থের একাদশতম কবিতা "হলাহল" দ্রষ্টব্য।

২৩ "অসহ্য ভালোবাসা"; 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র দশম সংখ্যক কবিতা।

২৪ 'আহ্বানসঙ্গীত'; তুলনীয় :

মড়কের কণা, নিজ হাতে তুই
রচিলি নিজের কারা,
আপনার জালে জড়ায়ে পড়িয়া
আপনি হইলি হারা।
অবশেষে কারে অভিশাপ দিস
হাহুতাশ করে সারা,
কোণে বসে শুধু ফেলিস নিশাস,
ঢালিস বিষের ধারা।

২৫ দ্র. "বিদায়", "আর্তস্বর", "রাহুর প্রেম"।

২৬ 'অভিজ্ঞতা', শব্দটিকে একটু বিশেষরূপে ব্যবহার করতে চাই। এখানে 'অভিজ্ঞতা' বলতে কেবল বিভিন্ন বাস্তবসত্যের সাথে সংঘাতজনিত মানসিক উপলব্ধিই বোঝাচ্ছি না, বালক কবির আনুষঙ্গিক শৈশবস্বপ্ন বা infantile phantasyও এর সঙ্গে বিধৃত।

২৭ 'In children we often see this path to knowledge quite overtly. The child takes something apart, breaks it up in order to know it; ...The other path to knowing

'the secret' is love. Love is active penetration of the other person, in which my desire to know is stilled by union. In the act of fusion I know you, I know myself, I know everybody—and I 'know' nothing. ... I have torn the other being apart limb from limb, yet all I have done is to destroy him. Love is the only way of knowledge, which in the act of union answers my quest. In the act of loving, of giving myself, in the act of penetrating the other person, I find myself, I discover myself, I discover us both, I discover men.'—Erich Fromm (*The Art of Loving* গ্রন্থের The Theory of Love অধ্যায়। আনউইন পেপারব্যাক সংস্করণ, পৃ. ২৭-২৮)।

২৮ 'প্রভাতসঙ্গীত' কাব্যগ্রন্থের "আহ্বানসঙ্গীত' দ্রষ্টব্য।

২৯ "অনন্ত মরণ" কবিতা, 'প্রভাতসঙ্গীত' কাব্যে।

৩০ পূর্বোক্ত কবিতা।

৩১ মার্চ ১৮৭৫; কবি তখন ১৪ বৎসরের বালক মাত্র।

৩২ দ্র. ফ্রয়েড-শিষ্য Ernest Jones লিখিত *Papers on Psychoanalysis* গ্রন্থের Some Problems of Adolescence অধ্যায়।

৩৩ ঐ, বীকন পেপারব্যাক সংস্করণ, পৃ ৩৯৭।

৩৪ প্রসঙ্গত, Mario Praz অতিশয় সঙ্গত কথা বলেছেন : 'Classicism, then, is a phenomenon by no means alien to the romantic spirit; on the contrary, inasmuch as it strives longingly towards a fantastic pagan world, rather than sharing in the state of serene equilibrium proper to so-called classical works of art (which are serene without knowing it), it shares in the same spiritual travail which is usually defined as characteristically and par excellence 'romantic'.—*The Romantic Agony,* ফন্টানা লাইব্রেরি সংস্করণ, পৃ. ৩০।

৩৫ 'রোমান্টিক' শব্দটির উদ্ভব ও অর্থবিবর্তন চমকপ্রদ। "The word 'romantic' appears for the first time in the English language about the middle of the seventeenth century, meaning 'like the old romances"; ডক্টর জনসনের সমকালেই (১৭০৯-১৭৮৪ খ্রি.) শব্দটি "has gradually ceased to retain its connexion with the literary genre (the romances) from which it was originally derived and has come to express more and more the growing love for wild and melancholy aspects of nature." এবং অবশেষে অষ্টাদশ শতকের শেষ পঁচিশ বৎসরের মধ্যে ফ্রান্সেও এই 'mot anglais'টি ইংরেজি ভাবার্থেই ফরাসি ভাষায় চালু হল। দ্র. পূর্বোক্ত; ৩০, ৩১ ও ৩২ পৃষ্ঠা।

৩৬ দ্র. 'জীবনস্মৃতি'র 'ভগ্নহৃদয়' অধ্যায়, পৃ. ১০১-১০৩। এ-প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু চমৎকার কথা বলেছেন: 'শেক্সপীয়রে, বায়রনে এবং সাধারণভাবে ইংরেজি সাহিত্যে যে 'হৃদয়াবেগের প্রবলতা' পাওয়া যায়, 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ তার নিন্দা করেছেন, কিন্তু ঠিক ঐ উন্মাদনা বাংলা কবিতায় এনেছিলেন বলেই আমরা অনেকে রবীন্দ্রনাথের কাছে চিরকালের মতো বিকিয়ে আছি।'—*কবি রবীন্দ্রনাথ,* ১০০, ১০১ পৃষ্ঠার পাদপূরণ দ্রষ্টব্য।

৩৭ 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে 'পাশ্চাত্যপ্রভাব ও রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য; পৃ. ৫৮।

৩৮ 'strangeness of beauty' : 'there are no excellent beauty that hath not some strangeness in the proportion.' দ্র. মারিও প্রাৎসের *The Romantic Agony*র ভূমিকা, পৃ. ৩৯।

৩৯ ঐ।

৪০ 'আট বছর আগের একদিন'।

৪১ "হৃদয়ের গীতধ্বনি", 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' কাব্য।

৪২ "দুঃখ-আবাহন", ঐ।

৪৩ "হলাহল", ঐ।

৪৪ 'The discovery of Horror as a source of delight and beauty ended by reacting on men's actual conception of beauty itself : the Horrid from being a category of the Beautiful, ended by becoming one of its essential elements, and the 'beautifully horried' passed by insensible degrees into the 'horribly beautiful'.' দ্র. *The Romantic Agony,* পৃ. ৪৪।

৪৫ 'What may be called the fascination of corruption penetrates in every touch is exquisitely finished beauty'—ওয়াল্টার পেটারের এই মন্তব্য কবিগুরুতে অনেকখানি সত্য বলে মনে করি। প্রসঙ্গত, "নিষ্ফল কামনা ও "হৃদয়ের ধন" কবিতাদ্বয়ে এমন কিছু বর্তমান যা বোদলেয়ারকে স্মরণ করায়।

৪৬ 'পুষ্করিণী নির্জন হইয়া গেলে সেই বটগাছের তলাটা আমার সমস্ত মনকে অধিকার করিয়া লইত। তাহার গুঁড়ির চারিধারে অনেকগুলা ঝুরি নামিয়া একটা অন্ধকারময় জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই কুহকের মধ্যে, বিশ্বের সেই একটা অস্পষ্ট কোণে যেন ভ্রমক্রমে বিশ্বের নিয়ম ঠেকিয়া গিয়াছে।'—'জীবনস্মৃতি'র 'ঘর ও বাহির' অধ্যায়, পৃ. ৭।

৪৭ "সিন্ধুপারে" কবিতার রচনাকাল : ২০ ফাল্গুন ১৩০২ সাল।

৪৮ কীট্‌সের La Belle Dame sans merci.

৪৯. প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথ এডগার এলান পো-র একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী 'রবীন্দ্রস্মৃতি' নামক স্মৃতিচারণ-গ্রন্থে স্পষ্ট বলেছেন যে, তাঁর রবিকা-ই তাঁকে এলান পো-র সাথে পরিচিত করান। আর বোদলেয়ার, যতদূর জানি, কবি মূলে কখনো পাঠ করেন নি, ইংরেজিতে পাঠ করেছেন এমন প্রমাণও পাওয়া যায় না। কিন্তু ১৯২৪-এর শেষ দিকে তিনি যখন আর্জেন্টিনায়, তখন একটি ব্যাপার ঘটে। কোনো এক প্রভাতে শ্রীমতী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো তাঁকে ফরাসি কবির L'invitation au voyage ('ভ্রমণের আমন্ত্রণ') কবিতাটি মূল থেকে পাঠ করে শোনাতে যান এবং তৎসঙ্গে নিজের ইংরেজি ভাষান্তর দ্বারা কবিকে কবিতাটি বুঝতে সাহায্য করেন। কিন্তু, 'Tagore interrupted me : 'Vijaya, I don't like your furniture Poet'.' অতঃপর শ্রীমতী ওকাম্পো মন্তব্য করেছেন : 'The words and the tone were so funny that I could not help laughing. My translation had converted a French genius into a 'furniture poet'. Translation can be often murderous." দ্র. *Rabindranath Tagore : A Centenary Volume 1861-1961* গ্রন্থে Victoria Ocampo রচিত 'Tagore on the Banks of the River Plate' প্রবন্ধ।

৫০ রবীন্দ্রনাথ 'মহামায়া' নামক গল্পটি লিখেছিলেন ১২৯৯ সালের ফাল্গুন মাসে, 'সিন্ধুপারে' রচিত হওয়ার দু-বৎসর পূর্বে। সহৃদয় পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ করবেন, উক্ত নারী তার সর্বচৈতন্যে যা লালন করে বেড়ায় তাকে mystery বলাই সঙ্গত এবং তার রূপও Medusan Beauty-র সগোত্র। মহামায়া নাম্নী নায়িকাটিও বিষণ্ন, ক্ষমাহীন, আত্মমগ্ন ও নির্মম।

৫১ 'The absence of memory, silence, and night are the characteristics of death. But silence is more than the abolition of language and night is not only an absence of light... Swallowed up in the night, black as the night, we are all absorbed in

the blackness of night and in collective unconscious.'—*The Vampire* by Ornella Volta ("Tales of Terror" অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

৫২ লক্ষণীয়, কীট্‌সের নায়িকার এক বর্ণ কথাও নায়ক হৃদয়ঙ্গম করে নি, কেবল অনুভব করেছিল : 'She looked at me as she did love, / And made sweet moan' এবং "And sure in language strange she said— / 'I love thee true'."

৫৩ দ্র. Ligeia—Edgar Allan Poe.

৫৪ দ্র. Romance—Edgar Allan Poe.

৫৫ Either mysterious and indecipherable like the Sphinx or the Gioconda (of whom Walter Pater had said that "like the Vampire, she has died and been reborn a thousand times and has learned the secrets of the tomb") or malefic and pitiless like Lilith or Herodias, the *femme fatale* has represented extreme mental cruelty, even in her hallucinating pallor which only a few years before marked the sadist's victim or the necrophile's ideal companion."—*The Vampire* by Ornella Volta, টাভেম পেপারব্যাক সংস্করণ, পৃ. ১৪৪।

৫৬ 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের রচনাকাল : শ্রাবণ ১৩০২।

৫৭ 'Exotic ideals and erotic ideals often go hand in hand : exoticism is usually the fantastic projection of a sexual need'—Mario Praz (*The Romantic Agony*). অতঃপর শ্রীমতী Ornella Volta প্রশ্ন তুলেছেন, "Is the fascination of the vampire part of a wider fascination of the exotic?" দ্র. *The Vampire,* পৃ.১১৫।

৫৮ 'সম্পত্তি সমর্পণ', 'একরাত্রি', 'স্বর্ণমৃগ', 'মহামায়া', ও 'নিশীথে' গল্পাবলি যথাক্রমে পৌষ ১২৯৮, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯, ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯, ফাল্গুন ১২৯৯ ও মাঘ ১৩০১ সালে রচিত। লক্ষণীয়, সব ক'টি গল্পই 'সোনার তরী' কাব্য রচনার সমকালীন।!

৫৯. 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশ : বৈশাখ ১৩০৮-কার্তিক ১৩০৯ এবং গ্রন্থপ্রকাশ ১৩০৯ সালে।

৬০ 'বিচিত্রা'য় প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৩৪-চৈত্র ১৩৩৫, এবং গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৩৩৬ সালের আষাঢ় মাসে।

৬১ 'পূরবী' কাব্য প্রকাশিত হয় ১৩৩২ সালে (ইং ১৯২৫)। কাব্যগ্রন্থটি দুই অংশে বিভক্ত। ১৩২৪-৩০ (অর্থাৎ ১৯১৭-২৩) সালে লিখিত কবিতাগুলি 'পূরবী' অংশে এবং ১৩৩১ সালে দক্ষিণ আমেরিকায় ও ইতালি ভ্রমণকালে লিখিত কবিতাসমূহ 'পথিক' অংশে মুদ্রিত। 'পথিক' অংশটিই আপাতত আমাদের আলোচ্য। কবির বয়স এখন চৌষট্টি বৎসর।

৬২ 'শেষরেখা' কবির মৃত্যুর (১৩৪৮ সালের ২২শে শ্রাবণ) পরের মাসে প্রকাশিত হয়।

৬৩ 'বলাকা' কাব্যের প্রকাশ ১৩২৩ (ইং ১৯১৬) সাল; রচনাকাল ১৯১৪-১৬।

৬৪ 'পলাতকা' ও 'শিশু ভোলানাথ' প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৩২৫ (ইং ১৯১৮) ও ১৩২৯ সাল (১৯২২-২৩ ইং)।

৬৫ক ১৯২৪-এর ৫ই অক্টোবর লিখিত।

৬৫খ ১৯২৫-এর ১২ই ফেব্রুয়ারি লিখিত।

৬৫গ ১৯২৪-এর ২৭শে সেপ্টেম্বর লিখিত।

৬৬ উক্ত আরামকেদারা সম্পর্কে দুটি কবিতা আছে 'শেষ লেখা' কাব্যগ্রন্থে : ৪ সংখ্যক ও ৫ সংখ্যক। শেষোক্তটি উদ্ধৃতিযোগ্য :

আরো একবার যদি পারি
খুঁজে দেব সে আসনখানি

যার কোলে রয়েছে বিছানো
বিদেশের আদরের বাণী।
অতীতের পালানো স্বপন
আবার করিবে সেথা ভিড়,
অস্ফুট গুঞ্জনস্বরে
আরবার রচি দিবে নীড়

সুখস্মৃতি ডেকে ডেকে এনে
জাগরণ করিবে মধুর,
যে বাঁশি নীরব হয়ে গেছে
ফিরায়ে আনিবে তার সুর।
বাতায়নে রবে বাহু মেলি

বসন্তের সৌরভের পথে,
মহানিঃশব্দের পদধ্বনি
শোনা যাবে নিশীথজগতে।

বিদেশের ভালোবাসা দিয়ে
যে প্রেয়সী পেতেছে আসন
চিরদিন রাখিবে বাঁধিয়া
কানে কানে তাহারি ভাষণ।

ভাষা যার জানা ছিল নাকো,
আঁখি যার কয়েছিল কথা,
জাগায়ে রাখিবে চিরদিন
সকরুণ তাহারি বারতা।

৬৭ প্রতিমা ঠাকুর রচিত 'নির্বাণ'।

৬৮ "When Tagore lived in San Isidro I was impressd by the copy-book where he was writing his *Puravi* poems in Bengali. He played with the erasures, following them from verse to verse with his pen, making lines that suddenly jumped into life out of this play : prehistoric monsters, birds, faces appeared. The cancelled mistakes in Tagore's poems gave birth to a new world of forms that grinned, frowned or laughed at us in a mysterious and fascinating way. I begged him to let me photograph some of the pages. The permission was granted. That copy-book, I think, was the beginning of Tagore the Painter, of his urge to translate his dreams with a pencil or a brush"—Victoria Ocampo রচিত "Tagore on the Banks of the River plate" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (*Rabindranath Tagore : A Centenary Volume*, পৃ. ৪০)।

৬৯ 'ছিন্নপত্রাবলী': পত্রসংখ্যা ১০৭, পৃ. ১৬২-৬৩।

৭০ ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে লিখিত ১৮৯৩-এর ৮ই মে-র পত্র। দ্রষ্টব্য, 'ছিন্নপত্রাবলী': পত্রসংখ্যা ৯৪, পৃ. ১৪৬।

৭১ *History of Art Criticism*—Lionello Venturi. ডাটন পেপারব্যাক সংস্করণ, ৩০৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত মন্তব্য।

৭২ 'সাহিত্যচিন্তা'—শিবনারায়ণ রায়। 'চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ' অধ্যায় দ্রষ্টব্য। পৃ. ৯৫–৯৬।

৭৩ *Rabindranath Tagore : A Centenary Volume* গ্রন্থে 'Tagore on the Banks of the River Plate' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, পৃ. ৪০।

৭৪ *Rabindranath Tagore : A Biography*—Krishna Kripalani গ্রন্থের ৩৪১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

৭৫ ঐ।

৭৬ এঁরা যথাক্রমে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৮ই নভেম্বর ১৯২৯ মৃত্যু), দৌহিত্র নীতু (৭ই অগাস্ট ১৯৩২), 'গানের ভাণ্ডারী' দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (৫ই শ্রাবণ ১৩৪২), গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯শে আগস্ট ১৯৩৮), একনিষ্ঠ ভক্ত ও সঙ্গী C. F. Andrews (৫ই এপ্রিল ১৯৪০) এবং সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর (৬ই মে ১৯৪০)। শুধু এই নয়, সমমনাদের মধ্যেও অনেকে চলে গেলেন : জগদানন্দ রায় (২৫শে জুন ১৯৩৩), পণ্ডিত Winternitz (৩১শে জানুয়ারি ১৯৩৭), আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু (ডিসেম্বর ১৯৩৭), ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (জানুয়ারি ১৯৩৮), দীর্ঘকালের একনিষ্ঠ সঙ্গী–কর্মী কালীমোহন ঘোষ (১২ই মে ১৯৪০)।

৭৭ 'রোগশয্যায়', ৭ সংখ্যক কবিতা।

৭৮ ঐ ৮ সংখ্যক কবিতা।

এই কবিতাদ্বয়ের গূঢ়তর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন আবু সয়ীদ আইয়ুব তাঁর এক সাম্প্রতিক প্রবন্ধে: "যাবতীয় দ্যাবাপৃথিবী থেকে আশ্রয়ের শেষ চিহ্নটাও কি মুছে গেছে? নইলে বিনিদ্র গভীর রাত্রে প্রিয়জন কেউ অল্পক্ষণের জন্য শুশ্রূষার কাজে ঘরে এলে কেন মনে হয় গ্রহতারা সস্নেহে কথা বলে উঠেছে, আর চলে গেলেই সমস্ত জগৎ একেবারে উদাসীন হয়ে যায়? এমন উপলব্ধির তাৎপর্য কী? আশার রেশটুকু ধরে রাখার কী অপরিসীম ব্যাকুলতা; অথচ কবিতার মধ্যে আশার সুর একবার শুধু ঝংকার দিয়েই থেমে যায়, তার পরে কবির চারিদিকে রয় কেবল উদাসীন জগতের ভীষণ স্তব্ধতা—যে-স্তব্ধতা আমাদের মনে করিয়ে দেয় পাস্কালের সেই বিখ্যাত উক্তি : 'অনন্ত আকাশের স্তব্ধতা আমার চিত্তে আতঙ্কের সঞ্চার করে।' দ্বিতীয়টিতে আলোর ভর্ৎসনা শুনে স্বভাবতই আশা জাগে—কুজ্ঝটিকা সরে যাবে। কিন্তু যায় না; বরঞ্চ সূর্যোদয়েই ফ্যাকাসে হয়ে আসে। ভোরের আলোর ক্ষীণাভাসটুকু দেখতে পেয়ে অরণ্যের পাখিরা গান গেয়ে উঠেছিল, সে গানও থেমে যায়, সারা পৃথিবীর স্তব্ধতা সবকিছুকে গ্রাস করে। এমনি এক সর্বগ্রাসী নিস্তব্ধতার মধ্যেই কি 'ডুইনো এলিজি'র প্রথম পঙ্‌ক্তিটি উচ্চারিত হয়েছিল Who, if I cried, would hear me among the angelic orders? রবীন্দ্রনাথ ও রিল্‌কে এ শতাব্দীর দুই মহান কবির সেই একই চূড়ান্ত ঘোষণা : For beauty's nothing but beginning of Terror we're just able to bear, and why we adore it so is because it serenely disdains to destroy us"—'অমঙ্গলবোধ ও রবীন্দ্রনাথ : শেষ পর্বের কবিতা'। দ্র. 'দেশ' পত্রিকা, ৩৪, ২৪, ২৬ সংখ্যা।

৭৯ আবু সয়ীদ আইয়ুব। উপর্যুক্ত প্রবন্ধ।

শামসুর রাহমান

নতুন করে রবীন্দ্রচর্চা

যখন সাহিত্যচর্চায় হাতে-খড়ি হয় তখন আমরা নিজেদের রবীন্দ্রস্বর্গ থেকে স্বেচ্ছায় নির্বাসিত করেছিলাম। এ স্বেচ্ছা-নির্বাসনের পেছনে অবশ্য ছিল তিরিশের সেই প্রধান পুরুষদের তুমুল আন্দোলনের প্ররোচনা ও কতিপয় বিদেশী ঠাকুরের মহিমার মন্ত্রণা। বিদেশী সাহিত্যে আশির নিমজ্জিত হয়ে, নৈরাশ্য ও নিঃসঙ্গতার মদে চুর হয়ে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে নানা নালিশ রুজু করেছিলাম সেদিন। এলিয়ট, এজরা পাউন্ড, সার্ত্রে, কাফকা, কামু প্রমুখের মানসতা আমাদের এমন পেয়ে বসেছিল যে, তখন রবীন্দ্রনাথকে মানস থেকে উৎখাত করতে পারলেই যেন বাঁচি। রবীন্দ্র-সাহিত্যে শুধু এরিয়েলের পাখার ঝাপট শোনা যায়, ক্যালিবানের আনাগোনা নেই—এই অভিযোগে ভরপুর ছিলাম আমরা অনেকেই। আর যারা সদ্য মার্ক্সবাদের কড়া ভিয়েনে মনকে তুখোড় করে এনেছি তারা তো রবীন্দ্র-সাহিত্যকে বুর্জোয়া মনের বিকার ঠাউরে রবীন্দ্র-রচনাবলি ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করেই খালাস! এ এক কৌতুকপ্রদ তথ্য যে, বঙ্গীয় সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত পুরুষও বটে। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বাকবিতণ্ডা কম হল না আজ পর্যন্ত। এবং দুঃখের বিষয়, সেসব বাকবিতণ্ডার অধিকাংশই অসাহিত্যিক। বাঙালিরা কখনো রবীন্দ্রনাথকে সহজে মাল্যদান তো করেই নি এবং পঙ্ক-ভূষণ ছুঁড়ে দিয়েছে তাঁর দিকে হেলায়, অবজ্ঞায়।

বঙ্গবাসীর এই ক্রিয়াকাণ্ডে রবীন্দ্রনাথ কম ব্যথিত হন নি। 'পায়রা কবি', 'হেঁয়ালি কবি' ইত্যাদি খেতাব তো তাঁর ভাগ্যে জুটেইছিল, এমনকি পঞ্চাশবর্ষপূর্তি উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক কবি সংবর্ধনার আয়োজন করা হলে তখন তাতে অনেকেই বাধা দান করে। সংবর্ধনা ভণ্ডুল করার জন্য সেসব অকৃতজ্ঞ, অসূয়াপরায়ণ, সংকীর্ণমনা ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে পত্র লিখে লিখে উত্ত্যক্ত করে তুলেছিল। এসব ঘটনায় রবীন্দ্রনাথ যে কতদূর মর্মাহত হয়েছিলেন তা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লেখা তাঁর একটি চিঠিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে :

> আমাদের দেশে জন্মলাভকে একটা পরম দুঃখ বলিয়া থাকে, কথাটা যে অমূলক নহে তাহা আমার জন্মদিনের পঞ্চাশৎ সাম্বৎসরিক উপলক্ষ্যে বিশেষভাবে অনুভব করিবার কারণ ঘটিল।
>
> আপনাদের মধ্যে যাঁহারা আমার বন্ধু তাঁহাদের প্রীতি আমি লাভ করিয়াছি সেই আমার চিরজীবনের সমস্ত সাধনার পরম সফলতা। কিন্তু সম্মানলাভকে ভগবান মনু বিষের মত পরিহার করিতে বলিয়াছেন—আমাকে সেই বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন।
>
> এক্ষণে আমি যে বিদ্যালয়ে কাজ করি সেখানকার ছাত্র ও অধ্যাপকগণ আমার বৃদ্ধ

> বয়সের সূচনা লইয়া উৎসবের আয়োজন করিতেছেন—আপনি বুঝিতেই পারিতেছেন সে তাঁহাদের অকৃত্রিম আত্মীয়তারই আনন্দ উপদ্রব—তাহাকে ঠেকাইবার সাধ্য আমার নাই। এখানে ইঁহারা আমাকে যে মালা দিয়া সাজাইবেন তাহা ফুলের মালা, তাহা বহিতে পারব। কিন্তু সাধারণ জনসভা যে মানের মুকুট আমার মাথায় পরাইতে চাহেন তাহার ভারবহন করিতে গিয়া আমার মাথা হেঁট হইবে। আমি জানি আপনি আমাকে ভালবাসেন সেইজন্য আপনার কাছে আমার সানুনয় অনুরোধ, এই জনসভার স্নেহালিঙ্গন হইতে আমাকে রক্ষা করিবেন।
>
> আপনারা পরিষৎ হইতে যে উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইয়াছেন একদল তাহার বিরুদ্ধে একখানি পত্র মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিতেছেন। নিঃসন্দেহে তাঁহারা পরিষদের সভ্য। আপনাদের এই কবি-সম্বর্ধনা প্রস্তাবের ইতিহাস আমি কিছুই জানি না সুতরাং তাঁহারা যে লিখিয়াছেন আপনারা চক্ষুলজ্জার বিড়ম্বনায় আপনাদের বিধিলঙ্ঘনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা সত্য কিনা বলিতে পারি না। কিন্তু তাহার মধ্যে আমার প্রতি যে কটাক্ষপাত আছে তাহা পড়িয়া বুঝিলাম আমার চিরন্তন ভাগ্য আমার পাঞ্চাশিক জন্মোৎসবেও অবিচলিত আছেন। ভগবানের কৃপায় আমি সত্য মিথ্যা অনেক নিন্দা জীবনে বহন করিয়া আসিয়াছি। আজ আমার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইবার মুখে এই আর একটি আমার জন্মদিনের উপহাররূপে লাভ করিলাম এই যে, আমি আত্মসম্মানের জন্য লোলুপ হইয়াছি এবং অভিনন্দনের দায় হইতে পরিষৎকে নিষ্কৃতি দান করা আমারই উপরে নির্ভর করিতেছে। এই নিন্দাটিকেও নতশিরে গ্রহণ করিয়া আমার একপঞ্চাশৎ বৎসরের জীবনকে আরম্ভ করিলাম। আপনারা আশীর্বাদ করিবেন সকল অপমান সার্থক হয় যেন।

তিরিশের সেই কতিপয় অস্থির, অভিনবত্ব-মত্ত, প্রতিষ্ঠাসন্ধানী যুবকের রবীন্দ্র-বিরোধিতার অর্থ বুঝি; কেননা, সেটা ছিল সম্পূর্ণতই সাহিত্যিক। কিন্তু যে বিরোধিতার মূলে অসাহিত্যিক কারণসমূহ গিজগিজ করছে তার অর্থোদ্ধারের দায়িত্ব শুধু ফ্রয়েডই গ্রহণ করতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ যখন খ্যাতির কৈলাসে তাঁর হিরণ্ময় সিংহাসনটিতে অধিষ্ঠিত, তখন চতুর্দিক উথালপাথাল করে যে একদল নব্য লেখক পদার্পণ করেছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁরা চিহ্নিত হয়েছিল 'কল্লোল গোষ্ঠী' বলে। যেহেতু রবীন্দ্রপ্রভাব বিষয়ে আশুচেতন সেই লেখক সম্প্রদায়ের সামনে ছিল রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের পরিণতির বিখ্যাত, করুণ উদাহরণ, সুতরাং তাঁরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, কবি সার্বভৌমের অনুগামিতা সিদ্ধির সঙ্গে তাঁদের মিলন তো ঘটাবেই না বরং নিয়ে যাবে শোকাবহ আত্ম-বিলুপ্তির পথে। তাঁদের একজন স্পষ্টতই ঘোষণা করলেন, 'সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্রঠাকুর /... মোর পথ আরো দূর।' কিন্তু আত্মপ্রতিষ্ঠার হৈ-হৈ সংগ্রামে তাঁরা এ কথা বেমালুম ভুলে থাকলেন যে, সাহিত্য ক্ষেত্রে কেউ কারুর পথ রোধ করে বসে থাকে না। নিজেদের প্রাতিস্বিকতা বজায় রাখার জন্য তাঁরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাকে আমি অন্তত অপসিদ্ধান্ত মনে করি না। তবে চেতনাকে যথাসাধ্য উচ্চকিত রেখেও তাঁদের কেউ কেউ রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে নিস্তার পান নি পুরোপুরি। 'কল্লোল গোষ্ঠী' রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন সত্য, কিন্তু তা বলে রবীন্দ্রচর্চা থেকে বিরত থাকেন নি কেউ। রবীন্দ্র-সাহিত্য বিহারে তাঁরা ছিলেন ক্লান্তিহীন, ক্ষান্তিহীন। সেই বিদ্রোহীদের একজন নির্দ্বিধায় কবুল করেছেন যে, দিনে তিনি কবিগুরুর বিরুদ্ধে তপ্ত ভাষ্য রচনা করতেন আর রাত জেগে পাগলের মতো পড়তেন রবীন্দ্রনাথের কবিতাবলি। এটি উল্লেখ করলাম এ জন্য যে, উক্ত তথ্য থেকে 'কল্লোল গোষ্ঠী'র রবীন্দ্র-বিরোধিতার চরিত্রটি পরিস্ফুট হয়।

২

আমাদের সমাজে সংস্কৃতির জন্য যখন তখন মায়াকান্না জুড়ে দেয়ার মতো লোকের কমতি নেই। তারা 'সংস্কৃতি গোল্লায় গেল' বলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পাঁচ পাড়া মাথায় তুলেই ক্ষান্ত হয় না, পত্র-পত্রিকাগুলোসুদ্ধ চোখ-রাঙানো কথাবার্তায় ভরিয়ে তোলে। তাদের ধমকে পাঠকগোষ্ঠীর টনক না নড়লে তারা রীতিমতো ক্ষেপে ওঠে, মরিয়া হয়ে গজরাতে থাকে সারাক্ষণ। মজার কথা এই যে, যাঁরা সংস্কৃতির ধুয়া তুলে চতুর্দিকে বিভ্রান্তির ধোঁয়া ছড়ান সংস্কৃতি বেচারি কস্মিনকালেও তাদের ত্রিসীমায় ঘেঁষতে পারে না। বলা নিষ্প্রয়োজন, সেসব প্রচণ্ড মরদের সংস্কৃতির জন্যে এই দরদ অনেকাংশেই লোক-দেখানো ব্যাপার, অন্তরের জিনিস নয়। যদি তারা প্রকৃতই সংস্কৃতিবান হত তা হলে কথায় কথায় যা কিছু চিৎপ্রকর্ষের তর্কাতীত উপাদান বলে গ্রাহ্য সেগুলোর বিরুদ্ধে লাঠি উঁচিয়ে আসত না। তারা নিজেরা সংস্কৃতির সুফল উপভোগ করেই না, উপরন্তু আর দশজনও যাতে তার স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয় সেজন্য সুপরিকল্পিতভাবে নানাবিধ ফন্দি-ফিকির আঁটতে শুরু করে। যারা জীবনে কখনো ভালো গান শুনে বিচলিত হয় না, নাটক দেখতে ভালবাসে না, চিত্রকলার প্রতি যাদের ঔদাসীন্যের সীমা নেই, নৃত্যে যাদের অরুচি, শিল্প-সাহিত্যের কানাকড়ি মূল্য দিতে শেখে নি যারা, তারাই যখন সংস্কৃতি বিষয়ে ফতোয়া জারি করে ঘন ঘন তখনো যে ব্যক্তি হাসি সংবরণ করে রাখবে তাকে রামগরুড়ের ছানার দলের একজন বলে ভেবে নিতে বাধা থাকবে না কারুর।

যাঁদের গাঁয়ে মানে না অথচ আত্মগরজে বেসামাল হয়ে দিব্যি মোড়ল সেজে বসেছেন যাঁরা, যাঁরা সংস্কৃতির দহলিজে তেলচিটচিটে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে গুড়গুড় করে হুঁকো টানছেন অবিরাম, তাঁরা হরেক বিষয়ে হরহামেশাই নোস্‌খা বিতরণ করতে ভালবাসেন, ভালবাসেন মগজের সুনসান ময়দানে উদ্ভট সব চিন্তার ঘোড়দৌড় করাতে। এঁরাই রবীন্দ্র-সাহিত্য বর্জনের প্রস্তাব পেশ করেন সোৎসাহে। রবীন্দ্র-সাহিত্যকে দেশ থেকে নির্বাসিত করলেই যেন আমাদের সুখনিদ্রা হবে চিরদিন, রবীন্দ্রনাথকে অসম্মান করতে পারলেই যেন আমাদের মুখরক্ষা হবে, তাঁদের মনোভাব অনেকটা এ-রকম। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয়, অতএব তাঁর রচনাবলি অবশ্যই বর্জনীয়—এই তুখোড় যুক্তি তুলে ধরেন তাঁরা। তবে কি এই একই কারণে কাজী নজরুল ইসলামের রচনাবলিও বর্জনীয় নয়? তিনিও তো, যতদূর জানি, ভারতীয়। তাঁর বেলায় বর্জনের প্রশ্ন ওঠে না কেন? নাকি মুসলমান বলেই তিনি রেয়াত পেয়ে যাচ্ছেন আমাদের কাছে? বস্তুত, যতদিন না চোখ থেকে সাম্প্রদায়িকতার পরকলা খুলে ফেলি ততদিন সবকিছুই ঘোলাটে দেখতে থাকব আমরা। বস্তুত, রবীন্দ্র-সাহিত্য-বর্জনের পেছনে রয়েছে এক উগ্র সাম্প্রদায়িকতাপুষ্ট মনোভাব। আমার কাছে এবং, আশা করি, আমার মতো আরো অনেকের কাছেই রবীন্দ্রনাথ কোন দেশের অধিবাসী কিংবা তিনি কোন ধর্মাবলম্বী, এসব তথ্যাদি তেমন জরুরি নয়। তিনি পৃথিবীর মহত্তম কবিদের অন্যতম, বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক, এইটেই তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয়। আমরা যারা বাংলা ভাষায় কথা বলি, সাহিত্যচর্চা করি তাদের কাছে বিশ্বের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ লেখকদের চেয়েও রবীন্দ্রনাথের স্থান বেশ উঁচুতে। কেননা, আমরা তাঁর কাছে প্রত্যক্ষভাবে অশেষ ঋণী।

কেউ কেউ সরবে এ-কথাও প্রচার করে থাকেন, রবীন্দ্রচর্চা করলে হিঁদুয়ানি নাকি আমাদের গ্রাস করে ফেলবে। এ-ধরনের কথা শুনলে হাসব কি কাঁদব ভেবে পাই না। তা হলে তো পাছে আমরা কমিউনিস্ট হয়ে যাই, এই ভয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন কিংবা নয়াচীনের

সাহিত্যসুদ্ধ স্পর্শ করতে পারব না। আমাদের সমাজে এমন শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন যাঁরা বাইবেল পাঠে আনন্দিত হন, কিন্তু তাঁরা কেউ স্বধর্ম বিসর্জন দিয়ে গির্জায় ঢুকে পড়েছেন বলে শোনা যায় নি। বুদ্ধদেবের কথামৃত পান করলেই কি আমরা সবাই দলে দলে বৌদ্ধ হয়ে যাব? যদি তাই হয়, তবে টি. এস. এলিয়টের কবিতাও আমাদের কাছে অপাঠ্য ও বর্জনীয় ঠেকা উচিত। কারণ, তিনি সংশয়াতীতভাবে রোমান ক্যাথলিক। এই একই কারণে ইমরুল কায়েসের কবিতাবলিও বর্জনীয়। সেই বিধর্মী আরবি কবির কবিতা আওড়ালে লোকে কাফের বলবে না আমাদের? সাম্প্রদায়িকতা নামক রাহু আমাদের এমন গ্রাস করেছে যে, রবীন্দ্রনাথ যে হিন্দু নয় ব্রাহ্ম ছিলেন এই সাধারণ তথ্যটুকু পর্যন্ত আমরা বিস্মৃত হই।

গালিব, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল—এক অর্থে এঁরা তিন জনই ভারতীয়। ভারতীয় বলেই তাঁদের রচনাবলি থেকে আমরা নিজেদের বঞ্চিত করব, এই উক্তি কোনো শুভবাদীর সমর্থন যোগাতে পারবে না। সত্য কথা বলতে কি, শিল্পী-সাহিত্যিকদের কোনো দেশ নেই, কোনো কাল নেই। তাঁরা সর্বদেশের, সর্বকালের। আমরা বাঙালিরা কী করে রবীন্দ্রচর্চা থেকে বিরত থাকতে পারি? আমরা কী করে অস্বীকার করব আধুনিক বঙ্গসংস্কৃতির স্থপতি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ? কী করে ভুলব বঙ্গীয় সাহিত্যের একরত্তি এঁদো মফস্বলকে এক কল্লোলিনী তিলোত্তমা নগরীতে রূপান্তরিত করেছেন একা রবীন্দ্রনাথ? কী করে ভুলব বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বাংলা ভাষার মহত্তম গদ্য লেখকও? কী করে ভুলব যে ভাষায় আমরা বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করি, শত্রুর সঙ্গে কলহে মাতি, প্রিয়তমাকে প্রেম নিবেদন করি, কোনো মানবীর পাষাণপ্রতিম হৃদয়কে দ্রব করার মনোহর চক্রান্তে রাত জেগে যে ভাষায় পত্রের ফাঁদ পাতি, এমনকি যে-ভাষায় প্রবন্ধ লিখে রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করি তা গ্রন্থিল ও বর্ণিল হয়ে গড়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথেরই পৌরোহিত্যে? সুতরাং যাঁর সামনে বরাবর আমরা অধমর্ণের ভূমিকাই পালন করে এসেছি তাঁকে সম্মান করার ব্যাপারে যদি বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করি তবে বিশ্ববাসীর নিকট আমরা অত্যন্ত খর্ব হয়ে যাব। আমাদের দেশে কোনো কোনো মহলে রবীন্দ্রনাথকে হেয় করার একটা উদ্যম প্রকট বলেই এসব কথা উল্লেখ করলাম। যারা সংস্কৃতির প্রেমে বিহ্বলতা প্রকাশ করতে সদা তৎপর তারাই আধুনিক বঙ্গসংস্কৃতির স্থপতিকে এদেশের মানুষের মন থেকে উৎখাত করতে উঠেপড়ে লেগেছেন। তবে আশা করি, আজ যাঁরা সম্পূর্ণ অসাহিত্যিক কারণে রবীন্দ্র বিরোধিতায় নিয়োজিত, একদিন তাঁরা তাঁদের ভুল বুঝতে পারবেন। এ বিশ্বাস আমার বদ্ধমূল। আর রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।'

৩

রবীন্দ্র-বিশ্বে আমি সর্বপ্রথম প্রবেশ করেছিলাম পদ্যের নয় গদ্যের হাত ধরে। নিচু ক্লাসে রবীন্দ্রনাথের একটি কি দুটি পদ্য পড়ি নি, এমন নয়; তবে তখন আমি তাঁর বিষয়ে ছিলাম অত্যন্ত অসচেতন। দৈবদয়ায় সেকালে স্কুলে দশম শ্রেণীর পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল 'গল্পগুচ্ছ', দ্বিতীয় খণ্ড। কবুল করতে দ্বিধা নেই, ক্লাসে কয়েকটি গল্প পড়ানো হওয়া সত্ত্বেও তখন সেগুলি তেমন ভালো লাগে নি আমার। পড়ে গেছি, এইমাত্র। মাস্টার মশাই জায়গায় জায়গায় শব্দার্থ বলে দিয়েছেন, 'আপদ' গল্পের সেই বালক নীলকান্ত চুরি করা সত্ত্বেও কেন চোর নয় তার ব্যাখ্যাও জপিয়েছেন, কিন্তু আমার মনে দাগ কাটে নি ওসব। ইতোমধ্যে প্রবেশিকা পরীক্ষা শেষ হল। পরীক্ষাশেষের ক্লান্তি ও আনন্দ-ভরা এক দুপুরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম চিলের ডাক শুনতে শুনতে, খেজুর গাছের পাতার ঝিলিমিলি দেখতে দেখতে। ঘুম ভাঙতেই দেখি, দুপুর ভিড়ে পড়েছে বিকেলের সোনালি বন্দরে। হাতে কী-একটা

ঠেকল যেন। কুড়িয়ে নিয়ে দেখলাম, 'গল্পগুচ্ছ', দ্বিতীয় খণ্ড। বিবর্ণ মলাট, জখমি পাতা। খেলুড়ে চোখ গড়িয়ে চলল পাতায় পাতায়। 'অতিথি' গল্পটা পড়ে ফেললাম আগাগোড়া নতুন করে। মন তারাপদের পদ-চিহ্নিত জনহীন নদীতীরের মতোই কেমন উদাস হয়ে গেল। তারাপদের হু-হু মাঠ, নদী ছেড়ে চলে এলাম 'ক্ষুধিত পাষাণে'; পাগলা মেহের আলীর সেই 'সব ঝুট্ হ্যায়, সব ঝুট্ হ্যায়' ধ্বনি শুনে মন ছমছম করে উঠল, আবার আমার মনে 'হঠাৎ গুমট ভাঙিয়া হু-হু করিয়া একটা বাতাস দিল—শুস্তার স্থির জলতল দেখিতে দেখিতে অপ্সরীর কেশদামের মতো কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, এবং সন্ধ্যাছায়াচ্ছন্ন সমস্ত বনভূমি এক মুহূর্তে একসঙ্গে মর্মরধ্বনি করিয়া যেন দুঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিল। স্বপ্নই বলো আর সত্যই বলো, আড়াই শত বৎসরের অতীত ক্ষেত্র হইতে প্রতিফলিত হইয়া আমার সম্মুখে যে এক অদৃশ্য মরীচিকা অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহা চকিতের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। যে মায়াময়ীরা আমার গায়ের উপর দিয়া দেহহীন দ্রুতপদে শব্দহীন উচ্চকলহাস্যে ছুটিয়া শুস্তার জলের উপর গিয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিল, তাহারা সিক্ত অঞ্চল হইতে জল নিষ্কর্ষণ করিতে করিতে আমার পাশ দিয়া উঠিয়া গেল না। বাতাসে যেমন করিয়া গন্ধ উড়াইয়া লইয়া যায়, বসন্তের এক নিশ্বাসে তাহারা তেমনি করিয়া উড়িয়া চলিয়া গেল।'

সেদিন 'গল্পগুচ্ছে'র গল্পের পর গল্প দ্বারা প্রবলভাবে আক্রান্ত হতে দিলাম নিজেকে। বিকেল কখন সন্ধ্যা হল, সন্ধ্যা মধ্যরাত্রি—টের পেলুম না বিন্দুমাত্র। শুধু কিছুক্ষণের জন্য আম্মার পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে তাড়াহুড়ো করে জঠরে প্রেরণ করেছিলাম খাদ্য। ক্ষুধা ছিল না মোটেই। তখন আরেক অলৌকিক ক্ষুধার দখলে আমি। কী তীব্র সেই ক্ষুধা, তার দামাল লকলকে জিভকে সামাল দেওয়া হল মুশকিল। সেই ক্ষুধা আমাকে নিয়ে গেল গ্রন্থাগারের সারি সারি পুরোনো আলমারির কাছাকাছি। 'গল্পগুচ্ছ' আমার মনে শুধু রবীন্দ্র-সাহিত্যের জন্য নয় সমগ্র সাহিত্যের জন্যই এক অনির্বাণ ক্ষুধাকে জাগ্রত করল। উপরে বর্ণিত ঘটনাটি আজো আমার মনে ঝকঝক করছে, কেননা 'গল্পগুচ্ছে'র বদান্য সান্নিধ্যেই আমি হতে পেরেছিলুম রৈবিক বিশ্বের নাগরিক। আর সেই ঘুম-ভাঙা বিকেলেই ভেঙেছিল আমার মনের ঘুম।

৪

রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে কিছু লিখতে গেলে বাকসংযম বজায় রাখা স্বভাবতই দুষ্কর। এই অসামান্য উত্তমর্ণের সান্নিধ্যে এলে এমনিতেই মাথা নুয়ে আসে। কারণ, বঙ্গীয় সাহিত্যের যে ক্ষেত্রের দিকেই দৃষ্টি প্রসারিত করি না কেন সর্বত্রই সবিস্ময়ে দেখি রবিশস্যের বিচিত্র সম্ভার। রবীন্দ্রনাথের আজীবন অসাধারণ কবিব্রতের কথা পুনরুক্তি করা আমার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। সাহিত্যের অন্যান্য শাখাতেও ছিল তাঁর স্বচ্ছন্দবিহার। সেসব ক্ষেত্রে তিনি যে সিদ্ধিলাভ করেছেন সেগুলির যে কোনো একটিতে রৈবিক ব্যুৎপত্তি দেখাতে পারলে অন্য যে কোনো লেখক বর্তে যেতেন, সন্দেহ নেই। আজ পর্যন্ত 'গোরা' বাংলা উপন্যাসের মধ্যমণিরূপে জাজ্বল্যমান; রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছোটগল্পের একাধারে জনক ও সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক; নাটকে তাঁর প্রতিভা কিঞ্চিৎ হীনপ্রভ ঠেকলেও, নৃত্যনাট্যের ক্ষেত্রে তিনি এখানো নিঃসঙ্গ, অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রধান কবি বহুমুখী গদ্য রচনাতেও শিল্প ও প্রজ্ঞার যে পরাক্রান্ত স্বাক্ষর রেখে গেছেন তা চিরকাল পাঠকবর্গের কাছে এক বিরাট বিস্ময়ের বিষয় হয়ে থাকবে। এবং এ মন্তব্য অনস্বীকার্য ঠেকে যে, বাংলা ভাষায় যাঁরা প্রবন্ধকার হওয়ার বাসনা লালন করেন তাঁদের বারবার যেতে হবে কোনো গদ্য লেখকের কাছে নয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামের কবি সার্বভৌমের কাছেই।

আর তাঁর সেই অবিনাশী গীতিমালা? মৃত্যু যখন ঘনিয়ে এল জীবন-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথের সত্তার চতুঃসীমায় যখন তিনি অন্যান্য অনেক কিছুর মতো নিজের প্রতিও প্রশ্নশীল হয়ে পড়েছিলেন, সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন তাঁর অজস্র লেখার স্থায়িত্ব সম্পর্কে, তখনো তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'বাংলা দেশের লোককে আমার গান গাইতেই হবে; আর কিছু যদি নাও থাকে, তবু আমার গান থাকবে।' রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তাই সপ্রমাণ করে তাঁর ভাবীকথনের সত্যতা। 'প্রাণহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারিধার' সেখানে ঘরে ঘরে গুঞ্জরিত হচ্ছে তাঁর গান, অসংখ্য গান। হ্যাঁ, তাঁর গান থাকবে। বাঙালির কণ্ঠ থেকে কোনোদিন বিলীন হবে না তাঁর গানের সুর। কখনো কেউ কোনো প্রলোভন দেখিয়ে আমাদের কণ্ঠ হতে ভুলিয়ে নিতে পারবে না রবীন্দ্রনাথের গান। আমরা অনেকেই রবীন্দ্রনাথের গান থেকে এমন কিছু পেয়েছি যা শুদ্ধ স্বরগ্রাম ও নন্দনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার চেয়ে ঢের বেশি গভীর। আমি অন্তত এমন এক জনের কথা জানি যে তার দেশ-শ্রীর সাক্ষাৎ পরিচয় যতটা রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যে পেয়েছে ততটা আর কিছুতেই নয়। স্বদেশকে সে ভালবাসতে শিখেছে কোনো রাজনীতিবিদের তুখোড় বক্তৃতা শুনে নয়, শ্রুতিকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের অবিরল প্রবাহে স্নাত করে। এ দেশের প্রকৃতির দিকে কোনোদিন সে কি বিস্ময় ও মুগ্ধতা বোধ নিয়ে তাকাতে পারত যদি না রবীন্দ্রনাথ লিখতেন ষড়ঋতুর বৈচিত্র্য-বর্ণিল সব গান?

রবীন্দ্র-বিশ্বে কীভাবে প্রবেশ করেছিলুম সে কথা পূর্বে বলেছি। বালক যেমন পিতামহের হাত ধরে ভ্রমণে বেরোয় আমিও তেমনি রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে সাহিত্যের দেশবিদেশে চলাফেরা করতে শিখেছি, বলা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল বলেই আমার মন প্রাগৈতিহাসিক গুহার অন্ধকার থেকে সভ্যতার সুপ্রভ আলোর দিকে করেছিল উধাও যাত্রা। বাংলা সাহিত্যের সেই সিদ্ধার্থ পুরুষ অনেকের মতো আমারও মননজাত অভিজ্ঞতার পরিধি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন অপার দাক্ষিণ্যে। তাঁর রচনাবলিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত আমি, আমার পক্ষে বলা অসম্ভব রবীন্দ্রনাথের কোন্ বিশেষ লেখা অভিভূত করেছিল আমাকে? রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম প্রধান নায়ক বিষ্ণু দে আমাদের সকলের হয়ে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এভাবে :

এ যেন বা জিজ্ঞাসা সূর্যের
কোন ক্ষণ ভালো লাগে সারাদিনে প্রহরে প্রহরে
কিংবা কবে কোন্ দিন ঋতুতে ঋতুতে বৎসরে
সূর্যের কি গান ভালো লেগেছিল প্রকাশ-উদ্যের
মধ্যাহ্নে উষার স্বচ্ছ বৈকালীতে সন্ধ্যায় করুণ ?

আমাদের চতুর্দিকে এত অসঙ্গতি, এত নৈরাশ্য যে জীবন নামক ব্যাপারটাকেই মনে হয় আগাগোড়া অর্থহীন। বিশেষ করে গ্রিক ট্রাজেডির নিয়তির মতোই অপ্রতিরোধ্য, অনিবার্য মৃত্যু আমাদের কানে জপায় এই অর্থহীনতার মন্ত্র। সেই তামসিক মুহূর্তে আমাদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায়, চতুর্দিকে হাতড়ে মরলেও কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না কোনো থাম। জীবনকে অপব্যয়ের খাতে বইয়ে দিয়ে নয় তাকে ভালবেসেই যে প্রাগুক্ত অর্থহীনতাকে জয় করা চলে, এই শিক্ষা রবীন্দ্রসাহিত্যেরই দান। তাঁর সূর্যোদয় সূর্যাস্তের দীর্ঘ আশি বছরের আলো আমাদের চিরদিন পথ দেখাবে জীবন-বিমুখতার প্রচণ্ড নৈরাজ্যে।

রবীন্দ্রনাথ একবার 'শান্তিনিকেতনে'র একটি ভাষণে তাঁর পিতৃদেব সম্পর্কে বলেছিলেন, 'প্রাচীন ভারতের তপোবনের ঋষিরা যেমন তাঁর গুরু ছিলেন, তেমনি পারস্যের

সৌন্দর্যকুঞ্জের বুলবুল হাফেজ তাঁর বন্ধু ছিলেন। তাঁর জীবনে আনন্দ–প্রভাতে উপনিষদের শ্লোকগুলি ছিল প্রভাতের আলোক এবং হাফেজের কবিতাগুলি ছিল প্রভাতের গান। হাফেজের কবিতার মধ্যে যিনি আপনার রসোচ্ছ্বাসের সাড়া পেতেন তিনি যে তাঁর জীবনেশ্বরকে কী রকম নিবিড় রসবেদনাপূর্ণ মাধুর্যঘন প্রেমের সঙ্গে অন্তরে বাহিরে দেখেছিলেন সেকথা অধিক করে বলাই বাহুল্য।' রবীন্দ্রনাথ–বিষয়ে অবহিত যে কোনো পাঠককে, আশা করি, বলে দিতে হবে না যে এই উক্তি তাঁর নিজের সম্পর্কেও প্রযোজ্য। তবে আমাদের পরম সৌভাগ্য, মহর্ষির ঔপনিষদ অধ্যাত্মবোধের পরিমণ্ডলেই সীমিত ছিল না তাঁর পুত্রের আনাগোনা। যদি তাই হত, তবে কি আমরা পেতাম রবীন্দ্রনাথের চিত্রশালার সেসব দুঃখ–দীর্ণ, ভীষণ–কবলিত মুখের মেলা? পেতাম কি কবিজীবনের গোধূলি–মুহূর্তের সেসব আশ্চর্য প্রশ্নশীল কবিতাবলি? আর এই কবিতাবলির কোনো কোনো পঙ্‌ক্তিতে শোনা যায় ক্যালিবানের পদধ্বনি। তাই প্রশ্ন জাগে, ঔপনিষদ অধ্যাত্মবোধের প্রশান্ত ভিতে কি ফাটল ধরেছিল রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনে? নইলে কেন তিনি লিখলেন তাঁর জীবনের সর্বশেষ কবিতায়—

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে,
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত,
তার তরে রাখ নি গোপন রাত্রি।

সে যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির ডালপালা এত বিভিন্ন দিকে বিস্তৃত যে তাঁকে কোনো গণ্ডিতেই বাঁধা চলে না। সবকিছু ছাপিয়ে তিনি জেগে থাকেন, যেমন কোলবিজের কবিতায় নিঃসীম সমুদ্রে সূর্য জেগে ওঠে "like God's own head" । কিন্তু এতৎসত্ত্বেও শিল্পীর অসন্তোষ থেকে নিস্তার পান নি তিনি এবং নিস্তার পান নি বলেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র রবীন্দ্রনাথ হতে পেরেছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্যভাণ্ডারে দীর্ঘ জীবনের অক্লান্ত সাধনা–লব্ধ, প্রতিভাভাস্বর অপরূপ বর্ণাঢ্য উপহার দিয়েও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনে হয়েছে যে তাঁর কাব্যপ্রয়াস প্রকৃতই সীমিত। এবং এই বোধ বিনয়ের ছদ্মবেশ হলে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি কখনো লিখতেন না—

আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।

এবং বাংলা কবিতার ভবিষ্যটির রূপটি তাঁর মনশ্চক্ষে উদ্‌ভাসিত হয়েছিল বলেই হয়তো উপনিষদ–পুষ্ট মানসের অধিকারী, দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাজ্ঞ কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন সম্পূর্ণ নিরভিমানে :

কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।

যেহেতু প্রগাঢ় জীবনবোধ ও শৈল্পিক অসন্তোষ তাঁর মজ্জায় মজ্জায় মিশে ছিল, তাই একটির পর একটি আশ্চর্য গ্রন্থের খেয়া বেয়ে তিনি চলে গেলেন অমরত্বের সুনন্দ লোকে। একদা রবীন্দ্রনাথের একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যেসব সামন্তরাজ বিদ্রোহের ধ্বজা

তুলেছিলেন তাঁরা সবিস্ময়ে দেখলেন যে, সেই সাম্রাজ্য ভাঙার কাজে স্বয়ং মহারাজই তাঁদের সর্বাপেক্ষা কর্মিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বী। সার্থকতার বহু স্বর্ণসিঁড়ি পেরিয়ে, আত্মতৃপ্তিতে মজে তিনি তো মনে করতে পারতেন যে, বাংলা কবিতায় যা-কিছু করণীয় তাই সম্পাদিত হয়েছে তাঁর নিজের অমিত প্রতিভাবলে; কিন্তু তা না করে তিনি চৈতন্যকে জাগ্রত রাখলেন সর্বক্ষণ, সূর্যাস্তের কালেও এগিয়ে গেলেন কাব্যের নতুন রাজ্য অধিকারের আশায়। আর এই আশা যে নিষ্ফল হয় নি তার নির্ভুল স্বাক্ষর রয়েছে রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের কবিতায়। এতদিন যাঁর কাব্য ছিল আশ্চর্য সালংকরা, মোহন অতিকথনে ভরপুর, তিনি রচনা করলেন নির্মেদ, মিতবাক্, নিরাভরণ কবিতাবলি। এ ধরনের কবিতা লিখে তিনি প্রমাণ করলেন যে মহৎ কবিকে অনেক দুর্দমনীয় লোভ জয় করতে হয়, নিতে হয় বড় রকমের ঝুঁকি। তিনি বিলক্ষণ জানতেন, কবিতার রাজ্যে নয়ন-ভোলানো কোনো খুঁটি পুঁতে বলা যায় না, এই-এখানেই শেষ সীমা। তাই জীবনের শেষ দিনটিতেও অসীম ধৈর্যে তিনি সেধে গেছেন সেই ক্ষমাহীন, খামখেয়ালি রমণীকে, কাব্যলক্ষ্মী যার নাম। কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পক্ষে 'রূপনারাণের কূলে', 'প্রথম দিনের সূর্য' ও 'দুঃখের আঁধার রাত্রি'র মতো কবিতা লেখা যে কতদূর নির্লোভ, দুঃসাহসিক কাজ তা' বোঝা শুধুমাত্র রৈবিক উপলব্ধিতেই সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "'আমি আমার পৌত্র হইতে ইচ্ছা করি।'—ভবিষ্যতে তাঁর চক্ষে এমন লোভনীয় বলিয়া ঠেকিয়াছিল। কিন্তু শতসহস্র লোক আছেন, তাঁহাদের উক্ত প্রশ্ন করিলে উত্তর করেন 'আমি আমার পিতামহ হইতে ইচ্ছা করি'।" রবীন্দ্র-মানস ছিল এই পৌত্র হওয়ার বাসনা-জাগর। এবং এই চৈতন্যের ফলেই তিনি তাঁর স্বকালে বঙ্গদেশের সবচেয়ে প্রাগ্রসর ব্যক্তিত্ব হিসেবে শ্রদ্ধা কুড়িয়েছেন সর্বত্র।

তিনি আমাদের এতভাবে ঋণী করেছেন যে, তাঁর সম্পর্কে পুনরুক্তিময় প্রিয়ভাষণ একান্ত অপরিহার্য। কিন্তু তা বলে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করা কিংবা তাঁর ধ্যানধারণার সঙ্গে একমত না হওয়ার অধিকার কারুর থাকবে না এ-কথা বলার উদ্দেশ্য আমার নয়। আমরা যারা বিশ্বসমর আর দুর্ভিক্ষের ঘর-পোড়া মানুষ, নানা রাজনৈতিক ডামাডোলে যারা নিয়ত দোদুল্যমান, আন্তর্জাতিক সংবর্তে দিশাহারা, অশুভের পদধ্বনি শুনে শুনে ক্লান্ত, আতঙ্কগ্রস্ত, তাদের মনোজগৎ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনোজগতের মধ্যে সেতুবন্ধন নিঃসন্দেহে দুঃসাধ্য। সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের নিখুঁত পরিক্রমা সেরেও আমরা বলতে বাধ্য, আমাদের মনোজগতের সব অভাব মেটাতে তিনি অক্ষম। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে সমালোচনা-মুখর হয়েও রবীন্দ্রসাহিত্য বর্জনের অপচেষ্টায় নয় রবীন্দ্রচর্চায় আমাদের অনলস হতে হবে নতুন করে, ব্যাপকভাবে। কেননা, এখনো এই দারুণ অস্বাস্থ্যের কালে আমাদের ক্ষীয়মাণ, রুগ্‌ণ মানসে স্বাস্থ্য-ফেরানো অপরিমেয় পথ যোগাতে পারে রবীন্দ্রচর্চা। তবে যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে এক পরাক্রান্ত বিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠা করেই ভাবেন যে দায়িত্ব চুকল, তাঁদের ক্রিয়াকাণ্ডে আমার সায় নেই আদৌ। যেহেতু আজো নাস্তিকতা আমার মজ্জায় মজ্জায় মিশ্রিত, তাই পূজামাত্রই আমার চক্ষুশূল। আমি মনে করি, রবীন্দ্র-পূজায় মেতে উঠলেই সেই মহাকবির প্রতি সম্মান দেখানো হয় না; বরং আমরা যদি রবীন্দ্র-সাহিত্য-পাঠে গভীর নিষ্ঠার পরিচয় দেই তবেই তিনি সম্মানিত হবেন এবং আমাদেরও মানস-শ্রী বৃদ্ধি পাবে উত্তরোত্তর। আর যাঁরা বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চায় ব্রতী তাঁদের পক্ষে রবীন্দ্রনাথ সেই অলৌকিক খনি, দারুণ আকালেও যার সম্পদ ফুরোয় না।

রবীন্দ্রসাহিত্য বর্জনের যে অশুভ প্রবণতা এখানকার এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে তার উল্লেখ করেছিলাম এই নিবন্ধের গোড়ার দিকে। জাতীয় সাহিত্যের

শ্রীবৃদ্ধির জন্যই নাকি রবীন্দ্রনাথকে বাতিল করা একান্ত জরুরি। দেশের সাহিত্য পুষ্প-বিকাশের সুরের মতোই আপন সুষমায় গড়ে উঠুক, এ আমাদের সকলেরই কাম্য। আমাদের সাহিত্যে অগ্রগতির মুখে রবীন্দ্রনাথ যে হঠাৎ কী করে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালেন তা অন্তত আমার বোধগম্য নয়। প্রসঙ্গত এখানে গ্যেটের একটি উক্তি স্মরণযোগ্য। সেই কবে তিনি তাঁর আশ্চর্য সংস্কারমুক্ত উদার মন নিয়ে ঘোষণা করেছিলেন, 'National literature is now rather an unmeaning term; the epoch of world literature is at hand and each one must try to hasten its approach.' অর্থাৎ, 'জাতীয় সাহিত্য এখন একটা অর্থহীন শব্দমাত্র; বিশ্ব সাহিত্যের যুগ আসন্ন-প্রায় এবং এই যুগের সূচনা ত্বরান্বিত করার জন্য প্রত্যেকেরই উদ্যোগী হওয়া উচিত।' এতকাল পরেও যদি জাতীয় সাহিত্যের দোহাই দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে প্রবল উপদ্রব মনে করি, বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে উজ্জ্বল শস্য-সম্ভার থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখি তবে সে ক্ষতি কার? আর যারই হোক না কেন, রবীন্দ্রনাথের নিশ্চয় নয়। দরজা-জানালা বন্ধ করে, সূর্যের মুখ না দেখলে রবি বিন্দুমাত্র অনুজ্জ্বল হবে না, অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে হন্দ হবে তিমিরবিলাসীরা। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ একাই বাংলা সাহিত্যের এক বিরাট ঐতিহ্যের স্থপতি। এবং ঐতিহ্য জামা-কাপড় নয় যে ইচ্ছে হলেই বাতিল করা চলে। সুতরাং রবীন্দ্রসাহিত্য বর্জনের পরিকল্পনায় যাঁরা সারাক্ষণ বাগাড়ম্বরে মেতে উঠেছেন তাঁরা যদি সেই অসাহিত্যিক কাজে লিপ্ত না হয়ে আন্তরিকভাবে খোলা মনে রবীন্দ্রচর্চায় মনোযোগী হন তবে মঙ্গলবুদ্ধির পরিচয় দেবেন, আশা করি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সপ্ততিবর্ষপূর্তি উপলক্ষে রবীন্দ্রজয়ন্তী-উৎসব-পরিষদের অভিনন্দনের যে উত্তর দেন তাঁদের সেটি স্মরণ করতে বলি :

> অনুকূলতা এবং প্রতিকূলতা শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষের মতোই, উভয়েরই যোগে রাত্রির পূর্ণ প্রকাশ। আমার জীবন নিষ্ঠুর বিরোধের প্রভূত দান হইতে বঞ্চিত হয় নাই। কিন্তু তাহাতে আমার সমগ্র পরিচয়ের ক্ষতি হয় না। বরঞ্চ তাহার যা শ্রেষ্ঠ যা সত্য তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। আমার জীবনেও যদি তাহা না ঘটিত, তবে অদ্যকার এইদিন সার্থক হইত না। আমার আঘাতপ্রাপ্ত শরবিদ্ধ খ্যাতির মধ্য দিয়া এই উৎসব আপনাকে প্রমাণ করিয়াছে। তাই আমার শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষেরই অতিথিকে প্রণাম করা আমার পক্ষে আজ সহজ হইল। যে ক্ষয়ের দ্বারা ক্ষতি হয় না, তাহাই বিধাতার মহৎ দান—দুঃখের দিনেও যেন তাহাকে চিনিতে পারি, শ্রদ্ধার সহিত যেন তাহাকে গ্রহণ করিতে বাধা না ঘটে।

আহমদ ছফা

রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতি-সাধনা

রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক জীবন-সাধনার প্রতি তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি ফেললে ক্রমশ মনে বিশ্বাস সঞ্চারিত হয় যে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত দূরের মানুষ। তাকে ধরি ধরি ছুঁই ছুঁই মনে করলেও তিনি সম্পূর্ণভাবে ধরাছোঁয়ার অতীতই থেকে যান। এবং একই কারণে দুর্বোধ্য না হলেও রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে হলে সাধনা, শ্রম, নিষ্ঠা এবং সর্বোপরি সময়ের প্রয়োজন অপরিহার্য।

রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠকমাত্রই অবগত আছেন যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় কড়া আলো কদাচিৎ ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সমধর্মী সূক্ষ্ম, মিহি, সর্বব্যাপ্ত ও সর্বভুক এক ধরনের চেতনায় পুষ্ট রবীন্দ্রনাথের সাংস্কৃতিক অবদান। তিনি যে যুগের চৌহদ্দিতে লালিত-পালিত সংবর্ধিত তার আগের কিংবা পরের যুগের বাংলা সাহিত্যে জীবনের শ্রেয়োবোধের সঙ্গে সৌন্দর্যচেতনার এমন সুনিবিড় মিলন কোথাও ঘটে নি। এ অসম্ভব একমাত্র রবীন্দ্রনাথের সাধনাতেই সম্ভব হয়েছে। তা-ই রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রধান গুণ। আবার প্রকারান্তরে দুর্বলতাও বটে।

এই শ্রেয়োবোধের সঙ্গে সৌন্দর্যচেতনার সহজ স্বাভাবিক মিলন রবীন্দ্রসাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম বৈশিষ্ট্য। তা তাঁকে দেশকালের গণ্ডি ছাড়িয়ে সর্বলোকের, সর্ব যুগের, সর্ব দেশের আপনার জন করে তুলেছে যেমন, তেমনি অন্যদিকে শিল্পের এই অতি গভীর প্রতীতি, অতি প্রসারিত জীবনদৃষ্টি তাঁর শিল্পকর্মের অনন্যতা কতকাংশে খর্ব করেছে। জীবনের সরু, মোটা, বঙ্কিম, তির্যক অনেকগুলো স্বাভাবিক জিজ্ঞাসা রবীন্দ্রমানস মথিত করে নি, সেজন্য তাঁর মানসিকতার বিকাশ ঘটেছে অনেকটা ঋতুবৈচিত্র্যের মতো প্রাকৃতিক নিয়মে। দুয়েকটা বিস্ফোরণ ছাড়া রবীন্দ্রমানসে কোনো বিপ্লব কিংবা ব্যাপক পরিবর্তন নেই। উদ্ভিদের সহনশীলতায় তিনি ক্রমাগত আলোর পানে এগিয়ে গেছেন। নদীর একনিষ্ঠ স্রোতের মতো একটি স্থির লক্ষ্যের পানে আমৃত্যু ধেয়ে চলেছে রবীন্দ্রনাথের চেতনা।

এ অন্তঃসলিলা ধারাস্রোতের সঙ্গে আরো নানা ধারার মিলন এর গতিতে দিয়েছে বেগ, কখনো বা এসেছে বন্যা। জল কূল ছাপিয়ে গেছে। সমগ্র বাংলাদেশ প্লাবিত হয়েছে। বিশ্বেও দিয়েছে দোলা। কিন্তু মৌল ধারাটি কোথাও রুদ্ধ কিংবা ব্যাহত হয় নি। এমনকি জীবনের অন্তিম ক্ষণেও সূর্যের প্রলম্বিত রশ্মিছটার মতো সুন্দরভাবে অন্তরের সত্য বোধটি কবিতার আকারে তাঁর মুখ থেকে একটি আলো লাগা শিশিরবিন্দুর মতো ঝরে পড়েছে।

আজীবন সুন্দরের সঙ্গে সত্যের সম্বন্ধ–প্রতিষ্ঠার দুর্মর প্রচেষ্টাই তো রবীন্দ্রনাথ। এ বিষয়ে তাঁর ঐকান্তিকতা ধর্মপ্রচারকের চাইতে কোনো অংশে কম ছিল না। অত্যন্ত সুকুমার, সংবেদনশীল, স্পর্শকাতর, শ্রদ্ধার ভারে আনত একখানা মন নিয়ে তিনি যেন প্রচারকের ভূমিকায় নেমেছিলেন। কিন্তু প্রচারকের লেবাস তিনি কখনো অঙ্গে ধারণ করেন নি। হৃদয়ের সত্যোপলব্ধি প্রকাশের জন্য কবিতা লিখেছেন। কবিতা লিখে তাঁর মনে হয়েছে যা বলতে চেয়েছেন, তার কিছুই বলা হল না। গল্প লিখেছেন তাই। তার পরেও মনে হয়েছে কালির আখরে সূক্ষ্ম রেখায় রেখায়িত অন্তরের সুবর্ণ তরঙ্গমালা যেমনভাবে উচিত তেমনিভাবে বেঁধে রাখতে পারেন নি। তারপরে লিখেছেন নাটক, হয়তো প্রবন্ধ। এতগুলো মাধ্যমের মারফত নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার পরেও তৃপ্তি আসে নি। শরণ নিতে হয়েছে সঙ্গীতের। সঙ্গীতের দ্রাক্ষাকুঞ্জের মর্মরিত বিবাগী বাউল বাতাসে সমস্ত অন্তরখানা মেলে ধরেও মনে হয়েছে অস্তিত্বের গোপন গহন অন্তঃপুরে আরো সৃষ্টির বীজ বুঝি রয়ে গেল; অন্তরের গভীরে যেখানে চাপ চাপ আঁধারের নিশুতি, যেখানে মানুষ নিজের অজান্তে আদিমতার ছাপ বয়ে বেড়ায়, সেখানেও পৌঁছেছে সৌন্দর্যের 'গন্ধহীন চামেলীর লাবণ্য বিলাসের' আহবান। সত্যের শুভ্রস্বরূপ লতায়িত জলের মতো চেতনার গভীরতম স্তরকেও করেছে রঞ্জিত। সেজন্য তিনি শুধুমাত্র অলঙ্কার আর আলোর প্রতিমা নির্মাণ করে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। রং, রেখা আর তুলির সাহায্যে আপন হৃদয়ের প্রতিরূপ নির্মাণের জন্য তাঁকে আসতে হয়েছিল চিত্রকলার বর্ণিল জগতে।

সৌন্দর্যের আহিতাগ্নিতে এই যে নিঃশেষে তিলে তিলে আত্মবলিদান এবং তার যে ফল—তা কবিতা হোক, গল্প হোক, নাটক হোক, পত্র–সাহিত্য হোক, চিত্রকলা হোক, ভাষণ কিংবা ভ্রমণবৃত্তান্ত অথবা প্রবন্ধ, প্রার্থনা, সমালোচনা, বাদ, প্রতিবাদ যাই হোক না তাকেই বলব রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতি।

যা কিছু মানুষের মনের ওপর ভারস্বরূপ হয়ে স্বাভাবিক বিকাশের পথ রোধ করে দাঁড়ায়, সেই জড়ের ওপর প্রাণের বিজয়–ঘোষণাই হল রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতি–সাধনার মূলমন্ত্র। জীবনের ভোগে উপভোগে নিষ্প্রাণ জড়কে পোষ মানানোই হল সত্যিকার বীরের চারিত্র্য–ধর্ম। মানবিক আশা কল্পিত এবং নৈতিক শ্রেয়োবোধে মণ্ডিত, নগ্ন মনুষ্যত্বই প্রকৃত জীবনশিল্পীর অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র। কবি শেলী তাঁর *Revolt of Islam* কাব্যের ভূমিকায় কথাটিকে আরো সহজ, আরো প্রাঞ্জলভাবে বলেছেন, 'Still love is the only one thing, which shall guide the moral world of human being.'

জীবনের আশ্বাসের মতো বিভিন্নভাবে সহস্র ধারায় ঘটেছে তাঁর নিঃসরণ। সত্যের স্থির অকম্পিত শিখাকে বুকে ধারণ করেছিলেন যিনি, সৌন্দর্যের স্পর্শমাত্রেই যিনি আন্দোলিত হয়েছেন, মানুষের পাপ, লোভ, রিরংসাকে হত্যা করার জন্য, অন্তরস্থিত সত্যের পাষাণে সৌন্দর্যের তলোয়ার শানিয়েছিলেন যিনি, সে রবীন্দ্রনাথের সাধনা সম্যক উপলব্ধি করতে হলে মূল উৎসের থেকে দূরে গিয়ে বিচার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

বহু দেশের চিত্তসম্পদ আত্মস্থ করলেও রবীন্দ্র–মানসের মর্মমূলে ভারতীয় জীবনবোধই ছিল সব সময়ে জীবন্ত। আর্য ঋষির চেতনায় তাঁর মানসপট সিঞ্চিত ছিল। সুখী পরিবারের সুস্থ পরিবেশে প্রাচীন সংস্কৃতির চর্চা তাঁর শিশুমনের সমস্ত আয়তন জুড়ে যে অনপনেয় রঙ্গিলা ছাপ ফেলেছিল, কোনোদিন তার রঙছুট হয় নি। অতৃপ্ত শিশুর সঞ্চরণশীল চেতনায় প্রাচীন ঋষির বাণী ঋষিপ্রতিম পিতৃদেবের মৌন সংযত স্নেহঘন ছোঁয়ার শিহরণ অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যের শাখা এবং সবল কাণ্ডজ্ঞানের অঙ্কুর জাগিয়ে তুলেছিল। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে দুটি বোধ ঘনিষ্ঠ হতে ঘনিষ্ঠতর হয়ে সোনার সঙ্গে সোহাগার মতো মিশে গেছে।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবার, পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রাজা রামমোহন রায়-প্রচারিত ব্রাহ্মধর্মে মহর্ষির আত্যন্তিক অনুরক্তির কথা স্মরণে না রেখে রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোচনা করলে তা একপেশে হতে বাধ্য।

কবির অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর আত্মজীবনীতে লিখেছেন :

> হে ধ্রুবসত্য সনাতন! কাল সহকারে কত বিষয়ের কত প্রকারে পরিবর্তন হইতেছে, কিন্তু তোমার কারুণ্য-স্বরূপে কদাচ পরিবর্তন নাই। নদীর প্রবাহ পরিবর্তিত হইতেছে, রাজ্য ও রাজা বিনষ্ট হইতেছে, মাস ও পক্ষের অতীত হইতেছে, শীত ও বসন্ত গমনাগমন করিতেছে, বাল্য ও যৌবন তড়িৎ সমান তিরোহিত হইতেছে, কাল ও মৃত্যু নিরন্তর ক্রীড়া করিয়া চরাচর শাসন করিতেছে কিন্তু তোমার কারুণ্য-স্বরূপের কোনো পরিবর্তন নাই।

বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথেরা প্রার্থনায় এই মন্ত্র উচ্চারণ করতেন। কবি-পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উপাসনার মন্ত্রকেই দৈনন্দিন জীবনচর্চার একমাত্র নিয়ামক হিসাবে কঠিন কঠোর আত্মবিশ্বাসে গ্রহণ করেছিলেন। ফার্সি সাহিত্যের রসিক পাঠক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজা রামমোহন রায়ের প্রচারিত ব্রাহ্মধর্মকে বেদ কিংবা বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠা করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে বিফল হয়ে মানুষের 'হৃদয় মন্দিরে' প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মধর্মকে হৃদয়ে ধারণ করার উপযোগী নির্ভার করার জন্য তাঁর সমগ্র জীবনের ত্যাগ তিতিক্ষা তাঁকে পরবর্তী সময়ে মহর্ষিতে রূপান্তরিত করেছিল।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথের উপর তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব এত ব্যাপক, এত সুগভীর যে দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী-পাঠকের মনে হবে 'গীতাঞ্জলি', 'নৈবেদ্য', 'গীতিমাল্য', 'গীতালি' ইত্যাদি আত্মনিবেদনমূলক কাব্যগুচ্ছে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার মুখের কথাই শুধু ছন্দোবদ্ধ আকারে প্রকাশ করেছেন। অনেকগুলো গানের বেলাতেও এই একই কথা খাটে। এ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের প্রায় রচনাতেই সৌন্দর্যের বসনে ভূষিত সত্যবোধের যে 'কারুণ্য-স্বরূপ'কে আপন মহিমায় স্থিত দেখি তা-ও মহর্ষিরই পরমারাধ্য সত্যের প্রতিরূপ যেন। রবীন্দ্র-মানসের যে কঠিন ফ্রেম, যার ওপর প্রবল একটি আলোকিত কণার মতো রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিচেতনা সমুজ্জ্বল বিশ্বাসে আমৃত্যু উড্ডীন ছিল ঠাকুরবাড়ির কারখানাতেই তার সৃষ্টি আর দেবেন্দ্রনাথ তার জাদুকর কারিগর।

নিঃসঙ্গ বালকের মনে অনন্তের তৃষ্ণার বীজরূপী উপনিষদের বোধ কোমল চিত্তবৃত্তির সঙ্গে তরল সঞ্জীবনী সুধার মতো মিশে গিয়েছে। অস্তিত্বের সঙ্গে বিলীন হওয়ায় সুপ্রাচীন ফসিলীভূত প্রাণের ললিত বাণী সহস্র শিখায় জ্বালিয়ে তোলার জন্য প্রয়োজন ছিল আরো অনেক কিছুর।

আপন পরিবারেই তিনি ভারতীয় সাধনার বিভিন্ন ধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। বেদ, উপনিষদ, গীতার সারসত্য যেমন একদিকে তেমনি অন্যদিকে হাফিজ, খৈয়াম প্রমুখ ইরানি সাধকের সাধনার রাঙা স্রোতের ধারাও শৈশবে রঞ্জিত করেছে তাঁর চিত্ততল। প্রাচীন ভারতের মহিমামণ্ডিত প্রতিভা বাল্মীকি, কালিদাস, বেদব্যাস, ভবভূতির সংস্কৃত কাব্য তিনি আগ্রহ সহকারে পড়েন নি শুধু, কাব্যবিধৃত মতকেও বালকের সচঞ্চল অনুভূতি দিয়ে আপনার করে নিয়েছিলেন। হাজার হাজার বছরের তমসা বিদীর্ণ করে রবীন্দ্রনাথের কল্পনা প্রাচীন ভারতের দেবদেউল, তুষারমণ্ডিত শৈলশিখর, বেত্রবতী, শিপ্রা, শ্রাবস্তী, উজ্জয়িনী, প্রশান্ত তপোবন, সুকুমার ঋষিকুমার, নিবিড় অরণ্যানী, মহানুভব রাজন্যসকলকে চিনে নিয়েছিল। সে যে কত গভীর চেনা, কত নিবিড় আত্মীয়তা রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠক তার মর্মোপলব্ধি করেছেন।

শুধু সংস্কৃত কেন প্রাচীন–মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রাণ–প্রবাহের স্পন্দন তাঁর চেতনায় এক অপরূপভাবে তরঙ্গিত হয়েছে। 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'তে মেলে তার কিঞ্চিৎ পরিচয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইউরোপীয় সংস্কৃতির অভিঘাতে রামমোহন–মনীষার আশ্রয়ে বাংলা সাহিত্যের যে নব অঙ্কুরোদগম—বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিহারীলাল প্রমুখ সাহিত্য–সাধকের সঞ্চারিত প্রাণাবেগে যার সমৃদ্ধি একটু একটু করে প্রায় তার সবটুকু প্রাণসম্পদ তিনি আত্মসাৎ করেছিলেন। সুদক্ষ অস্ত্র–চিকিৎসকের মতো ভারজীর্ণ অংশ কেটে ফেলে পূর্বসূরি সাহিত্য–সাধকের প্রাণকণা সূর্যশিখার উপকরণস্বরূপ সঞ্চয় করছিলেন।

এতে শেষ নয়, পূর্বপুরুষের জীবনসংগ্রাম, রাষ্ট্রবিপ্লব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা নিরুপদ্রব শান্ত–স্নিগ্ধ জীবনে কেঁপে ওঠা প্রাণের রসময় প্রবাহ—যা উত্তরপুরুষের মুখে মুখে বাড়ির পাশের ছোট্ট নদীটির মতো তিরতিরানো ধারায় বয়ে গেছে। সমগ্র বাংলাদেশের সে লোকায়ত সংস্কৃতিকেও তিনি কোল দিয়েছিলেন, হজম করেছিলেন তার মর্মমধু।

রবীন্দ্রসাহিত্যে রামায়ণের ভারতবোধ, মহাভারতের গাম্ভীর্য, কালিদাসের উপমা–অলঙ্কার, বৈষ্ণব কবির ললিত গানের বাণী, ইরানের রসসিক্ত প্রাণের পেলবতা, লোকসংস্কৃতির সাদামাটা চেতনা, ভারতচন্দ্রের নিপুণতা এবং অগ্রজ কবিদের কোনো পঙ্‌ক্তি, কোনো পদ, কোনো শব্দের অবিকৃত অথবা ঈষৎ ভিন্ন প্রয়োগ দেখে বোঝা যায়, তিনি স্বদেশী অতীতের মানসফসল কী গভীর আন্তরিকতায় বুকে তুলে নিয়েছিলেন, কী মমতায় 'অন্তরের সহস্র ব্যগ্রবাহু মেলে' দেশের ঐতিহ্যকে আলিঙ্গন করেছিলেন।

ইউরোপ প্রবাসকালে অল্পবয়স্ক বালক কী প্রচণ্ড অনুসন্ধিৎসা নিয়েই না ইউরোপকে দেখেছিলেন ! মনে ইউরোপকী তীক্ষ্ণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল! 'য়ুরোপ–প্রবাসীর পত্রে' আমরা এমন একজন তরুণকে দেখি যাঁর দৃষ্টি কড়া আলোকের বহ্ন্যুৎসবের তলায় নিশ্ছিদ্র, নিরন্ধ্র, ঘনায়মান অন্ধকারকে স্পর্শ করেছে। এমন একটি মনের অনুরণন আমাদের কানে এসে বাজে—যেমন হাসির ফোয়ারার অন্তরালবর্তী কীটদষ্ট মনের ভাঁজে থমকে থাকা করুণ ক্রন্দনের সন্ধান পেয়েছে।

ইউরোপের অহমিকা তাঁকে আহত করেছে, কিন্তু গরিমা মুগ্ধ করেছে। শেক্সপিয়রের জ্ঞানবোপলব্ধি, মিল্টনের কল্প সাঁতার, শেলীর মুক্ত প্রমিথিউস, বায়রনের উদ্দামতা, কীট্‌সের তন্ময়তা, ব্রাউনিংয়ের অধ্যাত্মোপলব্ধি, রাসকিনের প্রগাঢ়তা, টলস্টয়ের ব্যাপ্তি এবং ফরাসি সাহিত্যিকদের বাক্‌বৈদগ্ধ তাঁকে স্বাভাবিকভাবেই আকর্ষণ করেছে। তা ছাড়া আরো নানা জনের স্পর্শ প্রাণে এসে অবশ্যই লেগেছে। তবে তিনি ইউরোপের মধ্যযুগের সাধকদের মধ্যেই সমমর্মিতা খুঁজে পেয়েছিলেন বেশি।

রেনেসাঁস–প্রভাবিত পশ্চিম ইউরোপের চিন্তন এবং মনন–পদ্ধতি তিনি সম্পূর্ণভাবে না হলেও আংশিক গ্রহণ করেছিলেন। ইউরোপের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, যুক্তিপ্রেম, নরনারীর সমানাধিকার তাঁর ওপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার ফলেই তিনি সামন্ততন্ত্রের খোলস ভেঙে ব্যক্তিচিন্তার মুক্তি ঘোষণা করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই রেনেসাঁস–চেতনার সঙ্গে ভারতবোধের সমন্বয়ে রবীন্দ্রনাথের 'পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্বে'র আদর্শ সমুজ্জ্বলভাবে দল মেলেছে।

সদাজাগ্রত মন দিয়ে পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যিনি বিশ্বসংস্কৃতির মধুভাণ্ডার থেকে এত দান গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর দানের পরিমাণও যে সেখানে বিপুল হবে তাতে অবাক হবার কী বা আছে।

ইতিহাসের এক যুগসন্ধিকালে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। সাম্রাজ্যবাদের প্রসার এবং তার ফলে শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের মধ্যে মরণপণ সংগ্রাম, পরাধীন দেশসমূহের স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং তদুপরি পরপর দুটি রক্তক্ষয়ী বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে প্রবলের লোভ প্রতিহিংসাকে তিনি জ্বলন্তভাবে দেখতে পেয়েছেন। পরাধীন ভারতের 'বঞ্চিতের' 'চিত্তক্ষোভ' তাঁর বুকে অতি শৈশবেই বেজেছিল।

তারপর যতই বয়স বেড়েছে দেশপ্রেম মনে আরো প্রগাঢ়ভাবে ঘনীভূত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেম 'নিকষিত হেম' যেন। দেশের প্রতি অন্ধ না হয়ে সত্তার আলোময় স্বরূপ দিয়ে দেশের মাটিকে এমনভাবে কেউ কোনো দেশে ভালোবেসেছেন কি না আমাদের জানা নেই। যাঁদের শতাব্দীব্যাপী দুঃখ-দুর্দশা তিনি চোখে দেখেছেন, কানে শুনেছেন, ইতিহাসে পড়েছেন, তাদেরকে হিংসার দিকে নয়—শান্তির ললিত উদার দিগন্তের পানে আপন বাণীর মন্ত্রশক্তিতে আকর্ষণ করার জন্য সে কি অনিদ্র প্রচেষ্টা! আপন দেশের হতভাগ্যের সঙ্গে তুলনা করে তিনি বিশ্বের হতভাগ্য দেশসমূহকে ভালোবেসেছেন। ফ্যাসিবাদ-বিরোধী ভূমিকায় নেমেছেন, 'নাইট' খেতাব পরিত্যাগ করেছেন, শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং আরো কত গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। বিচিত্র কর্মধারার মধ্যে তিনি সর্বপ্রকারের আত্মশ্লাঘা জলাঞ্জলি দিয়ে সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের প্রতীক হিসেবে ফুটে উঠেছিলেন। সেজন্য দেখি বৃদ্ধ বয়সের জড়তাকে উপেক্ষা করেও 'ব্রাত্য জাতহারা' রবীন্দ্রনাথ সর্বহারাদের রাষ্ট্র সোভিয়েত দেশ দর্শন করতে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ভাষা নদীর স্রোতের মতো, কেউ তাতে নিজের নাম লিখে রাখতে পারে না।' কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় নিজের নাম লিখে রেখেছেন। ভাষার মতো সংস্কৃতিকেও দেশ-সীমা কালসীমার মধ্যে বেঁধে রাখতে পারে না—অদল বদল রূপান্তরের মাধ্যমে ধাবমান হরিণীর মতো দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায়। কালের বিবর্তনে জীর্ণ অংশ ঝরে যায়, নূতন প্রাণের স্পন্দনে নবাঙ্কুর গজায়। রবীন্দ্রনাথ অতীত বর্তমানের বিশ্বসংস্কৃতির স্রোতে অবগাহন করে তার প্রাণের শিখা ছেঁকে পরিশ্রুতভাবে প্রকাশ করেছেন। আপন বাণীর মতো করে জীবন রচনা করেছেন। বিশ্বাভিসারী প্রাণের উদার আকুতি কর্মের পাষাণ-গলা স্রোতে ভাষায়িত করেছেন।

আমাদের আনন্দ—আমাদের গৌরব তার প্রকাশ বাংলা ভাষায়। রবীন্দ্রনাথের কাছে মানুষ হওয়ার প্রেরণা আমরা পাই। নিত্যকালের মানব মহাপৃথিবীর স্বাপ্নিক কবিকে কিশোর কবি সুকান্তের ভাষায় স্মরণ করবে :

এখনো প্রাণের স্তরে স্তরে—
তোমার দানের মাটি সোনার ফসল তুলে ধরে।

রফিকুল ইসলাম

রবীন্দ্রনাথ ও পূর্ব পাকিস্তান

উত্তর, পূর্ব আর দক্ষিণ বঙ্গ, এই তিন ভূখণ্ড নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তানের উত্তর অংশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ ছিল সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। উত্তর বাংলার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ের সুযোগ ঘটে জমিদারিসূত্রে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথকে জমিদারির 'কাজের ডোরে' বাঁধবার চেষ্টা করেন, ফলে রবীন্দ্রনাথকে দু-এক মাস করে জমিদারিতে গিয়ে বাস করতে হয়। সম্ভবত ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ-জীবন যাপন শুরু হয়। সমসাময়িক একটি পত্রে তিনি লিখেছেন,

> শিলাইদহের অপর পারে একটা চরের সামনে আমাদের বোট লাগানো আছে। প্রকাণ্ড চর — ধূ ধূ করচে—কোথাও শেষ দেখা যায় না...। গ্রাম নেই, লোক নেই, তরু নেই, তৃণ নেই— বৈচিত্র্যের মধ্যে জায়গায় জায়গায় ফাটলধরা ভিজে কালো মাটি, জায়গায় জায়গায় শুক্‌নো সাদা বালি ...। এমনতর desolation কোথাও দেখা যায় না।... পৃথিবী যে বাস্তবিক কী আশ্চর্য সুন্দরী তা কলকাতায় থাক্‌লে ভুলে যেতে হয়।

শিলাইদহের অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে নতুন বটে। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তিনি পাবনার সাজাদপুরে আগমন করেন। কয়েক মাস পর, ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে তিনি আবার শিলাইদহ ফিরে আসেন। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের ৩রা জুন তারিখে প্রথম চৌধুরীকে লিখিত একটি পত্র থেকে জানা যায় যে, শিলাইদহে বসে রবীন্দ্রনাথ জার্মান ভাষায় মহাকবি গ্যেটের মূল 'ফাউস্ট' অধ্যয়ন করছিলেন। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ বর্ষাকালটা নদীতে নদীতে ও সাজাদপুরের কুঠির সামনে নৌকায় কাটিয়ে দেন। এ নদীপথের ও গ্রাম্য সমাজের বহু দৃশ্য ও ঘটনা 'দেনাপাওনা', 'গিন্নী', 'পোষ্টমাস্টার', 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি', 'ব্যবধান' এবং 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' গল্পগুলোর উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ বছরই হেমন্তকালে রবীন্দ্রনাথ নৌকায় শিলাইদহের ঘাটে এসে পৌছান। শিলাইদহ থেকে তিনি ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ১লা অক্টোবর তারিখে লিখেছিলেন,

> পৃথিবী যে কি আশ্চর্য সুন্দরী এবং কী প্রশস্ত প্রাণ এবং গভীরভাবে পরিপূর্ণ তা এইখানে না এলে মনে পড়ে না। যখন সন্ধেবেলা বোটের উপর চুপ করে বসে থাকি, জল স্তব্ধ থাকে, তীর আবছায়া হয়ে আসে, এবং আকাশের প্রান্তে সূর্যাস্তের দীপ্তি ক্রমে ক্রমে ম্লান হয়ে যায়, তখন আমার সর্বাঙ্গে এবং সমস্ত মনের উপর নিস্তব্ধ নতনেত্র প্রকৃতির কী-একটা বৃহৎ উদার বাক্যহীন স্পর্শ অনুভব করি। কী শান্তি, কী স্নেহ, কী মহত্ত্ব, কী অসীম করুণাপূর্ণ বিষাদ।

জমিদারির কাজেই রবীন্দ্রনাথ বারবার শিলাইদহে ফিরে আসেন। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে তিনি বিরাহিমপুরের সেরেস্তায় ঐ পরগনার নীলকরদের ইজারাধীন আমলের কাগজপত্রের বিশৃঙ্খলা দূর করতে শিলাইদহে ব্যস্ত ছিলেন। ঐ বছরের শরতে তিনি গান লিখলেন "ক্ষ্যাপা শ্রাবণ ছুটে এলো আশ্বিনেরই আঙ্গিনায়"। 'মানসী' কাব্যগুচ্ছ রচনা সমাপ্ত করার পনের মাস পর শিলাইদহে বসে ফাল্গুন মাসে রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেন 'গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা'—তাঁর বিখ্যাত 'সোনার তরী' কবিতা। 'সোনার তরী' কবিতাটি ১২৯৮ সালের ফাল্গুন মাসে লিখিত হলেও, এ কাব্যের যে চিত্র তা হল শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন দিনের। কবি ঐ সম্পর্কে লিখেছেন : 'যে দিন বর্ষার অপরাহ্ণে খরস্রোত পদ্মার উপর দিয়ে কাঁচা ধানে ডিঙিনৌকা বোঝাই করে মগ্নপ্রায় চর থেকে চাষীরা এপারে চলে আসছে—সেই দিনেই সোনার তরী কাব্যের সঞ্চার হয়েছিল মনে ...।' রবীন্দ্রনাথের 'শৈশবসন্ধ্যা' কবিতা এবং 'কঙ্কাল' গল্পটির জন্মও শিলাইদহে।

১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মকালটা তিনি উত্তরবঙ্গে অতিবাহিত করেন। জমিদারি কার্য-উপলক্ষে পদ্মায় জীবনযাপন রবীন্দ্রনাথের জন্যে কবিতা রচনা ও কাব্যসম্ভোগের জীবনও বটে। শুধু কাব্য কেন, রবীন্দ্রনাথ এ সময়ে যে ছোটগল্পগুলো রচনা করেন তাতেও পদ্মা ছায়া ফেলেছে। 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পটি পদ্মার রাক্ষুসে ছবি দিয়ে আরম্ভ যদিও তার পরিসমাপ্তি মানুষের ব্যর্থ জীবনের হাহাকারে।

১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের শেষদিকে রবীন্দ্রনাথ রাজশাহী এবং নাটোরে কিছুদিন অতিবাহিত করেন। রবীন্দ্রনাথের বন্ধু লোকেন পালিত তখন রাজশাহীর জেলাকর্তা; রবীন্দ্রনাথ তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেন, তাঁর সঙ্গে সাহিত্যিক প্রথম চৌধুরীও ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ রাজশাহীতে ছিলেন পনের দিন, রাজশাহী থেকে তিনি নাটোর গমন করেন মহারাজা জগদিন্দ্রনারায়ণের অতিথি হয়ে। রাজশাহীতে তিনি 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধটি রচনা ও পাঠ করেন। এ প্রবন্ধে বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের সমর্থন ছিল। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনারায়ণের আমন্ত্রণে রাজশাহী থেকে রবীন্দ্রনাথ যখন নাটোর যাচ্ছিলেন তখন তিনি রাজশাহী–নাটোরের পথের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন। ইন্দিরা দেবীকে লিখিত একটি পত্রে এ পথের সৌন্দর্যের প্রশংসা রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ নাটোর থেকে শিলাইদহ প্রত্যাবর্তন করার পর তাঁর বিখ্যাত কবিতা "মানসসুন্দরী" সৃষ্টি করেন ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে। কবিতাটি শিলাইদহের বোটে বসে লিখিত। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় রাজশাহী গমন করেন, কলকাতা থেকে 'মিনো' স্টিমারে করে রাজশাহী যাবার পথে 'দুর্বোধ' কবিতাটি লেখা। রাজশাহীতে এ সময় দুটি বিখ্যাত কবিতা 'ঝুলন' এবং 'সমুদ্রের প্রতি' রচিত হয়।

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ থেকে পুনরায় রাজশাহী যান। শিলাইদহ থেকে ঐ সময় লেখা একটি পত্রে তিনি বলেন :

> বাস্তবিক, পদ্মাকে আমি বড়ো ভালবাসি।...আমি যখন শিলাইদহে বোটে থাকি, তখন পদ্মা আমার পক্ষে সত্যিকার একটি স্বতন্ত্র মানুষের মতো।...
>
> আমি বিকেলে... চরের উপর নদীর ধারে ঘণ্টাখানেক বেড়াই, তারপর আমাদের পুরোনো জলিবোটটাকে নদীর মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে তার উপরে বিছানাটি পেতে ঠাণ্ডা হাওয়ায় সন্ধ্যার অন্ধকারে চিৎ হয়ে চুপচাপ পড়ে থাকি।... আমি প্রায় রোজই মনে করি, এই তারাময় আকাশের নীচে আবার কি কখনো জন্মগ্রহণ করব?

এ বছর বর্ষায় রবীন্দ্রনাথ নদীপথে ঘুরে বেড়ান এবং আষাঢ় মাসেই পাঁচটি কবিতা লিখে ফেলেন, "হৃদয় যমুনা", "ব্যর্থযৌবন", "ভরা বাদরে", "প্রত্যাখ্যান" ও "লজ্জা"। শ্রাবণ মাসটাও তিনি উত্তর বঙ্গে নদীবক্ষে কাটিয়ে দেন। প্রায় দু-বছর কালের অধিকাংশ সময়ই তিনি শিলাইদহ, সাজাদপুর, রাজশাহী এবং ঐসব অঞ্চলের নদীবক্ষে অতিবাহিত করেন। এ সময়ের মধ্যে রচিত কবিতাগুলিই 'সোনার তরী' গ্রন্থে সংকলিত। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

> আমি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা মানি নি, কতবার সমস্ত বৎসর ধরে পদ্মার আতিথ্য নিয়েছি—বৈশাখের খররৌদ্রতাপে, শ্রাবণের মুষলধারা বর্ষণে। পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্যামশ্রী, এপারে ছিল বালুচরের পাণ্ডুবর্ণ জনহীনতা, মাঝখানে পদ্মার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দ্যুলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানা বর্ণের আলোছায়ার তুলি।...এই সময়কার কাব্যের ফসল ভরা হয়েছিল 'সোনার তরী'তে।

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে রবীন্দ্রনাথ পতিসর আগমন করেন, এখানে বসে তিনি "সন্ধ্যা" কবিতাটি রচনা করেছিলেন। নদীপথেই রবীন্দ্রনাথ আবার রাজশাহী পৌঁছোন, সেখানে বসে তিনি লিখলেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা "এবার ফিরাও মোরে"। এ বছর বসন্তকালটা তিনি উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে পতিসরে অতিবাহিত করেন। পতিসর থেকে ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ১৯ ও ২৭শে ফেব্রুয়ারি এবং ১৯, ২২, ২৫, ২৮ ও ৩০শে মার্চ তারিখে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রগুচ্ছে মানুষ ও শিল্পী রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ পরিচয় ধরা পড়ে। এ বছর বর্ষকালটাও তিনি শিলাইদহে অতিবাহিত করেন। তাঁর বিখ্যাত গল্প "মেঘ ও রৌদ্র" এ সময়ে শিলাইদহে বসে লেখা। তিনি শরৎকালে গেলেন সাজাদপুরের কুঠিতে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "অনেক কাল বোটের মধ্যে বাস করে হঠাৎ সাজাদপুরের বাড়ীতে এসে উত্তীর্ণ হলে বড়ো ভালো লাগে।" এ সময় তিনি ছড়া সম্পর্কে লিখতে শুরু করেন, যে প্রবন্ধটি "মেয়েলি ছড়া" নামে প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ পুনরায় রাজশাহী সফর করেন এই শরৎকালে।

১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দেও বর্ষাকালে রবীন্দ্রনাথকে উত্তর বঙ্গে ফিরে আসতে দেখি। এ বছর জুন মাসের শেষের দিকে তিনি সাজাদপুরে বসে তাঁর বিখ্যাত গল্প "ক্ষুধিত পাষাণ" রচনা করেন। সাজাদপুরে এ সময়ে তিনি "শীতে ও বসন্তে" কবিতাটি লেখেন। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে কবি নৌকাযোগে পুনরায় পতিসর যান। এমনি সন্ধ্যায় নাগর নদীর ঘাটে পতিসরে নৌকায় রবীন্দ্রনাথ লিখলেন "পূর্ণিমা" আর তার দু-দিন পর "চিত্রা", যে কবিতাটি 'চিত্রা' কাব্যের ভূমিকারূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এ সময়ে রচিত "আবেদন", "উর্বশী" ও "স্বর্গ হইতে বিদায়" কবিতাত্রয়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এই ধরিত্রীর, এই পৃথিবীর প্রেম আর সৌন্দর্যের প্রতি তাঁর যে নিবিড় আকুলতা, তার পরিচয় দান করেছেন। 'সোনার তরী'র মতো 'চিত্রা'ও রবীন্দ্রনাথের উত্তরবঙ্গ জীবনের ফল।

১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে গ্রীষ্মকালে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় পতিসর আগমন করেন এবং নৌকাতে দিন যাপন করেন। এবারের পতিসর বাসের ফল 'চৈতালি'। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

> পতিসরের নাগর নদী নিতান্তই গ্রাম্য। অল্প তার পরিসর, মন্থর তার স্রোত। তার এক তীরে দরিদ্র লোকালয়, গোয়ালঘর, ধানের মরাই, বিচালির স্তূপ; অন্য তীরে বিস্তীর্ণ ফসলকাটা শস্যক্ষেত্র ধূ ধূ করছে।... দুঃসহ গরম। মন দিয়ে বই পড়বার মতো অবস্থা নয়। বোটের

জানালা বন্ধ করে খড়খড়ি খুলে সেই ফাঁকে দেখছি বাইরের দিকে চেয়ে। মনটা আছে ক্যামেরার চোখ নিয়ে, ছোটো ছোটো ছবির ছায়া ছাপ দিচ্ছে অন্তরে। অল্প পরিধির মধ্যে দেখছি বলেই এত স্পষ্ট করে দেখছি। সেই স্পষ্ট দেখার স্মৃতিকে ভরে রাখছিলুম নিরলংকৃত ভাষায়। অলংকার প্রয়োগের চেষ্টা জাগে মনে যখন প্রত্যক্ষবোধের সুষ্ঠুতা সম্বন্ধে সংশয় থাকে। যেটা দেখছি মন যখন বলে, এটাই যথেষ্ট, তখন তার উপরে রঙ লাগাবার ইচ্ছাই থাকে না। চৈতালির ভাষা এত সহজ হয়েছে এই জন্যেই।

বস্তুত 'সোনার তরী' এবং 'চিত্রা' কাব্যের মতো 'চৈতালি' কাব্যও আমরা পেয়েছি রবীন্দ্রনাথের উত্তরবঙ্গ–জীবনযাপনের ফলস্বরূপ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন প্রায় আশি বৎসরের বৃদ্ধ তখন তিনি তাঁর বিরাট জমিদারি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। এতদিন ঠাকুরবাড়ি জমিদারির তদারকের ভার ছিল রবীন্দ্রনাথের উপর। বিষয় বণ্টনের ফলে সাজাদপুরের জমিদারি মহর্ষির ভ্রাতুষ্পুত্র গগনেন্দ্রনাথের ভাগে পড়ে। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের বর্ষাকালে রবীন্দ্রনাথ সাজাদপুরে আসেন জমিদারি–সংক্রান্ত কাজের বন্দোবস্ত করে দেওয়ার জন্যে। সাজাদপুরের সঙ্গে কবির মনের একটা গভীর সম্পর্ক ছিল, ফলে স্বভাবতই সাজাদপুরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক চুকে যাওয়ার মুহূর্তে তাঁর মন অশান্ত ও বিক্ষুব্ধ ছিল। এই পরিবেশে সাজাদপুরে বসে রবীন্দ্রনাথ তাঁর "যাত্রী" কবিতাটি রচনা করেন।

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে রবীন্দ্রনাথকে শিলাইদহে বোটে অবস্থান করতে দেখি। এ সময়ে তিনি "পসারিণী" কবিতাটি রচনা করেন। এ কবিতাটি 'কল্পনা' কাব্যের অন্তর্গত। এ বছর জুন মাসে রবীন্দ্রনাথ নাটোরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশনে যোগদান করেন এবং সম্মেলনের সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইংরেজি অভিভাষণের বাংলা তর্জমা সভায় পাঠ করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন। সে যুগে সভা–সমিতিতে ইংরেজিতে ভাষণদানেরই রেওয়াজ ছিল, অথচ রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ নবীন যুবকের নিকট দেশের মঙ্গলকর্মে বিদেশী ভাষার ব্যবহার অত্যন্ত বিসদৃশ ঠেকত। এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতির পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের "ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ" কবিতাটি লেখা। এ কবিতাটিও 'কল্পনা' কাব্যের অন্তর্গত।

'কল্পনা' কাব্যে সংকলিত অনেকগুলি গান, যেমন, "লজ্জিতা", "হতভাগ্যের গান", "যাচ্না", "কাল্পনিক", "মানসপ্রতিমা", "সংকোচ", "প্রার্থী", "সকরুণা", "প্রণয়–প্রশ্ন", "ভিখারি", "বিদায়" প্রভৃতি এ বছর শরৎকালে উত্তরবঙ্গের নদীতে নদীতে ঘুরে বেড়ানোর সময় রচিত। পাবনার চলনবিলে এক ভীষণ ঝড়ের মুহূর্তে কবি নৌকায় বসে রচনা করেন "যদি বারণ কর তবে গাহিব না"।

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভার ঢাকা অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ যোগদান করেন। অধিবেশন শেষে তিনি শিলাইদহ ফিরে যান এবং স্ত্রীপুত্রকন্যাদের কলকাতা থেকে শিলাইদহ নিয়ে আসবার সিদ্ধান্ত করেন। ইতোমধ্যে নৌকাযোগে তাঁর উত্তরবঙ্গ ভ্রমণ অবিশ্রামভাবে চলছিল। এই বর্ষাকালে তাঁর নৌকাজীবনে কয়েকটি দেশাত্মবোধক কবিতা তিনি রচনা করেন। নাগর নদীতে আত্রাইয়ের পথে তিনি লিখলেন "মাতার আহ্বান", "আশা", "বঙ্গলক্ষ্মী", "শরৎ" প্রভৃতি।

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মকাল থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রীপুত্রকন্যাদের নিয়ে শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে বসবাস করতে থাকেন এবং এখানে একটি গৃহশিক্ষা–কেন্দ্রও স্থাপন করেন। এই কেন্দ্রে শিক্ষক ছিলেন লরেন্স নামক জনৈক ইংরেজ শিক্ষক এবং জগদানন্দ রায়। শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে রবীন্দ্রনাথ নানা পরীক্ষা–নিরীক্ষা চালান, যেমন আমেরিকান ভুট্টা

ও মাদ্রাজি সরু ধানের চাষ, রাজশাহী থেকে রেশমের গুটি আনিয়ে রেশম উৎপাদনের চেষ্টা ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ এই সময় কুষ্টিয়াতে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঠাকুর কোম্পানী'র সঙ্গে সম্পর্কিত হন এবং আখমাড়াই কলের কাজেও হাত দেন বলে জানা গেছে। বিষয়কর্মে ব্যস্ত রবীন্দ্রনাথ এ সময়ে বিশেষ কিছু নতুন সৃষ্টিতে হাত দেন নি। শুধু অবসর সময়ে তিনি রচনা করেন 'কণিকা'র ছোট ছোট কবিতাগুলি। 'কথা' এবং 'কাহিনী' কাব্যগ্রন্থ এই সময়েরই অপর দুটি সৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে শিলাইদহে স্থায়ী বসবাস কালে, ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের বর্ষায় অনেকগুলো কবিতা রচনা করেন, যে কবিতাগুলো 'ক্ষণিকা' কাব্যে স্থান পেয়েছে। 'ক্ষণিকা'র ছন্দ ও রীতির বৈশিষ্ট্য বাংলা কবিতায় নতুন। রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন,

> ক্ষণিকায় আমি প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রাকৃত বাংলা ভাষা ও প্রাকৃত বাংলা ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলাম। তখন সেই ভাষার শক্তি, বেগ ও সৌন্দর্য্য প্রথম স্পষ্ট করিয়া বুঝি। দেখিলাম এ ভাষা পাড়াগাঁয়ে টাট্টু ঘোড়ার মতো কেবলমাত্র গ্রাম্য ভাবের বাহন নয়, ইহার গতিশক্তি ও বাহনশক্তি কৃত্রিম পুঁথির ভাষার চেয়ে অনেক বেশি।

বলাবাহুল্য যে শিলাইদহ-জীবনযাপন রবীন্দ্রনাথকে প্রাকৃত বাংলা ভাষা ও ছন্দ আবিষ্কারে সবচেয়ে বেশি সহায়তা করেছে। শিলাইদহে এ সময়ের আরো দুটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হল 'চিরকুমার সভা' নাটক ও 'চোখের বালি' উপন্যাস।

১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে রবীন্দ্রনাথ আবার শিলাইদহে আসেন, সঙ্গে কয়েক জন অধ্যাপক ও ছাত্র। এবারে তিনি শিলাইদহে একটি বোর্ডিং স্কুল স্থাপন করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র দর্শনবিদ্ মোহিতচন্দ্র সেন এই স্কুলের হেড মাস্টার হলেন। এই স্কুলে রবীন্দ্রনাথ আদর্শ বিদ্যালয়ের নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন।

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে এক প্রাদেশিক সম্মেলন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ বরিশাল যান। এই সম্মেলনের মনোনীত সভাপতি ছিলেন ব্যারিস্টার আবদুর রসুল, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সাহিত্য শাখার সভাপতি। রবীন্দ্রনাথ নৌকাযোগে বরিশাল যান এবং নৌকাতেই বরিশালে অবস্থান করেন। এ সময়ে 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতা লিখিত হয়।

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে পাবনায় একটি প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য মে মাসে শিলাইদহ থেকে পাবনায় যান রবীন্দ্রনাথ। পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ তিনি বাংলা ভাষায় দেন। এতদিন পর্যন্ত প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ ইংরেজি ভাষাতেই দেওয়া হত।

শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ পল্লী উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

> বিরাহিমপুর পরগনাকে পাঁচটা মণ্ডলে ভাগ করে প্রত্যেক মণ্ডলে একজন অধ্যক্ষ বসিয়ে এসেছি। এই অধ্যক্ষেরা সেখানে পল্লীসমাজ স্থাপনে নিযুক্ত। যাতে গ্রামের লোক নিজেদের হিতসাধনে সচেষ্ট হয়ে ওঠে—পথঘাট সংস্কার করে, জলকষ্ট দূর করে, সালিসের বিচারে বিবাদ নিষ্পত্তি করে, বিদ্যালয় স্থাপন করে, জঙ্গল পরিষ্কার করে, দুর্ভিক্ষের জন্য ধর্মগোলা বসায় ইত্যাদি সর্বপ্রকার গ্রাম্য সমাজের হিতে নিজের চেষ্টা নিয়োগ করতে উৎসাহিত হয়—তারই ব্যবস্থা করা গিয়েছে।...আমার প্রজাদের মধ্যে যারা মুসলমান তাদের মধ্যে বেশ কাজ অগ্রসর হচ্ছে—হিন্দুপল্লীতে বাধার অন্ত নেই। হিন্দুধর্ম হিন্দু-সমাজের মূলেই একটা গভীর ব্যাঘাত রয়েছে যাতে করে সমবেত লোকহিতের চেষ্টা অন্তর থেকে বাধা পেতে থাকে। এই সমস্ত প্রত্যক্ষ দেখে হিন্দুসমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধে idealize করে কোনো আত্মঘাতী

শ্রুতিমধুর মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিতে আর আমার ইচ্ছাই হয় না।

এই অভিজ্ঞতার পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে শিলাইদহে 'গোরা' উপন্যাসখানি রচনা করতে শুরু করেন। 'গোরা' উপন্যাসের রবীন্দ্রনাথ লালন ফকিরের "খাঁচার মাঝে অচিন পাখী কেমনে আসে যায়" গানের দুটি চরণ ব্যবহার করেছেন। শিলাইদহতেই লালনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেখা হয়। রবীন্দ্রনাথ লালন শাহর কুড়িটি গান 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করেন। লক্ষণীয় যে শিলাইদহে আদর্শ আবাসিক বিদ্যালয় ও পল্লী উন্নয়ন পরীক্ষামূলক কার্যক্রমই পূর্ণ রূপ লাভ করে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে। এ বছর শরৎকালে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে বসে কয়েকটি গান রচনা করেন, "প্রভু আজি তোমার দক্ষিণ হাত", "গায়ে আমার পুলক লাগে" এবং "জগতের আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ"। এ গানগুলি 'গীতাঞ্জলি'তে সংকলিত। এ বৎসর শীতকালে পুত্র রথীন্দ্রনাথসহ উত্তর-বঙ্গ ভ্রমণ করেন রবীন্দ্রনাথ। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, "আমরা আট নয় দিন হল বোটে করে শিলাইদহ থেকে বেরিয়েছি। প্রথম দুই দিন গোয়ালন্দ হয়ে পদ্মা ও যমুনা বেয়ে আসা গিয়েছিল। আবার বুঝি একটা সাইক্লোনের ভিতর পড়া যাবে। তারপর বড়াল নদী দিয়ে চলন বিলে এসে পড়ি। বড়াল নদীটা ভারি সুন্দর।"

পরবর্তী বর্ষাকালেও তিনি আবার নৌকা ভাসান। এবার গোরাই নদী ও পদ্মার শাখা প্রশাখা দিয়ে জানিপুর, কয়া প্রভৃতি নানা স্থানে আষাঢ়ের শেষে ভরা বর্ষায় তিনি এক সপ্তাহ ছিলেন নদীবক্ষে। এই সময়ে তিনি 'গীতাঞ্জলি'র আরো ১২টি গীত রচনা করেন। গানগুলি হল "গর্ব করে নিইনে ও নাম", "কে বলে সব ফেলে যাবি", "নদীপারের এই আষাঢ়ের প্রভাতখানি", "মরণ যেদিন দিনের শেষে", "দয়া করে, ইচ্ছা করে", "ওগো আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা", "যাত্রী আমি ওরে", "উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে", "ভজন পূজন সাধন আরাধনা", "তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর", "মনের আসন আরাম শয়ন"। এবারের রচিত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গানটি হল, গোরাই— জানিপুরে রচিত,

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি
বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।
কত বর্ণে কত গন্ধে
কতগানে কত ছন্দে
অরূপ, তোমার রূপের লীলায়
জাগে হৃদয়পুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা
এমন সুমধুর।

১৯১০ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবর মাসে পুত্র রথীন্দ্রনাথ, পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী, জামাতা নগেন্দ্রনাথ ও কন্যা মীরা দেবীসহ শিলাইদহ অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথ কৃষি উন্নয়ন বিষয়ে গবেষণার কাজ চালান। ইতোমধ্যে রথীন্দ্রনাথ আমেরিকা থেকে কৃষিবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে এসেছেন। শিলাইদহ কুঠিবাড়ি কৃষি-গবেষণা-কেন্দ্র হয়ে উঠল, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি এল, কৃষি-গবেষণার জন্য কুঠিবাড়িতে ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি স্থাপিত হল। কবি শিলাইদহের কুঠিবাড়িটি "একাধারে ইংলণ্ডের মধ্যযুগীয় জমিদারদের ম্যানর হাউসের ন্যায় গ্রামের সকল প্রকার আলোক ও আনন্দের কেন্দ্র এবং কৃষি বিষয়ক এক্সপেরিমেন্টাল ষ্টেশন" রূপে গড়ে

তুলতে চেয়েছিলেন। কন্যা ও পুত্রবধূকে আধুনিক পদ্ধতির শিক্ষা দানের জন্য মিস বুর্ডেট নামে একজন মার্কিন মহিলাকেও তাঁদের সঙ্গে কুঠিবাড়িতে আনা হয়। পল্লী ও কৃষি উন্নয়নের যে চেষ্টা আজকাল আমাদের দেশে দেখা যায় আজ থেকে ষাট বছর আগে শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ তারই পথ প্রদর্শন করে যান।

শিলাইদহের কুঠিবাড়ির এই কর্মবহুল আনন্দমুখর পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'রাজা' নাটকটি রচনা করেন। 'রাজা' নাটকের ২৫টি গানও এই সময়ে লেখা। 'রাজা'র একটি গান বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে?
দেখিসনে কি শুকনা পাতা ঝরা ফুলের খেলা রে।
যে ঢেউ ওঠে তারি সুরে বাজে কি গান সাগর জুড়ে?

রবীন্দ্রনাথ একই সময়ে শিলাইদহ থেকে শান্তিনিকেতন ফিরে 'ডাকঘর' লিখেছিলেন।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে শিলাইদহে তিনি 'গীতিমাল্য'র অনেকগুলি গান ও কবিতা রচনা করেন। কবিতাগুলির মধ্যে "ভাগ্যে আমি পথ হারালেম কাজের পথে", "নামহারা এই নদীর ধারে", "কে গো তুমি বিদেশী", "ওগো পথিক দিনের শেষে", "এই দুয়ারটি খোলা", "এই যে এরা আঙিনাতে এসেছে জুটি" এবং গানের মধ্যে "আমি হাল ছাড়লে তবে তুমি হাল ধরবে জানি", "এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী", "যেদিন ফুটল কমল কিছুই জানি নাই", "এখনো ঘোর ভাঙে না তোর যে", "আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ", "কোলাহল তো বারণ হল এবার কথা কানে কানে", "ঝরে যায় উড়ে যায় গো", "তুমি একটু কেবল বসতে দিয়ো কাছে", "এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে সবাই জয়ধ্বনি কর" ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতরাজি উল্লেখযোগ্য। এ সময়ে শিলাইদহে বসে তিনি নিজের বহু কবিতা ও গানের ইংরেজি তর্জমা করেন।

রবীন্দ্রনাথের পল্লী ও কৃষি উন্নয়নের প্রচেষ্টা তখনো পূর্ণ উদ্যমে চলছে। রথীন্দ্রনাথের কাছে শিলাইদহ থেকে লেখা একটা চিঠি থেকে আমরা জানতে পারি যে গ্রাম-উন্নয়নের জন্য অর্ধশতাব্দী পূর্বে তিনি সমবায় ব্যাংকের এবং কুটীর শিল্পের পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি লিখেছেন,

> বোলপুরে একটি ধানভানা কল চলচে—সেই রকম একটা কল এখানে আনতে পারলে বিশেষ কাজে লাগবে। এদেশ ধানের দেশ—বোলপুরের চেয়ে অনেক বেশী ধান এখানে জন্মায়। আমার ইচ্ছা ৫/১০ টাকা শেয়ার করে এখানকার অনেক চাষায় মিলে এই কলটা যদি চালায় তা হলেই ওদের মধ্যে মিলে কাজ করবার যথার্থ সূত্রপাত হতে পারবে। আমাদের ব্যাঙ্ক [পতিসর কৃষিব্যাঙ্ক] থেকে ধার দিয়ে এই ধানভানার ব্যবসাটা এখানে সহজেই চালানো যেতে পারে...তারপরে এখানে চাষাদের কোন্ industry শেখানো যেতে পারে সেইকথা ভাবছিলুম। এখানে ধান ছাড়া আর কিছু জন্মায় না—এদের থাকবার মধ্যে কেবল শক্ত এঁটেল মাটি আছে। আমি জানতে চাই pottery জিনিসটাকে cottage industry রূপে গণ্য করা চলে কিনা। অর্থাৎ ছোটখাটো furnace আনিয়ে এক গ্রামের লোক মিলে এ কাজ সম্ভবপর কিনা। মুসলমানরা যে রকম সান্‌কির জিনিস ব্যবহার করে এরা যদি সেই রকম মোটা গোছের প্লেট বাটি প্রভৃতি তৈরি করতে পারে তা হলে উপকার হয়।...আর একটা জিনিস আছে ছাতা তৈরি করতে শেখানো। সেইরকম শেখাবার লোক যদি পাওয়া যায় তা হলে শিলাইদহ অঞ্চলে এই কাজটা চালানো যেতে পারে।

ইতোমধ্যে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের

শুরুতে তিন জন শিল্পী নন্দলাল বসু, মুকুলচন্দ্র দে এবং সুরেন্দ্রনাথ কর–কে সঙ্গে নিয়ে তিনি শিলাইদহ এলেন কিন্তু কুঠিবাড়িতে না উঠে নৌকাতেই থাকলেন। পদ্মাতীরে নয় দিনে তিনি বারটি কবিতা লেখেন—'বলাকা' কাব্যের ২২–৩৩ সংখ্যক কবিতাসমূহ। 'বলাকা'র "মুক্তি", "উপহার", "দেওয়া–নেওয়া", "দুই নারী", "স্বর্গ", "তুমি আমি", কবিতাসমূহ কবির এবারের শিলাইদহ বাসের ফল। কিছুদিন পরেই কলকাতা প্রত্যাবর্তন করে তিনি 'ফাল্গুনী' রচনা করেন।

মনে হয় কলকাতা–বোলপুর জীবনে হাঁপিয়ে উঠলেই তিনি বারবার শিলাইদহ ছুটে যেতেন, ঘুরে বেড়াতেন নদীতে নদীতে আর সৃষ্টির বান ছুটত। কলকাতার কৃত্রিম আবেষ্টনীতে সৃষ্টির উৎস যেন শুষ্ক হয়ে আসত। শিলাইদহ, পদ্মা, সাজাদপুর, যমুনা, পতিসর, গোরাই, আত্রাই, চলনবিল কবির মানসকে অফুরন্ত রসের ধারায় সঞ্জীবিত রেখেছে অবিরল।

এতদিন আমরা রবীন্দ্রনাথকে প্রধানত কুষ্টিয়া, পাবনা, রাজশাহী অঞ্চলে অর্থাৎ তাঁর জমিদারি এলাকায় বসবাস বা ভ্রমণ করতে দেখেছি। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের শেষদিক থেকে আমরা তাঁকে পূর্ববঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলে—সিলেট, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ইত্যাদি স্থানে যেতে দেখি।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ৫ই নভেম্বর রবীন্দ্রনাথ সিলেট গমন করেন। কবিকে রেলস্টেশন থেকে ছাত্র ও যুবকেরা ফিটন গাড়িতে বসিয়ে ঘোড়া খুলে নিজেরাই গাড়ি টেনে নিয়ে যান। পাদরি টমাস সাহেবের বাড়ির পাশে টিলার উপর অবস্থিত একটি বাড়িতে ওঠেন কবি। সিলেটে তিনি ছিলেন পাঁচ দিন। প্রতিদিনই তাঁর জন্যে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল। সিলেট টাউন হলে জনসাধারণের তরফ থেকে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সৈয়দ আবদুল মজিদ উর্দু ভাষণের মধ্যে দিয়ে সম্ভাষণ জানান কবিকে। এই সভায় কবি যে ভাষণ দেন তা 'প্রবাসী'তে 'বাঙালির সাধনা' নামে প্রকাশিত হয়। মুরারিচাঁদ কলেজের ছাত্ররাও কবিকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। এই সভায় কবির ভাষণ 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় "আকাঙ্ক্ষা" নামে ছাপা হয়। কবিকে স্থানীয় মণিপুরী সমাজ মণিপুরী নৃত্য দ্বারা আপ্যায়িত করেন।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দের মে মাস থেকে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাস পর্যন্ত চৌদ্দ মাস রবীন্দ্রনাথ দেশের বাইরে, ইউরোপ ও আমেরিকায় ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যখন দেশে ফিরে এলেন তখন গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল উত্তেজনা। রবীন্দ্রনাথ অসহযোগের নামে পাশ্চাত্য জ্ঞান–বিজ্ঞানের বিরোধিতা সমর্থন করেন নি। তিনি শিক্ষা–সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রবন্ধে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাও একই সময়ে ঘটে। মনে হয় প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর ইউরোপ আমেরিকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা অন্ধ স্বাদেশিকতার বিষময় পরিণতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথকে সচেতন করে তুলেছিল—তারই প্রতিবাদে বিশ্বভারতীর মাধ্যমে স্বদেশে আন্তর্জাতিকতার উদ্বোধন করলেন রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পরই ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ গেলেন। শিলাইদহের নির্জন বাস সমাপনান্তে, পদ্মা থেকে ফিরে গিয়েই তিনি লিখলেন 'মুক্তধারা' নাটক। মার্চ মাসে অধ্যাপক সিলভাঁ লেভির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নেপাল যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু কবি নেপাল না গিয়ে শিলাইদহ চলে এলেন। শিলাইদহে এবার তিনি কয়েকটি গান রচনা করেন। গানগুলি হল, "পূর্বাচলের পানে তাকাই", "আসা–যাওয়ার পথের ধারে", "কার যেন এই মনের বেদন", "নিদ্রাহারা রাতের এই গান", "এক ফাগুনের গান গো আমার" এবং "ক্লান্ত বাঁশীর শেষ রাগিণী"।

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্মৌ সঙ্গীত সম্মেলনে ভাষণ দান করেন। ইতোমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রবীন্দ্রনাথকে ভাষণদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গীরা, রথীন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ, কালিমোহন ঘোষ, মরিস, ফর্মিকি, তুচ্চি ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারি ঢাকা পৌঁছোন। নারায়ণগঞ্জ ঘাটে কবিকে বিপুল সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়, তাঁকে মোটরযোগে নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকা নিয়ে আসা হয়। শহরের প্রবেশপথে স্কাউট ও ভলান্টিয়াররা কবিকে অভ্যর্থনা জানান। রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় নদীবক্ষে নবাব বাহাদুরের 'তুরগ' নামক প্রমোদতরীতে অবস্থান করেন।

সেদিন অপরাহ্নে নর্থব্রুক হলে মিউনিসিপ্যালিটি ও পিপল্‌স এসোসিয়েশনের তরফ থেকে কবিকে সংবর্ধনা জানানো হয়। সদরঘাট করোনেশন পার্কে রেটপেয়ার্স এসোসিয়েশন এবং হিন্দু–মুসলমান সেবক সমিতির তরফ থেকে তাঁকে জন–সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ঢাকায় দ্বিতীয় দিনে মহিলারা কবিকে সংবর্ধনা জানান। তৃতীয় দিনে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে কবি ভাষণ দেন; তাঁর ভাষণের বিষয় ছিল, "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার স্বরূপ"।

১০ই ফেব্রুয়ারি তারিখে কবি কলেজিয়েট স্কুল পরিদর্শন করেন। ঐদিনই তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলে ছাত্ররা সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। সন্ধ্যাবেলায় কার্জন হলে তিনি ভাষণ দেন। এই বক্তৃতার জন্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস–চ্যান্সেলর মি. ল্যাংলি এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষণের বিষয় ছিল "The Philosophy of Art"। এই ভাষণে তিনি বলেন,

> মানব তাহার প্রাচুর্যের প্রভাবেই আপনাকে অভিব্যক্ত করে, যেটুকু নিজের পক্ষে অত্যাবশ্যক, সেটুকুতে মানবের আত্মা তৃপ্ত থাকিতে পারে না।...মানুষও তেমনি সৃষ্টিতেই আনন্দ উপভোগ করে। এ সৃষ্টি তাহার আতিশয্য বা অমিতব্যয়িতার প্রমাণ—কার্পণ্যের নহে, দৈন্যের নহে। মানব পূর্ণস্বরূপে আপনাকে মিলিত করিতে চায়, সেই মিলনে যে অপূর্ব স্বাধীনতার আনন্দ আছে, সে তাহারই সন্ধানে ফিরিতেছে। আর্ট মানবজীবনের সম্পদকে অভিব্যক্ত করে।

১৩ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ঢাকায় রবীন্দ্রনাথকে ভাইস চ্যান্সেলর একটি পার্টি দেন। সেদিনই রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর শেষ বক্তৃতা দেন, বিষয় ছিল "The Rule of the Giant" (স্মরণীয় যে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে জুলাই তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে ডি. লিট্ (Honoris causa) ডিগ্রি প্রদান করে। অসুস্থতার জন্যে রবীন্দ্রনাথ ঢাকা যেতে পারেন নি, তাঁর অনুপস্থিতিতেই তাঁকে ঐ সম্মান দেওয়া হয়)।

১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ঢাকার কর্মচঞ্চল সফর শেষ করে রবীন্দ্রনাথ ময়মনসিংহ যাত্রা করেন। ময়মনসিংহ স্টেশনে মুক্তাগাছার মহারাজার নেতৃত্বে কবিকে বিপুল সংবর্ধনা জানানো হয়। রবীন্দ্রনাথ এখানে মহারাজ শশিকান্তের আতিথ্য গ্রহণ করেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারি টাউন হলে কবিকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়, উত্তরে কবি পূর্ববঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ১৬ই ফেব্রুয়ারি কবিকে মুক্তাগাছার ত্রয়োদশী সম্মিলনী থেকেও অভিনন্দন জানানো হয়। পরদিন ময়মনসিংহের শহরবাসী এবং সাহিত্যসভার পক্ষ থেকে কবিকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তিনি আনন্দমোহন কলেজ, বিদ্যাময়ী স্কুল ও সিটি স্কুল পরিদর্শন করেন এবং ছাত্রদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। স্থানীয় মহিলা সমিতিতেও রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা করেন।

১৯শে ফেব্রুয়ারি তারিখে ময়মনসিংহ থেকে কুমিল্লা যান রবীন্দ্রনাথ। অভয় আশ্রমের তৃতীয় বার্ষিক উৎসবে সভাপতিত্ব করার জন্যে তিনি সেখানে আসেন। অভয় আশ্রমের

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী তিন দিন ধরে চলে, কবি অনেকগুলো অনুষ্ঠানে যোগ দেন। কুমিল্লায় মহিলা সমিতি কবিকে অভিনন্দন জানান, কবি এখানে এক বিরাট জনসভায়ও বক্তৃতা করেন। কুমিল্লা অবস্থানকালে তিনি রামমালা ছাত্রাবাস ও ভিক্টোরিয়া কলেজ পরিদর্শন করেন। কুমিল্লা থেকে ২২শে ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রনাথ আগরতলা যান। আগরতলা থেকে ফেরার পথে তিনি চাঁদপুর যান, সেখানে নীরদ পার্কে তাঁর সংবর্ধনা অনুষ্ঠান বসে। ২৮শে ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রনাথ স্টিমারযোগে চাঁদপুর থেকে নারায়ণগঞ্জ ফিরে আসেন। নারায়ণগঞ্জ ছাত্রসংঘের মানপত্রের জবাবে রবীন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গের চরিত্রবল ও কর্তব্যনিষ্ঠার প্রশংসা করেন।

প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়, "পূর্ববঙ্গ ভ্রমণকালে কবিচিত্তে ছন্দ ও সুরের লীলাতরঙ্গ পুনরায় দেখা যায়" এবং তারই ফলে পাই 'বৈকালী'র অন্তর্গত গানগুলি, যেগুলি পর্যায়ক্রমে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ আবার বাংলাদেশের পূর্বাংশে আসেন ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসে। পুণ্যাহ উপলক্ষে পতিসর সফর সম্ভবত এ অঞ্চলে তাঁর শেষবারের মতো আগমন। কবির প্রজারা কবিকে বিপুলভাবে সংবর্ধনা জানিয়েছিল, প্রজাদের পক্ষ থেকে মোঃ কাফিলউদ্দিন আকন্দ কবিকে মুদ্রিত শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করেন। একজন বৃদ্ধ মুসলমান কবিকে বলেছিলেন, "আমরা তো বুড়ো হয়েছি, আমরাও চল্‌তি পথে, আপনিও চল্‌তি পথে, বড়ই দুঃখ হয়,...।"

১৮৯৮ সালের শীতকালে এলাহাবাদ থেকে প্রবাসী বাঙালিদের মুখপত্র 'প্রবাসী' মাসিকপত্র প্রকাশের আয়োজন করা হয়। এর প্রথম সংখ্যার জন্য "প্রবাসী" কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ লিখে পাঠিয়েছিলেন শিলাইদহ থেকে :

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে,
আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া;
দেশে দেশে মোর দেশ আছে
আমি সেই দেশ লব বুঝিয়া।

শিলাইদহ–জীবন রবীন্দ্রনাথের প্রবাস–জীবন ছিল না, শিলাইদহ–বাস কবির পক্ষে নির্বাসন ছিল না, বরং শিলাইদহে তিনি নিজের দেশ খুঁজে নিয়েছিলেন, নিজের ঠাঁই পেতেছিলেন। তাই শিলাইদহ কবি রবীন্দ্রনাথের জীবন থেকে অচ্ছেদ্য, যেমন অচ্ছেদ্য সাজাদপুর, পতিসর, রাজশাহী, আত্রাই, চলনবিল, আর পদ্মা, যমুনা, ইছামতি।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

রবীন্দ্রনাথের কবিতার ছন্দ

রবীন্দ্রনাথের আগে বাংলা কবিতার ছন্দের বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের রচনায়। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর, সনেট, স্তবকবিন্যাসরীতিবৈচিত্র্য ও নতুন কাব্যপঠনরীতি বাংলা কবিতাকে আকস্মিকভাবে এক অভিনব অভিজ্ঞতা ও অত্যাশ্চর্য সম্ভাবনায় মণ্ডিত করে দিয়েছিল। এই অভিজ্ঞতা ও সম্ভাবনার পরবর্তী দিগন্ত উন্মোচন ঘটে রবীন্দ্রকাব্যে। বলাবাহুল্য, কাব্যচিন্তায় রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের মতো বিপ্লবী ছিলেন না। তাই তাঁর কবিতার ছন্দও ধীর লয়ে বিবর্তিত ও ক্রমলালিত। বর্তমান প্রবন্ধে এই বিবর্তনের প্রধান প্রধান প্রসঙ্গগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে।

১. অক্ষরবৃত্ত

অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রবীন্দ্রনিরীক্ষার প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রয়াস লক্ষ করা যায় 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'[১] নাটকে। এই নাটকের কাব্যসংলাপে মধুসূদন-প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ-প্রচেষ্টা আছে। যেমন,

কোথা দিন, কোথা রাত্রি, কোথা বর্ষ মাস!
অবিশ্রাম কালস্রোত কোথায় বহিছে
সৃষ্টি যেথা ভাসিতেছে তৃণপুঞ্জসম!
আঁধার গুহার মাঝে রয়েছি একাকী,
আপনাতে বসে আছি আপনি অটল।
অনাদি কালের রাত্রি সমাধিমগনা
নিশ্বাস করিয়া রোধ পাশে বসে আছে।
শিলার ফাটল দিয়া বিন্দু বিন্দু করি
ঝরিয়া পড়িছে বারি আর্দ্র গুহাতলে।[২]

লক্ষণীয় যে, কবি এখানে 'অমিত্রাক্ষর'কে প্রায় আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয়। ফলে এখানে মিলহীনতাই মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, প্রবহমানতা নেই এবং যতিপাতের স্বাধীনতাও নেই বললেই চলে।

অল্প পরবর্তীকালে রচিত 'রাজা ও রাণী'[৩] নাটকে অমিত্রাক্ষরের সকল শক্তিরই প্রকাশ ঘটে :

ইলারে দেখিয়া যাবে?
কী হইবে দেখে তারে! কি হইবে দেখা
দিয়ে! স্বার্থপর! রয়েছ মৃত্যুর মুখে
অপমান বহি—গৃহহীন, আশাহীন,
কেন আসিয়াছ ইলার হৃদয়মাঝে
জাগাতে প্রেমের স্মৃতি?[৪]

অমিত্রাক্ষর নামে পরিচিত এই অমিল প্রবহমান যতিস্বাধীন ১৪ মাত্রার অক্ষরবৃত্তের প্রধান গুণ যে এর প্রবহমানতা এবং যতিস্বাধীনতা এ–কথা উপলব্ধি করেই যেন অতঃপর রবীন্দ্রনাথ সমিল–অমিলের সংস্কার শোধনের চেষ্টা করেন। ফলে 'মানসী' কাব্যে[৫] সমিল প্রবহমান যতিস্বাধীন ১৪ মাত্রার অক্ষরবৃত্তের কবিতা দেখি :

অন্ধকার রুদ্ধগৃহে একেলা বসিয়া
পড়িতেছি মেঘদূত; গৃহত্যাগী মন
মুক্তগতি মেঘপৃষ্ঠে লয়েছে আসন,
উড়িয়াছে দেশদেশান্তরে। কোথা আছে
সানুমান আম্রমূট; কোথা বহিয়াছে
বিমল বিশীর্ণ রেবা বিন্ধ্যপদমূলে
উপলব্যথিতগতি; বেত্রবতীকূলে
পরিণতফলশ্যাম জম্বুবনচ্ছায়ে
কোথায় দশার্ণ গ্রাম রয়েছে লুকায়ে
প্রস্ফুটিত কেতকীর বেড়া দিয়ে ঘেরা;[৬]

'মানসী'র সমকালে প্রকাশিত 'বিসর্জন' কাব্যনাট্যে[৭] আবার অমিল প্রবহমান যতিস্বাধীন ১৪ মাত্রার অক্ষরবৃত্তের সুপ্রয়োগ লক্ষণীয় :

জয়সিংহ। দশ দিক জেগে ওঠে যদি
দশটি সন্দেহ–সম, তখন কোথায়
সুখ, কোথা পথ? জান কি একেলা কারে
বলে?
অপর্ণা। জানি। যবে বসে আছি ভরা মনে—
দিতে চাই, নিতে কেহ নাই।[৮]

পরবর্তী কাব্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা'ও[৯] এই ছন্দে রচিত :

দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,

আমার পাইবে তবে পরিচয়।[১০]

'চিত্রাঙ্গদা'র অল্প পরবর্তীকালে রচিত 'সোনার তরী' কাব্যের[১১] "সমুদ্রের প্রতি" কবিতায়[১২] কবি সমিল প্রবহমান ছন্দে ১৪ মাত্রার চরণকে বাড়িয়ে১৮ মাত্রায় পরিণত করেন।

হে আদি জননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার,
একমাত্র কন্যা তব কোলে। তাই তন্দ্রা নাহি আর
চক্ষে তব, তাই বক্ষ ছড়ি সদা শঙ্কা, সদা আশা,
সদা আন্দোলন; তাই উঠে বেদমন্ত্রসম ভাষা
নিরন্তর প্রশান্ত অম্বরে, মহেন্দ্রমন্দির–পানে
অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা, নিয়ত মঙ্গলগানে
ধ্বনিত করিয়া দিশি দিশি, তাই ঘুমন্ত পৃথ্বীরে
অসংখ্য চুম্বন কর আলিঙ্গনে সর্ব অঙ্গ ঘিরে
তরঙ্গবন্ধনে বাঁধি, নীলাম্বর অঞ্চলে তোমার
সযত্নে বেষ্টিয়া ধরি সন্তর্পণে দেহখানি তার
সুকোমল সুকৌশলে।[১৩]

"সমুদ্রের প্রতি" কবিতাটির এই প্রথম বাক্যে পরিচিত ১৪ মাত্রা থেকে ১৮ মাত্রায় চরণের বিস্তারের ফলে প্রবহমান অক্ষরবৃত্তের নতুন শক্তির পরিচয় মেলে। অবশ্য এই কবিতায় অত্যন্ত সার্থকভাবে এই ১৮ মাত্রার সমিল প্রবহমান অক্ষরবৃত্তের ব্যবহার সত্ত্বেও পরবর্তী নাট্যকাব্য 'বিদায়–অভিশাপ'[১৪] এবং কাব্যনাট্য 'মালিনী'তে[১৫] কবি আবার ১৪ মাত্রার সমিল প্রবহমান অক্ষরবৃত্তেরই ব্যবহার করেন।

প্রায় সমকালে রচিত 'চিত্রা'[১৬] কাব্যের "এবার ফিরাও মোরে"[১৭] কবিতায় কবি অবশ্য ১৮ মাত্রার সমিল প্রবহমান প্রয়োগ করেন :

সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কর্মে রত
তুই শুধু ছিন্নবাঁধা পলাতক বালকের মতো
মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ন তরুচ্ছায়ে
দূরবনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্তবায়ে
সারাদিন বাজাইলি বাঁশি। ওরে তুই ওঠ্ আজি।
আগুন লেগেছে কোথা?[১৮]

এবং এই কাব্যেরই "উর্বশী"[১৯] কবিতায় কবি ১৮ মাত্রার সমিল অক্ষরবৃত্তের কাঠামোর ওপরে যে স্তবকবিন্যাস করেন তাতে তিনি প্রবহমানতাকে খর্ব করে সফলতার সঙ্গে অসমমাত্রিক চরণ ব্যবহার করেন :

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী,
হে নন্দনবাসিনী উর্বশী।
গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে শ্রান্ত দেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি
তুমি কোনো গৃহপ্রান্তে নাহি জ্বাল সন্ধ্যাদীপখানি,
দ্বিধায় জড়িত পদে কম্প্রবক্ষে নম্রনেত্রপাতে
স্মিতহাস্যে নাহি চল সলজ্জিত বাসরশয্যাতে
স্তব্ধ অর্ধরাতে।
উষার উদয়সম অনবগুণ্ঠিতা
তুমি অকুণ্ঠিতা।[২০]

অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনকালে এই ছন্দে উৎকৃষ্ট নাটক রচনার অভিলাষ পোষণ করেছিলেন মধুসূদন।[২১] এবং 'মেঘনাদবধ' ও 'বীরাঙ্গনা'য় উপস্থিত নাটকীয় গুণাবলির মধ্যে মধুসূদনের এই আকাঙ্ক্ষার অঙ্কুর প্রত্যক্ষভাবেই উপস্থিত; প্রকৃতপক্ষে বন্ধুদের পরামর্শ পরিত্যাগ না করলে 'রিজিয়া' নাটক তিনি অমিত্রাক্ষরেই যে লিখতেন তা ঐ নাটকের যেটুকু রচিত হয়েছিল তার থেকেই অনুমান করা যায়।[২২] অমিত্রাক্ষর নামে পরিচিত এই প্রবহমান অক্ষরবৃত্তের নাট্যোপযোগিতা মধুসূদনের রচনায় যথার্থভাবে পরীক্ষিত না হলেও রবীন্দ্রনাথের রচনায় তার একাধিক সফল ব্যবহার লক্ষ করা গেল। এবং প্রবহমানতা, যতিপাতের স্বাধীনতা ও পঠনরীতির নবরূপ যে এই ছন্দের মূলসূত্র, এ কথা অনুভব করবার পর রবীন্দ্রনাথ এ ছন্দের সমিল–অমিলের সংস্কার থেকে মুক্ত হন। এবং অল্পকালের মধ্যেই ১৮ মাত্রার সমিল প্রবহমান ও ১৮ মাত্রা ভিত্তিক স্তবকবন্ধে অসমমাত্রিক চরণ সন্নিবেশিত সমিল অক্ষরবৃত্ত রচনা করে অক্ষরবৃত্তের নতুন শক্তির উদ্বোধন করেন। পরবর্তী 'কাহিনী'[২৩] কাব্যের "গান্ধারীর আবেদন", "সতী", "নরকবাস", "কর্ণ–কুন্তী–সংবাদ" ১৪ মাত্রার সমিল প্রবহমান অক্ষরবৃত্তে এবং "ভাষা ও ছন্দ" ১৮ মাত্রার সমিল প্রবহমান অক্ষরবৃত্তে রচিত। 'কল্পনা'[২৪] কাব্যে কবি ১৪ মাত্রা ভিত্তিক সমিল অক্ষরবৃত্তে অসমমাত্রার চরণ বিন্যাস করেন "স্বপ্ন" কবিতায় :

দূরে বহুদূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদীপারে
মোর পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়ারে।
মুখে তার লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম হাতে,
কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে,
তনু দেহে রক্তাম্বর নীবীবন্ধে বাঁধা,
চরণে নূপুরখানি বাজে আধা আধা।
বসন্তের দিনে
ফিরেছিনু বহুদূরে পথ চিনে চিনে।[২৫]

লক্ষণীয় যে এই অংশে ১৪ মাত্রার সমিল অক্ষরবৃত্তের কাঠামোতে ৬ মাত্রার প্রথম চরণ, ১০ মাত্রার দ্বিতীয় চরণ ও ৬ মাত্রার নবম চরণ নতুন দোলা সঞ্চার করেছে। এই কাব্যেই "বর্ষশেষ" ও "বসন্ত" কবিতায় কবি পর্যায়ক্রমে একটি ১৮ ও একটি ৬ মাত্রার চরণ বিন্যাস করেছেন :

১। হে নূতন , এসো তুমি সম্পূর্ণ গগন পূর্ণ করি
পুঞ্জ পুঞ্জ রূপে—
ব্যাপ্ত করি, লুপ্ত করি, স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে
ঘনঘোরস্তূপে।[২৬]

২। আমার বসন্তরাতে চারি চক্ষে জেগে উঠেছিল
যে–কয়টি কথা,
তোমার কুসুমগুলি হে বসন্ত, সে গুপ্ত সংবাদ
নিয়ে গেল কোথা?[২৭]

এই ভঙ্গিতেই "রাত্রি" কবিতায় তিনি ব্যবহার করেছেন একটি ১৮ ও একটি ১০ মাত্রার চরণ :

মোরে কর সভাকবি ধ্যানমৌন তোমার সভায়
হে শর্বরী, হে অবগুণ্ঠিতা!
তোমার আকাশ জুড়ি যুগে যুগে জপিছে যাহারা
বিরচিব তাহাদের গীতা।[২৮]

এবং "বৈশাখ" কবিতায় কবি ব্যবহার করেন ১০।১৮।১৮।৬।১০ মাত্রার চরণের স্তবক :

ছাড়ো ডাক, হে রুদ্র বৈশাখ!
ভাঙিয়া মধ্যাহ্নতন্দ্রা জাগি উঠি বাহিরিব দ্বারে,
চেয়ে রব প্রাণীশূন্য দগ্ধতৃণ দিগন্তের পারে
নিস্তব্ধ নির্বাক্।
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ![২৯]

'কল্পনা'র পর কবি অসমমাত্রার চরণের অক্ষরবৃত্ত রচনা অপেক্ষা স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্তের কবিতা এবং গান রচনায় অধিকতর আগ্রহী হয়ে ওঠেন। সম্ভবত অসমমাত্রার অক্ষরবৃত্তের অপ্রবহমানতায় তিনি বাধাপ্রাপ্ত হন।

কিন্তু পরবর্তীকালে 'বলাকা' কাব্যের[৩০] চঞ্চল গতিবাদের ভাবনা প্রকাশের মধ্যে অসমমাত্রার অক্ষরবৃত্তে প্রবহমানতা সঞ্চারের উপযুক্ত সুযোগ খুঁজে পান তিনি। এ কাব্যে অসমমাত্রার চরণে শুধু যে তিনি প্রবহমানতাই সঞ্চার করেন তা নয়, ২ থেকে ১৮ পর্যন্ত যথেচ্ছ অসমমাত্রার চরণ ব্যবহারের স্বাধীনতাও গ্রহণ করেন। যেমন :

কে বলে রয়েছ স্থির রেখার বন্ধনে
নিস্তব্ধ ক্রন্দনে।
মরি মরি, সে আনন্দ থেমে যেত যদি
এই নদী
হারাত তরঙ্গবেগ
এই মেঘ
মুছিয়া ফেলিত তার সোনার লিখন।
তোমার চিকন
চিকুরের ছায়াখানি বিশ্ব হতে যদি মিলাইত
তবে
একদিনে কবে
চঞ্চল পবনে লীলায়িত
মর্মর মুখর ছায়া মাধবী-বনের
হত স্বপনের।[৩১]

অক্ষরবৃত্ত-প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-নিরীক্ষার আর দুটি প্রসঙ্গ বিশেষভাবে আলোচ্য : একটি সনেট বা সনেটকল্প রচনা, অন্যটি গদ্যকবিতা।

সমগ্র কাব্যজীবনে রবীন্দ্রনাথ মোট ২৮১টি সনেট বা সনেটকল্প কবিতা রচনা করেন।[৩২] এ জাতীয় কবিতা সর্বাধিক সংকলিত হয় 'কড়ি ও কোমল' (৫৮টি), 'চৈতালী' (৬৮টি) ও নৈবেদ্য' (৭৮টি) কাব্যে।

পেত্রার্কার কাব্যকলামুগ্ধ মধুসূদন বাংলা ভাষায় সনেট প্রবর্তন করেন বিশুদ্ধ পেত্রার্কান ভঙ্গিতে।[৩৩] "কিন্তু মধুসূদন পেত্রার্কার কবি-কৃতি ও কবিকল্পনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও পেত্রার্কার কাব্যসাধনার মূলীভূত প্রেরণা—অর্থাৎ পেত্রার্কার প্রেমসাধনার পরোক্ষ প্রভাব

থেকেও দূরে ছিলেন। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রজীবনে পেত্রার্কার প্রেমসাধনার আদর্শও প্রভাব বিস্তার করেছিল। পেত্রার্কা ও লরার প্রেম...শুধু পেত্রার্কা ও লরাই নয়, দান্তে ও বিয়েত্রিচের প্রেমও রবীন্দ্রনাথের কিশোর স্বপ্নকে মুগ্ধ বিস্ময়ে আবিষ্ট করে রেখেছিল।"[৩৪]

'ভারতী' পত্রিকায় ১২৮৫ সালে ভাদ্র সংখ্যায় "বিয়েত্রীচে, দান্তে ও তাহার কবিতা" এবং আশ্বিন সংখ্যায় "পিত্রার্কা ও লরা" যখন তিনি লেখেন তখন তাঁর বয়স সতের বৎসর চার মাস।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিশুদ্ধ পেত্রার্কান সনেট রবীন্দ্রনাথ খুব কমই রচনা করেছেন। 'কড়ি ও কোমলে'র ৫৮টি সনেট বা সনেটকল্প রচনার মধ্যে মাত্র আটটি ("ছোট ফুল", "হৃদয় আকাশ", "তনু", "কল্পনা", "মধুপ", "পূর্ণমিলন", "বন্দী", "সন্ধ্যার বিদায়" এবং "চিরদিন-৪") পেত্রার্কান ও ১৬টি শেক্সপিয়রীয় রীতিতে রচিত। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "দুর্ভাগ্যবশত রবীন্দ্রসাহিত্যে বিশুদ্ধ সনেটের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। কড়ি ও কোমলে সংকলিত রবীন্দ্রসনেটের প্রথম ফসল সংখ্যায় ষাটের কাছাকাছি হলেও সেখানেই কৌলীন্যচ্যুতির লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তারপর সারা জীবন রবীন্দ্রনাথ প্রায় তিন শত চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করেছেন, কিন্তু পেত্রার্কা গোত্রের বিশুদ্ধ সনেট রচনায় তিনি আর কখনই উৎসাহ প্রকাশ করেন নি।"[৩৫]

পেত্রার্কান রীতির একটি বিশুদ্ধ সনেটে রবীন্দ্রনাথ সনেট সম্পর্কে যে মনোভাব প্রকাশ করেছেন তা এখানে উল্লেখযোগ্য :

আমি শুধু গাঁথি মালা ছোটো ছোটো ফুলে,
সে ফুল শুকায়ে যায় কথায় কথায়,
তাই যদি, তাই হোক, দুঃখ নাহি তায়,
তুলিব কুসুম আমি অনন্তের কূলে।
যারা থাকে অন্ধকারে, পাষাণ-কারায়,
আমার এ মালা যদি লহে গলে তুলে,
নিমেষের তরে তারা যদি সুখ পায়,
নিঠুর বন্ধন-ব্যথা যদি যায় ভুলে!

ক্ষুদ্র ফুল, আপনার সৌরভের সনে
নিয়ে আসে স্বাধীনতা, গভীর আশ্বাস—
মনে আনে রবিকর নিমেষ-স্বপনে,
মনে আনে সমুদ্রের উদার বাতাস।
ক্ষুদ্র ফুল দেখে যদি কারো পড়ে মনে
বৃহৎ জগৎ, আর বৃহৎ আকাশ।[৩৬]

বস্তুত সনেটের ক্ষুদ্র ফুলে বৃহৎ জগৎ ও বৃহৎ আকাশ প্রস্ফুটিত করাই বিশুদ্ধ সনেটের আদর্শ : এই ভাবের উত্থান ও প্রবহণ অষ্টকে ও ষটকে সুন্দরভাবে ফুটেছে। এখানে মিল বিন্যাসের রীতি ক খ খ ক খ ক খ ক গ ঘ গ ঘ গ ঘ।

"বন্দী" কবিতায় "মানসলক্ষ্মীর সর্বগ্রাসী প্রেমের প্রাণান্তকর বন্ধনে কবিতার বন্দিদশার কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে"। এর সঙ্গে তুলনীয় পেত্রার্কার Pace non trovo, e non ho da far guerra (I find no peace yet am not armed for war) শীর্ষপঙ্‌ক্তিক সনেটে প্রকাশিত "দুর্বিষহ বন্দিদশার বর্ণনা"।[৩৭]

রবীন্দ্রনাথের সনেটকল্প চতুর্দশপদাবলিতে কবিচিত্তের পরিবর্তমান জগৎ ও জীবন প্রতিফলিত। এ পরিবর্তনের ধারায় জীবনের শেষ প্রান্তে এসে কবি রচনা করেছেন ১৮ মাত্রার অমিল প্রবহমান চতুর্দশপদী :

পশ্চাতের নিত্যসহচর, অকৃতার্থ হে অতীত,
অতৃপ্ত তৃষ্ণার যত ছায়ামূর্তি প্রেতভূমি হতে
নিয়েছ আমার সঙ্গ, পিছু-ডাকা অক্লান্ত আগ্রহে
আবেশ-আবিল সুরে বাজাইছ অস্ফুট সেতার,
বাসাছাড়া মৌমাছির গুনগুন গুঞ্জরণ যেন
পুষ্পরিক্ত মৌনী বনে। পিছু হতে সম্মুখের পথে
দিতেছ বিস্তীর্ণ করি অস্তশিখরের দীর্ঘ ছায়া
নিরন্ত ধূসরপাণ্ডু বিদায়ের গোধূলি রচিয়া।
পশ্চাতের সহচর, ছিন্ন করো স্বপ্নের বন্ধন;
রেখেছ হরণ করি মরণের অধিকার হতে
বেদনার ধন যত, কামনার রঙিন ব্যর্থতা,
মৃত্যুরে ফিরায়ে দাও। আজি মেঘমুক্ত শরতের
দূরে-চাওয়া আকাশেতে ভারমুক্ত চিরপথিকের
বাঁশিতে বেজেছে ধ্বনি, আমি তারি হব অনুগামী।[৩৮]

লক্ষণীয় যে পেত্রার্কান ভঙ্গির চতুর্দশপদী রচনার মাধ্যমে মধুসূদনের কবিজীবন সমাপ্ত আর রবীন্দ্রনাথের যথার্থ কবিজীবন শুরু। এবং চতুর্দশপদীতে সনেট-আঙ্গিকে মধুসূদন ও কাব্যভাবনায় প্রথম পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ পেত্রার্কানুসারী। অবশ্য কাব্যভাবনার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ 'কড়ি ও কোমল' থেকেই পেত্রার্কা থেকে সরে এসেছেন। পেত্রার্কার প্রেম শরীরী, কিন্তু বলা বাহুল্য 'কড়ি ও কোমলে'র পর রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কল্পনা কেবল শরীরী নয়। পুনশ্চ লক্ষণীয় যে চতুর্দশপদী সৃষ্টির প্রান্তিকে এসে রবীন্দ্রনাথ আবার রচনা করেছেন অমিল প্রবহমান।

রবীন্দ্র-কবিতায় অক্ষরবৃত্ত নিরীক্ষার আলোচনা সমাপ্তির আগে গদ্যছন্দ সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য আবশ্যক। রবীন্দ্র-রচনায় এর একটা নিরূপিত রূপ আছে। গদ্যছন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ গদ্যে যেমন বিস্তৃত আলোচনা করেছেন তেমনি 'লিপিকা', 'পুনশ্চ', 'পত্রপুট', 'আরোগ্য'-এর প্রচুর কবিতায় এর ছন্দ-নিরীক্ষার পরিচয় রেখেছেন। তার দুটি মন্তব্য স্মর্তব্য :

১। গদ্যকাব্যে অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে যে একটা সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠনপ্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীনক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে।[৩৯]

২। গদ্যই হোক পদ্যই হোক, রসরচনামাত্রেরই একটা স্বাভাবিক ছন্দ থাকে। পদ্যে সেটা সুপ্রত্যক্ষ, গদ্যে সেটা অন্তর্নিহিত। সেই নিগূঢ় ছন্দটিকে পীড়ন করলেই কাব্যকে আহত করা হয়। পদ্যছন্দবোধের চর্চা বাঁধা নিয়মের পথে চলতে পারে, কিন্তু গদ্যছন্দের পরিমাণবোধ মনের মধ্যে যদি সহজ না থাকে অলংকারশাস্ত্রের সাহায্যে এর দুর্গমতা পার হওয়া যায় না। অথচ অনেকেই মনে রাখেন না যে, যেহেতু গদ্য সহজ সেই কারণেই গদ্যছন্দ সহজ নয়।[৪০]

স্পষ্টতই গদ্যছন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনে শেষ পর্যন্ত একটা সংস্কার দানা বেঁধেছিল : পদ্যের সলজ্জ সসজ্জ ভাব ত্যাজ্য কিন্তু অন্তর্নিহিত নিগূঢ় ছন্দ প্রতিপাল্য। ফলে

রবীন্দ্র-গদ্যকবিতার রূপ নিরূপিত। একে বলা চলে অমিল অসমমাত্রিক অপ্রবহমান অক্ষরবৃত্ত। অপ্রবহমান কথাটি লক্ষণীয়। গদ্য কবিতার প্রকৃতি ও চরিত্র বর্ণনা করে রবীন্দ্রনাথ যে কবিতাংশ লিখেছেন তার দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা যেতে পারে :

কোথাও তার সমতল, কোথাও অসমতল;
কোথাও দুর্গম অরণ্য, কোথাও মরুভূমি।
একে অধিকার যে করবে তার চাই রাজপ্রতাপ;
পতন বাঁচিয়ে শিখতে হবে
নানা রকম গতি অবগতি।
বাইরে থেকে এ ভাসিয়ে দেয় না স্রোতের বেগে,
অন্তরে জাগাতে হয় ছন্দ
গুরু লঘু নানা ভঙ্গিতে।
সেই গদ্যে লিখেছি আমার নাটক,
এতে চিরকালের স্তব্ধতা আছে
আর চলতি কালের চাঞ্চল্য।[৪১]

প্রতিটি চরণের শেষেই শ্বাসযতি পড়ছে। একে অক্ষরবৃত্তে শ্রেণীবদ্ধ করার কারণ মাত্রাগণনা রীতিতে এর ভঙ্গি অক্ষরবৃত্তেরই। রবীন্দ্রনাথ অমিত্রাক্ষরের সঙ্গে এ ছন্দের পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে প্রকারান্তরে বলেছিলেন—অমিত্রাক্ষরে পয়ারের লয় হয়তো আছে, এতে তা নেই।[৪২]

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতায় ১৪, ১৮ প্রভৃতি মাত্রার চরণ অপ্রচুর নয় :

১। দুটি দুটি সরু চুড়ি সুকুমার দুটি তার হাতে।[৪৩]
২। মাথার টুপিতে উঁচু পাখির পালক।[৪৪]
৩। সে নিয়ো তোমার অর্ধনিমীলিত চোখের পাতায়।[৪৫]
৪। তত্ত্বজ্ঞানী জপ করছেন নিশ্বাসে প্রশ্বাসে।[৪৬]
৫। চিনছিলে জলস্থল-আকাশের দুর্বোধ সঙ্কেত।[৪৭]

২. মাত্রাবৃত্ত

মাত্রাবৃত্ত ছন্দের মূল সংস্কৃত ছন্দে। চর্যাপদে মাত্রাবৃত্তের ধ্বনি-দ্যোতনার নমুনা :

উমত সবরো/পাগল সবরো/মা কর গুলি গু/হারী।
তোহরি নিঅ/ঘরিণী ণামে/সহজ সুন/দরী।।[৪৮]

লক্ষণীয় যে, গুরুস্বর অস্বীকার করলে প্রথম চরণটি বাংলা মাত্রাবৃত্তের পরিণততর পর্যায়ের অনুরূপ। কিন্তু চর্যায় গুরুস্বর উপেক্ষাযোগ্য নয় এবং মাত্রাতিরেক বা পতন সুরাশ্রয়ী। এই সুরাশ্রয়ী পতন বা অতিরেক বৈষ্ণব পদাবলিতেও মেলে। তবে চণ্ডীদাসের পদে বিশুদ্ধ বাংলা উচ্চারণভঙ্গির মাত্রাবৃত্তের নমুনা রয়েছে, যেমন,

চলে নীল শাড়ী/নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত/মোর[৪৯]

এবং আধুনিক কাব্যে এসে, রবীন্দ্রনাথের পূর্বে, মধুসূদনের রচনায় এ ছন্দের যে ব্যবহার আছে তাও উল্লেখযোগ্য :

কেন এত ফুল/তুলিলি, স্বজনি—/
ভরিয়া ডালা

মেঘাবৃত হলে,/ পরে কি রজনী/
তারার মালা
আর কি যতনে/কুসুম রতনে/
ব্রজের বালা?[৫০]

রবীন্দ্র–রচনায় মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রথম সফল নিরীক্ষা হয় 'মানসী' কাব্যে। 'মানসী'র প্রথম কবিতাতেই দেখি :

চাঁপা কোথা হতে/এনেছে ধরিয়া/
অরুণকিরণ/কোমল করিয়া/
বকুল ঝরিয়া/মরিবারে চায়/
কাহার চুলে?
কেহ ভোলে, কেউ/ভোলে না যে, তাই/
এসেছি ভুলে।[৫১]

লক্ষণীয় যে উদ্ধৃতির শেষাংশের চার চরণে ৬/৬/৫ মাত্রাবিন্যাসের ফলে মধুসূদনের পূর্বোদ্ধৃত কাব্যাংশের অনুরূপ দোলা জেগেছে কিন্তু এখানে একটি বিশিষ্ট স্তবকরীতি গ্রহণ করায় এর মধ্যে নতুনত্ব সঞ্চারিত হয়েছে।

পরবর্তী কাব্য 'সোনার তরী'তে মাত্রাবৃত্তের ব্যবহারে কবি আরো স্বচ্ছন্দ :

উড়ে কুন্তল,/উড়ে অঞ্চল,/
উড়ে বনমালা/বায়ুচঞ্চল,/
বাজে কঙ্কণ/বাজে কিঙ্কিণী/
মত্ত–বোল।
দে দোল্ দোল্।
আয় রে ঝঞ্ঝা,/পরাণ–বধূর/
আবরণরাশি/করিয়া দে দূর,/
করি লুণ্ঠন/অবগুণ্ঠন–/
বসন খোল্।
দে দোল্ দোল্।[৫২]

'চিত্রা' কাব্যে মাত্রাবৃত্তে অপূর্ণ পর্ব ব্যবহারে কবি নতুন বৈচিত্র্য এনেছেন,

অন্তরমাঝে/শুধু তুমি একা/একাকী
তুমি অন্তর/ব্যাপিনী
একটি স্বপ্ন/মুগ্ধ সজল/নয়নে
একটি পদ্ম/হৃদয়বৃন্ত/শয়নে
একটি চন্দ্র/অসীম চিত্ত/গগনে
চারি দিকে চির/যামিনী।[৫৩]

'কাহিনী' ও 'কল্পনা' কাব্যে কবি মাত্রাবৃত্তের নানা ধ্বনিবৈচিত্র্য সম্পাদন করেছেন। তার দুটি দৃষ্টান্ত :

১। ভূতের মতন/চেহারা যেমন/নির্বোধ অতি/ঘোর
যা কিছু হারায়/গিন্নি বলেন/কেষ্টা বেটাই/চোর।[৫৪]

২। কেতকী কেশরে/কেশপাশ কর/ সুরভি,
ক্ষীণ কটিতটে/গাঁথি লয়ে পর/করবী,

কদম্বরেণু/বিছাইয়া দাও/শয়নে,
অঞ্জন আঁকো/নয়নে।[৫৫]

লক্ষণীয় যে মাত্রাবৃত্তের প্রতি চরণে একাধিক সমমাত্রিক পর্ব থাকায় এ ছন্দের একটা নির্ধারিত দোলা আছে এবং এ ছন্দের বদ্ধাক্ষর সর্বদা দুমাত্রা হওয়ায় সেই দোলা বেশ ধীর লয়ের। এ যাবৎ যে সমস্ত কবিতার দৃষ্টান্ত দিয়েছি তার সবই ৬ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত। কিন্তু মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কবিতা ৪, ৫, ৬ ও ৭ মাত্রার হতে পারে। বস্তুত মাত্রাবৃত্তে ছন্দের দোলায় বৈচিত্র্য আসে পূর্ণ পর্বের সংখ্যা হ্রাসবৃদ্ধি এবং অপূর্ণ পর্বে মাত্রাসংখ্যার প্রয়োজনানুসারী (পূর্ণ পর্বের মাত্রাসংখ্যা থেকে অন্তত একমাত্রা কম পর্যন্ত) ব্যবহার করে। রবীন্দ্র-রচনায় এর যে সমস্ত দৃষ্টান্ত আছে তার কয়েকটি হল :

৪ মাত্রার পর্ব

বরষার/নির্ঝরে/অঙ্কিত/কায়
দুই তীরে/গিরিমালা/কতদূর/যায়[৫৬]

স্মর্তব্য যে 'মানসী'র অন্তর্গত "নিষ্ফল উপহার' নামের এই কবিতাটি কবি পরে পরিত্যাগ করেন এবং সমগ্র কবিতাটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে লিখে 'কাহিনী' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন।[৫৭]

৫ মাত্রার পর্ব

পঞ্চশরে/দগ্ধ করে/করেছ একি/সন্ন্যাসী
বিশ্বময়/দিয়েছ তারে/ছড়ায়ে।
ব্যাকুলতর/বেদনা তার/বাতাসে উঠে/নিশ্বাসি
অশ্রু তার/আকাশে পড়ে/গড়ায়ে।
ভরিয়া উঠে/নিখিল ভব/রতি-বিলাপ/সংগীতে
সকল দিক/কাঁদিয়া উঠে/আপনি।
ফাগুন মাসে/নিমেষ-মাঝে/না জানি কার/ইঙ্গিতে
শিহরি উঠি/মুরছি পড়ে অবনী।[৫৮]

৬ মাত্রার পর্ব

হৃদয় আজি মোর/কেমনে গেল খুলি
জগত আসি সেথা/করিছে কোলাকুলি![৫৯]

৭ মাত্রার পর্বের মাত্রাবৃত্ত 'উৎসর্গ' কাব্যেও (৪৩ সংখ্যক কবিতা) দেখা যায়। এ ধরনের পর্ববিন্যাস মূলত সংস্কৃত ও সংস্কৃতভঙ্গির রচনা থেকে আহরিত। মহাভারতের আদি পর্বে (১ম অধ্যায় ১৫৩, ১৫৪), 'প্রাকৃত পৈঙ্গলমে' (১/১৯৩) এ দৃষ্টান্ত আছে; মধ্যযুগের কাব্যে গোবিন্দদাসের পদাবলিতে (গৌরলীলা) ও ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'ও (অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান) এই ছন্দের ব্যবহার দেখা যায়।[৬০] সাত মাত্রা দৈর্ঘ্যের পর্বের উচ্চারণ বাংলা ধ্বনির পক্ষে গুরুভার বিবেচনা করেই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ এ রীতির মাত্রাবৃত্তে তেমন উৎসাহ দেখান নি।

৩. স্বরবৃত্ত

স্বরবৃত্ত ছন্দ বাংলা কবিতার নিজস্ব বস্তু; ছড়ার ছন্দে এর মূল নিহিত এবং ঘুমপাড়ানি ও ছেলেভুলানো ছড়ার পঠনরীতির মধ্যেও একটা লঘু সুর বর্তমান। যার ফলে মাত্রাবৃত্তের মত

এ ছন্দের প্রাচীন রূপেও সুরাশ্রয়ী পতন বা অতিরেক আছে। ছড়ার সুরাশ্রয়ী পতন অতিরেক সরিয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বরবৃত্তকে আধুনিক কবিতায় ব্যবহার-উপযোগী করে তোলেন। তাঁর 'ক্ষণিকা' কাব্য এ ছন্দের প্রয়োগসাফল্যে উজ্জ্বল। পরিহাস-তরল প্রৌঢ় কবিচিত্ত এ ছন্দে নতুন মুক্তি পেল। লঘু সুরে তিনি অনেক গুরু কথা বললেন। অসমমাত্রার চরণ ব্যবহার করে, মিলের বৈচিত্র্য এনে এবং স্তবকবিন্যাসে চঞ্চল থেকে তিনি বাংলা কবিতায় এ ছন্দের প্রভূত সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিলেন। তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

১। যে যায় চলে/বিরাগভরে/
তারেই শুধু/আপন জেনেই/
বিলাপ করে/কাটাই, এমন/
সময় যে নেই,/সময় যে নেই।[৬১]

২। কোন্ হাটে তুই/বিকোতে চাস/
ওরে আমার/গান,
কোন্‌খানে তোর/স্থান?
পণ্ডিতেরা/থাকেন যেথায়/
বিদ্যেরত্ন/-পাড়ায়
নস্য উড়ে/আকাশ জুড়ে/
কাহার সাধ্য/দাঁড়ায়,
চলছে সেথায়/সূক্ষ্ম তর্ক/
সদাই দিবা/রাত্র—
'পাত্রাধার কি/তৈল কিম্বা/
তৈলাধার কি/পাত্র',
পুঁথিপত্র/মেলাই আছে/
মোহাধ্বান্ত/নাশন
তারই মধ্যে/একটি প্রান্তে/
পেতে চাস কি/আসন?
গান তা শুনি/গুঞ্জরিয়া/
গুঞ্জরিয়া/কহে—
নহে, নহে,/নহে।[৬২]

৩। তোমার তরে/সবাই মোরে/
করছে দোষী/
হে প্রেয়সী!/
বলছে—কবি/তোমার ছবি/
আঁকছে গানে,/
প্রণয়গীতি/গাচ্ছে নিতি/
তোমার কানে,/
নেশায় মেতে/ছন্দে গেঁথে/
তুচ্ছ কথা/

ঢাকছে শেষে/বাংলা দেশে/
উচ্চ কথা।/[৬৩]

৪। মরব না ভাই,/নিপুণিকা/
চতুরিকার/শোকে—
তারা সবাই/অন্য নামে/
আছেন মর্তলোকে।
আপাতত/এই আনন্দে/
গর্বে বেড়াই/নেচে—
কালিদাস তো/নামেই আছেন,/
আমি আছি/বেঁচে।[৬৪]

উদ্ধৃত সবগুলি অংশই 'ক্ষণিকা' কাব্য থেকে গৃহীত। এ ছাড়াও তিনি 'কড়ি ও কোমল', 'শিশু ভোলানাথ', 'পলাতকা', 'ছড়ার ছবি', 'জন্মদিনে', 'পরিশেষ', 'পূরবী' প্রভৃতি কাব্যেও সার্থকতার সঙ্গে স্বরবৃত্ত কবিতা রচনা করেছেন। 'পূরবী'র একটি দৃষ্টান্ত :

ভাবল তারা,/—এই শিখাটাই/ধ্রুবজ্যোতির/তারার সাথে/
মৃত্যুহীনের/দখিন হাতে/
জ্বলবে বিপুল/বিশ্বতলে।/
ভাবল তারা/এই শিখারই/ভীষণ বলে
রাত্রি-রানীর/দুর্গ-প্রাচীর/দগ্ধ হবে,/
অন্ধকারের/রুদ্ধ কপাট/দীর্ণ করে/ছিনিয়ে লবে/
নিত্যকালের/বিত্তরাশি;/
ধরিত্রীকে/করবে আপন/ভোগের দাসী।[৬৫]

লক্ষণীয় যে এই অংশে কেবলমাত্র পূর্ণ পর্বের অসমচরণ ব্যবহার ও ভাষার গাম্ভীর্যের সাহায্যে হালকা রসের সঞ্চার না করেও, কবি সফল স্বরবৃত্ত কবিতা রচনা করেছেন।

বস্তুত স্বরবৃত্ত ছন্দের সম্ভাবনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ এতটা নিঃসন্দিগ্ধ হন যে পরবর্তীকালে তিনি লেখেন :

এই প্রাকৃত-বাংলাতেই 'মেঘনাদবধ' কাব্য লিখলে যে বাঙালিকে লজ্জা দেওয়া হত সে কথা স্বীকার করব না। কাব্যটা এমনভাবে আরম্ভ করা যেত—

যুদ্ধ যখন সাঙ্গ হল বীরবাহু বীর যবে
বিপুল বীর্য দেখিয়ে হঠাৎ গেলেন মৃত্যুপুরে
যৌবনকাল পার না হতেই। কও মা সরস্বতী,
অমৃতময় বাক্য তোমার, সেনাধ্যক্ষপদে
কোন্ বীরকে বরণ করে পাঠিয়ে দিলেন রণে
রঘুকুলের পরম শত্রু, রক্ষকুলের নিধি।

এতে গাম্ভীর্যের ত্রুটি ঘটেছে এ-কথা মানব না।[৬৬]

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির প্রতিবাদ করে মোহিতলাল মজুমদার লেখেন :

'গাম্ভীর্যের ত্রুটি ঘটেছে এ-কথা মানব না'—এই যুক্তিই কি যথেষ্ট? এই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া কোন সাহিত্যিক সন্দীপ যদি 'বলাকা' কবিতাটির রীতি বদলাইয়া দেয়, অথবা ঘটাং ঘটাং করিয়া তাল-ঠোকা ছন্দে 'শাজাহান' কবিতাটি পড়িতে থাকে, তবে তাহার দোষ

> বীরত্বব্যঞ্জনায় 'বলাকা'র কবিতাগুলির সুর কি অক্ষুণ্ন থাকিবে? রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধের মাত্র কয়েক ছত্র এই অপূর্ব্ব ছন্দে প্যারাফ্রেজ করিয়াছেন, সমগ্র মেঘনাদবধ কাব্যখানি একটানা এই ভেক-প্রলম্ফী ছন্দে রচনা করিলে কেমন হয়, তাহাকে লিখিয়া দেখিতে বলি না—কল্পনা করিতে বলি।[৬৭]

বলা বাহুল্য 'মেঘনাদবধ কাব্য'র ছন্দ পরিবর্তন প্রচেষ্টা আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। কেননা কাব্যের ছন্দ বাইরের কোনো পোশাকী বস্তু নয়, ছন্দ কবিতারই অন্তর্গত। এই কারণেই যা কবিতা নয় তার ছন্দ বিচার শুধু নিষ্প্রয়োজন নয়, হাস্যকর। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ছন্দ 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র বক্তব্য, কবিমানস, অলঙ্কার ও ভাষার সঙ্গে ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ। তাই মোহিতলালের উষ্মার সঙ্গত কারণ স্বীকার্য। তবে মোহিতলাল সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সমগ্র তাৎপর্য বিবেচনা করেন নি। বস্তুতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ 'মেঘনাদবধে'র ছন্দ পালটে ফেলার সুপারিশ যে করেছেন, তা নয়। তিনি শুধু স্বরবৃত্ত ছন্দের সম্ভাবনার কথা বোঝাতে চেয়েছেন। হয়তো-বা 'মেঘনাদবধে'র উল্লেখ না করে অন্য দৃষ্টান্ত দিলেও চলত এবং রবীন্দ্রনাথ তো তাঁর নিজের অনেক রচনাতেই স্বরবৃত্তের শক্তি ও সম্ভাবনার নিরীক্ষা-উত্তীর্ণ রূপ দেখিয়েছেন।

টীকা

১ ১২৯১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ চৈত্র ১৩৭০।

২ ঐ, পৃ. ১৬৩।

৩ ১২৯৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। রচনাবলী-১।

৪ ঐ, পৃ ৩৪০।

৫ ১২৯৭ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ভাদ্র ১৩৭০।

৬ ঐ, পৃ ২৬০।

৭ "রাজর্ষি উপন্যাসের প্রথম অংশ থেকে নাট্যাকারে রচিত" 'বিসর্জন' ১২৯৭ সালে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। রচনাবলী-২।

৮ ঐ, পৃ ২৯৬-৭।

৯ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১২৯৯ সালে। *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* তৃতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৩৭১।

১০ ঐ. পৃ ২০০।

১১ গ্রন্থাকারে ১৩০০ সালে প্রকাশিত হয়। রচনাবলী-৩।

১২ কবিতাটি ১৭ই চৈত্র ১২৯৯ সালে রচিত। রচনাবলী-৩, পৃ ৫৮।

১৩ ঐ, পৃ ৫৫-৫৬।

১৪ "বিদায় অভিশাপ চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে একত্রে গ্রথিত হইয়া ১৩০১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।" "গ্রন্থপরিচয়", *রবীন্দ্র-রচনাবলী'* চতুর্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ মার্চ ১৯৫৭, পৃ ৫৫৮।

১৫ "মালিনী সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থাবলীর (আশ্বিন ১৩০৩) অন্তর্গত হইয়া প্রথম প্রকাশিত হয়।" রচনাবলী-৪, পৃ ৫৫৮।

১৬ ১৩০২ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। রচনাবলী-৪।

১৭ ২৩ ফাল্গুন ১৩০০ সালে রচিত। রচনাবলী-৪, পৃ ৩৬।
১৮ ঐ, পৃ ৩২।
১৯ ২৩ অগ্রহায়ণ ১৩০২ সালে রচিত। রচনাবলী-৪, পৃ ৮৪।
২০ ঐ, পৃ ৮২।
২১ ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত 'পদ্মাবতী' নাটকের কয়েকটি সংলাপে মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করেন। এই সময়ে (১৫ই মে ১৮৬০) রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্রে মধুসূদন লেখেন—"I am of opinion that our drama should be in blank verse and not in prose, but the innovation must be brought about by degrees."—যোগীন্দ্রনাথ বসু, *'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত'*, চতুর্থ সংস্করণ, পৃ ৩১৬-১৭।
২২ ঐ, পৃ ৬৭৮-৮০ দ্রষ্টব্য।
২৩ গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ১৩০৬ সাল। রচনাবলী-৫, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ আশ্বিন ১৩৭০।
২৪ গ্রন্থাকারে ১৩০৭ সালের বৈশাখে প্রকাশিত হয়। রচনাবলী-৭, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ফাল্গুন ১৩৬৭।
২৫ ঐ, পৃ ১২৭।
২৬ ঐ, পৃ ১৮৫।
২৭ ঐ, পৃ ১৯৪।
২৮ ঐ, পৃ ১৯৮।
২৯ ঐ।
৩০ গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৩২৩ সাল (১৯১৬)। রচনাবলী-১২, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ পৌষ ১৩৬৭।
৩১ ঐ, পৃ ১৩। 'বলাকা'-৬, "ছবি" নামে 'সবুজপত্রে' অগ্রহায়ণ ১৩২১ সালে প্রকাশিত।
৩২ অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য সংকলিত রবীন্দ্রনাথের সনেট বা সনেটকল্প রচনার সম্পূর্ণ তালিকা হচ্ছে :

'কড়ি ও কোমল' (৫৮টি) :

প্রাণ, হৃদয়ের ভাষা, ছোটো ফুল, যৌবনস্বপ্ন, ক্ষণিক মিলন, গীতোচ্ছ্বাস, স্তন (১,২), চুম্বন, বিবসনা, বাহু, চরণ, হৃদয়-আকাশ, অঞ্চলের বাতাস, দেহের মিলন, তনু, স্মৃতি, হৃদয়-আসন, কল্পনার সাথী, হাসি, নিদ্রিতার চিত্র, কল্পনা-মধুপ, পূর্ণ মিলন, শ্রান্তি, বন্দী, কেন, মোহ, পবিত্র প্রেম, পবিত্র জীবন, মরীচিকা, গান-রচনা, সন্ধ্যার বিদায়, রাত্রি, বৈতরণী, মানবহৃদয়ের বাসনা, সিন্ধুগর্ভ, ক্ষুদ্র অনন্ত, অস্তমান রবি, অস্তাচলের পরপারে, প্রত্যাশা, স্বপ্নরুদ্ধ, অক্ষমতা, জাগিবার চেষ্টা, কবির অহংকার, বিজনে, সিন্ধুতীরে, সত্য (১,২), আত্মাভিমান, আত্ম-অপমান, ক্ষুদ্র আমি, প্রার্থনা, বাসনার ফাঁদ, চিরদিন (৪), শেষ কথা।

'মানসী' (৪টি) :

তবু, নিষ্ফল প্রয়াস, হৃদয়ের ধন, নিভৃত আশ্রম।

'সোনার তরী' (৮টি) :

সোনার বাঁধন, মায়াবাদ, খেলা, বন্ধন, গতি, মুক্তি, অক্ষমা, দরিদ্রা, আত্মসমর্পণ।

'চিত্রা' (৪টি) :

মরীচিকা, প্রস্তর মূর্তি, প্রৌঢ়, ধূলি।

'চৈতালী' (৬৮টি) :

দেবতার বিদায়, পুণ্যের হিসাব, বৈরাগ্য, সামান্য লোক, প্রভাত, দুর্লভ জন্ম, খেয়া, বনে ও রাজ্যে, সভ্যতার প্রতি, বন, তপোবন, প্রাচীন ভারত, ঋতুসংহার, মেঘদূত, দিদি, পরিচয়, অনন্ত

পথে, ক্ষণমিলন, প্রেম, পুঁটু, হৃদয়ধর্ম, মিলনদৃশ্য, দুই বন্ধু, সঙ্গী, সতী, স্নেহদৃশ্য, করুণা, স্নেহগ্রাস, বঙ্গমাতা, অভিমান, পরবেশ, সমাপ্তি, ধরাতল, তত্ত্ব ও সৌন্দর্য, মানসী, নারী, প্রিয়া, ধ্যান, মৌন, অসময়, শেষ কথা, বর্ষশেষ, অভয়, অনাবৃষ্টি, অজ্ঞাত বিশ্ব, ভয়ের দুরাশা, ভক্তের প্রতি, নদীযাত্রা, মৃত্যুমাধুরী, স্মৃতি, বিলয়, প্রথম চুম্বন, শেষ চুম্বন, যাত্রী, তৃণ, ঐশ্বর্য, স্বার্থ, প্রেয়সী, শান্তিমন্ত্র, কালিদাসের প্রতি, কুমারসম্ভবগান, মানসলোক, কাব্য, ইছামতী নদী, শুশ্রূষা, আশিসগ্রহণ, বিদায়।

'কল্পনা' (২টি) :

আশা, অনবচ্ছিন্ন আমি।

'নৈবেদ্য' (৭৮টি) :

২২–৯৯ সংখ্যক কবিতাগুচ্ছ।

'স্মরণ' (১৮টি) :

৫–১২, ১৪–১৯, ২১–২৪।

'উৎসর্গ' (১৮টি) :

২২, ২৪–২৯, ৩২, ৪৬ (১, ২); সংযোজন ৪–১১।

'গীতালি' (২টি) :

আশীর্বাদ, ১০৮।

'পূরবী' (৫টি) :

শেষ অর্ঘ্য, সমুদ্র (১, ২, ৩), অতিথি।

'মহুয়া' (৪টি) :

স্পর্ধা, রাখিপূর্ণিমা, আহ্বান, পুরাতন।

'বনবাণী' (১টি) :

দেবদারু।

'পরিশেষ' (১০টি) :

আশীর্বাদ, মুক্তি (১, ২), লেখা, আশীর্বাদ, প্রতীক্ষা, মিলন; সংযোজন—লক্ষ্যশূন্য, পরিণয়মঙ্গল, উত্তিষ্ঠিত নিবোধত।

'প্রান্তিক' (৪টি) :

৩, ৫, ১৪, ১৬।

'সেঁজুতি' (১টি) :

প্রাণের দান।

৩৩ জগদীশ ভট্টাচার্য, *'সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ'*, চৈত্র ১৩৬৪, পৃ ৮০–৮৪ দ্রষ্টব্য।

৩৪ ঐ, পৃ ২১১।

৩৫ ঐ, পৃ ১৯৬–৭।

৩৬ "ছোটোফুল", 'কড়ি ও কোমল', রচনাবলী–২, পৃ ৭৪–৭৫।

৩৭ জগদীশ ভট্টাচার্য, পৃ ২৫৪–৫৫ দ্রষ্টব্য।

৩৮ 'প্রান্তিক'–৫। ঐ, পৃ ২০৯–১০ দ্রষ্টব্য।

৩৯ "ভূমিকা", 'পুনশ্চ', রচনাবলী–১৬, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৩৬০, পৃ ৩।

৪০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ছন্দ' (প্রবোধচন্দ্র সেন সম্পাদিত), বিশ্বভারতী, পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৯৬২ নভেম্বর, পৃ ১৬৪–৬৫।

৪১ "নাটক", 'পুনশ্চ', রচনাবলী–১৬, পৃ ১২–১৩।

৪২ 'ছন্দ', পৃ ১৬৩-৬৪ দ্রষ্টব্য।

৪৩ "ভীরু", 'পুনশ্চ', রচনাবলী-১৬, পৃ ৯৩।

৪৪ "খেলনার মুক্তি", 'পুনশ্চ', রচনাবলী-১৬, পৃ ৭৭।

৪৫ "তোমার অন্যযুগের সখা", 'পত্রপুট',-চৌদ্দো, রচনাবলী-২০, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৩৬১, পৃ ৪১।

৪৬ "আমি", 'শ্যামলী', রচনাবলী-২০, পৃ ৬৫।

৪৭ "আফ্রিকা", 'পত্রপুট',-ষোলো, রচনাবলী-১০, পৃ ৪৯।

৪৮ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত Buddhist Mystic Songs, পৃষ্ঠা ৫১, চর্যা ২৮।

৪৯ এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যের জন্য দ্রষ্টব্য : প্রবোধচন্দ্র সেন, 'ছন্দগুরু রবীন্দ্রনাথ', পৃ ১৮৩।

৫০ মাইকেল মধুসূদন দত্ত, "কুসুম", 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ ১৩৬৬, পৃ ১৫।

৫১ "ভুল", 'মানসী', রচনাবলী-২, পৃ ১২০।

৫২ "ঝুলন", 'সোনার তরী', রচনাবলী-৩, পৃ ৯৭।

৫৩ "চিত্রা", 'চিত্রা', রচনাবলী-৪, পৃ ২১।

৫৪ "পুরাতন ভৃত্য", 'কাহিনী', রচনাবলী-৭, পৃ ৯৬।

৫৫ "বর্ষামঙ্গল", 'কল্পনা', রচনাবলী-৭, পৃ ১২৩।

৫৬ "নিষ্ফল উপহার", 'মানসী', রচনাবলী-৭, "গ্রন্থপরিচয়", পৃ ৫২৮।

৫৭ "নিষ্ফল উপহার", 'কাহিনী', রচনাবলী-৭, পৃ ১০৭।

৫৮ "মদনভস্মের পর", 'কল্পনা', রচনাবলী-৭, পৃ ১৩১।

৫৯ "প্রভাত উৎসব", 'প্রভাতসংগীত, রচনাবলী-১, পৃ ৬২।

৬০ "প্রবোধচন্দ্র সেন", 'ছন্দগুরু রবীন্দ্রনাথ', পৃ ৬৫-৭৭ দ্রষ্টব্য।

৬১ "অনবসর", 'ক্ষণিকা', রচনাবলী-৭, পৃ ২১৬।

৬২ "যথাস্থান", ঐ পৃ ২২০।

৬৩ "ক্ষতিপূরণ", ঐ, পৃ ২৪০।

৬৪ "সেকাল", ঐ, পৃ ২৫০।

৬৫ "বিজয়ী", 'পূরবী', রচনাবলী-১৪, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ ১৩৭১, পৃ ৪। 'পূরবী' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৩২ সালে।

৬৬ "ছন্দের প্রকৃতি", 'উদয়ন', ১৩৪১ বৈশাখ; 'ছন্দ', পৃ ১৩১।

৬৭ মোহিতলাল মজুমদার, "আধুনিক সাহিত্যের ভাষা", 'সাহিত্য-বিচার', দ্বি-স, কলিকাতা, ১৮৯৭ শকাব্দ, পৃ ১৮৯।

অজিতকুমার গুহ

রবীন্দ্রকাব্যে পরবর্তী পরিবর্তন

ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। 'চয়নিকা' খুলে এখানে-ওখানে পাতা উল্টাতেম—মাঝে মাঝে থমকে থেমে গুনগুন স্বরে আবৃত্তি করতেম—সারাদিন কী-যে শব্দ-সঙ্গীতের উন্মাদনার মধ্যে দিন কেটে যেত বলতে পারি নে। সেদিন আমার বালক মন ও কানের কাছে এ যেন একটা নেশার মতো ছিল। বারবার ফিরে ফিরে পড়ে তৃপ্তি নেই। মনে আছে, 'ক্ষণিকা'র "আবির্ভাব" আর 'কল্পনা'র "দুঃসময়" ও "বর্ষামঙ্গল" আমার সবচেয়ে প্রিয় ছিল। শব্দসুষমার কী আশ্চর্য সমাবেশ, ধ্বনির কী অপূর্ব সমারোহ!

"আবির্ভাবে" যখন পড়তেম :

সেদিন দেখেছি ক্ষণে ক্ষণে
তুমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে বনতল
নুয়ে নুয়ে যেত ফুলদল।...
পেয়েছিনু যেন ছায়াপথে যেতে
তব নিশ্বাস পরিমল—
ছুঁয়ে যেতে যবে বনতল।

আর "বর্ষামঙ্গলে" :

গুরু গর্জনে নীল অরণ্য শিহরে
উতলা কলাপী কেকাকলরবে বিহরে—

তখন 'ল' বর্ণের অনুপ্রাস হয়ে খেলা করতে করতে জিভ আমার আনন্দে নৃত্য করত। বাস্তবিক 'ল'-এর মতো তরল মধুর ধ্বনি বুঝি আমাদের ভাষায় আর নেই;—আর মধুরতর তার অনুপ্রাস। আমার সমস্ত কান ও মন শব্দসমুদ্রের কোন অতলতায় তলিয়ে যেত—জুড়িয়ে যেত সমস্ত চেতনাপ্রবাহ। সেদিনকার তরুণ পাঠকের মনের তার যে স্তরে বাঁধা ছিল তাতে কোন অপরূপ অঙ্গুলিস্পর্শে ঝঙ্কার জেগে উঠেছিল। কাকে বলে কবিকর্ম, আঙ্গিক ও ছন্দ কিছুই জানতেম না—শুধু ধ্বনির একটা রেশ জেগে থাকত আর তন্ময় হয়ে থাকতেম।

তারপর আরো কিছুদিন গেল। 'চয়নিকা'র যুগ কেটে গিয়ে 'সঞ্চয়িতা'র যুগ এল। ইতোমধ্যে অলঙ্কারশাস্ত্রের সঙ্গে অল্প অল্প পরিচয় ঘটছে। যখন পড়েছি : "শব্দার্থ শাসনজ্ঞান

মাত্রে নৈব ন বেদ্যতে বেদ্যতে সহি কাব্যার্থ তত্ত্বজ্ঞৈরের কেবলম।" অর্থাৎ "কাব্যের আসল প্রাণ ধ্বনি; কিন্তু এ ধ্বনির মর্ম কেবল শব্দের ওপর দখল ও তার জ্ঞান থেকেই পাওয়া যায় না", তখনি ছেলেবেলার সেই কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলো মনে করতে চেষ্টা করেছি। এবারে 'সঞ্চয়িতা' খুলে আমার প্রিয় কবিতাগুলো আবার পড়তে গেলেম—কিন্তু এ কী! আমার এত সাধের পঙ্‌ক্তিগুলোর সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে—তাদের ধ্বনিরূপ আমূল বদলে গেছে। আগে পড়তেম :

গুরু গর্জনে নীল অরণ্য শিহরে
উতলা কলাপী কেকাকলরবে বিহরে
নিখিল চিত্ত হরষা
ঘন গৌরবে আসিছে মত্ত বরষা।

আর এখন পড়ি :

গুরু গর্জনে নীপ মঞ্জরী শিহরে
শিখিদম্পতি কেকাকল্লোলে বিহরে
দিগ্বধূচিত—হরষা
ঘনগৌরবে আসে উন্মাদ বরষা।।

হঠাৎ যেন এ পরিবর্তনের জন্যে মন প্রস্তুত ছিল না। তাই একটা আঘাত পেলেম। নিম্নরেখ শব্দগুলোর পরিবর্তন বারবার লক্ষ করে মন আমার হঠাৎ মূল সুরটি আবিষ্কার করে খুশি হয়ে উঠল। বুঝতে পেলাম, "বর্ষামঙ্গল" কবিতার যে রাজকীয় সমারোহ ও ধ্বনি-গাম্ভীর্যসৃষ্টি কবির মূল লক্ষ্য—"উতলা কলপী কেকাকলরবে"তে তার সুর নেমে গিয়েছিল। অত্যন্ত হালকা আনন্দসঙ্গীত সৃষ্টি হয়েছিল এ শব্দযোজনায়। এ কবিতায় প্রথম স্তবকে দীর্ঘস্বরের অনুপ্রাসে সুর ও তালের যে গাম্ভীর্য ও গভীরতা জেগে উঠেছিল এই পঙ্‌ক্তিতে এসে সেই তাল যেন কেটে নিচে নেমে গিয়েছিল। পরিবর্তনগুলো ভালো করে লক্ষ করলেই দেখা যায় অযুগ্ম স্বল্পপ্রাণ ধ্বনির পরিবর্তে কবি ঘনসন্নিবিষ্ট যুগ্মধ্বনির পুঞ্জীভূত রূপ ব্যবহার করেছেন। ঠিক এরই যেন একান্ত প্রয়োজন ছিল। নিজের কাছেই এ কথাটা গোপন রইল না যে আমারও কাব্যরসাস্বাদনের স্তর বদলে গেছে। সেদিন মনের তারগুলো যে স্তরে বাঁধা ছিল আর তা নেই—তার সুরের পরদা পরিবর্তিত হয়েছে। আজ ধ্বনির এই গভীর ও গম্ভীর রূপের মধ্যেই মন যেন স্থায়ী আনন্দ পায়। এ কবিতাটির অন্যান্য শব্দ ও শব্দগুচ্ছের পরিবর্তনও একইভাবে চোখে পড়ে। আগে যেখানে ছিল : "তড়িৎচকিত নয়না", এখন সেখানে দেখি : "কিঙ্কিণী কলকলনা"। কেবলমাত্র যুগ্মধ্বনির সমাবেশ নয়—হ্রস্বস্বরধ্বনি দীর্ঘস্বরধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়েছে। 'কল্পনা'য় "দুঃসময়" কবিতাটির একটি পূর্বরূপ আছে। পূর্বরূপে কবিতাটির নাম ছিল "স্বর্গপথে"। সেখানে পড়ি :

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ চরণে ...
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত গগনে ...

কিন্তু পরিবর্তিত রূপে পড়ি :

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে ...
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে ....

নিম্নরেখ শব্দ দুটির পরিবর্তন লক্ষ করলে একই সত্য প্রমাণিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে ও কাব্যে পরিবর্তনের অবধি নেই। এই পরিবর্তনগুলোতে কোথাও স্থূলতা বর্জন করে ভাবকে বিশুদ্ধ ও পরিমার্জিত করার, কোথাও সংযত করার প্রয়াস দেখি।

কিন্তু কাব্যে শব্দযোজনার পরিবর্তন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার মূল ধ্বনিরূপ বা প্রাণবস্তুর প্রতিষ্ঠার জন্যেই হয়েছে। সে পরিণতি তরলতা থেকে গভীরতার পরিণতি—জটিলতা থেকে সহজ সুরে পরিণতি।

'ধ্বন্যালোক' বলেন— এ যেন রমণীদেহে লাবণ্যের মতো অবয়বের সৌন্দর্য নয়, অলংকরণের প্রাচুর্য নয়—এ ধ্বনি তারও অতীত বস্তু। সত্য দৃষ্টির পরিমিতিবোধ দিয়েই এতে অধিকার জন্মে। সার্থক কাব্য তাই আত্মার যে গহন আনন্দময় রহস্যলোকে নিয়ে যায় — তা শ্রুতিগম্য শব্দের অতীত। আমাদের ইন্দ্রিয়চেতনার উর্ধ্বে এক অতিচেতনার স্তরে তা মানবাত্মাকে নিয়ে যায় । সে জগৎ ধ্বনিস্বরূপ।

রবীন্দ্রকাব্যে পরিবর্তিত শব্দযোজনা এই একই লক্ষ্যের অভিমুখে নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু কবির কাছে এটা সচেতন শিল্পরূপ নয়, স্বাভাবিক ও স্বতোৎসারিত।

রবীন্দ্রকাব্যের বিরাট পরিধির মধ্যেই এই পরিবর্তনের ধারা যেমন বহুধা তেমনি বিচিত্র। প্রকাশের অতৃপ্তির অমেয় বেদনা কবিচিত্তকে বারবার উদ্বেল করে তুলেছে যখনই তিনি আপন অতীত সৃষ্টির দিকে ফিরে তাকিয়েছেন। একই ভাবপরিকল্পনাকে কত বিচিত্র আঙ্গিকের মাধ্যমে প্রকাশের প্রয়াস তার আর অবধি নেই। 'কালের যাত্রা'য় যে কবি বলেছেন, "আমি তাল রেখে গান গেয়ে যাবো", সেই কবির বিবর্তনশীল চেতনাকে আমরা এই ভাব ভাষা ও ছন্দের সামঞ্জস্যবিধানের মধ্যে দেখতে পাই। কাব্যসৃষ্টির গোড়া থেকে শুরু করে শেষ অবধি একটি সামগ্রিক ঐক্যসূত্র স্থাপনের কামনাও এরই মধ্যে বিধৃত। একই কাহিনীকে ছোটগল্পে ও নাটকে রূপান্তর ('মুক্তির উপায়'), উপন্যাস ও নাটকের একই ভাব-পরিকল্পনা ('রাজর্ষি', 'বিসর্জন'), কাব্যনাট্যগুলিকে নৃত্যনাট্যে রূপান্তর, কবিতাকে অবলম্বন করে নাটক রচনা, এ সব তো আছেই, আবার একই নাট্যকাহিনীকে নাটকের আঙ্গিকের মধ্যে বারবার রূপান্তরের প্রয়াসও দেখা যায় ('প্রায়শ্চিত্ত')।

কবিতার ক্ষেত্রে পরিবর্তনের এই ধারাকে কয়েকটি সূত্রের মধ্যে দেখা যায়।

১. ব্যক্তিগত ভাবের প্রকাশকে বিশ্বজনীন ভাবে রূপান্তর
২. পূর্বতন কবিতার বহু স্তবক বর্জন দ্বারা ভাবের সামঞ্জস্যবিধান
৩. ছন্দের সংস্কারের জন্য পরিবর্তন
৪. ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান ও শ্রুতিমাধুর্যের জন্য শব্দের পরিবর্তন।

আমরা 'মানসী' নিয়েই আমাদের এই আলোচনা শুরু করতে চাই। কারণ কবির মতে এই সময় থেকেই তাঁর "কাব্য ভূসংস্থানে ডাঙা জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে।"

কেবল কাব্যের শিল্পগত উৎকর্ষের জন্যে নয়, বাংলা ছন্দের ইতিহাসে 'মানসী' একটি বিশেষ স্থান জুড়ে আছে। সংস্কৃত ছন্দের অনুসরণে যুগ্মধ্বনিকে দুইমাত্রা গণনার প্রথম সচেতন প্রচেষ্টা 'মানসী'তেই দেখা যায় আর এর থেকেই রবীন্দ্রকাব্যে মাত্রা ছন্দের বিকাশ। প্রথম আভাস অবিশ্যি আমরা 'কড়ি ও কোমলে'ই দেখতে পাই। একটু দীর্ঘ হলেও কবির উদ্ধৃতি এ ব্যাপারে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

> কাব্যলীলা একদিন যখন শুরু করেছিলেম তখন বাংলা সাহিত্যে সাধুভাষারই ছিল একাধিপত্য। অর্থাৎ তখন ছিল কাটা-কাটা পিঁড়িতে ভাগ করা ছন্দ। এই আইনের অধীনে যতক্ষণ পয়ারের এলাকায় থাকি ততক্ষণ আসনপীড়া ঘটে না। কিন্তু তিনমাত্রামূলক ছন্দের দিকে আমার একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। ঐ ছন্দে প্রত্যেক অক্ষরে স্বতন্ত্র আরূঢ় সকল ওজনের ধ্বনিকেই সমান দরের একক বলে ধরে নিতে বারংবার কানে বাজত। সেইজন্য যুক্ত-অক্ষর অর্থাৎ যুগ্মধ্বনি বর্জন করবার একটা দুর্বল অভ্যাস আমাকে ক্রমেই পেয়ে

বসেছিল। ঠোকর খাবার ভয়ে পদগুলোকে একেবারে সমতল করে যাচ্ছিলুম। সব যায়গায় পেরে উঠি নি, কিন্তু মোটের উপর চেষ্টা ছিল। তাই যখন লিখেছিলুম,

কঠিন বাঁধনে চরণ বেড়িয়া
চিরকাল তোরে রব আঁকড়িয়া
লৌহ শৃঙ্খলের ডোর।

মনে খটকা লেগেছিল, কান প্রসন্ন হয় নি। তখন ছন্দের সদর রাস্তাও গ্রাম্য রাস্তার মতো এবড়ো-খেবড়ো থাকত, অভ্যাসের গতিকে কেউ সেটাকে নিন্দনীয় বলে মনেও করে নি।

কবির এই উদ্ধৃতি থেকে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে যৌগিক পয়ারের পঠনরীতি ও মাত্রাবৃত্ত পয়ারের পঠনরীতির পার্থক্য তখনো সুস্পষ্টরূপে পাঠকদের কানে লাগত না। কিন্তু 'কড়ি ও কোমল'র "রাহুর প্রেম" কবিতাটির ঢং মাত্রাবৃত্তের, অর্থাৎ এই কবিতার পঠনরীতিতে যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ সঙ্কুচিত হয় না, নেই তার সেই "শোষণশক্তি" অথবা তান-প্রধান রীতিতে টেনে পড়ে যাওয়ার সুযোগ। তাই "লৌহশৃঙ্খলের ডোর" এই পদটিতে যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ সম্প্রসারিত,—সঙ্কুচিত নয়। তাই মনে খটকা লেগেছে এবং কান প্রসন্ন হয় নি।

'কড়ি ও কোমল'র পর এসেছে 'মানসী'র যুগ। 'মানসী'তে এসেও এই যুক্তাক্ষর বা যুগ্মধনির সমস্যা একইভাবে রয়ে গেল। কবি বলেছেন যে, "আমার বিশ্বাস যুক্তাক্ষরকে দুই অক্ষরস্বরূপ গণনা করাই স্বাভাবিক এবং তাহাতে ছন্দের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। কেবল বাংলা ছন্দ পাঠ করিয়া বিকৃত অভ্যাস হওয়াতেই সহসা তাহা দুঃসাধ্য মনে হইতে পারে।"

কবি যাকে বাংলা ছন্দপাঠের বিকৃত অভ্যাস বলে নিন্দা করেছেন পরবর্তীকালে তার থেকেই একটি সুস্পষ্ট বাংলা ছন্দ তিনি সৃষ্টি করেছেন। এই নতুন ছন্দকেই বাংলায় বলা হয়, মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। 'মানসী'তে এই যুগ্মধ্বনির ব্যবহার সম্পর্কে কবি লিখছেন,—"এই গ্রন্থের অনেকগুলি কবিতায় যুক্তাক্ষরকে দুই অক্ষরস্বরূপ গণ্য করা হইয়াছে। সেরূপ স্থলে সংস্কৃত ছন্দের নিয়ম অনুসারে যুক্তাক্ষরকে দীর্ঘ করিয়া না পড়িলে ছন্দ রক্ষা করা অসম্ভব হইবে।" কিন্তু আজকের দিনে এ কথাটা আর অস্পষ্ট নেই যে যুগ্মধ্বনির সম্প্রসারিত উচ্চারণের যে পঠনপদ্ধতি তা যৌগিক বা অক্ষরবৃত্ত-ছন্দের কাঠামোর মধ্যে সাধারণত সম্ভবপর নয়। বাংলা মাত্রাবৃত্ত ছন্দের মধ্যেই এই সম্প্রসারিত উচ্চারণ স্বাভাবিক।

কবি যে "নিষ্ফল উপহার" কবিতাটি থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন, সেই কবিতাটিকে দৃষ্টান্ত দিয়েই আমাদের কথাটা আরো একটু বিশ্লেষণ করতে চাই।

নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল;
ঊর্ধ্বে পাষাণ-তট শ্যাম শিলাতল।

এখানে "নিম্নে", "স্বচ্ছ" এবং "ঊর্ধ্বে" এই কয়টি শব্দে তিন মাত্রা গণনা না করলে পয়ার ছন্দ থাকে না। যুক্তাক্ষর বা যুগ্মধ্বনিকে এই দুই মাত্রা হিসেবে গণনার রীতিই কলামাত্রিক বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দের সূচনা। তবু এ কবিতার ছন্দে কবির কান যে সম্পূর্ণ খুশি হতে পারে নি তার প্রমাণ পরবর্তীকালে কবিতাটির ছন্দের আমূল পরিবর্তন। এ কবিতার তৃতীয় স্তবকের তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে, "তৃণহীন সু-কঠিন বিদীর্ণ ধরায়"—"বিদীর্ণ" যুক্তাক্ষর হিসেবে দুই মাত্রা অথচ "তৃণ" আদিতে থাকার জন্যে এক মাত্রা। আমার মনে হয় এইজন্য কবি পরবর্তীকালে 'কাহিনী'তে এই কবিতাটিকে যৌগিক বা অক্ষরবৃত্ত পদ্ধতিতে সম্পূর্ণরূপ দান করেন এবং 'কাহিনী'র কবিতাটিতে প্রচুর যুক্তাক্ষর ব্যবহার করা সত্ত্বেও তা কানে লাগে নি। 'মানসী' কাব্যগ্রন্থে ও 'কাহিনী' কাব্যে একই কবিতার এই রূপান্তর পাশাপাশি রেখে দুটি কবিতা পড়লেই

বোঝা যাবে যে যৌগিক বা অক্ষরবৃত্ত রীতিতে পড়ার জন্যে যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ সঙ্কুচিত হয় এবং তা বাংলা উচ্চারণের স্বাভাবিক রীতিতে সুন্দরভাবে খাপ খায়। আমরা এখানে পাশাপাশি দুটি কবিতাই তুলে দিচ্ছি। 'মানসী'তে এ কবিতার প্রথম স্তবকের তৃতীয় পঙ্ক্তিতে "গহ্বর" কথাটিকে চার মাত্রা গণনা করলে কানে একটু খটকা লাগে বৈকি।

'মানসী' : "নিষ্ফল উপহার"

নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল।
ঊর্ধ্বে পাষাণ তট, শ্যাম শিলাতল।
মাঝে গহ্বর তাহে পশি জলধার
ছল ছল করতালি দেয় অনিবার।

বরষার নির্ঝরে অঙ্কিত কায়
দুই তীরে গিরিমালা কতদূর যায়।
স্থির তারা, নিশিদিন তবু যেন চলে
চলা যেন বাঁধা আছে অচল শিকলে।
মাঝে মাঝে শাল তাল রয়েছে দাঁড়ায়ে
মেঘেরে ডাকিছে গিরি হস্ত বাড়ায়ে।
তৃণহীন সুকঠিন বিদীর্ণ ধরা,
রৌদ্রবরণ ফুলে কাঁটাগাছ ভরা।

দিবসের তাপ ভূমি দিতেছে ফিরায়ে
দাঁড়ায়ে রয়েছে গিরি আপনার ছায়ে
পথহীন জনহীন শব্দবিহীন।
ডুবে রবি যেমন সে ডুবে প্রতিদিন।

রঘুনাথ হেথা আসি যবে উতরিলা
শিখগুরু পড়িছেন ভগবৎ-লীলা।
রঘু কহিলেন নমি চরণে তাঁহার,
"দীন আনিয়াছে প্রভু হীন উপহার।"

বাহু বাড়াইয়া গুরু শুধায়ে কুশল
আশিসিলা মাথায় পরশি করতল।
কনকে-হীরকে গাঁথা বলয় দু'খানি
গুরু-পদে দিলা রঘু জুড়ি দুই পাণি।

ভূমিতল হতে বালা লইলেন তুলে,
দেখিতে লাগিলা প্রভু ঘুরায়ে আঙুলে।
হীরকের সূচিমুখ শতবার ঘুরি
হানিতে লাগিল শত আলোকের ছুরি।

ঈষৎ হাসিয়া গুরু পাশে দিল রাখি
আবার সে পুঁথি পরে নিবেশিলা আঁখি।

'কাহিনী' : "নিষ্ফল উপহার"

নিম্নে আবর্তিয়া ছুটে যমুনার জল
দুই তীরে গিরিতট, উচ্চ শিলাতল।
সংকীর্ণ গুহার পথে মূর্চ্ছি জলধার
উন্মত্ত প্রলাপে ওঠে গর্জি অনিবার।

এলায়ে জটিল বক্র নির্ঝরের বেণী
নীলাভ দিগন্তে ধায় নীল গিরিশ্রেণী।
স্থির তারা নিশিদিন তবু যেন চলে—
চলা যেন বাঁধা আছে অচল শিকলে।
মাঝে মাঝে শাল তাল রয়েছে দাঁড়ায়ে
মেঘেরে ডাকিছে গিরি ইঙ্গিত বাড়ায়ে।
তৃণহীন সুকঠিন শতদীর্ণ ধরা।
রৌদ্রবর্ণ বনফুলে কাঁটা গাছ ভরা।

দিবসের তাপ ভূমি দিতেছে ফিরায়ে
দাঁড়ায়ে রয়েছে গিরি আপনার ছায়ে
পথশূন্য, জনশূন্য, সাড়া-শব্দ-হীন
ডুবে রবি যেমন সে ডুবে প্রতিদিন।

রঘুনাথ হেথা আসি যবে উতরিলা
শিখগুরু পড়িছেন ভগবৎ-লীলা
রঘু কহিলেন নমি চরণে তাঁহার,
'দীন আনিয়াছে প্রভু, হীন উপহার।'

বাহু বাড়াইয়া গুরু শুধায়ে কুশল
আশিসিলা মাথায় পরশি করতল
কনকে-হীরকে গাঁথা বলয় দু'খানি
গুরুপদে দিলা রঘু জুড়ি দুই পাণি।

ভূমিতল হতে বালা লইলেন তুলে,
দেখিতে লাগিলা প্রভু ঘুরায়ে অঙ্গুলে
হীরকের সূচীমুখ শতবার ঘুরি
হানিতে লাগিল শত আলোকের ছুরি।

ঈষৎ হাসিয়া গুরু পাশে দিলা রাখি,
আবার সে পুঁথি' পরে নিবেশিলা আঁখি।

'মানসী'

সহসা একটি বালা শিলাতল হতে
গড়ায়ে পড়িয়া গেল যমুনার স্রোতে।
আহা আহা চিৎকার করি রঘুনাথ
ঝাঁপায়ে পড়িল জলে বাড়ায়ে দু'হাত।
আগ্রহে যেন তার প্রাণমনকায়
একখানি বাহু হয়ে ধরিবারে যায়।

বারেকের তরে গুরু না তুলিলা মুখ
নিভৃত হৃদয়ে তার জাগে পাঠ সুখ।
কালোজল চুপে চুপে বহিল গোপন
ছলভরা সুগভীর চুরির মতন।

দিবালোক চলে গেল দিবসের পিছু
যমুনা উতলা করি না মিলিল কিছু
সিক্ত বসন লয়ে শ্রান্ত শরীরে
রঘুনাথ গুরু কাছে আসিলেন ফিরে

"এখনো উঠাতে পারি" কর জোড়ে যাচে,
"যদি দেখাইয়া দাও কোন্‌খানে আছে।"
দ্বিতীয় বলয়খানি ছুঁড়ি দিয়া জলে
গুরু কহিলেন, "আছে ওই নদীতলে।"

'কাহিনী'

সহসা একটি বালা শিলাতল হতে
গড়ায়ে পড়িয়া গেল যমুনার স্রোতে।
'আহা আহা' চীৎকার করি রঘুনাথ
ঝাঁপায়ে পড়িল জলে বাড়ায়ে দু' হাত
আগ্রহে সমস্ত তার প্রাণ–মন–কায়
একখানি বাহু হয়ে ধরিবারে যায়।

বারেকের তরে গুরু না তুলিলা মুখ,
নিভৃত অন্তরে তাঁর জাগে পাঠ সুখ।
কালো জল কটাক্ষিয়া চলে ঘুরিঘুরি
যেন সে ছলনাভরা সুগভীর চুরি।

দিবালোক চলে গেল দিবসের পিছু,
যমুনা উতলা করি না মিলিল কিছু,
সিক্ত বস্ত্রে রিক্ত হাতে শ্রান্ত নত শিরে
রঘুনাথ গুরু কাছে আসিলেন ফিরে।

'এখনো উঠাতে পারি' কর যোড়ে যাচে,
'যদি দেখাইয়া দাও কোন্‌খানে আছে।'
দ্বিতীয় কঙ্কণখানি ছুঁড়ি দিয়া জলে
গুরু কহিলেন, 'আছে ওই নদীতলে।'।

দু'টি কবিতাকে পাশাপাশি রেখে নিম্নরেখ পদগুলির বিভিন্নতা লক্ষ করলে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে 'কাহিনী'র কবিতায় যুগ্মধ্বনির সমাবেশ অনেক বেশি। 'মানসী'তে যে কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত পয়ারে রচিত ছিল সেই কবিতাটিই পরবর্তীকালের যৌগিক অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত হয়েছে।

শুধু এই কবিতাটি নয়, 'মানসী'র আরো কয়েকটি কবিতার মধ্যেই যুক্তাক্ষর বা যুগ্মধ্বনি প্রয়োগের অনুরূপ রীতি দেখা যায়। "আত্মসমর্পণ" কবিতায়,

তবে ভালো করে দেখো একবার
দীনতা হীনতা যা আছে আমার,
ছিন্ন মলিন অনাবৃত হিয়া
অভিমান নাহি জানে।

এখানেও "ছিন্ন" দুই মাত্রা ধরা হয়েছে, তবে "ছিন্ন মলিন অনাবৃত হিয়া" কানে একটু খটকা লাগে।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রথম বিকাশ হিসেবেই বাংলা ছন্দের ক্রমবিকাশে 'মানসী'র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। অনাবশ্যক দীর্ঘতার জন্য কতকগুলি কবিতার কতকগুলি স্তবক পরে বাদ দেওয়া হয়েছে। যেমন "ভৈরবী গানে"'র মতো অতিপরিচিত কবিতাটিরও বেশ কয়েকটি স্তবক বাদ দেওয়া হয়েছে 'সঞ্চয়িতা'য়। এটা বোধকরি একটা সুমিত সামঞ্জস্য স্থাপনের

জন্যেই। এই একই কারণে আরো অনেকগুলো কবিতায় পরে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, অথবা পূর্বপ্রকাশিত রূপকে পরিবর্তন করে 'মানসী'তে ছাপা হয়েছে।

"বিরহানন্দ" কবিতায় "বিফল মিলন" রচনাটির প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবক বর্জন করে অবশিষ্ট অংশ কিছু কিছু পরিবর্তনসহ গৃহীত হয়েছে। 'মানসী'তে সংকলনকালে "নূতন প্রেম"–এর তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম স্তবক বর্জিত ও অল্পস্বল্প পাঠ পরিবর্তন করা হয়েছে। "মানসী" কবিতাটির পাঠও প্রথম পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ থেকে অনেকটা ভিন্ন।

"শ্রাবণের পত্র" 'ছিন্নপত্রে' যেরূপ আছে তাতে অষ্টম ছত্রের পর আছে,

রাজছত্র ফেলো শ্যাম এসে এই ব্রজধাম
কলিকাতা যার নাম কিংবা ক্যালকাটা
ঘুরেছিলে এইখেনে কত রোডে কত লেনে
এইখেনে ফেলো এনে জুতোসুদ্ধ পাটা।

আরো একটি স্তবক কবিতাটির শেষের দিকে 'ছিন্নপত্রে' ছিল যা 'মানসী'তে বাদ পড়েছে :

আষাঢ় কাহার আশে বর্ষে বর্ষে ফিরে আসে,
নয়নের নীরে ভাসে দিবসরজনী
আছে ভাব, নাই ভাষা— আছে শস্য, নাই চাষা—
আছে নস্য, নাই নাসা—এও যে তেমনি।

এই স্তবক দুটি পড়লেই বুঝতে পারা যাবে যে বিদ্রূপের অতিরিক্ত সরলতা বর্জন করার জন্যেই এই স্তবক দুটি 'মানসী'তে বাদ দেওয়া হয়েছে।

এই পরিবর্তনের ধারা 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থে আরো ব্যাপকভাবে আমরা দেখতে পাব।

রণেশ দাশগুপ্ত

মার্ক্সবাদী দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ

দুটি দর্শন আজ বুদ্ধিজীবীদের আকৃষ্ট করছে। এরা কমবেশি সাধারণ পাঠকপাঠিকাকেও টানছে। একটি মার্ক্সবাদ, আরেকটি অস্তিত্ববাদ। একটি দর্শন বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক মানবমুক্তি সংগ্রামের দায়িত্ববোধের সঙ্গে মুক্তিপ্রয়াসী মানুষের একান্ত হওয়ার দরুন ব্যক্তিগত মৃত্যুকে অতিক্রম করে যাওয়ার দর্শন—মার্ক্সবাদ। আরেকটি দর্শন বিদ্রোহী ও স্বাধীনতাপ্রিয় ব্যক্তির একক দায়িত্ববোধের এবং সকল প্রচেষ্টার পথরোধকারী অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর কালো দরজা পর্যন্ত সেই দায়িত্বপালনের দর্শন—অস্তিত্ববাদ। এই দ্বিতীয়ের আবার দুটি উপধারা। একটি সর্বধ্বংসী মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে ধর্মীয় সংঘজীবনে মাথা গুঁজে থাকা। দ্বিতীয়টি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী আন্দোলনের গণসমাবেশে শরিক হয়ে থাকা। ফ্রান্সের ক্রুদ্ধ অস্তিত্ববাদী শিল্পী দার্শনিক জাঁ পল সার্ত্রে অস্তিত্ববাদের দ্বিতীয় ধারার বাহক হয়ে মার্ক্সবাদে উপনীত হলেও এবং স্বেচ্ছাধীন ব্যক্তি-আত্মাকে মার্ক্সবাদের সামগ্রিক সত্যের উপাদান হিসেবে সপ্রমাণ করার দাবি করলেও মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর মত বদলেছেন কি না তা এখনো জানা যায় নি। এই পরিপ্রেক্ষিতেই পূর্বসূরিদের খুব বেশিদিন সঙ্গে নিয়ে চলার পক্ষপাতী নন তিনি। কোনো মহৎ শিল্পীরও মৃত্যুর পরে সার্ত্রে তাঁকে বড়জোর এক পুরুষ পর পর্যন্ত সজীব সাথী বলে মানতে রাজী আছেন। যাঁরা জাঁ পল সার্ত্রের 'সাহিত্য' নামক গ্রন্থে প্রভাবিত, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের মতো মহীরুহকেও খুব বেশিদিন বরদাশ্‌ত করবেন বলে মনে হয় না। অস্তিত্ববাদের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ ইতোমধ্যেই "বাসি ফুলের মালা" হয়ে গিয়েছেন সম্ভবত; মৃত্যু রবীন্দ্রনাথকে জীর্ণ করে ফেলেছে এই দৃষ্টিতে।

কিন্তু মার্ক্সবাদী দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথকে সজিব ও সচল বলেই মনে করব। মার্ক্সবাদে দ্ব্যর্থহীনভাবে মৃত্যুকে অতিক্রম করার কথা আছে। মার্ক্সীয় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বলতে চায়, মানবসমাজের ব্যক্তিক ও গোষ্ঠীগত সৃজনশীলতা অতীতের আবরণ ভেদ করে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সৃষ্টিশীল উপাদানগুলি রসায়িত ও জারিত হয়ে মৃত্যুকে সবসময় ডিঙিয়ে চলে যাচ্ছে। কোনো বিপ্লবী প্রতিভার মৃত্যু নেই। মৃত্যু অনেক ক্ষেত্রে অতিক্রান্ত পথের নিশানা। মুক্তিসংগ্রামীর গলায় যে জয়ের মালা দোলে, তা কোনোদিন বাসি হতে পারে না। কারণ, মুক্তিসংগ্রামী সে মালা দিয়ে যায় তার উত্তরপুরুষের গলায়। অব্যাহত জীবনস্রোতের মোকাবিলায় এখানেই মৃত্যুকে মনে করা যেতে পারে অর্থহীন। অমরতার এই দর্শনকে সামনে রেখে যদি আমরা রবীন্দ্রনাথের স্থায়িত্ব-অস্থায়িত্ব বিচার করতে বসি, তা হলে তাঁকে নিয়ে নিরবধি কাল পর্যন্ত যেতে না পারলেও অনেক দূর যেতে পারব। তবে এক্ষেত্রেও দুটি দিক সামনে আসতে পারে।

প্রথমত, রবীন্দ্রনাথকে দেখা যাক এক অনন্যসাধারণ প্রতিভা হিসেবে। এই প্রতিভা কীভাবে সমস্ত বাধাবিপত্তিকে অতিক্রম করে বাংলা ভাষাভাষীর সংগ্রামী জীবনের তথাকথিত তুচ্ছাতিতুচ্ছ শরিকদের সঙ্গী হিসেবে পদ্মা-যমুনা-মেঘনার তরঙ্গধৌত পূর্ব পাকিস্তানের চলমান জীবনের কাজে ও কথায় সঞ্চারিত হয়ে রয়েছেন, সেকথা সব সময় আমাদের মনে না থাকতেও পারে। কিন্তু আমলাতন্ত্রের হুকুম মতো যেমন এই সঞ্চারকে নাকচ করা সম্ভব নয়, অস্তিত্ববাদীর অধৈর্যেও তেমনি রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি বাতিল বলে ঘোষিত হতে পারে না। যতদিন 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থের আন্তরিকতাপূর্ণ চিঠিগুলির নদীমাতৃক পরিবেশের পদ্মা আর গোরাই নদীর আশপাশের প্রাকৃতিক জীবন অব্যাহত থাকবে, যতদিন কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ সজীব থাকবে, ততদিন রবীন্দ্রনাথকে পূর্ব পাকিস্তানের এবং ব্যাপকতর ক্ষেত্রে সারা পাকিস্তানের মানবজীবন-প্রবাহ থেকে ছাঁটাই করে দেওয়া সম্ভব হবে না। আমরা রবীন্দ্রনাথের অনুভূতিপ্রবণ মনকে এবং সেইসঙ্গে সে মনের অধিকারী রক্তমাংসের মানুষটিকেও নতুন ফুলের মালার মতো করে আঘ্রাণ নিতে চাইব, কারণ ভবিষ্যতে আমাদের জীবনযাত্রার সাথী রক্তমাংসের মানুষের জীবনসত্তাকে আজকের থেকেও আরো বেশি গভীর করে জানতে চাইব। রবীন্দ্রনাথের সজীব অনুভূতিগুলি আমাদের সংগ্রামী জীবনসত্তার বিভিন্ন উপকরণ ও উপাদানে একীভূত হয়ে রয়েছে। আমরা যে মৃত্যুকে অতিক্রম করে চলেছি, রবীন্দ্রনাথের সজীব শিল্পীসত্তা বারবার সে-কথা মনে করিয়ে দেবে। আষাঢ়সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে, প্রান্তর পার হতে গিয়ে তাঁকে পাশে পাব। রবীন্দ্রনাথ বাসিফুলের মালা হবেন না একটি বিশেষ কারণে। সেটি এই যে, ব্যক্তিজীবনে, সে ব্যবহারিক হোক কিংবা শিল্পীসত্তার সৃজনলীলায় হোক, চিরজীবী হবার জন্য রবীন্দ্রনাথের মনে কোনো 'আতুরতা' বা 'হ্যাংলামি' ছিল না। পৃথিবীকে তিনি ভালবাসতেন অবশ্য। উপনিষদের মন্ত্রে শৈশবে লালিত হয়েও তিনি ধুলার ধরণীকে কিংবা এর মুটে-মজুরকে মায়া কিংবা ছায়া মনে করতে শেখেন নি। কিন্তু তবু সুন্দর ভুবনে মরতে না চাওয়ার মধ্যে কোনো ক্লিন্নতা ছিল না। বেঁচে থাকার স্বাভাবিক আসক্তিকে তিনি সকৌতুকে হালকা করে দিয়েছিলেন তাঁর "১৪০০ সাল" কবিতায়। জীবনের মধ্যাহ্নে "বসুন্ধরা" কবিতায় যে আসক্তি প্রকাশ পেয়েছিল, তাকে তিনি জীবনসায়াহ্নে "পৃথিবী" কবিতায় নির্মমভাবে পরিহার করেছিলেন। এই পৃথিবীকে অযথা তাঁর নামযশে ভারাক্রান্ত করার অহমিকাকে তিনি মনে স্থান দেন নি। এই কারণেই আমরা ভবিষ্যতেও তাঁকে স্থান দিতে পারব নিরুদ্বিগ্নচিত্তে। আমাদের মন তাঁর স্মরণীয় উপস্থিতিতে উদ্বেলিত হবে, কণ্টকিত হবে না। স্বচ্ছন্দ এই মৃত্যুহীনতা।

রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে ভবিষ্যতে অনেক দূর যাবার ব্যাপারে দ্বিতীয় দিকটিকে এবার যাচাই করা যাক।

এখানে আমরা রবীন্দ্রনাথের কাব্যকীর্তির একটি বিশেষ অধ্যায়কে সামনে আনব। এবং আমরা দেখব, এই কাব্যকীর্তি এমন সব নায়ক-নায়িকাকে বাংলা সাহিত্যে স্থাপন করে গিয়েছে যারা মৃত্যুকে নাকচ করে জীবনের গান গাইতে থাকবে দূর ভবিষ্যতেও। দেখতে পাব, মৃত্যুর কালো ছায়ার তলায় সংগ্রামী মানুষের জীবন অপঘাতের আবরণে আবৃত হয়েও ব্যর্থ হয়ে যায় নি। বিপ্লবীর জীবন মৃত্যুতে নিষিক্ত হয়ে বিস্তৃততর জীবনে উত্তরিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকের বিদ্রোহী নায়ক রঞ্জন এবং 'মুক্তধারা' নাটকের বিদ্রোহী নায়ক অভিজিত অপঘাতে নিহত হলেও চিরজীবী প্রকৃতির মতো, মানব-মুক্তিসংগ্রামে চিরজীবী। এই দুই বীরের জন্য নাটকে কোনো মায়াকান্না নেই। রঞ্জন আর অভিজিত আমাদের সাহিত্যে মৃত্যুকে তুচ্ছ করে বেঁচে থাকতে এসেছে। এই দুই গণবীর-চরিত রচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় রেখে গিয়েছেন।

আনিসুজ্জামান

রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা : একটি দিক

উনিশ শতকের বাংলাদেশে হিন্দু পুনর্জাগরণবাদের যে ঢেউ এসেছিল, তা অতি নিকট থেকে স্পর্শ করেছিল ঠাকুর পরিবারকে। ব্রাহ্ম পরিবারের বিদগ্ধ সন্তানেরা তাই হয়ে উঠেছিলেন হিন্দু মেলার (সূচনা : ১৮৬৬) প্রধান উদ্যোগী। স্বাদেশিকতার এই পরিমণ্ডল যে কিশোর রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবান্বিত করেছিল, তার পরিচয় পাই তাঁর স্বনামে মুদ্রিত প্রথম কবিতা "হিন্দুমেলায় উপহার"[১] থেকে। ১৮৭৫ সালের হিন্দু মেলায় তিনি এ কবিতাটি পাঠ করেন, তখন তাঁর বয়স তের বছর নয় মাস। এ কবিতায় ভারতের বর্তমান দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে বিলাপ করেছেন কবি, যুধিষ্ঠির ও রামের রাজ্যশাসন স্মরণ করেছেন, সবিস্ময় প্রশংসা করেছেন পৃথ্বীরাজ ও দুর্গাবতীর আত্মবিসর্জনের। তবে মুসলিম-শাসন বা ইংরেজ-রাজত্ব সম্পর্কে এতে কোনো কটাক্ষ নেই।

সেকালের বাংলা সাহিত্যে হিন্দু পুনর্জাগরণবাদী ভাবধারার যে প্রকাশ ঘটেছিল, তার কিছুটা পরিচয় আছে রঙ্গলালের কাব্যে, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে। এই তিন প্রতিভাধর পুরুষের ভিন্ন মাধ্যমের রচনাবলির একটা সাধারণ যোগসূত্র ছিল ইতিহাসের পটভূমিকায় হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের চিত্র উপস্থিত করে হিন্দু নায়কের মুখে স্বাধীনতার প্রেরণা ও জাতীয়তাবাদের শিক্ষা দান। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এমনি তিনটি নাটকে রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের তিনটি রচনা লুকিয়ে রয়েছে।

মনে হয়, 'সরোজিনী' (১৮৭৫) নাটকের জন্যে লেখা গানটিই এগুলোর মধ্যে প্রথম রচিত হয়।[২] সসৈন্য আলাউদ্দীন যখন চিতোর প্রাসাদ অধিকার করছেন, তখন রাজপুত রমণীরা চিতায় আত্মাহুতি দেবার মুহূর্তে সে গান গাইছেন :

জ্বল্ জ্বল্ চিতা ! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
পরাণ সঁপিবে বিধবা-বালা
জ্বলুক্ জ্বলুক্ চিতার আগুন,
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা॥

শোন্ রে যবন !— শোন্ রে তোরা,
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে,
সাক্ষী র'লেন দেবতা তার
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে।।

কিন্তু এই যবনবিদ্বেষী বক্তব্য রবীন্দ্রনাথের ছিল না। নাটকে এখানে যে গদ্যবক্তৃতা ছিল, নিতান্ত সাহিত্যিক কারণেই তাকে গানে রূপান্তরিত করেন রবীন্দ্রনাথ। এ বিষয়ে স্বয়ং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাক্ষ্য এই :

> "রাজপুত মহিলাদের চিতাপ্রবেশের যে একটা দৃশ্য আছে, তাহাতে পূর্ব্বে আমি গদ্যে একটা বক্তৃতা রচনা করিয়া দিয়াছিলাম। যখন এই স্থানটা পড়িয়া প্রুফ্ দেখা হইতেছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ পাশের ঘরে পড়াশুনা বন্ধ করিয়া বসিয়া বসিয়া শুনিতেছিলেন। গদ্য-রচনাটি এখানে একেবারেই খাপ খায় নাই বুঝিয়া, কিশোর রবি একেবারে আমাদের ঘরে আসিয়া হাজির। তিনি বলিলেন—এখানে পদ্যরচনা ছাড়া কিছুতেই জোর বাঁধিতে পারে না। প্রস্তাবটা আমি উপেক্ষা করিতে পারিলাম না—কারণ, প্রথম হইতেই আমারও মনটা কেমন খুঁৎ-খুঁৎ করিতেছিল। কিন্তু এখন আর সময় কৈ? আমি সময়াভাবের আপত্তি উথাপন করিলে, রবীন্দ্রনাথ সেই বক্তৃতাটির পরিবর্ত্তে একটা গান রচনা করিয়া দিবার ভার লইলেন, এবং তখনই খুব অল্প সময়ের মধ্যেই "জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ" এই গানটি রচনা করিয়া আনিয়া, আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন।"[৩]

'পুরুবিক্রমে' (দ্বি-স, ১৮৭৭) রবীন্দ্রনাথের যে গানটি মুদ্রিত হয়, তাতে দেশপ্রেম আছে, যবন-বিদ্বেষ নেই :

> এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
> এক কার্য্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।

আর 'স্বপ্নময়ী'তে (১৮৮২) অন্তর্ভুক্ত গানে যে মুঘল-বিদ্বেষ স্পষ্ট, আসলে তা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কৃত পরিবর্তনের মূল। ফল কবিতাটি পড়া হয় ১৮৭৭ সালের হিন্দুমেলায়। সে কবিতার আশু উপলক্ষ ছিল লর্ড লিটনের আমলে আয়োজিত রাজদরবার, যে-দরবারে ভারতীয় প্রতিনিধিদের সানন্দ যোগদান কিশোর রবীন্দ্রনাথকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। হিন্দু মেলায় পঠিত তাঁর প্রথম কবিতার মতো এখানেও যুধিষ্ঠির-অর্জুনের মহিমা কীর্তিত হয়েছে, মুহম্মদ ঘোরীর বিজয়ধ্বজার উল্লেখও একবার আছে, তবে ব্রিটিশরাজের মহিমাগানের হীনতাকেই কবি বিশেষ করে ধিক্কার দিয়েছেন। মূল কবিতায় যেখানে "ব্রিটিশ" ছিল, তার বদলে 'মোগল" বসিয়ে শুভসিংহের স্বগতোক্তিরূপে কবিতাটি 'স্বপ্নময়ী'তে গৃহীত হয়,[৪] সেখানে এর শেষ তিনটি চরণ এ রকম :

> মোগল বিজয় করিয়া ঘোষণা, যে গায় গাক্ আমরা গাব না
> আমরা গাব না হরষ গান,
> এস গো আমরা যে কজন আছি, আমরা ধরিব আরেক তান।[৫]

তা হলে দেখা যাচ্ছে, বাল্যে স্বাদেশিকতার যে প্রেরণা পেয়েছিলেন কবি, তা মাঝে মাঝে তাঁকে প্রাচীন ভারতের গৌরবগানে উদ্বুদ্ধ করলেও জাতিবৈরিতার ভাবে আচ্ছন্ন করে নি।

হিন্দু মেলায় দ্বিতীয়বার কবিতা পাঠের আগেই বোধহয়[৬] জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্যোগে ও রাজনারায়ণ বসুর সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত সঞ্জীবনী সভার সদস্য হিসেবে কবির দীক্ষা হয়। সনাতন ভারতের পুনরুদ্ধারই যে এ সভার লক্ষ্য ছিল, তা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-প্রদত্ত বিবরণী থেকে বোঝা যায় :

> আদি ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকাগার হইতে লাল রেশমে জড়ানো বেদমন্ত্রের একখানা পুঁথি এই সভায় আনিয়া রাখা হইয়াছিল। টেবিলের দুই পাশে দুইটি মড়ার মাথা থাকিত, তাহার দুইটি চক্ষুকোটরে দুইটি মোমবাতি বসানো ছিল। মড়ার মাথাটি মৃত-ভারতের সাংকেতিক চিহ্ন।

> বাতি দুইটি জ্বালাইবার অর্থ এই যে, মৃত-ভারতে প্রাণ সঞ্চার করিতে হইবে ও তাহার জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এ ব্যাপারে ইহাই মূল কল্পনা। সভার প্রারম্ভে বেদমন্ত্র গীত হইত—সংগচ্ছধ্বম্ সংবদধ্বম্। সকলে সমস্বরে এই বেদমন্ত্র গান করার পর তবে সভার কার্য্য (অর্থাৎ কিনা গল্পগুজব) আরম্ভ হইত।[৭]

ভারতবর্ষের সার্বজনীন পরিচ্ছদের আলোচনায় এই সভা স্থির করেছিল, "ধুতিটা কর্মক্ষেত্রের উপযোগী নহে অথচ পায়জামাটা বিজাতীয়"।[৮] এ থেকেও জাতীয়তার কোন্ ধারণাটা এঁদের মধ্যে প্রবল ছিল, তা সহজে অনুমান করা যায়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রচনায় জাতীয়তার এই বোধ তেমন প্রশ্রয় পেল না। 'কবিকাহিনী'র (১৮৭১) কবি দাসত্বের বেদনায় পীড়িত, 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে'র (১৮৮১) লেখক আইরিশদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' ((১৮৮২) তাঁর ভালো লাগে নি।[৯] ইতিহাসের পটে তিনি যেসব কাহিনী লিখলেন, তা থেকেও বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাহিত্যজগৎ থেকে রবীন্দ্রনাথের মানসলোকের দূরত্ব সুস্পষ্ট হল। 'বউঠাকুরানীর হাট' (১৮৮৩) ও 'রাজর্ষি' (১৮৮৭) উপন্যাসে ইতিহাস এল ব্যক্তিগত জীবনবিক্ষোভকে স্পষ্ট করে তোলার জন্যে, তার বেশি নয়। মুঘলদের বশ্যতা স্বীকারে প্রতাপাদিত্যের অসম্মতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ শুধু "অনভিজ্ঞ ঔদ্ধত্য"ই দেখতে পেয়েছিলেন।[১০] আর 'রাজর্ষি'তে যে-বিল্বন মুঘলদের হাত থেকে দেশরক্ষার কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, সেই বিল্বনকেই দেখা গেল মড়কের সময়ে হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সবার সেবায় আত্মনিয়োজিত।[১১] 'রাজর্ষি'র পর দেখা গেল, ইতিহাসের পটে গল্প লিখে কবি আর সুখ পাচ্ছেন না, সমসাময়িক সামাজিক জীবনের অন্তরঙ্গ চিত্র রচনাতেই তাঁর আগ্রহ অধিকতর।

সমাজের দিকে চোখ মেলে তাকাতেই হিন্দু মেলার বালক কবি ও সঞ্জীবনী সভার কিশোর সদস্য সেকালের 'জাতীয় আন্দোলন'র সমালোচক হয়ে উঠলেন। দেশের ভাষা অবহেলা করে ও রাজপুরুষদেরকে ভক্তির আসনে বসিয়ে 'ন্যাশনাল' আন্দোলনের যে প্রচেষ্টা তখন চলেছিল, 'ভারতী'র পাতায় (১৮৮৩) তার অন্তঃসারশূন্যতা প্রকাশ করলেন রবীন্দ্রনাথ।[১২] পর বছর আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক নির্বাচিত হবার পরে নব্য হিন্দুধর্মের মুখপাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মসীযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।[১৩]

ধর্মবিষয়ক বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়েই হোক অথবা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের কর্তব্য পালন করতে যেয়েই হোক, হিন্দুত্ব সম্পর্কে একটা সগর্ব সচেতনতাও একালে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা দেখতে পাই। ১৮৮৪ সালের শেষে সিটি কলেজে রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভায় যে প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ পড়লেন, তাতে পরলোকগত মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করতে গিয়ে তিনি বললেন :

> ...সকলে বলিল, তিনি হিন্দুধর্মের উপরে আঘাত করিলেন। কিন্তু তিনিই হিন্দুধর্মের জীবনরক্ষা করিলেন। সমস্ত ভারতবর্ষ এই জন্যে তাঁর নিকটে কৃতজ্ঞ।...
>
> ...ব্রাহ্মধর্ম পৃথিবীর ধর্ম বটে, পৃথিবীকে আমরা এ ধর্ম হইতে বঞ্চিত করিতে পারি না চাহিও না, কিন্তু অবস্থা ও সাধনা-বিশেষের গুণে ইহা বিশেষরূপে ভারতবর্ষেরই ব্রাহ্মধর্ম হইয়াছে, ব্রাহ্মধর্মের জন্য পৃথিবী ভারতবর্ষের নিকট ঋণী।...
>
> ... ব্রহ্মই ভারতবর্ষের জাগ্রত দেবতা; জিহোবা, গড্ অথবা আল্লা আমাদের ভারতের সম্পূর্ণ গম্য নহেন। রামমোহন রায় হৃদয়ের উদারতাবশত ইহা বুঝিয়াছিলেন। ... আমরা অগ্রে ভারতবর্ষের মন্দিরে সনাতন ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করিব; অবশেষে এমন হইবে যে, পৃথিবীর চারি দিক হইতে ধর্মার্থীরা ভারতবর্ষের তীর্থক্ষেত্রে ব্রহ্মদর্শন-লালসায় দলে দলে আগমন

করিতে থাকিবে। তখনই রাজা রামমোহনের জয়।..[১৪]

আবার, এর পরেই আর্যামি ও বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ খড়গহস্ত হয়েছেন। শশধর তর্কচূড়ামণি ও চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে মতবিরোধ চলল তাঁর। শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করেও হিন্দুবিবাহ বা আহারতত্ত্ব সম্পর্কে চন্দ্রনাথ বসু রবীন্দ্রনাথকে সপক্ষে টানতে পারলেন না। এই বিরোধের কিছু পরিচয় "হিন্দু-বিবাহ" ও "আহার সম্বন্ধে চন্দ্রনাথবাবুর মত" প্রবন্ধে,[১৫] "পত্র"[১৬] ও "ধর্মপ্রচার"[১৭] কবিতায়, "আর্য ও অনার্য" ও "গুরুবাক্য"[১৮] প্রভৃতি কৌতুকনাট্যে রয়ে গেছে। বলা যেতে পারে যে, এর জের টেনেই ১৮৯১ সালের আদমশুমারির আগে ব্রাহ্ম-সমাজের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথ দাবি জানালেন, লোকগণনায় ব্রাহ্মদেরকে হিন্দুদের থেকে পৃথক করে "হিন্দু-ব্রাহ্ম" হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে।[১৯]

রবীন্দ্রনাথকে আমরা দেশীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের সমালোচনা করতে দেখেছি। ১৮৯০ সালে এমারেল্ড থিয়েটারে রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে প্রবন্ধ পড়লেন রবীন্দ্রনাথ। এই "মন্ত্রী অভিষেক" প্রবন্ধে[২০] ভারতের শাসনব্যবস্থার যে সমালোচনা ছিল, তা তখনকার দিনের তুলনায় যেমন তীব্র, তেমনি সুস্পষ্ট। তিন বছর পর ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্টের সংশোধন-উপলক্ষে তিনি লিখলেন "ইংরেজ ও ভারতবাসী" :

> এক কথায়, ইংরেজ নিজেকে আমাদের পক্ষে আবশ্যক করিয়া তুলিয়াছে, কিন্তু প্রিয় করিয়া তোলা আবশ্যক বোধ করে নাই; পথ্য দেয়, কিন্তু তাহার মধ্যে স্বাদ সঞ্চার করিয়া দেয় না; অবশেষে যখন বমনোদ্রেক হয় তখন চোখ রাঙাইয়া হুহুংকার দিয়া উঠে।...
>
> ...অতিদুষ্প্রাপ্য তাঁহাদের সেই সিম্প্যাথির আঙুর ক্রমে আমাদের নিকটও টক হইয়া আসিয়াছে। আমরা অনেকক্ষণ ঊর্ধ্বে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়া অবশেষে ধীরে ধীরে ঘরে ফিরিবার উপক্রম করিতেছি। আমাদর এই চির-উপবাসী ক্ষুধিত স্বভাবের মধ্যেও যেটুকু মনুষ্যত্ব অবশিষ্ট ছিল তাহা ক্রমে বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে।...
>
> কিন্তু কে বলিতে পারে, এই মানসিক বিদ্রোহই বিধাতার অভিপ্রেত নহে।
>
> ... ইংরেজের সহিত সংঘর্ষ আমাদের অন্তরে যে একটি উত্তাপ সঞ্চার করিয়া দিয়াছে তদ্দ্বারা আমাদের মুমূর্ষু জীবনীশক্তি পুনরায় সচেতন হইয়া উঠিতেছে।[২১]

এই প্রবন্ধে একবার ইংরেজকে সম্বোধন করে তিনি বলেছেন, "হিন্দু জাতির শ্রেষ্ঠতা ধারণা করিবার শক্তিও তোমাদের নাই",[২২] কিন্তু প্রবন্ধের অন্যত্র যা বলেছেন, তা থেকে বোঝা যায় যে, হিন্দু আর ভারতবাসীকে তিনি আর সমার্থক মনে করতে পারছেন না। সকল ধর্মের বিরোধভঞ্জন করে সম্রাট আকবর যে 'প্রেমের ঐক্যস্থাপনের চেষ্টা" করেছিলেন, তার তুলনায় ইংরেজ শাসকের ধর্মনিরপেক্ষতাকে তাঁর মনে হয়েছে রাজনৈতিক কলাকৌশল মাত্র। কেননা, "ভারতবর্ষের দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে" ইংরেজ রাজশক্তি "প্রেমের অপেক্ষা ঈর্ষা বেশী করিয়া বপন করিয়াছেন" আর তার বিষময় ফল দেখা দিয়েছে হিন্দু-মুসলমানের উত্তরোত্তর বিরোধে।[২৩]

কিন্তু সে যুগের রাজনৈতিক আন্দোলন যে-পথ নিয়েছিল, তাতে এই বিরোধ প্রশমনের উপায় নির্ণীত হচ্ছিল না। গোরক্ষিণী সভা-স্থাপন, গণপতি পূজার উদ্বোধন ও শিবাজী উৎসবের প্রবর্তনের ফলে রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে হিন্দু পুনর্জাগরণের আন্দোলন অভিন্ন হয়ে উঠতে থাকল। অন্যদিকে মুসলমান রাজনৈতিক নেতারা মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য ও ভিন্ন স্বার্থের ওপর জোর দিলেন। কংগ্রেসী রাজনীতির ওপর রবীন্দ্রনাথের আস্থা তখন অটুট ছিল। তাই কংগ্রেস থেকে মুসলমানদের দূরে সরে থাকা আর গোরক্ষা-উপলক্ষে হিন্দু-

মুসলমান দ্বন্দ্ব, এ দুটোকেই তিনি দেখলেন শুধু ইংরেজের কারসাজি হিসেবে। তবে সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও বললেন যে, মুসলমান দূরে থাকলে কংগ্রেসের থেকে ইংরেজের ভয় পাবার তেমন হেতু নেই :

> মুসলমানেরা প্রথমে কন্‌গ্রেসে যোগ দিবার উপক্রম করিয়া সহসা যে বিমুখ হইয়া দাঁড়াইল তাহার কারণ বোঝা নিতান্ত কঠিন নহে—এবং পাঠকের নিকট সে কারণ স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করা অনাবশ্যক বোধ করি।
>
> কিন্তু এতদিনে ইংরেজ এ কথা কতকটা বুঝিয়া থাকিবে যে, হিন্দুর হাতে পলিটিক্‌স তেমন মারাত্মক নহে।... ঐক্য কাহাকে বলে মুসলমান তাহা জানে এবং পলিটিক্‌স্‌ও তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ নহে; মুসলমান যদি দূরে থাকে তবে কন্‌গ্রেস হইতে আশু আশঙ্কার কোনো কারণ নাই।...
>
> হিন্দু মুসলমানে যে বিরোধ সম্প্রতি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে ইহা গবর্মেন্টের পলিসি–সম্মত না হইতে পারে, কিন্তু গবর্মেন্টের অন্তর্গত বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইংরেজ বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুৎকারে যে এই অগ্নিকাণ্ডের সূচনা করিয়া দিয়াছে, আমাদের দেশের লোকের এইরূপ বিশ্বাস।[২৪]

কয়েক মাস পরে লেখা "সুবিচারের অধিকার" প্রবন্ধে মুসলমান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটু ক্ষোভের মনোভাব প্রকাশ পেল। এর প্রথম কারণ, কংগ্রেসী রাজনীতির সঙ্গে মুসলমানদের সম্পর্কের অভাব, আর দ্বিতীয় কারণ বোধ করি সমসাময়িক মুসলিম জননেতাদের ইংরেজপ্রীতির প্রকাশ। এই প্রবন্ধে তিনি বলছেন :

> অনেক হিন্দুর বিশ্বাস, বিরোধ মিটাইয়া দেওয়া গবর্মেন্টের আন্তরিক অভিপ্রায় নহে। পাছে কন্‌গ্রেস প্রভৃতির চেষ্টায় হিন্দুমুসলমানগণ ক্রমশ ঐক্যপথে অগ্রসর হয় এইজন্য তাঁহারা উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মবিদ্বেষ জাগাইয়া রাখিতে চান, এবং মুসলমানের দ্বারা হিন্দুর দর্প চূর্ণ করিয়া মুসলমানকে সন্তুষ্ট ও হিন্দুকে অভিভূত করিতে ইচ্ছা করেন।...
>
> ...হিন্দুমুসলমান–বিরোধে সাধারণের বিশ্বাস দৃঢ়মূল হইয়াছে যে দমনটা অধিকাংশ হিন্দুর উপর দিয়াই চলিতেছে এবং প্রশ্রয়টা অধিকাংশ মুসলমানেরাই লাভ করিতেছেন।...
>
> ... অল্পকাল হইল স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রে গবর্মেন্টের উচ্চ–উপাধিধারী, কোনো শ্রদ্ধেয় ইংরেজ সিভিলিয়ান প্রকাশ করিয়াছেন যে, আজকাল সাধারণ ভারতবর্ষীয় ইংরেজের মনে একটা হিন্দুবিদ্বেষের ভাব ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং মুসলমান জাতির প্রতিও একটি আকস্মিক বাৎসল্যরসের উদ্রেক দেখা যাইতেছে। মুসলমান–ভ্রাতাদের প্রতি ইংরেজের স্তনে যদি ক্ষীর সঞ্চার হইয়া থাকে তবে তাহা আনন্দের বিষয়, কিন্তু আমাদের প্রতি যদি কেবলই পিত্তসঞ্চার হইতে থাকে তবে সে আনন্দ অকপট ভাবে রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে।
>
> ... ইংরেজ মুসলমানকে মনে মনে কিছু ভয় করিয়া থাকেন। এই জন্য রাজদণ্ডটা মুসলমানের গা ঘেঁষিয়া ঠিক হিন্দুর মাথার উপরে কিছু জোরের সহিত পড়িতেছে।
>
> ... অপরপক্ষে, মুসলমানগণ রাজভক্তিভরে অবনতপ্রায় হইয়া কন্‌গ্রেসের উদ্দেশ্যপথে বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।...[২৫]

কিন্তু এ ক্ষোভ ক্ষণিকের। রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে পড়ে রবীন্দ্রনাথ বৃহত্তর সত্যকে দৃষ্টির আড়াল হতে দেন নি। তাই সঞ্জীবনী সভায় পায়জামার বিজাতীয়তার কথা যিনি শুনেছিলেন, তিনি এখন "কোট বা চাপকান" প্রসঙ্গ ধরে লিখলেন :

> মুসলমানদের সহিত বসনভূষণ শিল্পসাহিত্যে আমাদের এমন ঘনিষ্ঠ আদানপ্রদান হইয়া গেছে যে, উহার মধ্যে কতটা কার, তাহার সীমা নির্ণয় করা কঠিন। চাপকান হিন্দুমুসলমানের মিলিত বস্ত্র।...

যেমন আমাদের ভারতবর্ষীয় সংগীত মুসলমানেরও বটে হিন্দুরও বটে, তাহাতে উভয় জাতীয় গুণীরই হাত আছে; যেমন মুসলমান রাজ্য প্রণালীতে হিন্দু মুসলমান উভয়েরই স্বাধীন ঐক্য ছিল।

তাহা না হইয়া যায় না। কারণ মুসলমানগণ ভারতবর্ষের অধিবাসী ছিল।... চিত্র, স্থাপত্য, বস্ত্রবয়ন, সূচিশিল্প, ধাতুদ্রব্য নির্মাণ, দণ্ডকার্য, নৃত্য, গীত, এবং রাজকার্য, মুসলমানের আমলে ইহার কোনোটাই একমাত্র মুসলমান বা হিন্দুর দ্বারা হয় নাই, উভয়ে পাশাপাশি বসিয়া হইয়াছে। তখন ভারতবর্ষের যে একটি বাহ্যাবরণ নির্মিত হইতেছিল, তাহাতে হিন্দু ও মুসলমান ভারতবর্ষের ডান হাত ও বাম হাত হইয়া টানা ও পোড়েন বুনিতেছিল।...

এক্ষণে যদি ভারতবর্ষীয় জাতি বলিয়া একটা জাতি দাঁড়াইয়া যায়, তবে তাহা কোনোমতেই মুসলমানকে বাদ দিয়া হইবে না। যদি বিধাতার কৃপায় কোনোদিন সহস্র অনৈক্যের দ্বারা খণ্ডিত হিন্দুরা এক হইতে পারে, তবে হিন্দুর সহিত মুসলমানের এক হওয়াও বিচিত্র হইবে না। হিন্দু মুসলমানে ধর্মে না-ও মিলিতে পারে, কিন্তু জনবন্ধনে মিলিবে,— আমাদের শিক্ষা আমাদের চেষ্টা আমাদের মহৎ স্বার্থ সেই দিকে অনবরত কাজ করিতেছে। অতএব যে বেশ আমাদের জাতীয় বেশ হইবে তাহা হিন্দুমুসলমানের বেশ। ...[২৬]

এ প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে। হিন্দুমুসলমানের সম্পর্ক নিয়ে এত সহৃদয়তার সঙ্গে সেদিন আর কেউ ভেবেছিলেন কিনা, আমাদের জানা নেই। সেই রাজনৈতিক বিভেদের দিনে বাংলাদেশের কবির কণ্ঠেই শুধু হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত ভারতীয় জাতিত্বের ধারণা প্রকাশ পেয়েছিল এতটা দৃঢ়তার সঙ্গে।

তাই বলে রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর হিন্দুত্ব বিসর্জন দিলেন, তা নয়। উনিশ শতকের শেষদিকে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাবে, হিন্দুত্বের নতুন ব্যাখ্যাদান শুরু হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথও এতে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর একালের মনোভাবের পরিচয় আছে 'কথা' ও 'কাহিনী'র (১৯০০) কিছু কবিতায়, 'নৈবেদ্য' কাব্যে (১৯০১) আর "ব্রাহ্মণ" প্রবন্ধে (১৯০২)। "হিন্দুয়ানির গোঁড়ামি আমাদের পক্ষে মৃত্যু",[২৭] এ কথা ঘোষণা করার তিন বছর পরে "ব্রাহ্মণ" প্রবন্ধে তিনি বলেছেন :

যদি প্রাচ্যভাবেই আমাদের দেশে সমাজ রক্ষা করিতে হয়, যদি য়ুরোপীয় প্রণালীতে এই বহুদিনের বৃহৎ সমাজকে আমূল পরিবর্তন করা সম্ভবপর বা বাঞ্ছনীয় না হয়, তবে যথার্থ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের একান্ত প্রয়োজন আছে। তাঁহারা দরিদ্র হইবেন, পণ্ডিত হইবেন, ধর্মনিষ্ঠ হইবেন, সর্বপ্রকার আশ্রমধর্মের আদর্শ ও আশ্রয়স্বরূপ হইবেন ও গুরু হইবেন।[২৮]

যথার্থ ব্রাহ্মণের যে আদর্শ রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল, তাঁর জীবনীকারের ভাষায়, সে ব্রাহ্মণ "আদর্শায়িত মহামানব; তার অস্তিত্ব অতীতেও ছিল কিনা জানি না, তবে বর্তমান বিংশ শতাব্দে সে ব্রাহ্মণ দুর্লভ—কোনো ব্রাহ্মণের পক্ষেই সে আদর্শমত 'ব্রাহ্মণ' নাম করা অসম্ভব।"[২৯]

প্রাচীন ভারতের যে-আদর্শের জয়গান করছিলেন কবি, সে আদর্শ স্মরণে রেখেই ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল।[৩০]

কিন্তু অচিরেই প্রাচীন ভারত থেকে কবির দৃষ্টি ফিরে এল বর্তমান ভারতের দিকে। দেশে যখন অন্নাভাব, তখন ঘটা করে দিল্লিতে দরবারের আয়োজন করলেন লর্ড কার্জন— সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে। এই দরবারকে উপলক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন "অত্যুক্তি" :

আমাদিগকে যখন-তখন, সময়ে-অসময়ে, উপলক্ষ্য থাক্ বা না থাক্, চীৎকার করিয়া বলিতে হয়—আমরা রাজভক্ত। অথচ ভক্তি করিব কাহাকে তাহার ঠিকানা নাই। আইনের বইকে, না কমিশনার সাহেবের চাপরাশকে, না পুলিসের দারোগাকে? গবর্মেন্ট আছে, কিন্তু মানুষ কই? হৃদয়ের সম্বন্ধ পাতাইব কাহার সঙ্গে? ...

... মুসলমান সম্রাটের সময় দেশনায়কতা-সেনানায়কতার অধিকার আমরা হারাই নাই; মুসলমান সম্রাট যখন সভাস্থলে সামন্ত রাজগণকে পার্শ্বে লইয়া বসিতেন তখন তাহা শূন্যগর্ভ প্রহসনমাত্র ছিল না। যথার্থই রাজারা সম্রাটের সহায় ছিলেন, রক্ষী ছিলেন, সম্মানভাজন ছিলেন।...

দিল-দরাজ মোগল-সম্রাটের আমলে দিল্লিতে দরবার জমিত। আজ সে দিন নাই, সে দিল্লি নাই, তবু একটা নকল দরবার করিতে হইবে।...

...আগামী দরবারে ভারতবর্ষ তাহার সমস্ত রাজারাজন্য লইয়া বর্তমান বাদশাহের নায়েবের কাছে নতিস্বীকার করিতে যাইবে—কিন্তু বাদশাহ তাহাকে কী সম্মান, কী সম্পদ, কোন্ অধিকার দান করিবেন? কিছুই নহে।...[৩১]

কার্জন যেমন ভারতীয়দের রাজভক্তির সাড়ম্বর পরিচয় তুলে ধরলেন, দেশপ্রেমিক নেতা ও কর্মীরা তেমনি স্বদেশপ্রেমের সাড়ম্বর পরিচয় দানে উদ্যোগী হলেন। সে উদ্যোগকে আরো অনিবার্য করে তোলে কার্জনের বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা (১৯০৩)। রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী সরলা দেবী প্রতাপাদিত্য-উৎসবের আয়োজন করলেন (১৯০৪), মুঘল-অধীনতা-অস্বীকারে বাঙালি রাজার যে স্বাধীনতাপ্রিয়তা প্রকাশ পেয়েছিল, তার স্মরণে। 'বউঠাকুরাণীর হাটে'র লেখক আপত্তি তুললেন : একজন খুনী লোককে নিয়ে মাতামাতি করা তাঁর পছন্দ নয়। অন্যদিকে মহারাষ্ট্রের শিবাজী-উৎসব বাংলাদেশে প্রবর্তন করার ব্যবস্থা হল। এই উপলক্ষে সখারাম গণেশ দেউস্কর "শিবাজীর মহত্ত্ব' (১৯০৩) ও 'শিবাজীর দীক্ষা' (১৯০৪) বই দুটি রচনা করেন। হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিত জাতীয়তার কথা যিনি ভেবেছিলেন কয়েক বছর আগে, তিনিই এখন শেষোক্ত বইটির ভূমিকাস্বরূপ "শিবাজী-উৎসব" কবিতাটি রচনা করলেন। 'রবীন্দ্রজীবনী'-কার অনুমান করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ অচিরে এ কবিতাটির দুর্বলতা—অর্থাৎ স্বাধীনতার প্রতীক রূপে শিবাজীকে গ্রহণ করার সীমাবদ্ধতা আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন এবং সেই দ্বিধা থেকেই পরে "উৎসবের দিন" প্রবন্ধে আক্ষেপ করে বলেছেন, "এখন আমরা আমাদের উৎসবকে প্রতিদিন সংকীর্ণ করিয়া আনিতেছি"।[৩২] হয়তো কবি বলে কিংবা ভাবুক বলেই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই একটি ব্যাপার আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, একটি চিন্তা কিছুকালের জন্যে যখন তাঁর চিত্তকে আচ্ছন্ন করে, তারপরেই তার থেকে বেরিয়ে আসবার জন্যে অনেকটা বিপরীতমুখী নতুনতর ভাবনা তাঁকে আশ্রয় করে।

লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা ১৯০৫ সালে কার্যকরী হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ রহিত করার আন্দোলনে যোগ দিলেন। এর ফলে, একদিকে তাঁর অপরূপ স্বদেশী গানগুলো আমরা পেয়েছি আর পেয়েছি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তথা এ দেশের রাজনৈতিক কর্ম প্রচেষ্টার দুর্বলতা নির্দেশ করে লেখা অতি মূল্যবান কয়েকটি প্রবন্ধ। যিনি আগের বছর "শিবাজী-উৎসব" কবিতা লিখেছিলেন, তিনি এখন বললেন,

মুসলমানের আমলে হিন্দু সমাজের যে কোনো ক্ষতি হয় নাই তাহার কারণ সে-আমলে ভারতবর্ষের আর্থিক পরিবর্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের টাকা ভারতবর্ষেই থাকিত, বাহিরের দিকে তাহার টান না পড়াতে আমাদের অন্নের স্বচ্ছলতা ছিল।... বণিকজাতি রাজসিংহাসনে বসিয়া আমাদিগকে এই ধনদাসত্বের দারিদ্র্যে পীড়িত করিয়াছে।[৩৩]

বলা বাহুল্য, এ মনোভাব শিবাজী-উৎসবের অন্তরালে সক্রিয় চেতনার সম্পূর্ণ বিরোধী। ইংরেজ-শাসনের সঙ্গে মুসলিম-শাসিত ভারতবর্ষের তুলনা করে রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই মুসলমান আমলের প্রশংসা করেছেন। এর কারণ নিশ্চয় এই নয় যে, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় তাঁর আস্থা ছিল কিংবা বাদশাহী আমলের বিলাসের আড়ম্বর তাঁর মন ভুলিয়েছিল। মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের যে চিত্র-উন্মোচন তখনকার একটা সাধারণ প্রবণতা ছিল, তা ইংরেজ রাজশক্তিকে স্পর্শ করত না, কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অসন্তোষ জাগাত। রবীন্দ্রনাথ ঠিক এর উল্টো পথে পদচারণ করেছিলেন। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ যখনই প্রবল হয়েছে, তখনই তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, তাঁর সমসাময়িক কালের তুলনায় মুসলিম শাসনামল ছিল অনেক শুভকর।

বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন উপলক্ষে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যখন বিরোধ দেখা দিল, তখন রবীন্দ্রনাথ বুঝলেন যে, অতীতের এ শুভকর চিত্রাঙ্কনেও বর্তমান সমস্যার সমাধান নেই। বস্তুত এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হবার পরেই হিন্দু-মুসলমান সমস্যার বাস্তব দিকটা সম্পর্কে তিনি সচেতন হলেন অনেক বেশি করে। "ব্যাধি ও প্রতিকার" প্রবন্ধে তাই তাঁকে বলতে শুনি :

> হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধ লইয়া আমাদের দেশের একটা পাপ আছে। এ পাপ অনেকদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার যা ফল তাহা না ভোগ করিয়া আমাদের কোনো মতেই নিষ্কৃতি নাই।
>
> অভ্যস্ত পাপের সম্বন্ধে আমাদের চৈতন্য থাকে না।...
>
> ...আমাদের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এমন-একটি পাপ আমরা পোষণ করিয়াছি যে, একত্রে মিলিয়াও আমরা বিচ্ছেদকে ঠেকাইতে পারি নাই। এ পাপকে ঈশ্বর কোনো মতেই ক্ষমা করিতে পারেন না।
>
> আমরা জানি, বাংলাদেশের অনেকস্থানে এক ফরাশে হিন্দু-মুসলমানে বসে না—ঘরে মুসলমান আসিলে জাজিমে এক অংশ তুলিয়া দেওয়া হয়, হুঁকার জল ফেলিয়া দেওয়া হয়।
>
> ...মানুষকে ঘৃণা করা যে দেশে ধর্মের নিয়ম, প্রতিবেশীর হাতে জল খাইলে যাহাদের পরকাল নষ্ট হয়, পরকে অপমান করিয়া যাহাদিগকে জাতিরক্ষা করিতে হইবে, পরের হাতে চিরদিন অপমানিত না হইয়া তাহাদের গতি নাই। তাহারা যাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে সেই ম্লেচ্ছের অবজ্ঞা তাহাদিগকে সহ্য করিতে হইবেই।..
>
> হিন্দু-মুসলমান এক হইলে পরস্পরের কত সুবিধা একদিন কোনো সভায় মুসলমান শ্রোতাদিগকে তাহাই বুঝাইয়া বলা হইতেছিল। তখন আমি এই কথাটি না বলিয়া থাকিতে পারি নাই যে, সুবিধার কথাটা এ স্থলে মুখে আনিবার নহে; দুই ভাই এক হইয়া থাকিলে বিষয়কর্ম ভালো চলে, কিন্তু সেইটেই দুই ভাই এক হইয়া থাকিবার প্রধান হেতু হওয়া উচিত নহে।... আমাদের পরস্পরের মধ্যে, সুবিধার চর্চা নহে, প্রেমের চর্চা নিঃস্বার্থ সেবার চর্চা যদি করি তবে সুবিধা উপস্থিত হইলে তাহা পুরা গ্রহণ করিতে পারিব এবং অসুবিধা উপস্থিত হইলেও তাহাকে বুক দিয়া ঠেকাইতে পারিব।[৩৪]

এতদিন হিন্দু-মুসলমান বিরোধের জন্যে শুধু তৃতীয় পক্ষকেই তিনি দায়ী করেছেন, কিন্তু এখন এই বিরোধের মূল তাঁর কাছে অনাবৃত হয়ে দেখা দিল বলেই তিনি বলতে পারলেন,

> আমাদের দেশে হিন্দু ও মুসলমান যে পৃথক, এই বাস্তবটিকে বিস্মৃত হইয়া আমরা যে কাজ করিতেই যাই-না-কেন এই বাস্তবটি আমাদিগকে কখনোই বিস্মৃত হইবে না। এ কথা বলিয়া নিজেকে ভুলাইলে চলিবে না যে, হিন্দু মুসলমানের সম্বন্ধের মধ্যে কোনো পাপই ছিল

না, ইংরেজই মুসলমানকে আমাদের বিরুদ্ধ করিয়াছে।[৩৫]

শুধু তাই নয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বিরোধিতার জন্যে রবীন্দ্রনাথ মুসলমানের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতে পারলেন না। তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ পেল দেশীয় রাজনীতির ধারার বিরুদ্ধেই, যে ধারার পুরোভাগে ছিলেন হিন্দু নেতৃবৃন্দ :

> আমরা যে মুসলমানদের অথবা আমাদের দেশের জনসাধারণের যথার্থ হিতৈষী তাহার কোনো প্রমাণ কোনোদিন দিই নাই; অতএব তাহারা আমাদের হিতৈষিতায় সন্দেহ বোধ করিলে তাহাদিগকে দোষী করা যায় না। ভাইয়ের জন্য ভাই ক্ষতিস্বীকার করে বটে, কিন্তু ভাই বলিয়া একজন খামকা আসিয়া দাঁড়াইলেই যে অমনি তখনই কেহ তাহাকে ঘরের অংশ ছাড়িয়া দেয় এমনতরো ঘটে না।[৩৬]

১৩১৪ সালে পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর "সভাপতির অভিভাষণে" হিন্দু-মুসলমান বিরোধের আরেকটি প্রকৃত কারণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন রবীন্দ্রনাথ। বাস্তব অগ্রগতির অসাম্য যে উভয় সম্প্রদায়ের চিত্তকে বিপরীতমুখী করে তুলেছে, সেকথা এই ভাষণেই প্রথম তিনি উল্লেখ করেন :

> আমরা গোড়া হইতে ইংরেজের ইস্কুলে বেশি মনোযোগের সঙ্গে পড়া মুখস্থ করিয়াছি বলিয়া গবর্মেন্টের চাকরি ও সম্মানের ভাগ মুসলমান ভ্রাতাদের চেয়ে আমাদের অংশে বেশি পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। এইরূপে আমাদের মধ্যে একটা পার্থক্য ঘটিয়াছে। এইটুকু কোনো মতে না মিটিয়া গেলে আমাদের ঠিক মনের মিলন হইবে না, আমাদের মাঝখানে একটা অসূয়ার অন্তরাল থাকিয়া যাইবে। মুসলমানেরা যদি যথেষ্ট পরিমাণে পদমান লাভ করিতে থাকেন তবে অবস্থার অসাম্যবশত জ্ঞাতিদের মধ্যে যে মনোমালিন্য ঘটে তাহা ঘুচিয়া গিয়া আমাদের মধ্যে সমকক্ষতা স্থাপিত হইবে। যে রাজপ্রসাদ এতদিন আমরা ভোগ করিয়া আসিয়াছি আজ প্রচুর পরিমাণে তাহা মুসলমানদের ভাগে পড়ুক, ইহা আমরা যেন সম্পূর্ণ প্রসন্নমনে প্রার্থনা করি। কিন্তু এই প্রসাদের যেখানে সীমা সেখানে পৌঁছিয়া তাঁহারা যেদিন দেখিবেন বাহিরের ক্ষুদ্র দানে অন্তরের গভীর দৈন্য কিছুতেই ভরিয়া উঠে না, যখন বুঝিবেন শক্তিলাভ ব্যতীত লাভ নাই এবং ঐক্য ব্যতীত সে লাভ অসম্ভব, যখন জানিবেন যে একদেশে আমরা জন্মিয়াছি সেই দেশের ঐক্যকে খণ্ডিত করিতে থাকিলে ধর্মহানি হয় এবং ধর্মহানি হইলে কখনোই স্বার্থ রক্ষা হইতে পারে না, তখনই আমরা উভয় ভ্রাতায় একই সমচেষ্টার মিলনক্ষেত্রে আসিয়া হাত ধরিয়া দাঁড়াইব।
>
> যাই হউক, হিন্দু ও মুসলমান, ভারতবর্ষের এই দুই প্রধান ভাগকে এক রাষ্ট্রসম্মিলনের মধ্যে বাঁধিবার জন্য যে ত্যাগ, যে সহিষ্ণুতা যে সতর্কতা ও আত্মদমন আবশ্যক তাহা আমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে।...[৩৭]

এই উদ্দেশ্যসাধনের পথ কর্মক্ষেত্রের বিস্তৃতি ও হৃদয়ের উদারতা সাধন। স্বাদেশিক কর্মীদের প্রতি তাই রবীন্দ্রনাথের আবেদন :

> কর্মক্ষেত্রকে সর্বত্র বিস্তৃত করো—এমন উদার করিয়া এতদূর বিস্তৃত করো যে, দেশের উচ্চ ও নীচ, হিন্দু মুসলমান ও খ্রীস্টান সকলেই যেখানে সমবেত হইয়া হৃদয়ের সহিত হৃদয়, চেষ্টার সহিত চেষ্টা সম্মিলিত করিতে পারে।[৩৮]

১৯০২ খ্রিস্টাব্দে যিনি লিখেছিলেন, "মামুদের আক্রমণ হইতে লর্ড কার্জনের সাম্রাজ্যগর্বোদ্‌গারকাল পর্যন্ত যে-কিছু ইতিহাসকথা তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে বিচিত্র কুহেলিকা; তাহা স্বদেশ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টির সহায়তা করে না, দৃষ্টি আবৃত করে মাত্র", ১৯০৮ সালে তিনি বললেন, ভারতবর্ষের ইতিহাস শুধু হিন্দুর নয়, হিন্দু-মুসলমানের

ইতিহাসও নয়; এ ইতিহাসের ধারায় ইংরেজেরও একটা অর্থপূর্ণ স্থান আছে। তাই "ইংরেজের সঙ্গে আমাদের মিলন সার্থক করিতে হইবে" এবং এটাও মনে রাখতে হবে যে, "আমরা সমস্ত পৃথিবীর; আমাদেরই জন্য বুদ্ধ খ্রীষ্ট মহম্মদ জীবন গ্রহণ ও জীবন দান করিয়াছেন।"[৪০]

বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের ব্যাপকতা ও বিলাতি-বর্জন আন্দোলনের তীব্রতার দিনে ইংরেজ শাসনের কঠোর সমালোচক রবীন্দ্রনাথ যে প্রাচ্য-প্রতীচ্য মিলনের উপরে এতটা জোর দিলেন, তার পেছনে তাঁর তত্ত্বগত দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া একটা বাস্তব কারণও ক্রিয়াশীল ছিল। বিলাতিবর্জন আন্দোলনকে সর্বব্যাপী করার উদ্দেশ্যে বলপ্রয়োগ করা হয়েছিল বহু ক্ষেত্রে; আর এই রাজনৈতিক বিক্ষোভ সন্ত্রাসবাদের পথও নিয়েছিল। এই দুই প্রচেষ্টাই রবীন্দ্রনাথের কাছে ছিল নিন্দনীয়। তাঁর মতে, অন্যায় ও অবৈধ উপায়ে কোনো সুফল লাভ করা সম্ভব নয়, বরঞ্চ সে প্রচেষ্টা মানুষের বিচারবুদ্ধিকে বিকৃত করে, মানুষকে সত্যভ্রষ্ট করে। যে স্বাদেশিক চিন্তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি ছিল না, 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে (১৯১৬) সন্দীপ সেই চিন্তার সমর্থক : সে বলেছে, "সত্য মানুষের লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হচ্ছে ফললাভ"। মাস্টারমশায়ের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ তার ভ্রম-সংশোধন করে বলেছেন, "সত্য ফল-লাভ"।[৪১] রাজনৈতিক আন্দোলন যখন রবীন্দ্রনাথের অনভিপ্রেত বিরোধের মূর্তি নিল, তখন তিনি একাকী মিলনের সাধনায় ব্রতী হলেন, যে মিলনের উপলব্ধিতে 'গোরা' উপন্যাসের (১৯১০) নায়কের চিত্তবৃত্তি মুক্তি পেয়েছিল :

> আমি যা দিনরাত হতে চাচ্ছিলুম অথচ হতে পারছিলুম না, আজ আমি তাই হয়েছি। আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খৃস্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন।[৪২]

১৯১০ খ্রিস্টাব্দে শান্তিনিকেতনে রাখি-উৎসব উদ্‌যাপন-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সে কথারই পুনরাবৃত্তি করেন :

> আমরা বারংবার সহস্রবার সকলকেই প্রীতির বন্ধনে ঐক্যের বন্ধনে বাঁধবার চেষ্টা করব— এইটেই আমাদের একটা দায়; বিধাতা এইটেই আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন।...
>
> ... বঙ্গ-বিভাগের বিরোধক্ষেত্রে এই যে রাখিবন্ধনের দিনের অভ্যুদয় হয়েছে এর অখণ্ড আলোক এখন এই ক্ষেত্রকে অতিক্রম করে সমস্ত ভারতের মিলনের সুপ্রভাতরূপে পরিণত হোক। তা হলেই এই দিনটি ভারতের বড়োদিন হবে। তা হলেই এই বড়োদিনে বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদের মিলন হবে। এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে না, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস করতে হবে।[৪৩]

অন্তর যা চাইছে, বাইরে তার প্রকাশ দেখতে না পেয়ে আন্দোলনের পথ থেকে সরে এলেন রবীন্দ্রনাথ; তাঁর ভাবনা, তাঁর অনুভূতি নিঃসৃত হল 'গীতাঞ্জলি'র (১৯১০) গীতধারায়, 'শান্তিনিকেতন'-প্রবন্ধাবলির উপদেশে (১৯০০-১৬), 'রাজা' নাটকের (১৯১০) আধ্যাত্মিকতায়। কিন্তু দেশের সমস্যার কথা ভুলতে পারছেন না বলেই "ভারততীর্থে"র মতো কবিতা[৪৪] লিখছেন, "তপোবন" প্রবন্ধে হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টানের মিলনের কথা বলছেন, আর "ভক্ত" প্রবন্ধে "মানুষের ধর্মরাজ্যে যে তিনজন মহাপুরুষ সর্বোচ্চ চূড়ায় অধিরোহণ করেছেন"—বুদ্ধ, খৃস্ট ও মহম্মদ—তাঁদের বিশ্বজনীন বাণীর উদারতা স্মরণ করছেন।

বলা বাহুল্য, ব্রাহ্ম সমাজের ভাবলোকে রবীন্দ্রনাথ এই বিশ্বজনীনতার আদর্শকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ তাঁর কাছে সমন্বয়পন্থারই পথিক। কিন্তু দ্বিধাবিভক্ত ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেও যে বহু বিরোধ ও পরানুকরণ, গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতা প্রশ্রয়

পেয়েছিল, সে কথা অস্বীকার করাও কঠিন। 'গোরা'র পানুবাবুর মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ সে সংকীর্ণতাকে রূপ দিয়েছিলেন। পানুবাবু যদি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি না হন, তবে হিন্দু সংকীর্ণতাই–বা সে সমাজের বৈশিষ্ট্য হবে কেন? ঋষিদের বাণীতে যে উদার মানবতার প্রকাশ তিনি দেখেছেন, তাই–বা মিথ্যে হবে কেন?

রবীন্দ্রনাথ তাই এবারে হিন্দু ধর্ম ও প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে বিশ্বজনীন আদর্শ সন্ধান করলেন এবং সন্ধানলাভও করলেন। "ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা" ও "আত্মপরিচয়" প্রবন্ধ তার পরিচয় বহন করে। হিন্দু ধর্মের যে সর্বজনীন রূপ তিনি এতে তুলে ধরতে চাইলেন, তা নিয়ে হিন্দু ও ব্রাহ্ম সমাজেই বিতর্কের সূত্রপাত হল। তাঁর মতে, হিন্দু কোনো ধর্মের নাম নয়, তা ভারতেতিহাসের জাতিগত পরিণাম; আর ব্রাহ্ম, খ্রিস্টান, মুসলমান সম্প্রদায় এই বৃহত্তর হিন্দু সমাজের অংশবিশেষ। তাই ব্রাহ্মের পরিচয় হিন্দু ব্রাহ্ম হিসেবে, এদেশী খ্রিস্টানের পরিচয় হিন্দু খ্রিস্টান হিসেবে আর এদেশের মুসলমানের পরিচয় হিন্দু মুসলমান রূপে।[৪৬]

'গীতাঞ্জলি'–'শান্তিনিকেতন'র ভক্তিরস কি 'রাজাপ্রজা'–'সমূহ'র বাস্তব অভিজ্ঞতাকে এমনি করে বিপর্যস্ত করল? বস্তুত অধ্যাত্ম সাধনার দিক দিয়ে ভাবতে গিয়েই রবীন্দ্রনাথ এমন কথা বলতে পেরেছিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক সমস্যার আলোচনায় তাঁর এ বিভ্রান্তি ঘটে নি। মাত্র কয়েক মাস পূর্বে "হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়" প্রবন্ধে তিনি অত্যন্ত মুক্ত দৃষ্টি নিয়ে হিন্দু–মুসলমান সমস্যার আলোচনা করেছেন :

> হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সকল দিক দিয়া একটা সত্যকার ঐক্য জন্মে নাই বলিয়াই রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাদিগকে এক করিয়া তুলিবার চেষ্টায় সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সূত্রপাত হইল। এই সন্দেহকে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। আমরা মুসলমানকে যখন আহ্বান করিয়াছি তখন তাহাকে কাজ উদ্ধারের সহায় বলিয়া ডাকিয়াছি, আপন বলিয়া ডাকি নাই। যদি কখনো দেখি তাহাকে কাজের জন্য আর দরকার নাই তবে তাহাকে অনাবশ্যক বলিয়া পিছনে ঠেলিতে আমাদের বাধিবে না।...
>
> মুসলমান এই সন্দেহটি মনে লইয়া আমাদের ডাকে সাড়া দেয় নাই। আমরা দুই পক্ষ একত্র থাকিলে মোটের উপর লাভের অঙ্ক বেশি হইবে বটে, কিন্তু লাভের অংশ তাহার পক্ষে বেশি হইবে কি না, মুসলমানের সেইটেই বিবেচ্য। অতএব মুসলমানের এ কথা বলা অসংগত নহে যে আমি যদি পৃথক থাকিয়াই বড়ো হইতে পারি তবেই তাহাতে আমার লাভ।
>
> কিছুকাল পূর্বে হিন্দু–মুসলমানের মধ্যে এই স্বাতন্ত্র্য–অনুভূতি তীব্র ছিল না। ... একটা দিন আসিল যখন হিন্দু আপন হিন্দুত্ব লইয়া গৌরব করিতে উদ্যত হইল।... যে কারণে হিন্দুর হিন্দুত্ব উগ্র হইয়া উঠিল সেই কারণেই মুসলমানের মুসলমানি মাথা তুলিয়া উঠিল। এখন সে মুসলমান রূপেই প্রবল হইতে চায়, হিন্দুর সঙ্গে মিশিয়া গিয়া প্রবল হইতে চায় না।...
>
> আজ আমদের দেশে মুসলমান স্বতন্ত্র থাকিয়া নিজের উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিতেছে। তাহা আমাদের পক্ষে যতই অপ্রিয় এবং তাহাতে আপাতত আমাদের যতই অসুবিধা হউক, একদিন পরস্পরের যথার্থ মিলন সাধনের ইহাই প্রকৃত উপায়।...[৪৭]

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের এই মত সমর্থন করবার মতো লোক তখন দেশে বেশি ছিলেন না; বিশেষ করে, বঙ্গভঙ্গ–আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল ভিন্নরূপ। সে–আন্দোলন দীর্ঘকাল চলার পর ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে গেল; সেই ঘোষণার মাস দেড়েক পর রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ যাত্রা করলেন।

ইউরোপ যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে ভারতীয় সাধনার ঐক্য সন্ধান করছিলেন, তার পরিচয় আমরা পেয়েছি। প্রথমে ইউরোপে এবং পরে আমেরিকায় এ বিষয়ে তিনি বক্তৃতাও করেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ পেলেন তিনি। তার কিছুকাল পরে খবর এল মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে ইউরোপে। যুদ্ধের মধ্যে একদিকে সংকীর্ণ স্বার্থের দ্বন্দ্ব আর অন্যদিকে সরল মানবত্বের লাঞ্ছনা তাঁকে নিদারুণ আঘাত করল। তাঁর সে গভীর দুঃখবোধের কিছুটা পরিচয় আছে 'শান্তিনিকেতন'র কোনো কোনো ভাষণে।[৪৮] যুদ্ধের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সমসাময়িক প্রবন্ধ "লড়াইয়ের মূলে" তিনি বলেন, এই আত্মঘাতী দ্বন্দ্বের বীজ ইউরোপীয় সভ্যতা লালন করছিল তার নিজের গর্ভেই। এশিয়া ও আফ্রিকাকে ইউরোপ যখন পদদলিত করে, তখন মানবসমাজকে প্রভু ও দাসের শ্রেণীতে বিভক্ত করতে তার বাধে নি। সেই তত্ত্বের জোরেই আজ জার্মানি ইউরোপকে ভাগ করতে চাইছে প্রভু ও দাসের শ্রেণীতে।[৪৯] সুতরাং প্রভুত্ব বিস্তারের মূলে যে মনোভাব ক্রিয়াশীল, তার অপনোদন ছাড়া শান্তি দুর্লভ।

১৯১৬ সালে জাপান ও আমেরিকা ভ্রমণে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই কথাটাই বিশেষ করে বলতে চান। বঙ্গভঙ্গ–আন্দোলনের কালে স্বাদেশিকতার উগ্রমূর্তি দেখে তাঁর মনে যে প্রশ্ন জেগেছিল, এই বক্তৃতাগুলোয় তারই সম্প্রসারিত উত্তর পাওয়া গেল। *Nationalism* (১৯১৭) গ্রন্থে দেখতে পাই, কবি বলেছেন, ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ মানুষের পক্ষে আত্মঘাতী। ব্যক্তিমানুষের শ্রেয়োবোধকে এ তত্ত্বের পাদমূলে বিসর্জন দিতে হয়। সম্পদ ও শক্তির মোহ এ তত্ত্বের থেকে অবিচ্ছেদ্য, তাই দেশে দেশে মৈত্রীসাধনের অন্তরায় তা। জাতীয়তার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ জাতিসকল শুধু স্বার্থের মিলনেই বাধা পড়ে, অন্যথা তার দন্তনখর মানুষের সরল বিশ্বাস ও জীবন্ত আদর্শের মূল ছেদন করে।[৫০]

দেশে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ সংকীর্ণতার ভিন্নতর মূর্তি প্রত্যক্ষ করলেন। রাজনৈতিক আন্দোলনের মুখে ইংরেজ শাসকের মারমুখো চেহারা একদিকে, অন্যদিকে হিন্দু–মুসলমান বিরোধ। এর আগের বার ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ থেকে প্রত্যাবর্তন করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন "লোকহিত" প্রবন্ধ : হিন্দু–মুসলমান প্রসঙ্গে তাতে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। এবারে লিখলেন 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' : সেখানেও ধর্মভেদের কথা আছে। তবে এবারে দেখতে পাচ্ছি, ধর্ম আর ধর্মতন্ত্র এ দুটোকে পৃথক করে দেখে তিনি ধর্মতন্ত্রের নিন্দায় প্রবৃত্ত হয়েছেন :

> ধর্ম বলে মানুষকে যদি শ্রদ্ধা না কর তবে অপমানিত ও অপমানকারী কারও কল্যাণ হয় না। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, মানুষকে নির্দয়ভাবে অশ্রদ্ধা করিবার বিস্তারিত নিয়মাবলি যদি নিখুঁত করিয়া না মান তবে ধর্মভ্রষ্ট হইবে।[৫২]

ধর্মতন্ত্রের বিধানে দেশে শুধু দাসসৃষ্টির কারখানা খোলা হয়েছে, তাই আমরা সর্বত্রই কর্তৃত্বের অধিকার হারিয়েছি। তবু একথাও সত্য যে, কর্তৃত্বের অযোগ্যতার অজুহাত ইংরেজের মুখে সাজে না, কারণ, "লড়াইয়ের মূল" প্রবন্ধ লেখার তিন বছর পরেও রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস—অন্য জাতিকে এভাবে বঞ্চিত করার প্রবৃত্তি ইউরোপীয় সভ্যতার মর্মবাণী নয়।

> ইংরেজ ভারতের কাছে সত্যে বদ্ধ; ইংরেজ য়ুরোপীয় সভ্যতার দায়িত্ব বহিয়া এই পূর্বদেশে আসিয়াছে; সেই সভ্যতার বাণীই তাহার প্রতিশ্রুতি–বাণী। সেই দলিলকেই আমরা সব চেয়ে বড়ো দলিল করিয়া চলিব,—এ কথা তাহাকে কখনোই বলিতে দিব না যে, ভারতবর্ষকে আমরা টুকরা টুকরা করিয়া মাথাকাটা করিবার জন্যই সমুদ্র পার হইয়া আসিয়াছি।[৫৩]

"ছোট ও বড়ো" প্রবন্ধে এ কথার পুনরাবৃত্তি আছে আরো স্পষ্ট করে :

> ন্যায়, সত্য এবং স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা এই ইংরেজ জাতির অন্তরের আদর্শ। সেই আদর্শ ইহাদের সাহিত্যে ও ইতিহাসে নানা আকারে ও অধ্যবসায়ে প্রকাশ পাইয়াছে এবং আজিকার মহাযুদ্ধেও সেই আদর্শ নানা ছলনা ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাহাদিগকে শক্তিদান করিতেছে।[৫৪]

যে ইংরেজ এ আদর্শ বহন করে, সাহিত্যে আর ইতিহাসে যার পরিচয় পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথ তাকে চিহ্নিত করলেন বড় ইংরেজ বলে; আর যে ইংরেজের রুদ্রমূর্তি ভারতবর্ষে নিত্য প্রকাশমান, সে হল ছোট ইংরেজ।

কিন্তু ইংরেজ যেমনই হোক, তার শাসন থেকে যে আমাদের মুক্তি চাই, সে কথাটা খুব স্পষ্ট করেই রবীন্দ্রনাথ বললেন। তবে পূর্ব-পশ্চিমের মিলনের মধ্যেই সে মুক্তির সূত্র লুকিয়ে আছে, এও তাঁর কথা। মুক্তিলাভের পথে আমাদের প্রধান অন্তরায় হল স্বধর্মের নামে যে অধর্মকে আমরা স্থায়ী করে রেখেছি, তার শাসন। সন্ত্রাসবাদের মধ্যে বীরত্ব দেখা দিয়েছে বটে, তবু "এই চুরি ডাকাতি গুপ্তহত্যা" দেশভক্তি প্রকাশের প্রকৃষ্ট উপায় নয়। তাই চাই এমন একটি ভাবাদর্শ যার প্রভাবে—কি দেশপ্রীতির নামে, কি স্বধর্মপ্রীতির নামে হিংসাবৃত্তির যে প্রকাশ দেখা যায়, তার নিরসন ঘটে। রবীন্দ্রনাথ তাই বললেন :

> এ-কথা মানিতেই হইবে আমাদের দেশে ধর্ম লইয়া হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একটা কঠিন বিরুদ্ধতা আছে। যেখানে সত্যভ্রষ্টতা, যেখানে অপরাধ সেইখানেই শাস্তি। ধর্ম যদি অন্তরের জিনিস না হইয়া শাস্ত্রমত ও বাহ্য আচারকেই মুখ্য করিয়া তোলে তবে সেই ধর্ম যত বড়ো অশান্তির কারণ হয়, এমন আর কিছুই না।... বিশেষ শাস্ত্রমতের অনুশাসনে বিশেষ কালে যদি কেবল বিশেষ পশুহত্যা না করাকেই ধর্ম বলা যায় এবং সেইটে জোর করিয়া যদি অন্য ধর্মমতের মানুষকেও মানাইতে চেষ্টা করা হয়, তবে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিরোধ কোনো কালেই মিটিতে পারে না। নিজে ধর্মের নামে পশুহত্যা করিব অথচ অন্যে ধর্মে নামে পশুহত্যা করিলেই নরহত্যার আয়োজন করিতে থাকিব, ইহাকে অত্যাচার ছাড়া আর কোনো নাম দেওয়া যায় না। আমাদের আশা এই যে, চিরদিন আমাদের ধর্ম আচারপ্রধান হইয়া থাকিবে না। আরো-একটি আশা আছে, একদিন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে দেশহিতসাধনের একই রাষ্ট্রীয় আইডিয়াল যদি আমাদের রাষ্ট্রতন্ত্রে বাস্তব হইয়া উঠে তবে সেই অন্তরের যোগে বাহিরের সমস্ত পার্থক্য তুচ্ছ হইয়া যাইবে।[৫৫]

রাষ্ট্রীয় আইডিয়ালের ক্ষেত্রে যাই হোক, অন্তত শিক্ষাক্ষেত্রে "সার্বজাতিক মনুষ্যত্ব চর্চার কেন্দ্র" প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিশ্বভারতী স্থাপিত হয় এই প্রবন্ধ রচনার বছরখানেকের মধ্যেই। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের এ পরিণতি রবীন্দ্রনাথের ভাবলোকের পরিবর্তনের প্রবল স্বাক্ষর।

কিন্তু বাইরের ঘটনা বারবার তাঁর আইডিয়ালে আঘাত করতে কার্পণ্য করে না। ১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথের 'ছোট ইংরেজ' জালিয়ান-ওয়ালাবাগে যখন বর্বর মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করল, তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করে ভাইসরয়কে এক কঠোর পত্র লিখে জনতার কথা নিজের কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন। কিছুদিন পর ইউরোপ আমেরিকা ভ্রমণে গেলেন কবি। যখন ফিরলেন, তখন অসহযোগ আন্দোলনের জন্য দেশ প্রস্তুত। মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধাভাবাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও এ আন্দোলন তিনি সমর্থন করতে পারলেন না। বিশেষ করে, যা রাজনীতি ও অর্থনীতির বিষয়, গান্ধীজী যে তাকে ধর্মনীতির দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চাইছেন, রবীন্দ্রনাথের প্রবল আপত্তি হল সেখানে :

> আজ ঘোষণা করা হয়েছে, বিদেশী কাপড় অপবিত্র অতএব তাকে দগ্ধ করো। অর্থ শাস্ত্রকে বহিষ্কৃত করে তার জায়গায় ধর্ম শাস্ত্রকে জোর করে টেনে আনা হল। অপবিত্র কথাটা

ধর্মশাস্ত্রের কথা—অর্থের নিয়মের উপরের কথা।... কিন্তু কোনো কাপড় পরা বা না-পরার মধ্যে যদি কোনো ভুল থাকে তবে সেটা অর্থ তত্ত্বের বা স্বাস্থ্যতত্ত্বের বা সৌন্দর্যতত্ত্বের ভুল—এটা ধর্মতত্ত্বের ভুল নয়।... কাপড় পোড়ানোর হুকুম আজ আমাদের পরে এসেছে। সেই হুকুমকে হুকুম বলে আমি মানতে পারব না, তার প্রথম কারণ হচ্ছে এই যে, চোখ বুজে হুকুম মানার বিষম বিপত্তি থেকে দেশকে উদ্ধার করবার জন্যে আমাদের লড়তে হবে—...। যে-কলের দৌরাত্ম্যের সমস্ত পৃথিবী পীড়িত, মহাত্মাজি সেই কলের সঙ্গে লড়াই করতে চান, এখানে আমরা তাঁর দলে। কিন্তু যে মোহমুগ্ধ মন্ত্রমুগ্ধ অন্ধবাধ্যতা আমাদের দেশের সকল দৈন্য ও অপমানের মূলে, তাকে সহায় করে এ-লড়াই করতে পারব না। কেননা তারই সঙ্গে আমাদের প্রধান লড়াই, তাকে তাড়াতে পারলে তবেই আমরা অন্তরে বাহিরে স্বরাজ পাব।[৫৬]

রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের যোগ ঘটানোই যে গান্ধী-রাজনীতির সবচেয়ে বড় দুর্বলতা, সেকথা রবীন্দ্রনাথের মতো আর কেউ তখন উপলব্ধি করেন নি। যন্ত্রশক্তি সম্পর্কে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর মতের মিল যেখানে সেখানে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গিরও অসম্পূর্ণতা।

যন্ত্রশক্তির বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের এই গান্ধীবাদী বিক্ষোভ তাঁর 'মুক্তধারা' (১৯২২) নাটকেও রূপায়িত হয়েছে। এ সত্ত্বেও একথা স্মরণযোগ্য যে, গান্ধীজীর নির্দেশ মতো চরকা কাটতে বা তার মহিমা গাইতে কবি স্বীকৃত হন নি, যদিও এ অস্বীকৃতির জন্যে তাঁকে রূঢ় সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছে—এমনকি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কাছ থেকেও। আচার্য মশায়ের সমালোচনার জবাবে "চরকা" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যা লেখেন, তাতে দেখা যায়, যন্ত্রশক্তির আবশ্যকতা বা তার কল্যাণকর ভূমিকা সম্পর্কেও তিনি অচেতন ছিলেন না :

সকলে মিলে মৌমাছির মতো একই নমুনার চাক বাঁধবে, বিধাতা এমন ইচ্ছে করেন নি। কিন্তু সমাজবিধাতারা কখনো কখনো সেই রকম ইচ্ছা করেন। তাঁরা কাজকে সহজ করবার লোভে মানুষকে মাটি করতে কুণ্ঠিত হন না।...

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, মানুষ যেদিন প্রথম চাকা আবিষ্কার করেছিল সেদিন তার এক মহা দিন।... ইতিহাসের সেই প্রথম অধ্যায়ে যখন চরকা ঘুরে মানুষের ধন উৎপাদনের কাজে লাগল ধন তখন থেকে চক্রবর্তী হয়ে চলতে লাগল, সেদিনকার চরকাতেই এসে থেমে রইল না। ... বিজ্ঞান মর্তলোকে এই বিষ্ণুচক্রের অধিকার বাড়াচ্ছে এ কথা যদি ভুলি, তা হলে পৃথিবীতে অন্য যে সব মানুষ চক্রীর সম্মান রেখেছে তাদের চক্রান্তে আমাদের মরতে হবে।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মহাচক্রের যে বিরাট শক্তিরূপ দেখা যায় সেটাকে যখন ভুলি, যখন কোনো এক বিশেষ কালের বিশেষ চরকাকেই সুতো কাটবার চরম উপাদান রূপে দেখি ও অভ্যস্তভাবে ব্যবহার করি, ...তখন যে-চরকা মানুষকে একদিন শক্তির পথে ধনের পথে অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছে সে আর এগোবার কথা বলে না। ...[৫৭]

এতটা ইতিহাস সচেতন যিনি, কলের সঙ্গে লড়াই করার ভ্রান্ত ইচ্ছা তাঁর মনে স্থায়ী হতে পারে না; রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তা হয় নি।

"সত্যের আহবান" ও "চরকা"—এই প্রবন্ধ দুটি রচনার মাঝে রবীন্দ্রনাথ লেখেন "সমস্যা"। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমস্যার ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা এত বড় যে, কবিকে বারবার এ প্রসঙ্গে আসতে হয়েছে। এর আগে দেখা যাচ্ছিল ভেদবুদ্ধির জন্যে ধর্মকে বাঁচিয়ে তিনি দায়ী করছিলেন ধর্মতন্ত্রকে। এবারে যেন 'তন্ত্র'টুকু বাদ গেল :

আমাদের আর-একটি প্রধান সমস্যা হিন্দু-মুসলমান সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান এত দুঃসাধ্য তার কারণ দুই পক্ষই মুখ্যত আপন আপন ধর্মের দ্বারাই অচলভাবে আপনাদের

> সীমানির্দেশ করেছে। সেই ধর্মই তাদের মানববিশ্বকে সাদা কালো ছক কেটে দুই সম্প্রদায় ভাগে বিভক্ত করেছে—আত্ম ও পর।[৫৮]

মোপলা–হাঙ্গামার পরে লেখা এই "সমস্যা" প্রবন্ধে এবং আর তিন বছর পর মুসলমান আততায়ীর হাতে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের জীবননাশের পরে লেখা "স্বামী শ্রদ্ধানন্দ" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের এমন কিছু কিছু উক্তি আছে, বিচ্ছিন্ন করে দেখলে যার অপব্যাখ্যা সম্ভব। হিন্দু মুসলমানের পরস্পরবিরুদ্ধতা যে সাময়িক রাজনৈতিক মিলনের চেয়ে অধিকতর বাস্তব সত্য, এ কথা তিনি জোর দিয়ে বলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে মোপলা–হাঙ্গামা ও শ্রদ্ধানন্দ–হত্যার মধ্যে মুসলমানের একটা উগ্রমূর্তি দেখতে পেয়েছিলেন কবি। তাঁর মনে হয়েছিল যে, অবজ্ঞা ও সংকীর্ণতা দিয়ে মুসলমানকে এতকাল হিন্দু সমাজ দূরে ঠেলে রেখেছিল, তার প্রতিক্রিয়ায় মুসলমান এখন প্রবল হয়েছে এবং হিন্দুকে প্রতি–আঘাত করতে উদ্যত হয়েছে। মনে মনে এই ধরনের একটা অঙ্ক কষার পরে রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখলেন যে, বর্ণভেদের ফলে হিন্দু সম্প্রদায় নিজেদেরকে দেওয়াল তুলে বিভক্ত করেছে; অন্যপক্ষে মুসলমানের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে এই সামাজিক ভেদ না থাকায় সে ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছে। অতএব, হিন্দু দুর্বল আর মুসলমান প্রবল। উভয়কে মিলিত হতে বলে সমকক্ষ হতে হবে। সেই সমকক্ষতার পথে প্রথম পদক্ষেপ হওয়া উচিত হিন্দুর সামাজিক ঐক্য।[৫৯]

বস্তুত হিন্দুর সামাজিক ভেদ যে হিন্দু–মুসলমান সমস্যার মতো এদেশের একটা বড় সমস্যা, সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অনেক দিন ধরেই সচেতন। হিন্দু ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধ মুসলমানের শক্তি পরীক্ষা করুক, এটা তাঁর অভিপ্রায় নয়। কিন্তু সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার কালে হিন্দু–মুসলমানের রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্বের প্রশ্নে তিনি হিন্দুর সামাজিক সমস্যার কথা উত্থাপন না করলেই হয়তো ভালো করতেন।[৬০]

তবে রবীন্দ্রনাথ বোঝাতে চেয়েছেন যে, সাম্প্রদায়িক সমস্যা তথা আমাদের দেশের বহু সমস্যারই মূল রয়েছে আমাদের সামাজিক নীতি ও ধর্মীয় আচারের মধ্যে। "যে–মাটিতে কণ্টকতরু ওঠে, সে–মাটিকে যতক্ষণ শোধন না করা হয় ততক্ষণ তো কোনো ফল হবে না।"[৬০ক] যে ভেদবুদ্ধি হিন্দু সমাজকে বিভক্ত করেছে, যে–অবজ্ঞা নিম্নবর্ণের হিন্দুকে লাঞ্ছিত করেছে, সে ভেদবুদ্ধি মুসলমানকে আরো বেশি করে পর করেছে, আরো বেশি করে লাঞ্ছনা দিয়েছে। তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন।

ধর্ম যে মানুষকে জল–অচল ভাগে বিভক্ত করছে, "সমস্যা" প্রবন্ধে অভিব্যক্ত তাঁর এই দুঃখপূর্ণ উপলব্ধির তাই পরিবর্তন হয় নি। ১৯২৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে শান্তিনিকেতন মন্দিরে ভাষণ দিতে গিয়ে ব্যথিতচিত্ত কবি বললেন :

> এই মোহমুগ্ধ ধর্মবিভীষিকার চেয়ে সোজাসুজি নাস্তিকতা অনেক ভালো।... নাস্তিকতার আগুনে তার সব ধর্মবিকারকে দাহ করা ছাড়া, একেবারে নূতন করে আরম্ভ করা ছাড়া আর কী পথ আছে, বুঝতে তো পাচ্ছি নে।[৬১]

১৯৩০ সালে অক্সফোর্ডে প্রদত্ত *The Religion of Man* বক্তৃতামালায় কবি সর্বমানুষের ধর্ম খুঁজেছেন, আর পর বছর হিন্দু মুসলমান বিরোধ–প্রসঙ্গে বলেছেন :

> যে–দেশে প্রধানত ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায়, অন্য কোনো বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারে না, সে–দেশ হতভাগ্য। সে–দেশ স্বয়ং ধর্মকে দিয়ে যে–বিভেদ সৃষ্টি করে সেইটে সকলের চেয়ে সর্বনেশে বিভেদ। মানুষ বলেই মানুষের যে–মূল্য সেইটেকেই সহজ প্রীতির সঙ্গে স্বীকার করাই প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি। যে–দেশে ধর্মই সেই বুদ্ধিকে পীড়িত করে রাষ্ট্রিক স্বার্থবুদ্ধি কি সে–দেশকে বাঁচাতে পারে।

বিপ্লবকালের ফ্রান্স, বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত রাশিয়া, বিদ্রোহী মেক্সিকো আর নব্য তুরস্কের দৃষ্টান্ত দেখালেন রবীন্দ্রনাথ—যেখানে "ধর্মতন্ত্রের নিদারুণ অধার্মিকতা দমন করবার জন্যে, মানুষকে ধর্মপীড়া থেকে বাঁচাবার জন্যে" অর্থপূর্ণ প্রচেষ্টা হয়েছে।[৬২]

১৯২১ থেকে ১৯৩২, এই বার বছরের বেশির ভাগ সময় রবীন্দ্রনাথ বিদেশ-ভ্রমণে ব্যয় করেছেন। জাপানে গিয়ে কবি নবজাগ্রত উগ্র জাপানি জাতীয়তাবাদের নিন্দা করেন; ইতালিতে গিয়ে করেন মুসোলিনীর প্রশংসা—ফ্যাসিজমের রুদ্ররূপ সম্পর্কে তিনি অবহিত হন ইতালি ছেড়ে যাবার পর।[৬৩] সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণ করে তাঁর মনে হয় ব্যক্তির হাত থেকে সমষ্টির হাতে সম্পদ চলে যাওয়ায় সে-দেশ এত উন্নতি করেছে।[৬৪] পারস্য ভ্রমণ করতে করতে তাঁর মনে হয়, "চিরকালের মতো বাঁধা মতের ধর্মসম্প্রদায় আজকের দিনে সকলের চিত্তকে এক শাসনের দ্বারা ভয়ের দ্বারা লোভের দ্বারা মোহের দ্বারা অভিভূত করে স্থাবর করে রেখে দেবে, এ আর চলবে না।"[৬৫]

শেষ কথাটা বিশেষ করে দেশের পরিস্থিতি স্মরণ করেই বলা। স্বদেশে-বিদেশে যেখানেই থাকুন রবীন্দ্রনাথ, দেশের অবস্থা ভুলতে পারছেন না কখনো। প্রধানত সাম্প্রদায়িক ও সামাজিক সমস্যার কথাই ভাবছেন (উপরে যার কিছু আভাস আছে), রাজনীতির কথাও মাঝে মাঝে বলছেন। যেমন ১৯২৩ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যখন কংগ্রেস থেকে বের হয়ে এসে স্বরাজ্য দল গঠন করেন এবং কংগ্রেসের বাধা অগ্রাহ্য করে প্রাদেশিক পরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন রবীন্দ্রনাথ তার নিন্দা করেন নি, বরঞ্চ দেশবন্ধুর যে নিজের মতে চলবার অধিকার আছে, এ-কথাটাই প্রকারান্তরে বলবার চেষ্টা করেছিলেন। তবে পরিষদে প্রবেশ করে তার কাজে বাধা দেওয়া বা পরিষদ ভেঙে ফেলার চেষ্টা তাঁর সমর্থন পায় নি।[৬৬] এই সময়ে হিন্দু মহাসভা গঠনের প্রয়াসকেও তিনি প্রকারান্তরে সমর্থন করেন।[৬৭] ১৯২৭ সালে ইংরেজের দমননীতির প্রতিবাদে খোলা চিঠি লেখেন তিনি।[৬৮] ১৯৩০-এ একই বিষয়ে সংবাদপত্রে বিবৃতি দেন লন্ডনে বসে; লন্ডনের এক সভায় ভারতবাসীর স্বাধীনতা কামনাকে বাণী দেন : "Give us the right to serve our own country"।[৬৯] প্রথম গোল টেবিল বৈঠকে আমন্ত্রিত হলে গান্ধীজী তাঁর যোগদানের প্রশ্নে কতকগুলো শর্ত আরোপ করেন; রবীন্দ্রনাথ মনে করলেন, এ সম্মেলনে দ্বিধাহীনচিত্তে তিনি যোগ দিলেই ভাল করতেন।[৭০] ১৯৩১-এ হিজলি জেলে রাজবন্দী হত্যার প্রতিবাদে জনসভায় ভাষণ দিলেন তিনি।[৭১] পর বছর গান্ধীজীকে গ্রেফতার করা হলে তারবার্তার মাধ্যমে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে আর সংবাদপত্রে বিবৃতি মারফত সকলের সমক্ষে তাঁর প্রতিবাদ জ্ঞাপন করলেন।[৭২]

জেলে বসে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধী অনশন শুরু করলেন। মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের অধিকার আগেই স্বীকৃত হয়েছিল; এবারে তপসিলিদের স্বতন্ত্র অধিকার দেওয়া হলে দেশব্যাপী প্রতিবাদ উত্থাপিত হয় প্রধানত বর্ণহিন্দুদের পক্ষ থেকে। গান্ধীজীর অনশন ব্রতের প্রতি সমর্থন জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই আন্দোলনে যোগ দেন। পুণা-চুক্তির মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান হয়। মীমাংসার পরে অনুষ্ঠিত জনসভায় রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ প্রেরণ করেন, তাতে তিনি বিশেষভাবে বলেছিলেন হিন্দু-মুসলমান সহযোগের কথা :

> On this day of our rejoicing over our reconciliation with the depressed classes of India, we still suffer from a bitter sense of disappointment for not being able to realise the confidence of our Mahomedan brethren which is absolutely necessary for the fulfilment of our national life.[৭৩]

পুণা–চুক্তির পরে বাংলাদেশের বর্ণহিন্দু সমাজনেতারা দাবি করলেন যে, এই চুক্তির ফলে বাঙালি বর্ণহিন্দুর স্বার্থে আঘাত লেগেছে। যে–চুক্তি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন ভাষণ লিখে, নয় মাস পর সে–চুক্তিকে তিনি প্রতিবাদযোগ্য মনে করলেন। অন্য প্রদেশের নেতারা যে বাংলার হিন্দুস্বার্থকে এভাবে উপেক্ষা করেছেন, তা তাঁর মতে "terribly ominous"[৭৪]। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে পুণা–চুক্তির মর্ম গৃহীত হলে বাঙালি হিন্দুর পক্ষ থেকে ভারতসচিবের কাছে এক আবেদনপত্র পাঠানো হয় ১৯৩৬ সালে। এই আবেদনপত্রে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাম ছিল পুরোভাগে। তাঁদের আবেদন অগ্রাহ্য হলে কলকাতায় প্রতিবাদ–সভা আহূত হয়। শরৎচন্দ্র প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তির অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ এ সভায় যোগদান করেন। মুসলমানেরা তখন যা চাইছিলেন, এ সভার মূল সুর ছিল তার বিরুদ্ধে, তবু রবীন্দ্রনাথ মুসলমানের কথা ভাবলেন তাঁর বক্তৃতায় :

> ... নানা কারণে অবশ্য এতদিন মুসলমান সম্প্রদায় সুযোগসুবিধার অসাম্য হেতু নানারূপ কষ্ট পাইয়াছে। এ বৈষম্য হইতে তাহারা যাহাতে মুক্ত হয় সর্বান্তঃকরণে তাহাই আমি চাই। ... মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু দুর্লভ ও প্রশংসনীয় গুণের সমাবেশ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; বিশেষতঃ তাহাদের সহজাত গণতান্ত্রিক মনোবৃত্তি তাহাদিগকে স্বভাবতঃই যোগ্যতার অধিকারী করিয়াছে। ... আমাদের যখন একই ভূমিতে বাস ও বিচরণ করিতে হইবে, তখন সভ্যজনোচিত অস্তিত্ব রক্ষার জন্যও অন্ততঃ পারস্পরিক মৈত্রীর শরণাপন্ন হইতে হইবে,—উভয় পক্ষকেই এ–সব সাময়িক প্রলোভন ও উত্তেজনার ঊর্ধ্বে উঠিতে হইবে।[৭৫]

পণ্ডিত মালব্যকে প্রেরিত তারবার্তায় এই সমস্যার সমাধানকল্পে রবীন্দ্রনাথ যে আবেদন জানিয়েছিলেন, তাতেও তাঁর বক্তব্য এই বক্তৃতার মতোই, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা–বিরোধী নেতাদের মনোভাব থেকে পৃথক ছিল :

> I urge that Hindus and Mahomedans should sit together dispassionately to consider the communal award and the implications to arrive at an agreed solution of the communal problem.[৭৬]

পর বছর আরেকটি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে মতপ্রকাশ করতে হয়, যে–মত সমকালীন মুসলমানদের চিন্তার সপক্ষে ছিল না। "বন্দেমাতরম্" গান নিয়ে মুসলমানদের আপত্তি বহুকাল ধরেই শোনা গিয়েছিল। এটিকে জাতীয় সঙ্গীতরূপে গ্রহণ করা যায় কিনা, ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস কমিটি তা বিবেচনা করতে বসেন। রবীন্দ্রনাথ এক লিখিত পত্রে জানান যে, সম্পূর্ণ গানটি, বিশেষত উপন্যাসটির পরিপ্রেক্ষিতে, মুসলমানকে আঘাত করতে পারে; কিন্তু গানটির প্রথম যে স্তবক দুটি জাতীয় সঙ্গীতরূপে চলছে, বিচ্ছিন্নভাবে গ্রহণ করলে, তা কোনো সম্প্রদায়কে আঘাত করে না। এই দুটি স্তবক তখন জাতীয় সঙ্গীতরূপে গৃহীত হয়।[৭৭]

কংগ্রেসের মধ্যেকার একটি বিরোধেও রবীন্দ্রনাথ কিছুটা জড়িয়ে পড়েন। সে–বিরোধ সুভাষ বসু ও গান্ধী–ঘটিত। এ বিরোধে রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি ছিল সুভাষের সঙ্গে। ত্রিপুরী কংগ্রেসের পরে রবীন্দ্রনাথ যে কয়েকটি ব্যক্তিগত পত্র লেখেন, তাতে কংগ্রেস ও গান্ধী সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা করেন তিনি :

> অবশেষে আজ, এমনকি, কন্‌গ্রেসের মঞ্চ থেকেও হিটলারি নীতির নিঃসংকোচ জয়ঘোষণা শোনা গেল।... স্বাধীনতার মন্ত্র উচ্চারণ করবার জন্য যে বেদী উৎসৃষ্ট সেই বেদীতেই ফাসিস্টের সাপ ফোঁস করে উঠেছে।[৭৮]
>
> মহাত্মাজি যখন রাষ্ট্রিক উদ্দেশ্য নিয়ে মাঝে মাঝে অনশনব্রত গ্রহণ করেন তখন সমস্ত দেশ উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে, এতে তাঁর আত্মার কী উৎকর্ষ সাধন হয় আমি বুঝতেই পারি নে

> বরঞ্চ ফল উল্‌টো হবারই কথা। ... লক্ষ্যসিদ্ধির উদ্দেশে মানুষের করুণাবৃত্তির উপর এই যে পীড়ন অন্তত ভারতবর্ষ কোনোদিন একে কর্তব্য বলে স্বীকার করে নি।[৭৯]
>
> কন্‌গ্রেসের অন্তঃসঞ্চিত ক্ষমতার তাপ হয়তো তার অস্বাস্থ্যের কারণ হয়ে উঠেছে বলে সন্দেহ করি।...[৮০]

এরপরও সুভাষের উপরে আরোপিত কংগ্রেসের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের অনুরোধ জানিয়ে গান্ধীজীকে তার করেন কবি এবং প্রত্যাখ্যাত হন।[৮১] প্রতিষ্ঠানগত উদ্যোগের সঙ্গে এরপর আর তাঁর তেমন কোনো যোগ দেখতে পাই না।

দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কিছু কিছু জড়িত করছেন নিজেকে,[৮২] আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কেও তাঁর মানবতাবাদী মতামত প্রকাশ করছেন,[৮৩] এমনি সময়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হল। আর্তচিত্তে রবীন্দ্রনাথ একবার যুদ্ধের বিভীষিকাকে স্মরণ করলেন, একবার ফ্যাসিবাদ–নাৎসিবাদের মৃত্যু কামনা করলেন।

বাংলাদেশের বিশিষ্ট পুরুষেরা এ সময়ে এক বিবৃতি প্রকাশ করেন। মিত্রশক্তির সঙ্গে ভারতবর্ষের সহযোগিতার নীতি ঘোষণা করে এতে ভারতবর্ষের জন্যে আত্মরক্ষার সামর্থ্য ও স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দাবি করা হয়। সেই বিবৃতিতে রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর পড়ে সবার উপরে। মৃত্যুর দু–মাস আগে কবির শেষ বিবৃতি প্রকাশিত হয় : সেখানেও তিনি ভারতবর্ষের ইংরেজ শাসনের নির্ভীক সমালোচনা করেছেন, তার স্বাধীনতা কামনার আবেগ ব্যক্ত করেছেন।

জীবনের শেষ জন্মোৎসবে ভাষণ দিলেন কবি—'সভ্যতার সংকট'—মৃত্যুর চার মাস আগে। তাতে জীবনের অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ করেছেন তিনি :

> ...মানব মৈত্রীর বিশুদ্ধ পরিচয় দেখেছি ইংরেজ–চরিত্রে তাই আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়ে ইংরেজকে হৃদয়ের উচ্চাসনে বসিয়েছিলেম। তখনো সাম্রাজ্যমদমত্ততায় তাদের স্বভাবের দাক্ষিণ্য কলুষিত হয় নি।...
>
> ...অন্ন বস্ত্র পানীয় শিক্ষা আরোগ্য প্রভৃতি মানুষের শরীরমনের পক্ষে যা কিছু অত্যাবশ্যক তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধহয় পৃথিবীর আধুনিক শাসনচালিত কোনো দেশেই ঘটে নি। অথচ এই দেশ ইংরেজকে দীর্ঘকাল ধরে তার ঐশ্বর্য জুগিয়ে এসেছে।...
>
> যে যন্ত্রশক্তির সাহায্যে ইংরেজ আপনার বিশ্বকর্তৃত্ব রক্ষা করে এসেছে তার যথোচিত চর্চা থেকে এই নিঃসহায় দেশ বঞ্চিত। অথচ চক্ষের সামনে দেখলুম জাপান যন্ত্রচালনার যোগে দেখতে দেখতে সর্বতোভাবে কিরকম সম্পদবান হয়ে উঠল। ...আর দেখেছি রাশিয়ার মস্কাও নগরীতে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের আরোগ্য বিস্তারের কী অসামান্য অকৃপণ অধ্যবসায়—সেই অধ্যবসায়ের প্রভাবে এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের মূর্খতা ও দৈন্য ও আত্মাবমাননা অপসারিত হয়ে যাচ্ছে।... সেখানকার মুসলমানদের সঙ্গে রাষ্ট্র–অধিকারের ভাগ–বাঁটোয়ারা নিয়ে অমুসলমানদের কোনো বিরোধ ঘটে না; তাদের উভয়ের মিলিত স্বার্থসম্বন্ধের ভিতরে রয়েছে শাসনব্যবস্থার যথার্থ সত্য ভূমিকা।...
>
> ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মী ছাড়া দীনতার আবর্জনাকে। একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে। জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। ... কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস

হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে।...[৮৬]

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, যন্ত্রশক্তির বিকাশ, জীবনধারণের আবশ্যকীয় উপকরণের শুভকর বণ্টন আর সর্বোপরি সরল মানবতার প্রতিষ্ঠাকামনার মধ্যে আশি বছরের বিচিত্র সৃষ্টিশীল জীবনের যবনিকাপাত হল।

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়' (কলিকাতা, ১৩৪৯), পৃ ৬০-৬২।

২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'পুরুবিক্রম নাটকে'র (১৮৭৪) অন্তর্ভুক্ত গানটি রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত গান (ঐ, পৃ ৬১)। কিন্তু এ গানটি 'পুরুবিক্রমে'র প্রথম সংস্করণে ছিল না, দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৭৯) তা যুক্ত হয় ('গীতবিতান', অখণ্ড সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৭১, পৃ ৯৮৬-৮৮)। সুতরাং 'সরোজিনী'র গানটিকে রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত গান বলা যেতে পারে।

৩ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি' (কলিকাতা, ১৩২৬), পৃ ১৪৭।

৪ ব্রজেন্দ্রনাথ, পৃ ৬৬-৬৭।

৫ এই কবিতাটির মূল পাঠ স্মরণ করেই 'জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : "লর্ড কর্জনের সময় দিল্লিদরবার সম্বন্ধে একটা গদ্যপ্রবন্ধ লিখিয়াছি—লর্ড লিটনের সময় লিখিয়াছিলাম পদ্যে। তখনকার ইংরেজ গবর্মেণ্ট রুসিয়াকেই ভয় করিত, কিন্তু চৌদ্দপনেরো বছর বয়সের বালক কবির লেখনীকে ভয় করিত না। এইজন্য সেই কাব্যে বয়সোচিত উত্তেজনা প্রভূত পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও তখনকার প্রধান সেনাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া পুলিসের কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত কেহ কিছুমাত্র বিচলিত হইবার লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই।"—'রবীন্দ্র-রচনাবলী', সপ্তদশ খণ্ড (পুনর্মুদ্রণ; কলিকাতা, ১৩৬১), পৃ ৩৪৯।

৬ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্র-জীবনী', প্রথম খণ্ড (সংশোধিত সংস্করণ; কলিকাতা, ১৩৬৭), পৃ ৬১।

৭ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃ ১৬৬-৬৭।

৮ 'জীবনস্মৃতি'। 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', সপ্তদশ খণ্ড, পৃ ৩৫০।

৯ প্রভাতকুমার, প্রথম খণ্ড, পৃ ১৪৭।

১০ 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', প্রথম খণ্ড (পুনর্মুদ্রণ; কলিকাতা, ১৩৬৩), পৃ ৩৭০।

১১ ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড (পুনর্মুদ্রণ; কলিকাতা, ১৩৬৩), পৃ ৪৮৩।

১২ প্রভাতকুমার, প্রথম খণ্ড, পৃ ১৭০-৭১।

১৩ ঐ, পৃ ১৮৪-৮৮।

১৪ "রামমোহন রায়", 'চারিত্রপূজা'। 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', চতুর্থ খণ্ড (পুনর্মুদ্রণ ;কলিকাতা, ১৯৫৭), পৃ ৫১৯-২৩।

১৫ 'সমাজ'। 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', দ্বাদশ খণ্ড (পুনর্মুদ্রণ; কলিকাতা, ১৩৫৮), পৃ ৪১৩-৪৯; ৪৬১ ৬৭।

১৬ "শ্রীমান দামু বসু ও চামু বসু সম্পাদক সমীপেষু", 'কড়ি ও কোমল'র প্রথম সংস্করণের (১৮৮৬) অন্তর্ভুক্ত, পরে পরিত্যক্ত।

১৭ 'মানসী'। 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ২৩৬-৪২।

১৮ 'হাস্যকৌতুক'। 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', ষষ্ঠ খণ্ড (পুনর্মুদ্রণ; কলিকাতা, ১৩৬৩), পৃ ৭৩-৭৮; ১০১-৫।

১৯ প্রভাতকুমার, প্রথম খণ্ড, পৃ ২৮৭।

২০ 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড (পুনর্মুদ্রণ; কলিকাতা, ১৩৬৯), পৃ ১৬৩-৭৮।

২১ 'রাজা প্রজা'। 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', দশম খণ্ড (পুনর্মুদ্রণ; কলিকাতা, ১৩৫৭), পৃ ৩৮২-৯৪।

২২ ঐ, পৃ ৩৯৪।

২৩ ঐ, পৃ ৩৯৩-৯৪। বস্তুত মুসলমানদের সম্পর্কে তাঁর ভাবনা এর কিছুকাল আগে থেকেই আকার নিতে শুরু করেছিল।*Nineteenth Century* পত্রিকায় সৈয়দ আমীর আলীর প্রবন্ধ পড়ে রবীন্দ্রনাথ লেখেন "প্রাচ্য সমাজ"। তাতে তিনি বলছেন : "এমন সময়ে মহম্মদের আবির্ভাব হইল। মর্তলোকে স্বর্গরাজ্যের আসন্ন আগমন প্রচার করিয়া লোকসমাজে একটা হুলস্থূল বাধাইয়া দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। সে-সময়ে আরব-সমাজে যে-উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল তাহাই যথাসম্ভব সংযত করিতে তিনি মনোনিবেশ করিলেন। পূর্বে বহুবিবাহ দাসীসংসর্গ ও যথেচ্ছ স্ত্রী পরিত্যাগের কোনো বাধা ছিল না; তিনি তাহার সীমানির্দিষ্ট করিয়া দিয়া স্ত্রীলোককে অপেক্ষাকৃত মান্য-পদবীতে আরোপণ করিলেন। তিনি বার বার বলিয়াছেন, স্ত্রী বর্জন ঈশ্বরের চক্ষে নিতান্ত অপ্রিয় কার্য। কিন্তু এ-প্রথা সমূলে উৎপাটিত করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত ছিল না। এই জন্য তিনি স্ত্রীবর্জন একেবারে নিষেধ না করিয়া অনেকগুলি গুরুতর বাধার সৃষ্টি করিলেন।

... মহম্মদ প্রাচীন আরব কুপ্রথা কিয়ৎপরিমাণে দূর করিয়া তাহাদিগকে যেখানে দাঁড় করাইলেন তাহারা সেইখানেই দাঁড়াইল, আর নড়িল না। কোনো সংস্কারকার্য বীজের মতো ক্রমশ অঙ্কুরিত হইয়া যে পরিপুষ্টতা লাভ করিবে আমাদের সমাজ সেরূপ জীবনপূর্ণ ক্ষেত্র নহে। ..."— 'সমাজ'। 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' দ্বাদশ খণ্ড, পৃ ৪৫৮-৬০।

২৪ 'রাজা প্রজা'। 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', দশম খণ্ড, পৃ ৫৩৮-৪১।

২৫ ঐ, পৃ ৪১৮-২১। এখানে বলা সঙ্গত যে, ১৮৯৮তে কলকাতার নিম্নশ্রেণীর মুসলমানেরা যখন ইংরেজদের সঙ্গে সংঘর্ষজনিত কারণে উৎপীড়িত হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ তাদের হয়েই রাজসরকারকে ধিক্কার দিয়েছিলেন। দ্রষ্টব্য : "কণ্ঠরোধ", 'রাজা প্রজা'। ঐ, পৃ ৪২৮।

২৬ 'সমাজ'। 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', দ্বাদশ খণ্ড, পৃ ২২৮-২৯।

২৭ "প্রসঙ্গ কথা", 'ভারতী', ১৩০৫। 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', দশম খণ্ড, পৃ ৫৫৮।

২৮ 'ভারতবর্ষ'। 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', চতুর্থ খণ্ড, পৃ ৩৯০।

২৯ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রজীবনকথা' (কলিকাতা, ১৩৬৬), পৃ ৭৬। এর কিছুকাল আগে রবীন্দ্রনাথ দুই মেয়েরই বিয়ে দিলেন। বিয়ের বয়স সম্পর্কে নিজের প্রচারিত মতকে লঙ্ঘন করে এবং জ্যেষ্ঠা কন্যার ক্ষেত্রে একরকম বরপণ দিয়েই। দ্রষ্টব্য : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্র-জীবনী', দ্বিতীয় খণ্ড (তৃ-স; কলিকাতা ১৩৬৮), পৃ ২৭-৩০। তাঁর তৎকালীন হিন্দুভাবনার সঙ্গে এসব সিদ্ধান্তের কোনো সম্পর্ক আছে কি?

৩০ প্রভাতকুমার, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৪২-৪৩ : "[উপাধ্যায়] ব্রহ্মবান্ধবের ব্যবস্থায় রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত 'বোর্ডিং বিদ্যালয়' ব্রহ্মচর্যাশ্রম রূপ গ্রহণ করিল। শিষ্যরা গুরুগৃহে যেন বাস করিতেছে ইহা হইল আদর্শ, রবীন্দ্রনাথ হইলেন 'গুরুদেব' : এই নাম উপাধ্যায় কর্তৃক প্রবর্তিত। উপাধ্যায়ের কঠোর ব্যবস্থায় ছাত্রদের জুতা-ছাতা ব্যবহার নিষিদ্ধ, নিরামিষ ভোজন সার্বজনিক; তবে আহার-স্থানে বর্ণভেদ মানাই আবশ্যিক। এই মধ্যযুগীয় ব্যাপার উপাধ্যায়ের তৎকালীন মতবাদের অনুরূপ বলিয়াই এখানে প্রবর্তিত হইয়াছিল।..

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদর্শে প্রাতে ও সায়াহ্নে ছাত্রদিগকে গায়ত্রী-মন্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া ধ্যানের জন্য প্রদত্ত

হইত। উপাসনার সময় কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া শুচি দেহ মনে একান্তে উপবেশন করিতে হইত। উপাসনান্তে বর্তমান গ্রন্থাগারের মধ্যের ঘরটিতে ছাত্রেরা সমবেত হইয়া বেদমন্ত্র গাহিত, সেই সমবেত-উপাসনা-প্রথা এখন পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। অতঃপর ছাত্রেরা অধ্যাপকদের পদধূলি লইয়া প্রণাম করিয়া বনছায়াতলে গিয়া পাঠ আরম্ভ করিত।"

৩১ 'ভারতবর্ষ'। 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', চতুর্থ খণ্ড, পৃ ৪৪৩-৪৭।

৩২ প্রভাতকুমার, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ১২৬-২৮।

৩৩ "বিলাসের ফাঁস", 'সমাজ'। 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', দ্বাদশ খণ্ড, পৃ ২২০।

৩৪ 'প্রবসী', শ্রাবণ ১৩১৪, পৃ ২৩৮-৪০। 'রবীন্দ্র-রাচনাবলি', দশম খণ্ড, পৃ ৬২৮-৩০।

৩৫ "সমস্যা", 'রাজা প্রজা'। ঐ, পৃ ৪৮১।

৩৬ "সদুপায়", 'সমূহ'। ঐ, পৃ ৫২৬।

৩৭ 'সমূহ'। ঐ, পৃ ৫০০-২।

৩৮ "পথ ও পাথেয়", 'রাজা প্রজা'। ঐ, পৃ ৪৬৫।

৩৯ "ভারতবর্ষের ইতিহাস", 'ভারতবর্ষ'। 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', চতুর্থ খণ্ড, পৃ ৩৭৯।

৪০ "পূর্ব ও পশ্চিম", 'সমাজ'। 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', দ্বাদশ খণ্ড, পৃ ২৬৪-৬৫।

৪১ 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', অষ্টম খণ্ড (পুনর্মুদ্রণ; কলিকাতা, ১৩৬০), পৃ ২৪০।

৪২ 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ ৫৭০।

৪৩ প্রভাতকুমার, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ২৩১। শান্তিনিকেতনে এ বছর খ্রিস্টের জন্মোৎসব ও চৈতন্যের স্মরণে বিশেষ ভাষণের আয়োজন করা হয়।—ঐ, পৃ ২৫৫।

৪৪ 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', একাদশ খণ্ড (পুনর্মুদ্রণ; কলিকাতা, ১৩৫৮), পৃ ৮১-৮৪।

৪৫ 'শান্তিনিকেতন'। 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', চতুর্দশ খণ্ড (পুনর্মুদ্রণ; কলিকাতা; ১৩৬০), পৃ ৪৭৯, ৪৯১-৯৩।

৪৬ 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', অষ্টাদশ খণ্ড (পুনর্মুদ্রণ; কলিকাতা, ১৩৬১), পৃ ৪৬৪।

৪৭ ঐ, পৃ ৪৭৪-৭৫।

৪৮ "মা মা হিংসী" ও "পাপের মার্জনা"। 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', ষোড়শ খণ্ড (পুনর্মুদ্রণ; কলিকাতা, ১৩৬০), পৃ ৪৯০-৯৬।

৪৯ 'কালান্তর'। 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', চতুর্বিংশ খণ্ড (কলিকাতা, ১৩৫৪), পৃ ২৭১-৭২।

৫০ প্রসঙ্গক্রমে উদ্ধৃতিযোগ্য : "...We must must stand up and give warning to all, that this nationalism is a cruel epidemic of evil that is sweeping over the human world of the present age, and eating into its moral vitality ..... you who live under the delusion that you are free, are every day sacrificing your freedom and humanity to this fetich of nationalism, living in the dense poisonous atmosphere of world wide suspicion and greed and panic. ... Its [জাতীয়তাবাদের] one wish is to trade on the feebleness of the rest of the world, like some insescts that are bred in the paralysed flesh of victims kept just enough alive to make them toothsome and nutritious. Therefore it is ready to send its poisonous fluid into the vitals of the other living peoples, who, not being nations, are harmless. ... for the wisdom of the Nation is not in its faith in humanity but in its complete distrust. ... Nation can only trust Nation where there interests coalesce, or at least do not conflict."

Nationalism (reprinted; London, 1918) pp. 16. 26, 30, 40.
তুলনীয়, ৬৪,৬৫ ও ৬৬ সংখ্যক কবিতা, 'নৈবেদ্য', 'রবীন্দ্র–রচনাবলী', অষ্টম খণ্ড, পৃ ৫১–৫৩। ৬৫ সংখ্যক কবিতায় লিখেছিলেন, "ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে/বাহি স্বার্থতরী, গুপ্ত পর্বতের পানে।"
অন্যথা চমৎকার এই *Nationalism* বক্তৃতামালার একটিতে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় বর্ণাশ্রমধর্মের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাকে শোচনীয় না বলে পারা যায় না : "Her caste system is the outcome of this spirit of toleration. (p 115).

৫১ 'কালান্তর'। 'রবীন্দ্র–রচনাবলী', চতুর্বিংশ খণ্ড, পৃ ২৬১–৬২ দ্রষ্টব্য।

৫২ 'রবীন্দ্র–রচনাবলী', অষ্টাদশ খণ্ড, পৃ ৫৫৪। এই কালে নিজের ধর্মমত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছিলেন, এ প্রসঙ্গে তা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করা যেতে পারে : "সকল মানুষেরই 'আমার ধর্ম' বলে একটা বিশেষ জিনিস আছে। কিন্তু সেইটিকেই সে স্পষ্ট করে জানে না। সে জানে আমি খৃষ্টান, আমি মুসলমান, আমি বৈষ্ণব, আমি শাক্ত ইত্যাদি। কিন্তু সে নিজেকে যে ধর্মাবলম্বী বলে জন্মকাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত নিশ্চিত আছে সে হয়তো সত্য তা নয়। নাম গ্রহণেই এমন একটা আড়াল তৈরি করে দেয় যাতে নিজের ভিতরকার ধর্মটা তার নিজের চোখেও পড়ে না।
... জলের জলত্বই হচ্ছে জলের ধর্ম, আগুনের আগুনত্বই হচ্ছে আগুনের ধর্ম। তেমনি মানুষের ধর্মটিই হচ্ছে তার অন্তরতম সত্য।"—'আত্মপরিচয়'। 'রবীন্দ্র–রচনাবলী', সপ্তবিংশ খণ্ড (কলিকাতা, ১৯৬৫), পৃ ২১৩।

৫৩ 'রবীন্দ্র–রচনাবলী', অষ্টাদশ খণ্ড, পৃ ৫৫৪।

৫৪ 'কালান্তর'। 'রবীন্দ্র–রচনাবলী', চতুর্বিংশ খণ্ড, পৃ ২৮১।

৫৫ ঐ, পৃ ২৭৩–৭।

৫৬ "সত্যের আহ্বান", ঐ, পৃ ৩৩৫–৩৭। এই সঙ্গে ১৯৩৪ সালে গান্ধী–রবীন্দ্রনাথের মতবিরোধ স্মরণ করা যেতে পারে। বিহারের ভূমিকম্পে প্রচুর লোক ও সম্পদের হানি হলে গান্ধীজী বলেছিলেন যে, এ হচ্ছে অস্পৃশ্যতা পাপের প্রায়শ্চিত্ত। এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে পত্র লেখেন।—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্র–জীবনী', তৃতীয় খণ্ড (কলিকাতা, ১৩৫৯), পৃ ৩৬৮।

৫৭ 'কালান্তর'। 'রবীন্দ্র–রচনাবলী', চতুর্বিংশ খণ্ড, পৃ ৪০৫–৬।

৫৮ ঐ, পৃ ৩৫৩।

৫৯ ঐ, পৃ ৩৫৫–৫৬; ৪৩৩–৩৬।

৬০ এই দুটো সমস্যা মিলিয়ে ফেলেছিলেন বলেই সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী রবীন্দ্রনাথ ১৯২৩ সালে হিন্দু মহাসভা গঠনের প্রতি পরোক্ষ সমর্থন জানাতে পেরেছিলেন। তাঁর মতে, রাজনৈতিক আন্দোলনের চেয়ে সামাজিক আন্দোলন অধিক প্রয়োজনীয়। মুসলমানদের সংঘবদ্ধ হবার যে স্বাধীনতা আছে, হিন্দুদেরও তা থাক উচিত; হিন্দুরা সংঘবদ্ধ হতে চাইলে মুসলমানরা কেন তাতে বাধা দেবে?—প্রভাতকুমার, তৃতীয় খণ্ড, পৃ ১১৪।

৬০ ক "স্বামী শ্রদ্ধানন্দ", 'রবীন্দ্র–রচনাবলী', চতুর্বিংশ খণ্ড, পৃ ৪৩৬।

৬১ প্রভাতকুমার, তৃতীয় খণ্ড পৃ ১৮০–৮১। তুলনীয় একই সময়ে লেখা কবিতা "ধর্মমোহ", 'পরিশেষ' 'রবীন্দ্র–রচনাবলী', পঞ্চদশ খণ্ড (পুনর্মুদ্রণ; কলিকাতা, ১৩৬০), পৃ ২৮৪–৮৪ : "ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো,/এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।"

৬২ "হিন্দুমুসলমান", 'কালান্তর'। 'রবীন্দ্র–রচনাবলী', চতুর্বিংশ খণ্ড, পৃ ৪৩৫–৬।

৬৩ প্রভাতকুমার, তৃতীয় খণ্ড, পৃ ১৩৮ ও ১৮৮–৯৩।

৬৪ সোভিয়েত ইউনিয়নের সাফল্য সম্পর্কে অধ্যাপক পেট্রভকে প্রেরিত রবীন্দ্রনাথের তারবার্তা : "Your success is due to turning the tide of wealth from the individual to collective humanity."—'রবীন্দ্র-রচনাবলী', বিংশ খণ্ড (কলিকাতা, ১৩৫২), পৃ ৪৫৪।

৬৫ 'পারস্যে'। 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', দ্বাবিংশ খণ্ড (কলিকাতা, ১৩৫৩), পৃ ৫৭৫।

৬৬ প্রভাতকুমার, তৃতীয় খণ্ড, পৃ ১১৩–১৪।

৬৭ উপরে ৬০-সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৬৮ প্রভাতকুমার, তৃতীয় খণ্ড, পৃ ২০২–৩।

৬৯ ঐ, পৃ ২৭৫; ২৭৭।

৭০ ঐ, পৃ ২৮২–৮৩।

৭১ "হিজলি", 'কালান্তর'। 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', চতুর্বিংশ খণ্ড, পৃ ৪৫৩–৫৪ দ্রষ্টব্য।

৭২ প্রভাতকুমার, তৃতীয় খণ্ড, পৃ ৩১৪–১৫।

৭৩ ঐ, পৃ ৩৩৫–৩৬।

৭৪ ঐ, ৩৬০।

৭৫ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্র-জীবনী' চতুর্থ খণ্ড, (কলিকাতা, ১৩৬৩), পৃ ৬৫–৬৬। সভার মূল সুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের এই ভিন্নতায় এ কথা অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, এই আন্দোলনে কবি যোগ দিয়েছিলেন অনুরোধে পড়ে—তাঁর অন্তরের সবটুকু সমর্থন সেখানে ছিল না। ১৯৩৯ সালের একটি ঘটনা এই অনুমানের সমর্থন যোগায়। বাংলাদেশে সরকারী চাকরির হারের ভাগ নিয়ে হিন্দু-মুসলমানে তখন মতান্তর চলছে : সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে ভাগ চাইছেন মুসলমানেরা, যোগ্যতার মাপকাঠিতে নিয়োগ প্রার্থনা করে হিন্দুরা তার বিরোধিতা করছেন। ভারত সরকারের কাছে হিন্দুদের পক্ষ থেকে এই মর্মে প্রেরিত একটি আবেদনপত্রে স্বাক্ষর দেন রবীন্দ্রনাথ আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই (২০ জুন ১৯৩৯) একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে অমিয় চক্রবর্তীকে জানান : "সেই পত্রে স্বাক্ষর করতে আমার যথেষ্ট দ্বিধা ছিল।... অনিচ্ছাসত্ত্বেও নালিশের পত্রে আমি সই দিয়েছি।"—ঐ, পৃ ১৬৮।

৭৬ ঐ, পৃ ৬৪।

৭৭ ঐ, পৃ ১০২।

৭৮ অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা ১৭ মার্চ ১৯৩৯ তারিখের পত্র। ঐ, পৃ ১৬২।

৭৯ অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা ৩ এপ্রিল ১৯৩৯ তারিখের পত্র। ঐ, পৃ ১৬২।

৮০ অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা ২০ মে ১৯৩৯ তারিখের পত্র। ঐ, পৃ ১৭৩।

৮১ ঐ, পৃ ১৯২–৯৩।

৮২ যেমন, ১৯৩৭এ আন্দামান-বন্দীদের দাবির সমর্থন। ঐ, পৃ ৯৩–৯৬।

৮৩ যেমন, ১৯৩৮-এ চীনের প্রতি জাপানের অত্যাচারের প্রতিবাদ। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নোগুচিকে লেখেন : "Wishing your people whom I love, not success, but remorse."। ঐ, পৃ ১৩৮–৪০ দ্রষ্টব্য।

৮৪ ঐ, পৃ ১৮৬।

৮৫ ঐ, পৃ ২৫০–৫২।

৮৬ 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', ষড়বিংশ খণ্ড (কলিকাতা, ১৩৫৫), পৃ ৬৩৫–৪০।

প রি শি ষ্ট

১৯৬৭ সালে প্রচারিত বাংলা বিবৃতির প্রতিলিপি

সম্প্রতি একটি দৈনিক পত্রিকায় ২৩শে জুন ১৯৬৭ তারিখে মুদ্রিত এক সংবাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। ইহাতে সরকারী ~~[illegible]~~ মাধ্যম হইতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার হ্রাস ও বর্জনের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হইয়াছে। আমরা এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত দুঃখজনক বলিয়া মনে করি। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বাংলা ভাষাকে যে ঐশ্বর্য দান করিয়াছে, তাঁহার সঙ্গীত আমাদের অনুভূতিকে যে গভীরতা ও তীক্ষ্ণতা দান করিয়াছে, তাহা রবীন্দ্রনাথকে বাংলাভাষী পাকিস্তানীদের সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করিয়াছে। সরকারী নীতি নির্ধারণের সময় এই সত্যের গুরুত্বকে যথোপযুক্ত মর্যাদা দান করা অপরিহার্য।

[illegible] 25/6/67   [illegible] 24/6/67   [illegible] 24/6/67

[illegible] 24/6/67   [illegible] 24/6/67   [illegible] 24/6/67

কাজী মোতাহার হোসেন 24/6/67   মুনীর চৌধুরী

[illegible] 24.6.67   [illegible]   [illegible] 24/6/67

[illegible] 24/6/67 [illegible]

[illegible]   [illegible]   [illegible] 24/6/67

১৯৬৭ সালে প্রচারিত ইংরেজি বিবৃতির প্রতিলিপি

Our attention has been drawn to a news item published in a local daily of June 23, 1967. It discloses an official decision regarding the ~~exclusion~~ gradual elimination of Tagore songs from Broadcasting. This we consider very unfortunate. The enrichment Tagore brought to the Bengali language by his literary creations, the refinement his songs brought to our sensibility, make him an integral part of the cultural existence of the Bengali-speaking Pakistanis. In the framing of our Broadcasting policy the significance of this fact should be respected.

Mufazzal Haider Chaudhury 24.6.67
Ahmed Sharif 24.6.67
Neelima Ibrahim 24.6.67
Rafiqul Islam 24.6.67
Kamruzzaman 24/6/67
[illegible] Shahidullah Kaiser

M. A. Bari 24-6-67
Sufia Kamal
[illegible] 24.6.67
Munier Chowdhury 23.6.67
Hasan Hafizur Rahman 24.6.67
Sikander Abu Zafar 24/6/67
[illegible] 24.6.67
Shamsur Rahman 24/6/67
Fazal Shahabuddin 24/6/67
Zainul Abedin 24/6/67
[illegible] 24.6.67
[illegible] 24/6/67
K. [illegible]